

আল্লামা গোলাম আহমাদ মোর্তজা

ইতিহাসের ইতিহাস

মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ রিসার্চ একাডেমী

স্বচ্ছ চিন্তামূলক একটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান

ইতিহাসের আবরণে বর্ণনা করা অনেক বিষয় বস্তুই সত্যিকার ইতিহাস নয়। মনগড়া কাহিনীক কথার এবং
বিষয়ের ছড়া ছড়িতে অনেক কিছুই ইতিহাসের রূপ ধারণ করেছে এবং কালক্রমে এগুলোই ইতিহাসের
পাতায় স্থানান্তরিত হয়ে ইতিহাস নামে আমাদের চিন্তা-চেতনায় স্থায়ী আসন পেতে বসেছে
এবং এগুলোই আমরা ইতিহাস বলে বিশ্বাস করে আসছি।
-মওলানা আব্দুল কালাম আহাদ

ইতিহাসের ইতিহাস

সংশোধিত সংস্করণ-২০০৩ ইসারী

এতে পাওয়া যাবে প্রকৃত ইতিহাসের তথ্যমূলক আলোচনা, লেখকের বহু পরিশ্রমে
বহু দিবা এবং বিন্দু রজনীর অক্লান্ত চেষ্টার সূক্ষ্ম এবং এগুলো করতে গিয়ে
লেখক হয়েছেন বিভিন্ন মহলকর্তৃক মানুষিক নির্যাতনের শিকার, এতে রয়েছে
আগামী প্রজন্মের প্রকৃত ইতিহাস বিষয়ক ইতিহাসের দিক নির্দেশনা।
আমরা ইতিহাসের নামে যা জেনে আসছি এগুলো কি আসলেই
প্রকৃত ইতিহাস। দেশ ও জাতির কল্যাণে লেখক সেগুলোই
তথ্যসহ উপস্থাপন করে চ্যালেঞ্জ করেছেন, যা পাঠকালে
আপনিও বিম্বিত হবেন। তাই বইটি আপনি পড়ুন এবং
অপরকে পড়তে উৎসাহিত করুন এবং জাতীয়
চেতনা বিকাশের জন্য পরবর্তীদের জন্য
সংরক্ষণ করুন। হয়ত বা তারাই
এ পথ লক্ষ্য করেই রচনা করবে
আর এক সংস্কারধর্মী প্রকৃত
ইতিহাসের ইতিহাস। -তাড়ো
মিথ্যা হবে দূরীভূত সত্য
হবে উন্মোচিত। তখনই
আমাদের পূর্বসূরীদের
চিন্তা সাধনা সার্থক
ও ফলপ্রসূ হবে।

আব্দুল্লাহ গোলাম আহামদ মোর্তজা

ইতিহাস বিশেষজ্ঞ এবং শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ

মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ রিসার্চ একাডেমী

৪৫, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশনায় :

মোহাম্মদ শামসুজ্জামান

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রকাশনা পরিচালক

মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ রিসার্চ একাডেমী

৪৫, বাংলাবাজার, (৪র্থ তলা)

ঢাকা-১১০০

Estd. in the Year March—1997

উপদেষ্টা :

জনাব এডভোকেট মুনিরুজ্জামান

জনাব এডভোকেট লোকমান হোসেন

জনাব অধ্যাপক আতিকুর রহমান ভূঁইয়া

জনাব উবায়দুর রহমান খান নদভী

জনাব অধ্যাপক মিনহাজুর রহমান

প্রকাশকাল :

সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ

সেপ্টেম্বর-২০০৩ ঈসাব্দী

মূল্য : ২০০.০০ টাকা মাত্র

বিদেশে : ১০ ইউ. এস. ডলার

অক্ষর বিন্যাস :

জবা কম্পিউটার

বুকস এণ্ড কম্পিউটার মার্কেট (৪র্থ তলা)

৪৫, বাংলাবাজার

ঢাকা-১১০০

মুদ্রণে :

আকতার আর্ট প্রেস

২/১, তনুগঞ্জ লেন, ঢাকা-১১০০

ISBN—984-624-002-4

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	প্রাচীন ইতিহাসের শব্দ সমীক্ষা	১৩
২.	বিদ্যেশ্বের বীজ বপন	১৪
৩.	আর্যদের ভারত আগমন	১৭
৪.	(ক) 'সংস্কৃত ও ফার্সী, সমার্থবোধক তালিকা	১৯
৫.	(খ) অনুরূপ 'সংস্কৃত ও আরবী' শব্দের সমার্থক তালিকা	১৯
৬.	প্রাচীন ভারতের ইতিহাস	২০
৭.	মহামানবদের পদার্পণ	২৪
৮.	বিশ্ব মুসলিমের ভারত প্রেমের কারণ	২৭
৯.	প্রকৃত ইতিহাস ও ঐতিহাসিকগণ	৩০
১০.	সাম্প্রদায়িকতার ইন্ধনে	৪৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

১১.	মুসলমান আগমনের পূর্বে ভারতের সংক্ষিপ্ত রাজনৈতিক অবস্থা	৫৪
-----	--	----

তৃতীয় অধ্যায়

১২.	মুসলমানদের ভারত আগমনের পূর্ণ তথ্য	৬৬
১৩.	সত্যের অপ-প্রচার	৭৪

চতুর্থ অধ্যায়

১৪.	ঔরঙ্গজেব সম্পর্কিত বিকৃত ইতিহাসের পর্যালোচনা	৮২
১৫.	মুঘল সম্রাট আকবর	৮৩
১৬.	মহামতি স্বধর্মে বিরোধিতা	৯১
১৭.	মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব	৯৬
১৮.	"দীনি-ইলাহী" ও আকবরের বিদায় পর্ব	১৩১

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
পঞ্চম অধ্যায়		
১৯.	আওরঙ্গজেব ও মারাঠা শক্তির উত্থান	১৩৯
২০.	শিবাজী	১৩৯
ষষ্ঠ অধ্যায়		
২১.	মহীয়সী জেবুন্নেসার বিকৃত চরিত্রের আসল তথ্য	১৫২
সপ্তম অধ্যায়		
২২.	সম্রাট আওরঙ্গজেবের পরবর্তী মুঘল বাদশাহগণ	১৫৭
২৩.	হুমায়ুনের আগমন	১৫৮
২৪.	শের শাহ	১৬০
২৫.	জাহাঙ্গীর	১৬১
২৬.	শাহজাহান	১৬৩
অষ্টম অধ্যায়		
২৭.	সম্রাট বাবর	১৬৬
নবম অধ্যায়		
২৮.	ভারতীয় রাষ্ট্র মধ্যে গজনি ঘুর ও শাসকদের অভিযান	১৬৮
দশম অধ্যায়		
২৯.	দাস বংশের প্রতিষ্ঠা	১৭২
একাদশ অধ্যায়		
৩০.	খলজী বংশের উত্থান	১৭৬
দ্বাদশ অধ্যায়		
৩১.	তুঘলক বংশের আবির্ভাব	১৭৯
৩২.	মুহম্মদ বিন তুঘলকের মস্তিষ্ক বিকৃতি না ঐতিহাসিকদের হৃদয় বিকৃতি	১৮০
ত্রয়োদশ অধ্যায়		
৩৩.	প্রাদেশিক মুসলিম রাজ বংশ	১৮৮
চতুর্দশ অধ্যায়		
৩৪.	বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার দুর্লভ ঐতিহাসিক তথ্য	১৯৩
৩৫.	সিরাজের ইতিহাসের জগত শেঠদের ভূমিকা	১৯৬
৩৬.	সিরাজ-উদ-দৌলার বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ	১৯৭

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
৩৭.	অক্ষকুপ হত্যার পশ্চাতে নিষ্ঠুর ঐতিহাসিকতা	১৯৮
পঞ্চদশ অধ্যায়		
৩৮.	সিরাজোত্তর সংক্ষিপ্ত বাংলা	২০৫
ষষ্ঠদশ অধ্যায়		
৩৯.	ভারতের প্রথম স্বাধীনতা বিপ্লবী হযরত শাহ ওলীউল্লাহ দেহলবী (রহঃ) ও পরবর্তী মুসলিম মুজাহিদগণ	২১০
৪০.	বঙ্গে প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের ভূমিকা	২১২
৪১.	সিপাহী বিদ্রোহ না স্বাধীনতা বিপ্লব?	২২৪
৪২.	১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দে সৈন্য বিক্ষোভের ধারাবাহিকতা	২৩০
সপ্তদশ অধ্যায়		
৪৩.	ঐতিহাসিক নেতাদের গুপ্ত ঐতিহাসিক রহস্য	২৫৯
৪৪.	রাজা রামমোহন রায়	২৭৭
৪৫.	অক্ষয় কুমার দত্ত	২৮৬
৪৬.	কেশবচন্দ্র সেন	২৮৮
৪৭.	করমচাঁদ গান্ধী	২৮৯
৪৮.	শ্রী অরবিন্দ	২৯৬
৪৯.	স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী	২৯৮
৫০.	স্বামী বিবেকানন্দ	২৯৯
৫১.	অহরলাল নেহরু	৩০০
৫২.	চিত্তরঞ্জন দাস	৩০৪
৫৩.	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	৩০৭
৫৪.	কায়দে আযম মুহাম্মদ আলি জিন্নাহ	৩০৯
৫৫.	স্যার সৈয়দ আহমদ খান	৩১০
অষ্টাদশ অধ্যায়		
৫৬.	বিখ্যাত হয়েও যাঁরা অখ্যাত	৩১২
৫৭.	মাওলানা শওকত আলী	৩২৭
৫৮.	মাওলানা মুহাম্মদ আলী	৩২৮
৫৯.	শেষের কথা	৩৩১

আমাদের কথা

আল্লামা গোলাম আহমাদ মর্তোজা সাহেব একজন সংস্কারবাদী ঐতিহাসিক এবং বিশিষ্ট লেখক। ইতিহাস প্রণয়নে তিনি জাতি ধর্ম নির্বিশেষে যে ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন তাতে তাঁকে মনোবাদ না জানালে সত্যিই তাঁর প্রতি অবিচার করা হবে। ইতিহাস অনেকেই রচনা করেছেন—কিন্তু গোলাম আহমাদ মর্তোজা সাহেব তাঁদের থেকে ব্যতিক্রমধর্মী। ইতিহাসে তার বেলায় পক্ষপাতিত্বের কোন স্থান নেই—যা শাস্ত্রত সত্য তা অকপটে তুলে ধরেছেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রচলিত ইতিহাসে স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি, মাদরাসায় ছাত্র-ছাত্রীদের যা পড়ান হচ্ছে তাঁর অনেকটাই মুসলিম বিদ্বেষী ইতিহাস। যুগ থেকে যুগান্তরে এসবই চলে আসছে। প্রতিবাদ করার ভূমিকায় কেহ অবতীর্ণ হয়নি, তার একাধিক কারণও রয়েছে। এর মধ্যে অমুসলিমদের লেখা ইতিহাসের সংখ্যা এবং তা ইংরেজী ভাষায় কোন পাঠক যদি নিবিষ্ট মনে তা পাঠ করেন তা হলে সে কারণগুলো সম্পর্কে অবগত হতে পারবেন। এ সমস্ত কারণগুলোই লেখক তাঁর রচিত বইগুলোতে আলোচনা করেছেন। অমুসলিম ঐতিহাসিকগণ ইতিহাস রচনায় সিদ্ধহস্ত। কিন্তু মুসলমানগণও কোন ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম নয়। তারা আরবী, ফারসী, উর্দু প্রভৃতি ভাষায় ইতিহাস রচনা করেছেন। বিশ্ব জীবন ব্যবস্থায় ইংরেজীর প্রচলন ব্যাপক থাকায় এসব ইতিহাস তেমন পাঠকের বা গবেষকের হাতে পৌঁছায় নি। তাই অমুসলিমরা খালি মাঠেই বিজয়ীর ভূমিকায় জনপ্রিয় হয়েছেন। এসব ইতিহাস যদি চর্চা হত তা হলে তাঁদের দুরভিসন্ধি অবশ্যই অনেক ক্ষেত্রেই ধরা পড়ত। যা সমাজে গোলাম আহমাদ মর্তোজার মত গবেষক তৈরী হবার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে—তাঁর গবেষণামূলক ইতিহাস গ্রন্থগুলো যে পাঠকের মনে ব্যাপকভাবে সাড়া দিয়েছে—নতুন নতুন ইতিহাস লেখায় তার রেফারেন্স টানা ইতি মধ্যেই শুরু হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে যে স্বচ্ছ ইতিহাস প্রণীত হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এজন্য মুন্শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ রিসার্চ একাডেমী উক্ত লেখকের বইগুলো ব্যাপক প্রচারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। ইসলাম ও মুসলমানদের সংখ্যার পূর্ণ ইতিহাসের বাজারে বড়ই অভাব, ব্যবসায়িক অর্থে নয় দেশ ও জাতির কল্যাণেই এরূপ প্রচেষ্টা।

এরপরও আমরা বলব প্রচলিত ইতিহাসের পাশাপাশি গোলাম আহমাদ মর্তোজা সাহেবের ইতিহাসগুলো যিনি পাঠ করবেন তিনি এগুলো নিজ পরিবার পাঠাগারে সংরক্ষণের ব্যবস্থা অবশ্যই করবেন—জাতির পক্ষ থেকে এ দায়িত্ব আপনার। হয়ত বা আমরা দেখে যেতে পারব না পরবর্তীতে যে স্বচ্ছ ইতিহাস প্রণীত হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমরা গোলাম আহমাদ মর্তোজা সাহেবের বই প্রকাশ করার উদ্দেশ্য এটাই ইতিহাসের গোলক ধাঁধায় পাঠক যে হাবুডুবু খাচ্ছে তা থেকে টেনে উদ্ধার করার জন্য। এগুলো ব্যাপকভাবে প্রচারিত হলেই প্রচলিত ইতিহাসের দুরভিসন্ধি উদ্ঘাটিত হবে। আমরা কায়মনো বাক্যে এ লেখকের জন্য মহান আল্লাহ্ তায়ালার কাছে সুদীর্ঘ জীবন কামনা করছি। যাতে তিনি ইতিহাসের সংকীর্ণতা দূরীভূত করে প্রকৃত ইতিহাসের আলোকিত পথে লেখনীতে সমৃদ্ধ করে দেশ এবং জাতিকে সমৃদ্ধ করে যেতে পারেন। আর একটি কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ইতি মধ্যে গোলাম আহমাদ মর্তোজা সাহেবের গবেষণামূলক লেখনীর জন্য মুন্শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ রিসার্চ একাডেমী তাঁকে আল্লামা উপাধিতে ভূষিত করেছেন। সংস্কারপূর্ণ এবং সাম্প্রদায়িক বিশেষ পরিহার করে স্বচ্ছ ইতিহাস সমাজে বাস্তবায়নের জন্য আমরা তাঁর বই প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছি—তাছাড়া আর কোন ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য আমাদের নেই। মুন্শী মেহেরুল্লাহ রিসার্চ একাডেমী প্রতিষ্ঠার পর থেকে যারা নানানভাবে উপদেশ, পরামর্শ ও সহযোগিতা করে আসছেন এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট হয়েছেন সুমহান আল্লাহ্ তায়ালার তাঁদেরও পারলৌকিক মংগল প্রদান করুন।

মহান আল্লাহ্ তায়ালার আমাদের উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করুন। সফলতার পথে পরিচালিত করুন এ কামনা করেই বক্তব্যের পরিসমাপ্তি টানছি। আমীন!

বিনীত

ঢাকা

৫৮ - ৩৮ - ০৩ ঈসারী

মোহাম্মদ শামসুজজামান
প্রতিষ্ঠাতা ও প্রকাশনা পরিচালক

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

ইতিহাসের ইতিহাস

প্রথম অধ্যায়

প্রাচীন ইতিহাসের শব্দ সমীক্ষা

আমরা প্রত্যেকেই জানি ইতিহাস অতীতের ঘটনাবলীকে বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য আমাদের কাছে মূর্তমান হয়ে চির জীবন্তের অভিনয়ে চলে এবং আমাদের জ্ঞান, বুদ্ধি ও চিন্তার উৎকর্ষ সাধন করে। এক কথায়, ইতিহাস আমাদের যাত্রাপথের পাথেয় লাদানে দৃষ্টান্ত বিহীন সামগ্রী। এর অভাবে আমাদের সবই যেন অচল। বরগীয়ে, মাননীয়, শ্রবণীয় সব সুধীবৃন্দের কথা আমরা বিশ্বস্ত হব আর পুরাতন অভিজ্ঞতা অভাবে আমাদের থেকে হবে শোচনীয়ভাবে সর্বশাস্ত ও বিভ্রান্ত।

ইতিহাসের নাম বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন রূপ। যেমন বাংলায় 'ইতিহাস', ইংরাজীতে History (আরবীতে তা-খি, উর্দুতে 'তা-খি', হিন্দিতে 'ইতিহাস' প্রভৃতি)।

ইংরেজীতে 'H' একটা অক্ষর, 'Hi (হাই) অর্থে 'এ' (Word calling), 'His' অর্থে 'তার' (Possessive form of he), Story অর্থে 'ইতিকথা', 'বানান গল্প', Tale (an account of Past event)। তাহলে His+ Story=History. এবার যদি কেহ প্রতিবাদ করে বলেন যে, History এর বানান Hisstory হলনা কেন? তাহলে প্রতুত্তরে বলতে হয়, Hiss মানে বিষাক্ত সাপের হিস হিস শব্দ (Sharp sound that of a snake আর যদি His+tory 'রূপে সন্ধি বিচ্ছেদ করা হয় তাহলেও কম মারাত্মক হবেনা। tory মানে A consecutive Member of England., ইংলণ্ডের রক্ষণশীল দলের সভ্য, (বিলেতের সংকীর্ণমনা সাম্প্রদায়িক দলীয় স্বার্থপর একটি অতি গোড়া দল)

তাহলে History কথাটি বহু তথ্যপূর্ণ সন্দেহ নেই। ভারতের রাষ্ট্র ভাষা হিন্দি এবং বাংলাতেও 'ইতিহাস' কথাটি নিরর্থক নয়। ইতিহাসের 'ই' বাংলা বর্ণমালার তৃতীয় অক্ষর; 'ই' মানে কামদেব (ঠাকুর দেবতা), 'ইত' মানে 'গত', 'ইতি' মানে 'এ', 'ইতহ' মানে 'লেখক পরম্পরাক্রমে প্রচলিত কথা' (সত্য বা অসত্য যাই হোক), 'হাস' মানে 'হাস্য করা', 'ইতিহাস' মানে 'পুরাতন কথা'; এখানেও নিরপেক্ষ তাত্ত্বিক বিচারে আমরা ইতিহাসের অর্থ পাই কামদেব, গত, খতম করা, অর্থশূন্যতা, কিংবদন্তী বা লোককথা, পুরাতন কথা, হাসি, তামসা ইত্যাদি।

বর্তমান সভ্যতার ইতিহাসে মঞ্চে সঠিক তারিখ ও স্বাক্ষর প্রমাণ থাকলে তাহলে 'ইতিহাস'; নচেত তা রূপকথা, ভূত, রাক্ষস, প্রভৃতি পুরাণ পাঁচ কাসুন্দির ন্যায় মন মাতান গল্প বই কিছু নয়। আরবী ও উর্দুতে ইতিহাস অর্থে 'তা-রিখ' যে শব্দটি এটি আমাদের বাংলা ভাষায় সর্বজন ব্যবহৃত শব্দ। অতএব দিন পন্ডি, তারিখ, কাল, সময় প্রভৃতি সম্বন্ধে সমীক্ষান্তে আরবদেরও ইতিহাসের চরিত্র সহজেই অনুমেয়।

পৃথিবীতে বহু জাতি, বহু ভাষা, বহু ধর্ম ও মত থাকলেও ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য অবদান সকলেরই নেই। ভারতের ইতিহাস জানতে হলেও ভারতীয় ভাষায় ইতিহাস পাওয়া যায় বটে কিন্তু তাতে Reference বা উদ্ধৃতি যা পাওয়া যায় তা বেশীর ভাগ ইংরেজী। আর উর্দু ও ইংরাজী ইতিহাস পড়লে পাওয়া যাবে সে সব ইতিহাসের উদ্ধৃতি—ঐতিহাসিকদের মন্তব্য যা আরবী ফারসী, উর্দু প্রভৃতি ভাষা কেন্দ্রিক। এসব গোড়ার কথাগুলো না জানলে আমরা বক্ষ্যমান আলোচনা স্রোতে সাঁতার দিয়েও পাওয়া যাবেনা পর্যাপ্ত তৃপ্তি আর আনন্দের অকৃত্রিম স্বাদ।

বিদ্বেষের বীজ বপন

বর্তমান বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান (যা দেশ বিভাগের পূর্বাঞ্চে ছিল অবিভক্ত ভারতবর্ষ) যে সব ইতিহাস পড়া বা পড়ান হয় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তা ইংরেজী প্রভাবে প্রতিষ্ঠিত। সুচতুর ইংরেজরা ভারতবর্ষে যখন ছুঁচ হয়ে ঢুকেছিল তখন ভারতবর্ষ ছিল মুসলমানদের শাসনাধীন এবং যখন ইংরেজরা ছলে-বলে, কলে-কৌশলে মহা শক্তিদ্বারা হয়ে আত্মপ্রকাশ করে ভারতকে নিজেদের বলে টুটি চেপে ধরতে চেয়েছিল সেও মুসলমানদের শাসনকালে। কিভাবে ও কেমন করে তা সম্ভব হয়েছিল সে আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়সমূহে আসছে। তবে ইংরেজরা বুঝেছিল মুসলিম জাতি মণিহারা ফণির মত দিশেহারা হয়েছে এবং যে মাটি, যে যশ, যে সুযোগ, যে কৃতিত্ব তাদের হাতছাড়া হয়েছে তাঁরা প্রতি মুহূর্তের তার প্রতিশোধের প্রতিক্ষায় থাকবেই।

ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমান মূল জাতি দুটি ভারতের ইতিহাসে, ভারতের আকাশে বাতাসে, অতীতে-বর্তমানে-ভবিষ্যতে প্রাণ আর দেহের মত ওতপ্রোত ভাবে জড়িত ছিল বা আছে। অন্যান্য জাতি বা উপজাতি ভারতে বহু আছে স্বীকার করলেও অনেকের মতে সে গুলো এ দুটিরই শাখা প্রশাখা মাত্র।

সুচতুর ইংরেজরা জানত শরীরের সর্বত্রই রোগের প্রকাশ যত ব্যাপকই হোক না কেন সাধারণত হাতে ইন্জেকশন দিলেই সব জায়গায় ঔষধ পৌঁছায়। তাই ভারতবর্ষকে পদানত রাখার জন্য আবিষ্কার করল এক মহৌষধ। সাম্প্রদায়িকতার চেষ্টা করতে পারবেনা।

প্রথমতঃ সব সময় নিজেদের মধ্যে বিবাদ, কলহ আর প্রতিশোধ প্রবণতার সময় ও শক্তির ক্ষয় হবে।

দ্বিতীয়তঃ সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু জাতিকে ইংরেজরা মিত্র বা বন্ধু রূপে পেতে পারবে। ইংরেজরা এও বিশ্বাস করত যে হিন্দুজাতি ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বা

লড়াতে যাবেনা, কারণ মুসলমান শাসকদের অধীনে থাকা বা এর শাসকদের অধীনে থাকা একই কথা বরং অমুসলমান ভারতীয়দের মানসপটে এ ধারণাই বদ্ধমূল করে দেয়া হয়েছিল যে, মুসলমান শাসনাধীন থাকার চেয়ে ইংরেজ শাসনাধীন থাকা অধিক সুখকর হবে। কিন্তু এ ধারণার অবসান হয়েছিল তখন যখন ভারতের হিন্দু মুসলমান এক মন, এক পণ ও এক শপথ নিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছাতে গিয়ে শক্ত হাতে ধরেছিল স্বাধীনতার হাতিয়ার।

ইংরেজরা এটাও অত্যন্ত দৃঢ়চিত্তেই জানত যে সারা বিশ্বের সমস্ত মুসলমানগণ ছিলেন মহাশত্রু পবিত্র কুরআন শরীফ আর বিশ্বত্রাতা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তথা তদানীন্তন আরব সভ্যতার উপর শ্রদ্ধা ও আস্থাশীল। তাই ভারতে মুসলমান আমলে জাযার ক্ষেত্রে আরবী, ফারসী ও উর্দু সভ্যতার সংমিশ্রনে নূতন এক সংস্কৃতি ও সভ্যতার সৃষ্টি হয়েছিল। কোর্ট কাছারী, আইন আদালতের ক্ষেত্রে দলিল দরখাস্ত লকৃতি ফারসী ভাষায় হত আর ব্যক্তিগত আদান-প্রদানে হিন্দু মুসলমান প্রত্যেকেই রাজকীয় ভাষা আরবী ফারসী ও উর্দু মিশ্রিত সভ্যতা বহন করতেন। তাতে দুঃখ, লজ্জা কিংবা ঘৃণা ও দ্বিধাদ্বন্দ্বত ছিলইনা বরং প্রকাশ পেত আভিজাত্য আর শিক্ষা সুলভ যোগ্যতা।

ইংরেজরা এ ঐতিহ্যবাহী চলন্ত উজ্জল ধারাটিকে চাইল ম্লান করতে, চাইল ধ্বংস ও চিরকন্দ করতে। আর সর্বাত্মে তারই প্রথম প্রয়োগ বা প্রয়াস স্বরূপ সৃষ্টি হল ইতিহাসে ডেজাল প্রদান; এমন ভাবে ইতিহাস রচিত হল যা পড়লে ক্ষণে ক্ষণে ভেসে উঠে যেন মুসলমান জাতি, হিন্দুদের উপর অত্যাচার করেছিল। নূতন ইতিহাসে যেন মুসলমানদেরকে চিরশত্রু এবং হিন্দু বিদ্বেষী রূপে চিত্রিত করা হল এবং ধারণার উৎপত্তি সাধন করা হল যে, যে বাদশাহ বা শাসক যত বেশী ইসলাম ধর্মের ভক্ত তিনিই তত বেশী পরিমাণে হিন্দু বিদ্বেষী।

এর কারণ ছিল মোটামুটি দুটি। প্রথমতঃ এর ফলে সহজেই অমুসলমান পাঠকবর্গ মুসলমানদের উপর প্রতিশোধ প্রবণ ও শত্রু হয়ে উঠবে। আর দ্বিতীয়তঃ আধুনিক শিক্ষিত মুসলিম সমাজ ধর্মের উপর ঘৃণা ভাব পোষণ করবে এবং অনাস্থা আসবে তাদের ধর্মভীরুতার উপর। যার ফলে তারা সোনার পাথর বাটীর মত মুসলমান নামধারী খৃষ্টান অথবা অন্য কিছু অদ্ভুত নূতন খৃষ্টান দল হবে যা ইংরেজ শক্তিকে বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করবে দিনের পর দিন।

মুসলমান রাজা বাদশাদের মধ্যে অনেকেরই স্বধর্মের বিরুদ্ধাচরণ এবং চরিত্রহীনতার চরম পরিচয় প্রদান সত্ত্বেও ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ ও তাঁদের শোষাপ্রদর্শন ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে রং বে-রংয়ের উপাধির মালা পরিয়ে তাঁদেরকেই ইতিহাসে হিরো (Hero) মহামতি (The great) ইত্যাদি ভূষণে ভূষিত করার চেষ্টা করেছেন। তার ফলে মুসলিম শিক্ষিত সমাজধর্মে এবং সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে লাথি মেরে অথবা উপেক্ষার বাণ হেনে উদারচেতার উৎকট উপাধি পাওয়ার অভিযানে যেন উঠে লড়ে লাগতে চায়।

সারা বিশ্বে মুসলমান জাতি কম বা বেশী তাঁদের মূলধন পবিত্র কুরআন শরীফ এবং হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনদর্শন আর বাণীকেই পুঁজি করে শিক্ষার ক্ষেত্রে, রাজনীতির ক্ষেত্রে, ধর্মের ক্ষেত্রে, কর্মের ক্ষেত্রে এবং চিন্তা-চেতনা ও জীবনের যে কোন সাধনার ক্ষেত্রে সারা বিশ্বকে চমক লাগিয়ে দিয়েছে। শুধুমাত্র নিজেরাই উন্নত হয়ে ধনা হযনি বরং সে যার উপর কোমল কঠিন আঘাত করেছে সেও উপকৃত, সভ্য ও সুন্দর হয়েছে। আবার মুসলমানদের যারা ধ্বংস করার জন্য অথবা অন্য কোন কারণে আঘাত করতে গিয়েছে ইতিহাস প্রমাণ করে শুধু প্রতিঘাত ছাড়াও তাঁরা বহু দিকে লাভবান হয়েছেন। আঘাতকারী দল কলা-কৌশল, আক্রমণ, প্রতিরোধ গেরিলা পদ্ধতি ইত্যাদি শিখে অবশ্যই লাভবান হয়েছেন।

পূর্বোক্ত বক্তব্য প্রমাণোদ্দেশ্যে শ্রী অবিনাস ভট্টাচার্য, এম. এ. পি. এইচ. ডি. এবং অনিল কুমার দাস, এম. এ. বি-টি মহোদয়ের লেখা থেকে কিছু অংশ গভীর শ্রদ্ধার সাথে তুলে ধরছি। “...ভারতীয় সমাজ, ধর্ম, শিল্প প্রভৃতির উপর ইসলামের প্রভাব লক্ষ্য করা যায় কালক্রমে বহু হিন্দু ইসলামধর্মে দীক্ষিত হয়। ইহাদের মারফত হিন্দু আচার রীতি-নীতি মুসলিম সমাজে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে যেমন প্রভাবিত করিল তেমনি ইসলামের সংস্পর্শে আসিয়া হিন্দু সমাজ অধিকতর গোঁড়া রক্ষণশীল হইয়া উঠিল। কিন্তু ধীরে ধীরে ইসলামের প্রভাবে হিন্দু ধর্ম ও সমাজ অধিকতর উদার ও সাম্যভাবাপন্ন হইয়া উঠিত থাকে।”

অবশ্য একথাও মনে রাখতে হবে মুসলমান রাজা-বাদশাগণ ভাল মন্দ যাই কিছু করেছেন তাই কুরআন হাদীসের নির্দেশ নয়। যেখানে অত্যাচার, অনাচার, অবচার সেখানে আইনের দোষ নয়; বরং সেখানে তাঁদের ব্যক্তিগত অপরাধ ত্রুটি ও চারিত্রিক কলঙ্ক ছাড়া অন্য কিছু মনে করা চলে না।

পূর্বেই বলা হয়েছে ইংরেজদের প্রয়োজন ছিল হিন্দু ও মুসলিম জাতির মধ্যে বৈরীতা বা শত্রুতা সৃষ্টি করা। তাই মুসলমান মাওলানা, মৌলবী, মোল্লা, মুফতি, কাজী প্রভৃতি পণ্ডিতদের সম্মানীয় উপাধিকে ছোট করে দেখাবার জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করা হয়েছিল। অবশ্য তাঁরা বিজয়ীও হয়েছিলেন অনেকাংশেই। আজও আমাদের দেশে ‘মোল্লা’ যেন একটা ঘৃণ্য শব্দ, ‘কাজী’ উপাধিও মনে করিয়ে দেয় খামখেয়ালী অন্যায্য বিচারের কথা, সাধারণ সমাজের অনুমান কাজীর বিচার মানেই অবিচার; অথচ কাজী, মৌলবী, মাওলানা, মোল্লা উপাধিদারী মনীষীগণ ছিলেন নানা ভাষা ও অভিজ্ঞতায় সুপণ্ডিত। আবার প্রায় সকল ক্ষেত্রেই ইংরেজরা মুসলমান রাজা-বাদশাদের প্রশংসা করতেও ভোলেনি, কারণ শুধু যদি দুর্গাম আর দোষ বর্ণনা করা হয় তাহলে বর্ণনাকারীকে নিরপেক্ষ মনে নাও থেকে পারে। তাই বোধহয় আজ বর্তমান ইতিহাস মঞ্চে প্রশংসার দুগ্ধ বর্ষণ শেষে সামান্য গোমূত্র প্রয়োগ।

সবচেয়ে দুঃখের বিষয় ভারতের দু’টি বিশিষ্ট জাতি হিন্দু ও মুসলমান যদি ইংরেজদের এ ঔষধ সেবন না করত তাহলে অনেকের মতে আমাদের সাধারণ ভারতবর্ষ আজ তিন খণ্ডে খণ্ডিত হতনা এবং শত সহস্র বরং লাক্ষ লাক্ষ হিন্দু মুসলমান ভারতবাসী টুকরা টুকরা হয়ে রক্তাক্ত মৃত্যুর কোলে ছিটকে পড়তনা।

এখন এদেশ থেকে ইংরেজ বিতাড়িত। কিন্তু তাদের প্রয়োগকৃত ঔষধ আমাদের পেটে আছে তাই সাম্প্রদায়িকতা এবং ইতিহাসে ভেজাল দেয়ার ভয়াবহ ব্যাধি থেকে আজও ভারতবাসী মুক্ত বলে মনে হয় কি?

আজও মুসলমান জাতিকে যদি বিদেশী মনে করা হয় তাহলে নিঃসন্দেহে তা ত্রুটিপূর্ণ ধারণা। কেননা যারা বাইরে থেকে আক্রমণ করে লুটপাট করে ক্ষণিক পরেই করেছে পলায়ন তাদের বিদেশী নামে অভিহিত করা যায়, কিন্তু এদেশের আর্থ সভ্যতা এবং মুসলমান সভ্যতা ভারতের বাইর থেকে এলেও এরা উভয় জাতি ভারতে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করেছেন; এদেশকে নিজের দেশ বলে স্বীকৃতি দিয়ে ও নিয়ে এ দেশেরই সার্বিক উন্নতির জন্য শক্তি ও শ্রম, সময় ও অর্থ সবই ব্যয় করেছেন। বংশপরম্পরায় এখানে জন্মে এ ভারতেরই মাটিতে যারা নিজের দেহকে দিলেন মিশিয়ে তাঁদের বিদেশী বলে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করলে তা হবে চরম সংকীর্ণতার পরিচয়। আর যদি একান্তই কালের চক্রান্তে এটাই হয় চূড়ান্ত তা হলে মুসলিম সভ্যতা ও আর্থ সভ্যতা দু’টিকেই একই কষ্টি পাথরে বিচার করা দরকার। তাতে প্রমাণিত হবে এ দু’টি সভ্যতা হয় স্বদেশী নতুবা বিদেশী।

আর্যদের ভারত আগমন

বর্তমান ভারতে সরকার অনুমোদিত নবম, দশম ও একাদশ শ্রেণীর পাঠ্য-পুস্তকের ইতিহাস থেকে আর্যজাতি সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তা সামান্যই তুলে ধরছি—

“পণ্ডিতদের মধ্যে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া আর্যদের আগমনকাল ও বসতিকেন্দ্র লইয়া তর্ক চলিতেছে। কেহ বলেন, পূর্ব ইউরোপ হইতে, কেহ বলেন, দক্ষিণ রাশিয়া বা উত্তর মেরু হইতে আর্যরা আসিয়াছেন। বিগত উনিশ শতকের মাঝামাঝি হইতে পণ্ডিত ম্যাক্সমুলার এবং তাঁহার মত আরও কয়েকজন ভাষাতত্ত্ববিদ প্রচার করিতে থাকেন যে, মধ্য এশিয়ার কোন স্থানে আর্যদের আদিবাসস্থান ছিল, সেখান হইতে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বা অন্য কোন কারণে পশ্চিমে ও দক্ষিণে নানা দেশে ছড়িয়ে পড়েন। কয়েকটি দল যান ইউরোপে এবং সেখানে রুশ, গ্রীক, জার্মানী, ফ্রান্সে প্রভৃতি দেশে উপনিবিষ্ট হন। এসব দেশে স্বাব, ইতালীয়, টিউটন ও কেল্ট জাতীয় লোকেরা আর্যদের বংশধর। যাঁহারা দক্ষিণদিকে আছেন তাঁহারা পারস্য উপনিবিষ্ট হন এবং পরে পারস্য হইতে এক দল ভারতে আসেন। কেহ কেহ মধ্য এশিয়ার বদলে পূর্ব ইউরোপকে আর্যদের আদিবাসকেন্দ্র বলেন। তাঁহাদের মতে আর্যরা সেখান হইতে প্রথমে মেসোপটেমিয়া আসেন এবং পরে তাঁহাদের কয়েকটি দল পূর্ব দিকে পারস্যে ও ভারতবর্ষে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন।” সম্প্রতি পণ্ডিতরা বলিতেছেন খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০ বছরের দিকে মধ্য বা পূর্ব ইউরোপের কোন অংশে অথবা রুশ দেশের উরাল পর্বতমালার সমতল ভূ-ভাগে ইন্দো ইউরোপীয় বা আর্য জাতির উৎপত্তি হয়। অত্যাধিক শীতের জন্য হোক বা অন্য জাতির আক্রমণের ফলেই হোক এই আর্যরা পিতৃভূমি হইতে পূর্বে, দক্ষিণে ও পশ্চিমে ছড়াইয়া পড়িতে বাধ্য হন। বাস্তব সভ্যতায় ইহারা যে খুব উন্নত ছিলেন তাহা নহে।”

প্রসঙ্গত আর একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিকের উদ্ধৃতির লোভ সংবরণ করা গেলনা। তিনি বলেন, “খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্বে অর্থাৎ আজ হইতে প্রায় চার হাজার বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম সীমান্তের দুর্গম গিরিপথ পার হইয়া আর্য জাতির এক শাখা পশ্চিম-পাঞ্জাবে উপনিবিষ্ট হয়। তাহাদের পূর্বে এদেশে কোল-ভীল-সাঁওতাল প্রভৃতি অসভ্য জাতি এবং দ্রাবিড় নামক সুসভ্য জাতি বাস করিত।

(বাংলা সাংখ্যিকের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস; শ্রীঅসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এ. ডি. ফিল, অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য যে, এ উদ্ধৃতি ক’টিতে একটি বর্ণও যোগ বা বিয়োগ করার দুঃসাহসিকতা প্রদর্শন করা হয় নাই। অতএব এখানে পরিষ্কার প্রমাণিত হয় যে আর্যজাতি মানেই বিদেশীয় বিলেতি জাতি; এ ছোট্ট কথাটি মনে রাখলে তখনই মুসলমান স্বদেশী কি বিদেশী পার্থক্য বুঝতে অসুবিধা হবেনা। পারস্যকে ইরান বলা হয়, আর আরবেরা পারস্যকে ফারস বলে এবং পারস্যের ভাষাকে ফারসী বলে, ‘প’ কে ‘ফ’ বলার একটা কারণ হচ্ছে এটাই যে, আরবী বা আরব বর্ণমালায় ‘প’ বলে মোটেই কোন অক্ষর নেই; তৎপরিবর্তে আছে ‘ফে’ বা ‘ফ’। আর পারস্যের ভাব, ভাষা, চরিত্র ও রক্তের সাথে আমাদের যথেষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। এতদ্ব্যতীত গবেষণান্তে এও প্রমাণ পাওয়া যায় যে আরবী ভাষী; পারসী ভাষী ও আর্যগণ পরস্পর নিকটবর্তী একই অঞ্চলে বাস করেছিলেন এবং বহুকাল পর তাঁদের পরস্পরের ভাষা ও শব্দের সাথে পারস্পরিক সংমিশ্রণ ঘটে।

তখনকার দিনে হিন্দু আর্যগণ আরবী ও পারসী শিক্ষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও আগ্রহশীল ছিলেন, তার প্রমাণ স্বরূপ শাস্ত্রের কিছু বাণীর উদ্ধৃতি এখানে দেয়া হল :

“জ্যৈষ্ঠা শ্রেষা মশা মূলা রেবতী ভরণীদ্বয়ে।

বিশাখা শোণবামাড়া শতর্থে পাপ বাসরে—

লগ্নে স্থিরে সচন্দ্রেচ পারসী মারাবীং পঠেত—”

ইতি—

গণপতি মুহূর্ত চিন্তামণি

(শব্দ কল্পদ্রুম ও বিশ্বকোষ হইতে উদ্ধৃত)

অর্থ : জ্যৈষ্ঠা, অশ্রেষা, মঘা, মূলা, রেবতী, ভরণী, বিশাখা উত্তরষাঢ়া ও শতভিষা নক্ষত্রে, শনি রবি ও মঙ্গলবারে সচন্দ্রস্থির লগ্নে আরবী ও পারসী পড়াশোনা করবে।

“আর্য ও পারসিকেরা বহুদিন হইতে যে সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাহা এই উভয় জাতির ভাষা ও আচার ব্যবহার দ্বারা প্রমাণ করা যাইতে পারে।”

(বিশ্বকোষ কর্তা প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের লেখা থেকে)

পারসীদের ন্যায় অতটা ঘনিষ্ঠ সংস্রব না থাকলেও আরবদের সাথেও তাদের যে পারিবেশিক সংস্রব ছিল তাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রমাণিত। উপরে উল্লেখিত সত্য দু’টির যথার্থতা প্রমাণে নিম্নে যথাক্রমে ‘সংস্কৃত ও ফার্সী’ শব্দের এবং ‘সংস্কৃত ও আরবী’ শব্দের সমার্থবোধক তালিকা উল্লেখ করা হল।

(ক) ‘সংস্কৃত ও পার্সী, সমার্থবোধক তালিকা

সংস্কৃত	ফার্সী	সংস্কৃত	ফার্সী
১। শত	ছদ	৭। মেঘ	মিশ
২। সত্ত্বাহ	হফতা	৮। গ্রীবা	গ্রেব্বা
৩। শৃংখল	শেগাল	৯। দেব	দেও
৪। মাস	মাহ	১০। আম	আম
৫। সপ্তসিন্দু	হপ্তসিন্দ	১১। শকরা	শাকর
৬। উত্তর	গুতর	১২। এক	য়াক
			(ইত্যাদি)

(খ) অনুরূপ ‘সংস্কৃত ও আরবী’ শব্দের সমার্থক তালিকা

সংস্কৃত	আরবী	সংস্কৃত	আরবী
১। আনন্দ	আফৎ	৭। আর্য	আরিয়া
২। ছত্র	ছতর	৮। সর্দি	ছার্দী
৩। মা	উম্মা	৯। দ্রাবির	দ্রায়িদ
৪। কপূর	কাফুর	১০। চন্দন	সন্দল
৫। হলাহল	হলাহল	১১। শীত	শীত
৬। গণা	গেনা	১২। অল্প	আল্লাহ
			(ইত্যাদি)

অল্প মানে ‘পরমেশ্বর, ‘পরম দাতা’ (বাংলা অভিধান)

হিন্দু লেখকের ‘বিশ্বকোষ’ গ্রন্থে ১ম খণ্ডে ৫৮৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে “অল্প”, (আল্প, আল্পা) অর্থাৎ মুসলমানদের উপাস্য পরম দেবতা। আমাদের অর্থ বর্ণ সূত্রের ঐ পরম পুরুষের উপাসনার কথা উল্লেখিত আছে।

এখন ইরান ও পারস্য থেকে কেমনভাবে আর্যগণ ভারত তথা নানা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল সে সম্বন্ধে গবেষণান্তে যা পাওয়া যায় তা মোটামুটি নিম্নরূপ :—

ইরান দেশে জরদশত্ নামে এক মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করেন। ইনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা’য় (Encyclopædia Britannica) ‘Zoroaster’ এবং ‘বিশ্বকোষ’ এ “জরসুস্ত্রস্পিতম” নামে ডাকা হয়েছে। ইরানী ইতিহাসের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক Sir Percy Sykes এর বক্তব্যের ছায়াবলম্বনে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, শালতাশপ নামক জনৈক রাজবংশীয় ক্ষমতা ও প্রতিপন্ন সম্পন্ন পুরুষ জরদশতের শিষ্য হন। তখন সেখানে ভারতের পুরাতন ধর্ম অনুযায়ী পূজা পার্বণের মূল জোড়াল নীতির প্রচলন ছিল। কতটা বাড়াবাড়ি ছিল তা বিখ্যাত এক পণ্ডিতের পুস্তকের একাংশ তুলে ধরলাম; পাঠকের পক্ষে এটুকুই বোঝার পক্ষে পর্যাপ্ত হবে বলে মনে করি।

“প্রকৃতির প্রত্যেক অবদান—এমন কি ভেক পর্যন্ত ছিল তাহাদের পূজার দেবতা। বিবাহ পদ্ধতিতেও নানা প্রকার অনাচারের প্রাদুর্ভাব ছিল। হিন্দুদের মত তাদের মধ্যে নরমেঘ যজ্ঞের প্রচলন ছিল। দাস প্রথা ইত্যাদির ত কথাই নেই।”

যাহোক, গাশতাশপের এবং তার সভাসদ তথা বেশীর ভাগ লোকের নূতন ধর্ম গ্রহণের পর পুরাতন ও নূতন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। পুরাণের কাহিনী অবলম্বনে শেষ যুদ্ধটি সংঘটিত হয় সবজা ওয়ার শহরের পশ্চিমাংশে। তুরাণীদের আক্রমণে বৃদ্ধ গাশতাশপ নিহত হন; কিন্তু প্রচলিত মতানুসারে, তিনি উপাসনার মধ্যেই শিষ্যবৃন্দের সম্মুখে পরলোক গমন করেন। তিনি প্রচার করেছিলেন সৃষ্টিকর্তা এক; তিনি ছাড়া আর কারো উপাসনা নিষেধ। সোণতার রস ও মদপান নিষেধ। পরকাল ও ভাগ্যকে বিশ্বাস করতে হবে।

মোটকথা উপরোক্ত যুদ্ধের স্বভাবিক ফলাফল দাঁড়াল এটাই যে, পরাজিত মূর্তিপূজক বা পুরাতন আইন পদ্ধতির অনুসরণকারীরা নানা দিকে দেশ ত্যাগ করে চলে আসেন। ভারতের কাশ্মীর ও এলাহাবাদে আর্যদের আগমন এভাবেই হয়েছে।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস

ভারতের প্রাজন্ম ইতিহাস বলতে ‘বেদ নামে পরিচিত চারিখানি ধর্ম পুস্তকের বিশেষত ঋগ্বেদ’ আবার রামায়ণ ও মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থগুলো অনেকের মতে মূল ইতিহাস বলে গ্রহণীয়। কিন্তু বাইরের ইতিহাসগুলো বাদ দিলে এগুলোতে যে তথ্য বা তত্ত্ব আছে তা প্রকৃত ইতিহাসের উপাদান হিসেবে নগণ্য। তবে মুসলিম ইতিহাস ও ইংরেজদের ইতিহাসে পরিপক্ক জ্ঞান থাকলে এ সমস্ত গল্প কাহিনী থেকে কিছু কিছু যোগ বিয়োগের মাধ্যমে কোন কোন স্থানে খাপ খাওয়ান যেতে পারে। জানা দরকার পুরাতন পুস্তক মাত্রই ইতিহাস নয়। অনেক মুসলমান পুঁথি লেখকও লিখেছেন এসব কায়দায়। যথা—

“লাখে লাখে মর্দুহব ছহিদ হইল, লোহতে লাল হয়ে দরিয়া বহিল” ইত্যাদি ইত্যাদি। এর নাম ইতিহাস নয়। তেমনি আবার অনেক বিজ্ঞজনের মতে রামায়ণ মহাভারতের মধ্যেও অনেক কিংবদন্তী ও অসার কল্পকাহিনী রয়েছে যা ইতিহাসরূপে মর্যাদার অধিকারী নয়। যেমন বিখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশ মজুমদারের মতে আর্য জাতির জন্ম সম্বন্ধে পুরাণ ও মহাভারতে উল্লেখ আছে :

“দীর্ঘতমা নামে এক বৃদ্ধ অন্ধ ঋষি যযাতির বংশজাত পূর্ব দেশের রাজা মহাদার্মিক পণ্ডিত প্রবর সংগ্রামে অজেয় বলিয়া আশ্রয় লাভ করে এবং তাহার অনুরোধে তাঁহার বাণী সদ্বেজ্ঞা গর্ভে পাঁচটি পুত্র উৎপাদন করেন। ইহাদের নাম অঙ্গ, কলিঙ্গ, পুন্ড্র, সুক্ষ ও বঙ্গ। তাঁহাদের বংশধরেরাও তাঁহাদের বাসস্থান ও তাঁহাদেরই নামে পরিচিত। অঙ্গ বর্তমানে ভগলপুর এবং কলিঙ্গ, উড়িষ্যা ও তাহার দক্ষিণবর্তী ভূভাগ; পুন্ড্র, সুক্ষ ও বঙ্গ যথাক্রমে বাংলার উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ ও পূর্বভাগ। সুতরাং এসব পৌরাণিক কাহিনী মতে উল্লিখিত প্রদেশের অধিবাসীরা এ জাতীয় এবং আর্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের মিশ্রণে সমুদ্ভূত। এসব কাহিনী ঐতিহাসিক বলে মোটেই গ্রহণ করা যায় না।”

ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণগণ স্বামীর আদেশক্রমে পরপুরুষ বা অপর ব্রাহ্মণের দ্বারা সন্তান উৎপাদন করলে সেসব সন্তানকে বলা হয় ক্ষেত্রজ সন্তান। কিন্তু বর্তমান যুগে কেহই সেটাকে ধর্ম বলবে না বরং বলবে ব্যভিচার। ধর্মগ্রন্থের শাস্ত্রকারগণ বাংলাদেশের অধিবাসীদিগকে রাক্ষস, পিশাচ, অসুর প্রভৃতি বলে উল্লেখ করেছেন, এমনকি স্বয়ং “জগদান মনুও” ব্যবস্থা দিয়েছেন যে, “তীর্থ যাত্রা ব্যতীত গমন করিলে তাহাকে পুনরায় সংস্কার গ্রহণ করিতে হইবে।”

ঋগ্বেদের উপর অনেকেরই পরিপূর্ণ বিশ্বাস যে এর নাকি একটি অক্ষরেরও পরিবর্তন হয়নি, অবিকলরূপে পূর্বাবস্থায় বর্তমান আছে। কিন্তু এ কথা যে সর্বদা সত্য নয় তা নিচের আলোচনাতে তা পরিষ্কার হয়ে উঠবে।

হিন্দু সমাজে জাতিভেদ প্রথা মারাত্মকভাবে প্রচলিত; কিন্তু বর্তমান যুগে বহু নির্দিষ্ট মানুষ ধর্মের এ অংশের ভুল অর্থ করতে দ্বিধা করছেন না। ঋগ্বেদের ১০ম মন্ডলের ৯০ সূক্তটি “পুরুষ সূক্ত” বলে বিখ্যাত। এ সূক্তের শেষের দিকে জাতি বিভাজনের ব্যবস্থা দেয়া রয়েছে যথা :—“সেই বিরাট পুরুষের মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, তাঁহার গর্ভ হইতে ক্ষত্রিয়, উরুদ্বয় হইতে বৈশ্য” পরে আরও বলা হয়েছে ‘পদভ্যাং শূদ্র অজায়ত’ অর্থাৎ পা হইতে শূদ্র সৃষ্টি হয়েছে; কিন্তু বর্তমানে ঐটুকু ঢাকতে গিয়ে ভুল অর্থ করতে কুটম্বোদ্ধ বলা হচ্ছে না, অনেকে বলেছেন এর অর্থ হবে “শূদ্রই উহার গর্ভ হইত।” আবার স্বনামখ্যাত অনুবাদক ও টীকাকার রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় এ সূক্ত সম্বন্ধে বলেন, “ঋগ্বেদে অন্য কোন অংশে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এ চারি জাতির উল্লেখ নাই। জাতি বিভাগ প্রথা ঋগ্বেদের সময় প্রচলিত ছিল না। ঋগ্বেদে এই কু-ব্যাখ্যার একটি প্রমাণ সৃষ্টি করার জন্য এ অংশ প্রক্ষিপ্ত হয়েছে।”

সুতরাং প্রমাণিত হচ্ছে ‘ঋগ্বেদে কোন প্রকার পরিবর্তন ঘটে নাই’ এ দাবী সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

বলাবাহুল্য, এমন নানা তথ্যের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে তখন ভারতে সঠিক ইতিহাসের কোন অস্তিত্বই ছিলনা।

একদম্প্রতি মুসলমান সভ্যতা বা হযরত মুহাম্মদের (সাঃ) প্রতিভাময় প্রভাব প্রকাশ ও প্রচারের আগে সারা বিশ্বে অকথ্য কুসংস্কারের বন্যা চলছিল। ভারতে ছিল নরনরী, সতীদাহ, সাগর-সলিলে সন্তান বিজর্সন, অগ্নিপরীক্ষা, জড় পূজার আধিক্য, জাতিভেদ প্রথা, মারামারি, ঘৃণা, হিংসা, দ্বেষ, শোষণ, পীড়ন প্রভৃতির আরও কত শত অমায়িক আবির্ভাব। উল্লেখ করা যেতে পারে উপরোক্ত কুসংস্কারগুলোর প্রত্যেকটিই এক সভ্য যে, কোন ঐতিহাসিকেরই এ বিষয়ে কোন মতবিরোধ নেই।

এ বিষয়ে রুশ ঐতিহাসিক মিঃ A.Z. Manfred যা লিখেছেন তা গভীর শ্রদ্ধার সাথে পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করা হল :

“The most privileged caste was that of the priests Brahmins who were freed from all types of taxation, conscription and corporal punishment. According to the laws of ancient India a nine years old member of the Brahmen cast was considered as father in

relation to a ninty years old member of the Kshatriya. In peace time the Kshatiya cast led a relativity undisturbed existence and recived rich gifts and fevours from the kings, but in time of war the were the only section of the population required to fight. The vaisya cast had to pay taxes into the state treasury: commune peasnts up to one sixth of there hervest and merchants up to fifth of their income. Most wretched of all was the position of the Sudra caste/ Members of this caste had no rights whatever but merely obligatins. Member of higher castes only had to pay a fine for the murder of a sudra, the same as for killing a dog. (A short history of the world. V.I.P-G42,43)

অতএব রুশ ঐতিহাসিক পরিবেশিত তথ্যের দ্বারা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, সে যুগে ব্রাহ্মণদের কোন কর দিতে হত না; ক্ষত্রিয়, শূদ্র প্রভৃতি জাতিকে ছোট লোক শ্রেণী ধরা হত। নব্বই বছরের বৃদ্ধ ক্ষত্রিয়কে নয় বছরের ব্রাহ্মণের পদসেবা করতে হত; পিতৃজ্ঞান করা ব্যাধ্যকতা ছিল। ব্রাহ্মণ ছাড়া অপর জাতির প্রতি ছয় ভাগের একভাগ বা পাঁচভাগের একভাগ করা আদায় করা হত; নরহত্যা করলে শিরচ্ছেদ হত বটে কিন্তু কোন ব্রাহ্মণ যদি শূদ্রকে হত্যা করত তাহলে শুধুমাত্র সামান্য জরিমানা দিলেই চলত। যেমন পোষা কুকুর মেরে ফেলার শাস্তি স্বরূপ কিছু জরিমানা হয়।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে ঐতিহাসিক A.Z Manfred যা লিখেছেন এটাকে নিরপেক্ষ তথ্য বলা যায় এজন্য যে; ভারতের হিন্দু বা মুসলমান লেখকের মত এঁরা ইউরোপের প্রভাবে প্রভাবিত নন বলে অনেকেরই ধারণা।

এসব ছাড়াও ব্যভিচার এতই প্রবল ধারায় প্রবাহিত ছিল যা ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা করতেও লজ্জাবোধ করেছেন। বিখ্যাত বাঙালী ঐতিহাসিক রমেশ মজুমদার 'বাংলাদেশের ইতিহাস' গ্রন্থে যে তথ্য পরিবেশন করেছেন তাতে পুরান দিনের চরিত্র মনে পড়লে ঘৃণায় সংকুচিত থেকে হয়। ব্রাহ্মণ জাতি শুদ্রকে বিয়ে করতে পারতেন না, ধর্মে নিষেধ, কিন্তু অবৈধ সহবাস বা ব্যভিচার নিষিদ্ধ ছিলনা। শূদ্রকে বিবাহ করা না, ধর্মে নিষেধ, কিন্তু অবৈধ সহবাস বা ব্যভিচার নিষিদ্ধ ছিলনা। শূদ্রকে বিবাহ করা অসম্ভব, কিন্তু তাহার সহিত অবৈধ সহবাস তদৃশ নিন্দনীয় নয়। সে যুগের অবস্থার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে ধর্মের নামে, দেবদেবীর নামে দেবালয়াভ্যন্তরে যে ধরণের কথ্য বর্ণনা করতে গিয়ে ধর্মের নামে, দেবদেবীর নামে দেবালয়াভ্যন্তরে যে ধরণের চিত্র প্রদর্শিত হত তারও কিছুটা নমুনা তিনি উল্লেখ করেছেন, “রাজ প্রাসাদে প্রতি সন্ধ্যায় ‘বেশ বিলা সিনীজনের মঞ্জুস্বনে’ আকাশ প্রতিধ্বনিত হয়; সে যুগের কবি মন্দিরের একশত দেবদাসীর রূপ যৌবন বর্ণনায় উচ্ছসিত হইয়া লিখিয়াছেন যে, ইহারা কামিজনের কারাগার সঙ্গীত কেলীশ্রীর সঙ্গম-গৃহ এবং ইহাদের দৃষ্টিমাত্র ভস্মীভূত কাম পুনরুজ্জীবিত হয়। সে যুগে, কবি বিষ্ণু মন্দিরে লীলাকমল হস্তে দেবদাসীগণক লক্ষীর সহিত তুলনা করতে দ্বিধা করেন নাই, সে যুগের নরনারীর যৌন সম্বন্ধে ধারণা ও আদর্শ বর্তমান কালের মাপকাঠিতে বিচার করিলে খুব উচ্চ ও মহৎ ছিল, এরূপ বিশ্বাস করা বড়ই কঠিন।”

মনিষী আল-বিরুনী লিখেছেন, কোন বৈশ্য এবং শূদ্র বেদ অধ্যয়ন করলে শাস্তি হিসেবে তার জিহ্বা কেটে নেয়া হত। আইনের ক্ষেত্রে সমজ্ঞানের অভাব পরিলক্ষিত হত। উচ্চ জাতির লোক অপেক্ষা নিম্নজাতির লোকদিগকে কঠোর শাস্তি দেয়া হত। হিন্দু সমাজে শূদ্রগণ ছিল ভারবাহী পশুর ন্যায়; বিভিন্ন জাতির মধ্যে আন্তর্বিবাহ কিংবা লক্ষি ভোজন নিষিদ্ধ ছিল; এমনকি শূদ্রগণের স্পর্শও অপবিত্র বলে গণ্য হত। এরূপে শতাব্দীর পর শতাব্দী দূর্ভাগ্য শূদ্র নরনারী নিম্নস্তরের জীবন-যাপন করতে বাধ্য হত। 'মনু'র 'অনুজ্ঞা'তে তাদের জন্য নিতান্ত অপমানজনক কতকগুলো জীবন-যাপন নীতিগত শর্ত লিপিবদ্ধ হয়েছিল। মনু বলেন ব্রাহ্মণদের ভোজনের সময়ে কোন 'চামেলা' (অনুজ্ঞা জাতি) গ্রাম্য শূকর অথবা কুকুর দৃষ্টি দিতে পারিবেন। চামেলাদিগের আবাসভূমি হবে গ্রামের বহিঃপ্রান্তে, অন্যলোকের দ্বারা ভগ্ন পাত্রের কাছাদের আহাৰ্য্য দান করতে হইত। এবং রাত্রিতে তাহারা শহরে পরিভ্রমণ করতে পারবেন। দিনের বেলায় কার্যোদ্দেশ্যে বহির্গত হইলেও তাদিগকে রাজ আদেশের চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করতে হবে।” (মনুস্মৃতি)

মনু ব্যক্তিটি কে? তার সম্পর্কে জানা দরকার। মনু ব্রহ্মার পুত্র, মনুষ্য জাতির আদি পুরুষ, ধর্মশাস্ত্র মনুসংহিতা গ্রন্থের প্রণেতা, মুনি বিশেষ। (বাংলা অভিধান) ধর্মপ্রণেতা মনু বলেন, “পৃথিবীর যেখানে যা কিছু আছে তাহা ব্রাহ্মণদের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হবে।”

আমুন এবার প্রাচীন আরবের কথায় : হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জন্মের পূর্বে আরব পৃথিবীর সবচেয়ে পাপ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। নর হত্যা চলত কথায় কথায়; সামান্য উটকে পানি খাওয়ানো নিয়ে ঝগড়া শুরু হয়ে যেত এবং যুগযুগ ধরে চলতে চলতে ক্রমে তা রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ে রূপ নিত। সুদ, মদ, জুয়াখেলা, ব্যভিচার ইত্যাদি খুব ব্যাপক ভাবে চলত এবং বিয়ে বলে যা ছিল তা ব্যভিচারেরই নামান্তর। এমন কি নারী গর্ভধারণী মাও বিবাহের ইন্ধন হত। নারী পুরুষের ব্যভিচার ছাড়াও সেখানে পুং ব্যভিচার প্রভৃতি গর্হিত কাজ হত এবং জড়পূজার দিক দিয়েও মাত্রা চরমে পৌঁছেছিল। ঠাকুর দেবতা ছাড়া এক পাও যেন অগ্রসর হওয়া যায়না; যদি সাথে কোন দেব দেবী তুলনাক্রমে না আনা হত তখন পথিমধ্যে মূর্তি তৈরী করেও পথ চলতে হত। সংক্ষেপে নোংরামী, নিষ্ঠুরতা ও অহঙ্কারই ছিল তদানীন্তন আরবের পরিচয়।

এমনিভাবে ইসলাম ধর্ম প্রচারিত হওয়ার পূর্বে ইরানেও সব রকম অসভ্যতাই ছিল বর্তমান। জড়পূজা ও পশুপূজা প্রভৃতিকরতেও তারা অভ্যস্ত ছিল। ইরান সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা কিছু করা হয়েছে। তাদের সম্পর্কে জনৈক রাশিয়ান ঐতিহাসিক একই কথাই বলেছেন—The ancient Iranian religion involved nature (For example the mountains) and animal worship:-

Later worship of the Persian tribal god Ahura Mazda and the sun god Mithars became wides pread.

তেমনি চীনও চরম সভ্যতায় অনুন্নতার অভিশপ্ত শিকারে পরিণত হয়েছিল।

মহামানবের পদার্পণ

এভাবে যখন সারা পৃথিবীতে পাপের সমুদ্র যখন কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল ঠিক সে সময় পৃথিবী এক পূর্ণাঙ্গ চরিত্র, আদর্শবান মহাপুরুষের আগমন প্রতীক্ষায় অধীর হয়ে উঠেছিল; এমন সময়ে ৫৭০ ঈসাব্দে বিশ্বত্রাতা মহামানব হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একেশ্বরবাদের মূলমন্ত্র নিয়ে আবির্ভূত হলেন পৃথিবীর নাভিকুণ্ড আরব ভূমিতেই। তিনিই এ সময়ে সারাবিশ্বে মানবতার অবলুপ্ত প্রায় যৌবনকে আরব ভূমিতেই। তিনিই এ সময়ে সারাবিশ্বে মানবতার অবলুপ্ত প্রায় যৌবনকে ফিরিয়ে আনেন। বিশ্ব যেন দিন দিন তাঁর শিষ্যে পূর্ণ হয়ে উঠল। চারিদিকে শত্রু মিত্র ফিরিয়ে আনেন। বিশ্ব যেন দিন দিন তাঁর শিষ্যে পূর্ণ হয়ে উঠল। চারিদিকে শত্রু মিত্র বুঝতে পারল সত্যিই এ মহান মানুষটি, জীবনে লেখা পড়ার সুযোগ না পেলেও তাঁর শক্তি কেন্দ্র ও ভক্তি কেন্দ্র ছিল আল্লাহর অশেষ আনন্দোৎসব শিক্ষায় সমাচ্ছন্ন। তাই তিনি অবিলম্বেই সকলের কাছে ভক্তির পাত্র, শিক্ষাগুরু, দীক্ষাগুরু ও আদর্শরূপে মানবজাতির মানবতার সিংহাসনে উপবিষ্ট হলেন। যাঁরা তাঁকে সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করেন, ইহকালের ও পরকালের সুদীর্ঘ পথের পথে মনে করে গ্রহণ করলেন তাঁরাই হলেন মুসলমান। তাঁদের বল, বিদ্যা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, মানবতা, রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি, প্রত্যেক সুনীতিই পৃথিবীর মানুষের বিম্ময় সৃষ্টি করেছিল। এক কথায় তাঁর আত্মপ্রকাশে পৃথিবীর বুকে এমন একজনও নামকরা মানুষ জন্মাননি যিনি পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) অথবা তাঁর ভক্ত আরবদের প্রভাবে কিছুও প্রভাবিত নন। বরং প্রত্যেকেই পরোক্ষ অথবা প্রত্যক্ষভাবে সে অমর মহাপুরুষের মহান জীবনাদর্শের কাছে ঋণী। একথা অপরাপর ধর্মাবলম্বীরাও যুগ যুগ ধরে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে করেছেন। প্রমাণ স্বরূপ কতকগুলো মনীষীবৃন্দের মন্তব্য উল্লেখ করা হল।

মেজর আর্থার গ্লীন লিনওয়ার্ড লিখেছেন; “আরববাসীদের উচ্চশিক্ষা, সভ্যতা ও মানসিক উৎকর্ষ এবং তাদের উচ্চ শিক্ষার প্রণালী প্রবর্তিত না হলে ইউরোপ এখনো অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমগ্ন থাকত। বিজ্ঞতার উপর সদ্ব্যবহার ও উদারতা তাঁরা যে প্রকার প্রদর্শন করেছিলেন তা প্রকৃতই চিত্তাকর্ষক।”

ঐতিহাসিকগণের বিশ্ব ইতিহাসে ৮ম খণ্ডে লেখা আছে—“মধ্য যুগে আরব রাষ্ট্র এক মাত্র প্রতীক ছিল; উত্তরে অসভ্য জাতি সমূহের আক্রমণে বিপর্যস্ত ইউরোপকে তাঁহারা ই বরবর্তার হস্ত হইতে রক্ষা করেন।”

ঐতিহাসিক জি. সি. ওয়েলস বলেন, "আরবদের ভিতর দিয়েই বর্তমান জগত তার আলোক ও শক্তি সঞ্চয় করেছে।... ল্যাটিন জাতির ভিতর দিয়ে নয়।"

পাদ্রী আইজ্যাক টেলর বলেন, “জগতের বহুদেশ ব্যাপিয়া ইসলাম ধর্ম খৃষ্টান ধর্ম অপেক্ষা সাফল্য লাভ করেছে। সর্বক্ষেত্রে খ্রীষ্ট ধর্মের প্রচার ক্রমশ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়েছে এবং ইসলাম ধর্মাবলম্বী জাতিকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করা এক প্রকার অসম্ভব হয়ে পড়েছে এমন কি যে স্থানসমূহে পূর্বে খৃষ্টধর্ম প্রচারিত ছিল তাও ক্রমশ খৃষ্টধর্মের প্রচারকগণের প্রভাব থেকে মুক্ত থেকে আরম্ভ হয়েছে। মরক্কো থেকে জাভা এবং সম্প্রতি পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত স্বীয় প্রভাব বিস্তার করে ইসলাম ধর্ম সুদীর্ঘ পদবিক্ষেপে এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকা প্রভৃতি সকল মহাদেশই অধিকার করতে অভিযান আরম্ভ করেছে।

ভারতবর্ষে হিন্দু ধর্মের মূল পাশ্চাত্য সভ্যতার স্রোতে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করে দিচ্ছে। কোটি কোটি ভারতবাসীর এক চতুর্থাংশ এবং সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশের জনসংখ্যার অর্ধেকেরও অধিক মুসলমান।”

সন্ধ্যাট মেনেপোলিয়ান বোনাপার্ট বলেন, “আমার আশা হয় অদূর ভবিষ্যতে সমস্ত দেশের শিক্ষিত ও প্রাক্ষণলীকে সম্মিলিত করে কোরআনের মতবাদের উপর ভিত্তি স্থাপন করে জগতে একতামূলক শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হব। কারণ একমাত্র কোরআনই সত্য এবং মানবকে সুখ ও শান্তির পথে পরিচালিত করতে সক্ষম।”

স্যার উইলিংহাম মূর বলেন, “সম্রাট হিরাক্লিয়াসের অধীনে সিরিয়াবাসী খ্রীষ্টানগণ যেভাবে বাস করেছিলেন; আরব মুসলমানদের অধীনে তার অপেক্ষা অধিক পরিমাণে রাজনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনসতা উপভোগ করেছিলেন। খ্রীষ্টান নরপতি হিরাক্লিয়াসের অধীনে থাকা অপেক্ষা আরবদের অধীনে থাকা অধিকতর শান্তিপ্রদ হয়েছিল।”

ঐতিহাসিক নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপধ্যায় বলেন, “ইসলামের বিশ্বজনীনত্বের জলার্বি সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ মানবগণ আজ ধরায় এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত কাছাদের ডাব ও ভাষার আদান প্রদান করিতে এবং কর্মের যোগ সূত্র স্থাপন করিতে লয়ালী ... প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বক্ষ ব্যাপিয়া এই সৌভ্রাতৃত্ব স্থাপন তাহাও ইসলামের উদার শিক্ষার প্রকৃষ্ট অবদান।

আজ্ঞা যদি জগতের লোক সেই বিশ্ববন্ধু বিশ্বনবীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সংসার লম্বে বিচরণ করিতে পারে, সেই পূর্ণ কীর্তির চরিত্র কথা যদি সর্বত্র প্রচারিত হয় তাহা হইলে আইন কানুনের শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার জন্য হাজার হাজার প্রহরী নিযুক্ত করিবার কোন আবশ্যকতা থাকে না। তাহা হইলে হিংসা, দ্বেষ, কলঙ্ক, বিষাদ ধরাপৃষ্ট হইতে মুক্তি পায়। যে ধর্ম যে উদাহরণ সেই মহামানব এই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, আমাদের দেশবাসী যদি সেই ধর্মের অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া মানুষকে ভালবাসিতে পারে, যদি তাঁহার উদাহরণে আপনার চরিত্রকে গঠিত করিতে পারে, যদি সে ভাবোচ্ছ্বাসে চালিত হয়, তাহারই সুশীতল ছায়ায় বসিয়া শান্তির ধারা প্রবাহিত করিতে পারে, তাহা হইলে এই ভারতের স্বাধীনতার পথে কে অন্তরায় হইতে পারে? হাতা হইলে কখনও অশান্তির উদয় হয় না।”

ভারতে ব্রাহ্ম ধর্মের অন্যতম নেতা আচার্য কেশব চন্দ্র বলেন, হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্বন্ধে “তিনি তেজপূর্ণ সন্ধিবন্ধন বিমুক্ত একেশ্বরের রাজের প্রতিপোশক এবং নীতিবলিতার স্থির প্রতিজ্ঞা চির শত্রু। তাঁহার মত পুণ্ডলিকা ভঙ্গকারী আর কেউই ছিলেন না। দ্বিতীয় ব্যক্তিকে তিনি ঈশ্বরের সিংহাসন স্পর্শ করিতেও দেন নাই। কথালিও তিনি প্রেরিত পুরুষদের সম্মান করিতেন। তিনি তাঁহাদের পূজা নিষেধ করিলেন। তাঁহাদের কোন মধ্যবর্তিতা বা অবতারত্ব সহ্য করিলেন না। কিন্তু অপর নবী ও প্রেরিত পুরুষকে বিশ্বাস করিতে তিনিই প্রবর্তিত করিলেন। তিনি ঈশ্বরের বিরোধীগণের বিরুদ্ধে যোরতর প্রতিকূল ভাব প্রচলিত করিয়া ছিলেন। তিনি ঈশ্বরের প্রতি ঈদৃশ অনুগত এবং বিশ্বাসী ছিলেন যে, কোন প্রকারের অবিশ্বাস বা কোন শ্রেণীর অবিশ্বাসীকে উৎসাহ দানের ভাবও তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না।”

তিনি আরও বলেন, “যখন কোন অবিশ্বাসী স্বর্গের ঈশ্বরের সহিত সংগ্রাম করে তাঁহার অবমাননা করে, তাঁহার সিংহাসন বিপর্যস্ত এবং তাঁহার পৃথিবীস্থ রাজ্য ধ্বংস করিতে যত্ন করে, ঈশ্বরের প্রত্যেক যথার্থ সৈনিক ঈশ্বরের পবিত্র জয় পতাকা হস্তে করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইবে এবং দয়া না করিয়া অবিশ্বাস উপহাস বিমর্দিত হইবে—।”

.... “ভারতের ব্রাহ্মবাদীগণ যেন নিরন্তর ঈশ্বরের এই প্রেরিত পুরুষের সম্মান করিতে পারেন এবং তিনি স্বর্গ হইতে বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদের সংবাদ আনয়ন করিয়াছেন যেন তাহা গ্রহণ করিতে সমর্থ হন।” (মহাজন সমাচার, পৃঃ ১২৭-১২৯)

সুবিখ্যাত পরিব্রাজক চন্দ্রশেখর সেন (বার-এট-ল) লিখেছেন, “কেবলমাত্র ষোল বৎসরের বালক হযরত আলি (রাঃ) কে ও বিবি খাদিজা (রাঃ) কে সাথী করিয়া যিনি সংসারে সনাতন ধর্ম প্রচার করিতে সাহসী ও প্রবৃত্ত হন এবং সেই প্রচারের ফলে সহস্রাধিক বর্ষ পৃথিবীর অর্ধেক স্থান ব্যাপিয়া এই ধর্ম চরিতেছে। তিনি ও তাঁহার সেই ধর্ম যে বিধাতার প্রেরিত তাহাতে তিল মাত্র সন্দেহ নেই।” (ভূপ্রদক্ষিণ ৫২৫ পৃঃ)

শ্রী মানবেন্দ্রনাথ রায় বলেন, Learning from the Muslim, Europe became the leader of Modern civilization. (Historical Role of Islam.)

অর্থাৎ : মুসলিম শিক্ষার প্রভাবেই ইউরোপ জগত আধুনিক সভ্যতার নেতা থেকে পেরেছে।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বলেন; “জগতের বুকে ইসলাম সর্বোৎকৃষ্ট গণতন্ত্র মূলক ধর্ম। প্রশান্ত মহাসাগর হইতে আরম্ভ করিয়া আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূল পর্যন্ত সমস্ত মানব মণ্ডলীকে উদার নীতির এক সূত্রে আবদ্ধ করিয়া ইসলাম পার্থিব উন্নতির চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে।”

ডক্টর তেজ বাহাদুর সাফ্র বলেন, “হিন্দুদিগকে রক্ষা করিবার একমাত্র উপায় ইসলাম ধর্মের কতিপয় মূলনীতি : আল্লাহর একাত্ববাদ ও মানবের বিশ্ব জনীনত্ব।”

শ্রী ভূদেব চন্দ্র মুখোপাধ্যায় বলেন, “হিন্দুর স্বধর্ম বিদ্বেশরূপ পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্যই বিধাতা মোসলমানকে শাস্তারূপে এদেশে পাঠাইয়া ছিলেন।”

গুরু নানক বলেন, বেদ ও পুরাণের যুগ চলে গেছে; এখন দুনিয়াকে পরিচালিত করার জন্য কোরআনই একমাত্র গ্রন্থ।.... মানুষ যে অবিরত অস্থির এবং নরকে যায় তার একমাত্র কারণ যে ইসলামের নবীর প্রতি তার কোন শ্রদ্ধা নেই।”

ভারতের পরলোকগত প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহেরু বলেন, “হযরত মুহাম্মদ এর প্রচারিত ধর্ম, এর সততা, সরলতা, ন্যায়, নিষ্ঠা এবং এর বৈপ্লবিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, সমতা ও ন্যায় নীতি পার্শ্ববর্তী রাজ্যের লোকদের অনুপ্রাণিত করে। কারণ এ সমস্ত রাজ্যের জনসাধারণ সুদীর্ঘদিন যাবত একদিকে শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক নিপীড়িত, শোষিত ও নির্যাতিত হচ্ছিল; অপরদিকে ধর্মী ব্যাপারে নির্যাতিত নিষ্পেষিত হচ্ছিল পোপদের হাতে। ... তাদের কাছে এ (ইসলাম বা মুহাম্মদের নীতি) নূতন ব্যবস্থা ছিল মুক্তির দিশারী।”

শ্রী মহাত্মা গান্ধী বলেন, প্রতীচ্য যখন অন্ধকারে নিমজ্জিত, প্রাচ্যেয় আকাশে তখন উদ্ভিত হল এক উজ্জ্বল নক্ষত্র এবং আর্ত পৃথিবীকে তা দিল আরও স্বস্তি। ইসলাম একটি মিথ্যা ধর্ম নয়। শ্রদ্ধার সাথে হিন্দুরা তা অধ্যয়ন করুক তাহলে আমার মতই তারা একে ভালবাসবে।”

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিনে এবং বিশেষ করে গভীর রাতের সালাত বা নামায, যিকর (আল্লাহর স্মরণ) প্রভৃতি গভীর উপাসনায় নিজের এবং তাঁর ভক্তদের আধ্যাত্মিক ক্ষমতা বৃদ্ধি পেত। রাত্রির সন্ধিত এ শক্তি দিনের বেলায় প্রয়োগ করতেন। আরবের হিংস্র এক গুঁয়ে মানুষদের প্রতি। তার ফলে তীব্র বিরোধিতা ও লড়াই শুরু হত। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাতে ভীত থেকে না। বরং কোরানের আদর্শে ধৈর্যশীল হয়ে তাদের অত্যাচার সহ্য করতেন এবং সঙ্গীদের সহ্য করতে বাধ্য করতেন।

কিন্তু ফযর, যোহর এবং আসর এ ত্রিকালের ইবাদত জোটবদ্ধভাবে কোথাও প্রকাশ্যে কোথাও বা গোপনে চালিয়ে যেতে লাগলেন; তাছাড়া (সূর্যাস্তের পর) এবং মিশ্র এ দ্বিকালের ইবাদত জোটবদ্ধে করতেন। আধ্যাত্মিক উন্নতির এটাই ছিল তাঁদের প্রাথমিক কোর্স। তাঁরা রাত্রির অন্ধকারে প্রত্যেকে যথাসাধ্য শক্তি সংগঠন করতেন। ‘তাহাজ্জুদ’ (রাতি জাগরণ) সাধনা দ্বারা। তদুপরি তাঁরা প্রত্যেকেই এমন মনোভাৱে থাকতেন যদ্বারা এক পলকেই চেনা যেত এরা মুসলমান বা হযরত (সাঃ) মলের লোক; তাঁদের পরিধানে থাকত ঢিলা জামা, লুঙ্গি-পাজামা, মাথায় থাকত টুপি, তার উপরে অনেকের শিরোপরি শোভা পেত শিরস্থান; প্রাপ্তবয়স্কদের দাড়ী ছিল বড় কিন্তু প্রত্যেকের গোঁফ ছিল কাটা বা ছাঁটা। এই হল মোটামুটি ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের জিভার ও বাহিরের চিত্র।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য আমাদের তথা সারা বিশ্বের মহামানব হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) জানতেন যে অন্তরের সাথে সাথে বাহিরের পরিবর্তন সম্ভব না হলে আরগণ মানবতার মার্যাদা দানকারী রূপে বিশ্ব ইতিহাসে চিরজীবন্ত, চিরবরণ্য থাকতে পারেনা। হযরতের (সাঃ) এ ধারণার বাস্তব প্রতিচ্ছবি দেখেছি তখনই যখন আরবরা ছিল তাঁর মতাদর্শের অনুসারী ও অনুগামী। কিন্তু ক্রমে ক্রমে ধর্মের উপর অবহেলা, শৈথিল্য, ভগ্নাঙ্গী ও ভেজালের অনুপ্রবেশ ঘটল। হৃদয় বিক্রিত হল, চেহারাও পরিবর্তিত হল; তারা হল পুরনায় ধরণীর রঙ্গমঞ্চে নৈকি ও আধ্যাত্মিক পতনে জঘন্যতম দৃশ্যাবর্তন।

তাই আজ আমরাও যদি এহেন সংকটময় মুহূর্তে সে মহাপুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলতে পারি তাহলে অদূর ভবিষ্যতে হত মর্যাদাকে পুনরুদ্ধার করে বিশ্বের ইতিহাসে সম্মানের উচ্চাসনে উপবিষ্ট থেকে আমাদের বেগ পেতে হবে না।

বিশ্ব মুসলিমের ভারত প্রেমের কারণ

ভারতবর্ষ ইসলামের ইতিহাসে এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ স্থানাধিকারী দেশ। কারণ সারা বিশ্বের আদি মানব ও আদি নবী হযরত আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করা হয়েছিল যে মৃত্যুকা খণ্ডের দ্বারা তা ছিল ‘জয়িনী’ নামক স্থানের মৃত্তিকা। আর সে উজ্জয়িনী পৃথিবীর অন্য কোথাও নয় তা ভারতের সর্বজনবিদিত স্থান উজ্জয়িনী। আবার আদি

পিতা আদম (আঃ) কৃত ভুলের শাস্তি স্বরূপ মহান স্রষ্টা কর্তৃক জান্নাত থেকে মর্তধামে যেখানে নির্বাসিত হলেন তাও ছিল এশিয়া মহাদেশ-সংলগ্ন এ ভারতেরই সরণদ্বীপ বা লঙ্কা বর্তমানে সিংহল। (যেটা ছিল এ সময়ে ভারতেরই অংশ)।

এ ছাড়া বিশ্বনিয়ন্তা স্রষ্টার সৃষ্টি আর এক শ্রেণীর উপাসক আছেন যাদের আরবীতে মালায়েকা, ফারসীতে ফেরেস্তা, বলা হয় বাংলায় দেবদূত, ইংরেজীতে Angel বলে। সমস্ত দেবদূতের সর্দার মহান নেতার নাম জিব্রাঈল (আঃ)। তিনি বিশ্বনিয়ন্তা থেকে বিশ্ববক্ষে তাঁর বাণীবাহক ছিলেন। প্রত্যেক নবী বা পথ প্রদর্শকের কাছেই তাঁকে আসতে হত প্রভুর আদেশ আর উপদেশের বার্তা নিয়ে। বিশ্ব স্রষ্টার এ মহান দায়িত্ব পালনার্থে হযরত জিব্রাঈল (আঃ) পৃথিবীর যে স্থানে প্রথম পদার্পন করেন সেও এ সাধের ভারতবর্ষে, যেহেতু প্রথম নবী হযরত আদম (আঃ) এ ভারতেরই অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং তফসীরে জালালাইন' আরবী গ্রন্থে পাওয়া যায়; আদম (আঃ) ভারত থেকেই পৃথিবীর কেন্দ্র ভূমি পবিত্র মক্কার রওয়ানা হয়েছিলেন।

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে হযরত মুহাম্মদের (সাঃ) বাণী সিহাহসিত্তাহ হাদীসে খুব একটা পরিলক্ষিত না হলেও এ কথায় প্রমাণের অভাব নেই যে, বহু হাদীস সিয়াহসিত্তাহ হাদীসের বাইরেও বিদ্যমান। তবে এ বিষয়ে অবশ্যই মনে রাখতে হবে, হযরতের এমন কোন কথা বা কর্ম থাকতে পারে না যা কুরআন বা সিহাহসিত্তাহ হাদীসের নীতি বহির্ভূত অথবা এ দুই প্রামাণিক মাধ্যমকে মিথ্যা বা ভিত্তিহীন প্রতিপন্ন করতে পারে।

বহু পণ্ডিত তাঁদের গবেষণা ও পণ্ডিত্যের সাক্ষী স্বরূপ রেখে গেছেন পরিশ্রমলব্ধ অনেক জ্ঞানগর্ভ সংগ্রহ লিপি। তাই ভারতের কলকাতা, দিল্লি, আলিগড় প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং তৎসংলগ্ন বহু লাইব্রেরী মস্থন করে কিছু নতুন তথ্য পরিবেশিত হয়েছে যার দ্বারা প্রমাণ হয় ভারতে ইসলাম ধর্মের সম্পর্কশীলতা অবিস্ফেদ্য Dr. Syed Mhmud সাহেবের লেখনীতে প্রকাশ, হযরত আলি (রাঃ) তথা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর জামাতা এবং মুসলিম বিশ্বের খলিফা (প্রতিনিধি) ও পৃথিবীর প্রথম পুরুষ ছিলেন যিনি মুহাম্মদকে (সাঃ) সর্বশেষ এবং শ্রেষ্ঠতম নবী বলে স্বীকার করেছিলেন; তিনি বলেছেন ভারতের কথা। যার বঙ্গানুবাদ হল এটাই যে, “ভারত ভূমি—যেখানে হযরত আদম (আঃ) জান্নাত থেকে নেমে এসেছিলেন এবং মক্কার ভূমি যা হযরত ইব্রাহিমের (আঃ) দ্বারা সম্বন্ধযুক্ত, বিশ্ব ভূমণ্ডলের এ দুই স্থানই উত্তম ভূখণ্ড।” (তবে মক্কা, মদীনা ও জেরুজামের পরেই ভারতের স্থান)

ভারতে অযোধ্যার এক বিরাট ও বিখ্যাত মন্দিরের পাশে এক দীর্ঘকায় কবর আছে যার সম্বন্ধে অতীত কাল থেকে ঘোষিত জনশ্রুতি—এ সমাধি হযরত শীশ আলাঈহিস সালামের। হযরত শীস (আঃ) হযরত আদমের (আঃ) অন্যতম পুত্র যিনি হযরত আদমের পর নবীত্ব গৌরব প্রাপ্ত হয়েছিলেন। অর্থাৎ হযরত আদমের পরে দ্বিতীয় পয়গম্বর হযরত শীসের বসতি স্থানও এ ভারতেরই স্থাপিত হয়েছিল। একারণেরই সারা দুনিয়ার মুসলমান ভারতকে পয়গম্বরের দেশ বলা হয়।”

হযরত আলী (রাঃ)-কে একবার সিরিয়ার একজন জ্ঞানুসন্ধিৎসু প্রশ্ন করেছিলেন, “বিশ্বভূমণ্ডলে সব চাইতে গুরুত্বব্যঞ্জক দেশ কোনটি?” উত্তরে তিনি বলেছিলেন, সে দেশ যাকে ‘সরণন্দীপ’ (সরণদ্বীপ, লঙ্কা বা সিংহল) বলা হয়। যেখানে আদম (আঃ) জান্নাত থেকে বর্হিগত হয়ে নেমে এসেছিলেন।”

একজন উষ্টরেট প্রাপ্ত পণ্ডিত লিখেছেন, “বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) নিজেও ভারতকে ভালবাসতেন। তিনি একবার বলেছিলেন ভারত থেকে আমার প্রতি স্নিগ্ধ শীতল মৃদু হাওয়ায় হিল্লোল ভেসে আসে।”

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর বর্ণনায় প্রমাণিত হয় যে, বিশ্ব স্রষ্টা মহান আল্লাহ পৃথিবীতে পাঠানর পূর্বে মানবজাতির সমগ্র আত্মাকে একত্রিত করে জিজ্ঞেস করেছিলেন “আমি কি তোমাদের প্রভু নই?” তখন সকলে সমস্বরে উত্তর দিয়েছিল, “নিশ্চয়ই আপনি আমাদের প্রভু।” বলাবাহুল্য, আত্মা সমাজের এটাই একত্রিকরণ ও লিপ্তাওয়ার যে পবিত্র ভূমির উপর হয়েছিল সেও এ ভারতবর্ষ।

হযরত আদম (আঃ) সুগন্ধময় জান্নাত থেকে সর্বপ্রথম ভারতে অবতরণ করেছিলেন বলেই ভারতে পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বেশী পরিমাণে সুগন্ধি দ্রব্য পাওয়া যায়। যথা : মৃগনাভী, কর্পূর, সুগন্ধি চন্দন, কাফ, জাফরান, কেউড়া, গোলাপ প্রভৃতি।

এছাড়া হযরত আদম (আঃ) জান্নাত থেকে আসার সময় এক হাতে এনেছিলেন রাজারোল আসোয়াদ' নামক প্রস্তর খণ্ডটি যা অদ্যাবধি কাবা গৃহে সুসংরক্ষিত রয়েছে। অন্য হাতে এনেছিলেন নানা জান্নাতী বৃক্ষ, তরুলতার কিছু নিদর্শন যার প্রভাবে ভারতের মাটিতে আম কাঁঠালের মত বৃহৎ ও সুস্বাদু ফলের দৃষ্টান্ত সারা বিশ্বকে চমক লাগিয়ে দেয়।

হযরত আবু হোরাইরা (রাঃ) হযরত (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, যখন হযরত আদম (আঃ) এর অবস্থানের জন্য হযরত জিব্রাঈল (আঃ)-কে ধরায় পাঠান হয়েছিল তখন হযরত জিব্রাঈল (আঃ) পৃথিবীতে শুভাগমন করে আযানের ন্যায় চার আত্মাহু আঁকবার এবং দু'বার করে ‘আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আনুা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ’ ইত্যাদি বাক্যগুলো উচ্চারণ করেছিলেন। তখন হযরত আদম (আঃ) মুহাম্মদের (সাঃ) নাম জিজ্ঞেস করেছিলেন যে এ ব্যক্তি কে? উত্তর দেয়া হয়েছিল ইনি আপনার সন্তানদের মধ্যে সর্বশেষ নবী। (তবরানী গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)

এ বর্ণনা থেকে একথাই সুস্পষ্ট প্রতিপন্ন হয় যে, মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণার লক্ষ্যে বাণী ইসলামের মূল নির্দেশিকা প্রথম প্রতিধ্বনিত হয়েছিল এ ভারতেরই হৃদয় মাঝে এবং পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে একথাও পাওয়া গেল যে, যেহেতু আল্লাহ জালালা সমগ্র আত্মাকে একত্রিত করেছিলেন সেহেতু তার মধ্যে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর আত্মাও বিদ্যমান ছিল। অতএব সারা বিশ্বের তথা মুসলমানদের চরম ও পরমতম নবী শ্রেষ্ঠ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আত্মিক অবতার এও সর্বপ্রথম এ ভারতবর্ষেই হয়েছিল।

একপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত উত্থাপন করা যায়। কিন্তু পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় সে আশা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হলাম। অবশ্য উপরিউক্তি দৃষ্টান্ত সমূহের দ্বারা একথা সহজেই অনুমেয় যে, ভারতের সাথে মুসলিম বিশ্বের এক নিগূঢ় আত্মিক সম্পর্ক নিহিত ছিল। যার অনিবার্য কারণেই মুসলমানদেরকে বার বার ভারতের বুকে আশ্রয়ন করতে হয়েছে।

প্রকৃত ইতিহাস ও ঐতিহাসিকগণ

পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, আর্যগণের মতই মুসলমানগণ এসেছিলেন বহির্ভারত থেকে তৌহিদের (একেশ্বরবাদ) বাণী বহন করে।

আমরা আদি ইতিহাস আলোচনা করে দেখব যে ভারতের আদি ইতিহাস বেদ-পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন ধর্ম গ্রন্থ এবং পুঁথিপত্র। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেগুলোর অধিকাংশ সম্বন্ধে নানা জনের নানা মত। অবশ্য বিরোধীপক্ষ বা শত্রুপক্ষ অনেক কিছু বলতে পারেন কিন্তু মিত্রপক্ষ যা বলেন তা অগ্রাহ্যের নয় অবশ্যই।

ইতিহাস আর ধর্মগ্রন্থ দু'টিকে পৃথক বিষয় মনে করা উচিত কারণ ধর্মের ছায়াবলম্বনে কোন এক ধর্মাবলম্বী জাতি পরিচালিত হয় আর ইতিহাস পরিচালিত হয় মানব জাতির বুদ্ধি বিদ্যা প্রসূত অভিজ্ঞতার ছায়ায়। যদি বেদ-পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারতকে ধর্মগ্রন্থ বলে সম্মান প্রদর্শন করা হয় তাহলে সেগুলোকে, ইতিহাস গ্রন্থ বলে ছোট করতে অবশ্যই আপত্তি আছে। যেমন মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ কুরআন শরীফ। এটা স্বয়ং আল্লাহ রচিত সংবিধান, তাতে ইতিহাসের ইন্ধন মিললেও কোনক্রমেই তা শুধুমাত্র ইতিহাস নয়।

বেদ-পুরাণ, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, কোরআন শরীফ প্রভৃতি যদি নির্ভুল আসমানী গ্রন্থ হয় তা হলে ইতিহাসে শ্রেণীত অন্যান্য পুস্তক দাঁড় করাতে হয়। কিন্তু আমাদের প্রাচীন ভারতে সঠিক প্রাণবন্ত ইতিহাস বলতে তেমন কিছু ছিল না; বরং আমাদের তথা ভারতবাসীদের চেয়ে আরববাসীগণ ইতিহাস সৃষ্টিতে শত গুণে শ্রেয় বলে বিবেচিত। কারণ তারিখ ধরে সবকিছু লেখা বা গদ্য, পদ্য অথবা কাব্য গ্রন্থ ইত্যাদি মুখস্থ করার কারবার আরবে অতি জোরদার ছিল, এমনকি বাড়ির সামান্য ঘোড়ার ইতিহাস পর্যন্ত তারা লিখে রাখত। তাই ইতিহাসকে তারা 'তারিখ' বলত বা আজও বলে।

আমাদের ভারতে ইতিহাস শাস্ত্র আজ বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাট বিষয় সন্দেহ নেই; কিন্তু আমাদের দেশে ইতিহাস জানা পণ্ডিত বা ঐতিহাসিকগণ এবং ইতিহাস বইগুলোর বেশীর ভাগই ইংরেজ ঐতিহাসিক আর ইংরেজী ইতিহাসেরই প্রসবিত সন্তান। আবার ইংরেজরা কিন্তু ভারতেরও ইতিহাস জানবার এবং ভারতে তা অপরিচ্ছন্ন হাতে পরিবেশনের পরিপ্রেক্ষিতে আরব ও পারস্যদের লেখা মূল ইতিহাসের পাঠোদ্ধার করে বহুকষ্ট ও পরিশ্রম স্বীকার করে আরবী, ফারসী ও উর্দু ভাষা শিখে অধ্যাবসায়ের পরিচয় দিয়েছে।

আজ মনে রাখতে হবে যে, ভারতের মূল ইতিহাস যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমে আমরা জানতে পেরেছি তাঁদের বেশীর ভাগই ছিলেন মুসলমান। কিন্তু আফসোস আর দুঃখের বিষয় আমরা তাঁদের অনেকেই নাম পর্যন্ত জানিনা। সাধারণ মানুষের কথা যদি ছেড়েই দেয়া যায় তবু বলব আজ আমরা যারা কেবল ইতিহাসকেই মাধ্যম করে জীবনের উন্নতির পথ বেছে নিয়েছি তাঁরই বা ক'জন তাঁদের অতুলনীয় অবদানের কথা জানি। তাই পাঠকবৃন্দের অবগতির জন্য কতিপয় মুসলিম বিশ্বের স্বনামধন্য

ঐতিহাসিকের নাম উল্লেখ করা হল। অসংখ্য ঐতিহাসিকদের মধ্যে আল-বিরুনী ইবনে খালদুন, ইবনে বতুতা, অলিবিন হামি, বাইহাকী, উতবী, কাজী মিনহাজুদ্দিন সিরাজ, মইউদ্দীন, মুহাম্মদ ঘুরী, জিয়াউদ্দিন বারণী, আমীর খসরু, সামসী সিরাজ, নাবার, ইয়াহিয়া বিন আহমাদ, জওহর, আব্বাস দেওয়ানী, আবুল ফজল, বাদাউনি, ফেরিস্তা, কাফি খাঁ, মীল গোলাম হোসেন, গোলাম হোসেন সালেমী, সাদিয়েদ আলি লম্বুখ উল্লেখযোগ্য।

আজ যখন আমাদের ছেলেরা পাঠশালা, স্কুল বা কলেজে পড়ে তখন উপরোক্ত মহা পরিশ্রমী ঐতিহাসিকদের কত জনকেই বা তারা জানে অথবা জানতে পারে। তার উপরে ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করলে বা ইতিহাস নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে শেষ ডিগ্রী নিতে হলে যে ইংরেজী ইতিহাস পড়তে হয় তাতে সামান্য সামান্য অস্পষ্টভাবে অথবা টীকায এসব ইতিহাস বা ঐতিহাসিকের নাম এমনভাবে জানান হয়েছে যা অন্তরে বিশেষভাবে দাগ কাটতে পারেনা। অথচ মুসলমান ঐতিহাসিকদের ইতিহাস বিশ্বের লোকগণকে বিশ্বাসে হতবাক করে দেয় এবং এ গ্রন্থগুলো পৃথিবীর যে কোন ইতিহাসের সাথে তুলনামূলকভাবে শুধুমাত্র শীর্ষস্থানীয় নয় বরং পিতৃস্থানীয়। এক কথায়, এ সমস্ত ইতিহাস বা ঐতিহাসিকরাই জগতের ইতিহাসের জন্মদাতা। উদাহরণ স্বরূপ মুসলিম জ্ঞান-ভাণ্ডার থেকে সামান্য কয়টি মহা মণীষীর রচিত ইতিহাসের নাম উল্লেখ করা হল।

তারিখি-হিন্দ : (তারিখি মাসুমি) নামে বিখ্যাত ইতিহাসটি ১৬০০ খৃষ্টাব্দে ঐতিহাসিক মীর মুহাম্মদ মাসুম কর্তৃক লিখিত। ভারতে আরবীয় অভিযান থেকে মুহাম্মদ বিন কাসিমের মৃত্যু পর্যন্ত সঠিক তথ্য সম্ভার সম্বলিত এটি এক মহামূল্যবান গ্রন্থ।

চাচা নামা : চাচা নামা এক অত্যন্ত অভিজাত শ্রেণীর ইতিহাস। এটি লিখেছেন মুহাম্মদ আলি বিন বকর। সিন্ধুদেশে আরব জাতির বিজয় কাহিনী হল এর বিষয়বস্তু, গ্রন্থখানিতে গুরুত্বপূর্ণ স্থানের নাম ও ঘটনাবলী বিশদভাবে বর্ণিত আছে। আদ্যাদ্য এটি সে সময়কার সিন্ধু দেশ তথা ভারতবর্ষের সামাজিক ও রাজনৈতিক ঐতিহাসিক তথ্যের ও নির্ভরযোগ্য সংবাদদাতা। বইটি ফারসী ভাষায় লিখিত।

কিতাবুল ইয়ামিনি : গ্রন্থটি ঐতিহাসিক উতবীর রচনা। বইটির মধ্যে ঐতিহাসিক তথ্যের সাথে সাথে সাহিত্য সৃজনতারও বন্যা বয়ে গেছে পর্যাপ্ত পরিমাণে।

তারিখি মাসুদী : ইতিহাসটি লিখেছেন আবুল ফজল মুহাম্মদ বিন-হাসেম আল-বাইহাকী। উচ্চমানের এ ইতিহাসটি নানা ঐতিহাসিক তথ্যে পরিপূর্ণ।

বিশেষ করে সুলতান মাহমুদ সম্বন্ধে সঠিক আলোচনায় আর প্রকাশনায় ইতিহাসটি প্রশংসার দাবীদার।

তারিখি ফিরোজ শাহী : এর লেখ ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারণী। বইটিতে বলবদের রাজত্বকাল থেকে ফিরোজ তুঘলকের সময় পর্যন্ত ঐতিহাসিক ঘটনাপঞ্জী সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে। খিলজী ও তুঘলক বংশের উপর সর্বপেক্ষা নির্ভরযোগ্য

উপাদান এ পুস্তক খানি। ১৩৫৯ খ্রীষ্টাব্দে এটি রচিত। কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তক গ্রন্থ খানি পুনরায় ছাপা হয়েছে।

তৈন-উল-আখতার : ইতিহাস গ্রন্থটি লিখেছেন ঐতিহাসিক আবু সঈদ। নিখুঁত তারিখ উল্লেখ এবং সঠিক সংবাদ পরিবেশনে প্রামাণ্য হিসেবে পুস্তকটি সুপ্রশংসিত।

তারিখুল হিন্দু (তাহকিকে হিন্দ) : সুবিখ্যাত ইতিহাসটি প্রখ্যাত পর্যটক ও ঐতিহাসিক আবু রাইহান আল বিরুনীর লেখা। গ্রন্থটির মূল ভাষা আরবী। পরে এর ফারসীতে অনুবাদ করা হয়। গ্রন্থখানির ইংরাজী অনুবাদও করা হয় ডক্টর সাক্ষ মহাশয়ের তৎপরতায়। ভারতে হিন্দু জাতি, হিন্দু ধর্ম, হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতি জানার এটাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠতম মূল গ্রন্থ। আমাদের দেশের ঐতিহাসিক ডক্টর সুনীত কুমার মুখার্জি তাই মনীষী আল বিরুনিকে সভ্যতার আলোকবাহী উপাধিতে ভূষিত করেছেন।

তা-জুম্মাসির : বিখ্যাত ইতিহাসটির রচয়িতা ঐতিহাসিক হাসান নিজামী। ১১৯২ খ্রীষ্টাব্দে থেকে ১২৯৮ সাল পর্যন্ত সময়ের এটি তথ্যবহুল এক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। কুতুবুদ্দিন আইবেক, মুহাম্মদ ঘোরী প্রভৃতি বাদশাদের বিশদ বিবরণ আছে এ গ্রন্থে যা সমীক্ষিত, সঠিক এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ।

তবকাত-ই-নাসিরী : ইতিহাসটি লিখেছেন ঐতিহাসিক মিনহাজুদ্দিন আবু ওমর বিন সিরাজ। ১২৬০ সনে এটি রচিত। ইতিহাস মঞ্চে সর্বস্বীকৃত মূল্যবান এ গ্রন্থটির ইংরাজী অনুবাদ করেন মিঃ রেভারটি। মুসলমান রাজা বাদশাদের জানতে এটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় গ্রন্থ।

খাজেনুল ফতোয়া : ইতিহাসটি “ভারতের তোতা পাখী” উপাধি প্রাপ্ত ঐতিহাসিক আমীর খসরুর লেখা। নিঃসন্দেহে এটা একটি সত্য তথ্য যুক্ত সুন্দর পুস্তক। আমাদের পরবর্তী দেশীয় ঐতিহাসিক এ, এল, শ্রী বাস্তব মহাশয় লেখকের খুব প্রশংসা করেছেন। মিথ্যার মিশ্রন নেই বলেই ভাল ইতিহাসের কোঠায় এর এত বড় মর্যাদা। অধ্যাপক হাবির সাহেব ইংরাজীতে এর অনুবাদ করেছেন।

ফতোয়া-উস-সালাতিন : ইতিহাসটির লেখক খাজা আবু মালিক ইমামী। বইটি শিক্ষিত সমাজে খুবই সমাদৃত।

কিতাবুর বাহলাব : এ বিখ্যাত ইতিহাসটি ভ্রমণ কাহিনী সম্বলিত সুন্দর সৃষ্টি। এটি রচনা করেছেন ইবনে বতুতা।

তারিখে মুবারক শাহী : এর লেখক ছিলেন জনাব ইয়াহিয়া বিন আহমেদ।

তারিখে সানাতিনে আফাগান, গ্রন্থের লেখক আহমদ ইয়াদ গা। ‘তারিখে শেরশাহী-তোহফা এর আকবার শাহী’র লেখক হচ্ছেন আব্বাস শেরওয়ানী। **মাখজান-এ-আফগান :** এর লেখক হলেন নিয়ামতুল্লাহ।

এছাড়া আরও বহু মুসলমান ঐতিহাসিকদের লেখা ইতিহাস গ্রন্থ আজ ইতিহাস জগতে জন্মদাতা ও জন্মদাত্রীর ভূমিকায় চিরভাস্বর হয়ে আছে। যথা : ‘তারিখে

দাউদী’র লেখক হলেন আবদুল্লাহ। আবুল ফজলের লেখা ‘আকবর নামা’, ‘আইনি আকবরী’, বাদায়ূনির ‘মুনতাখাবুর তাওয়ারিখ’ নিজামুদ্দীনের লেখা ‘তাবাকাত-ই-আকবার’, হিন্দুবেগ (ছদ্মনাম) সাহেবের লেখা ‘ফেরিস্তা’, ফেরিস্তা লিখিত ‘তারিখে হিন্দুস্থান, কাকি খাঁ লিখিত ‘মুনতাখাবুল-লুবাব’, ফৈজি সাহেব লিখিত ‘আকবর নামা’ ‘আকবরনামা’ ও ‘মসনী’, আবদুল বাকী সাহেব লিখিত ‘মাসির-ই-রহিমী’, এনায়েত খাঁ লিখিত ‘শাহজাহান নামা’ দারাহেকো লিখিত ‘সফিনা-আল আউলিয়া’ ও ইকবালনামা -ই-জাহাঙ্গীরী’ প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত ইতিহাস ও ঐতিহাসিকের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বলাবাহুল্য মুসলমান জাতির রক্তে ইতিহাস লেখা, পড়া তথা ইতিহাসে সর্বপ্রকার আকর্ষণ যেন স্বাভাবিক হয়ে পড়েছে। অবশ্য বর্তমানে ইংরেজদের বিষ খাওয়া হিন্দু ও মুসলমান জাতির কথা স্বতন্ত্র।

আজ ভারতীয় হিন্দু ঐতিহাসিকদের নাম লিখলেও অনেকগুলো নামই সগর্বে লেখা যায়, যেমন ঐতিহাসিক শ্রী রমেশ মজুদার, শ্রী যদুনাথ সরকার, শ্রী ঈশ্বরী প্রসাদ, শ্রীপ্রভাত বাবু, শ্রী কিরন বাবু, শ্রী হিরেন বাবু, শ্রী চন্দ্রশেখর বাবু, শ্রী নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপধ্যায়, শ্রী অক্ষয় কুমার বাবু, শ্রী নৃপেন্দ্র চন্দ্র বাবু, শ্রী অশোক মেহতা বাবু, শ্রী সখারাম বাবু, শ্রী গনেশ বাবু, শ্রী ডাঃ কালিদাস নাগ বাবু, শ্রী হেমেন্দ্র কুমার বাবু, শ্রী কিরণ চৌধুরী, শ্রীবিনয় ঘোষ প্রভৃতি ঐতিহাসিকদের নাম বিশেষ প্রশংসার দাবীদার।

কিন্তু সে সাথে মনে রাখতে হবে যে, এ সমস্ত অমুসলমান ঐতিহাসিকদের নামই আজ ইতিহাসের পাতায় যথেষ্ট নয় বরং এমন অসংখ্য মূল্যবান ঐতিহাসিকদের নামও উল্লেখ করা যেতে পারে যে আজকের আধুনিক শিক্ষিত শিক্ষিতাদের বিশ্বয়ের উদ্রেক না করে পারে না।

মোটকথা আধুনিক শিক্ষিতদের মধ্যেও মুসলমান ঐতিহাসিকগণ সংখ্যায় নগণ্য নন মোটেই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ খোদাবখশ সাহেব এন, এ, বি, সি, আই, বি, এল; ব্যারিস্টার সালাহউদ্দিন সাহেব, মাওলানা আকরাম খাঁ সাহেব প্রভৃতি পণ্ডিত প্রবর গণের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁরা বহু পুস্তক-পুস্তিকা ও গ্রন্থ লিখে গেছেন। তাছাড়া ‘মুসলিম বিক্রম’, ‘বাংলায় মুসলিম রাজত্ব’ ইতিহাস বই দুটি লিখেছেন হুগলি জেলার শ্রীরামপুরের নুরুন্নেসা খাতুন। ‘পারস্য প্রতিভা’ লিখেছেন বরকত উল্লাহ সাহেব এম, এ, কি, এল, বি-সি-এস, ‘Musalman Culture.’ লিখেছেন শহীদ সোহাওয়ার্দী এম, এ, সাহেব। Islam and the modern world এবং Short cultural History of the Arabs’ ইতিহাস দুটি লিখেছেন কে, আলি এম, এ, সাহেব। সৈয়দ আলি হাসান সাহেব লিখেছেন ‘Our Heritage’ এম এন রায়ের ‘Historical Rule of Islam, এর বঙ্গানুবাদ ইসলামে ঐতিহাসিক অবদান আর বৈশিষ্ট্য’ লিখেছেন মোহাঃ আবদুল হাই এম, এ, H.A.R.Gilb ইংরেজ লেখকের ‘Mohammedanism- and Historical survey’ গ্রন্থের ঐতিহাসিক পর্যালোচনা বাংলায় লিখেছেন মতিউর রহমান সাহেব, মোঃ ইসহাক এম, এ, লিখেছেন, ‘ইসলামের অভিনব ইতিহাস’ ও পাক ভারতের ইতিহাস’। নুরুল ইসলাম

চৌধুরী সাহেব এম, এ, লিখেছেন 'ইসলামের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' এবং 'পাক ভারতের মুসলিম শাসনের ইতিহাস'। খ্রীষ্টান ফিলিপ, কে. হিট্টি সাহেবের The Arabs, A short History র বঙ্গানুবাদ 'আরব জাতির ইতিহাস' লিখেছেন প্রিন্সিপ্যাল জনাব ইব্রাহিম খাঁ সাহেব এম, এ, বি, এল। এছাড়া আরও অনেক ইতিহাস বই তিনি লিখেছেন, যেমন A needets from Islam আনোয়ার পাশা 'কামাল পাশা' ইত্যাদি। A brief survey of Muslim rule in India পুস্তক খানি লিখেছেন মোহাঃ মহর আলি এম, এ,। 'ইসলাম আধুনিক জগত' এবং 'An Intro duction to the History of Muslim culture পুস্তক দুটি লিখেছেন মোহাঃ মিজানুর রহমান সাহেব এম, এ, মোঃ ওলিউল্লাহ সাহেব লিখেছেন 'সেকাল ও একাল'। কাজী ইমদাদুল হক বি, এ, টি, লিখেছেন 'ঐতিহাসিক গ্রন্থ মালা'। জি, এইচ, রহমান এম, এ, লিখেছেন তিন খানি অতি মূল্যবান ইতিহাস বই 'Out lines of History of Islam, History of Indo Pakistan এবং Out lines of Modern Europe মোহাঃ আবদুর রহিম সাহেব এম, এ, লিখেছেন 'আরব জাতির ইতিহাস'। সিরাজ সাহেব লিখেছেন 'মুসলিম সভ্যতা', 'তুরস্ক ভ্রমণ', 'মহানগরী কার্ভোভা, প্রবৃত্তি ইতিহাস'। মজিবুর খাঁ এবং আহসানুল্লাহ খাঁন বাহাদুর লিখেছেন 'আমাদের ইতিহাস'। জাষ্টিস সৈয়দ আমীর আলি লিখেছেন History of the Saracenes', আবার এটাকে 'আরব জাতিরই ইতিহাস' নাম দিয়ে বাংলায় প্রকাশ করেন জনাব রিয়াজুদ্দিন সাহেব। তদানীন্তন স্কুল ইন্সপেক্টর আবদুল করিম সাহেব লিখেছেন 'ভারতে মুসলমান রাজত্বের ইতিবৃত্ত'। নোয়াখালির জনাব ডক্টর আবদুল কাদের সাহেব লিখেছেন 'সুলতান মাহমুদ', তারপর লিখেছেন 'বাবর', 'হায়দার আলি' ও টিপু সুলতান'। তাছাড়া আরও কয়টি ইতিহাস তিনি লিখেছিলেন যা মুসলিম প্রতিভার জীবন্ত সাক্ষী স্বরূপ চিরউজ্জ্বল হয়ে আছে। যেমন 'তুরস্কের ইতিহাস', 'স্পেনের ইতিহাস', 'ক্রসেডের ইতিহাস', 'সালাহউদ্দিন', 'মুরসভাতা', 'কামাল পাশা' ও 'মুসলিম কীর্তি' ইত্যাদি। এছাড়া ও আরও অনেক ইতিহাস ডক্টর সাহেবের অক্ষয় কীর্তির পরিচায়ক রূপে বেঁচে থাকলেও প্রকৃষ্ট প্রমাণের অভাবে তা এখানে উল্লেখ করা গেল না। খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার কালিগঞ্জ থানার নলতা গ্রামের খাঁন বাহাদুর জনাব আহসানউল্লাহ এম, এ, অবিভক্ত বঙ্গে শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল ছিলেন। তিনি লিখে গেছেন 'মুসলিম জগতের ইতিহাস' এবং 'ইসলামের ইতিবৃত্ত'।

এছাড়া আরও বহু মুসলমান ঐতিহাসিকদের লেখা ইতিহাস আরজও বেঁচে আছে যা মুসলিম বিশ্বের অবিস্মরণীয় কীর্তির বাহক। যেমন হুগলী জেলার বাগনানের ডাঃ সৈয়দ আবুল হোসেন সাহেব, খুলনার কাজী আকরাম হোসেন ইত্যাদি বহু ইতিহাস রচয়িতার নাম পাওয়া যায়। বর্ধমান জেলার আবুল হায়াত সাহেবের ইংরেজী ইতিহাসটি ও চিত্তাকর্ষক বই সন্দেহ নেই। তাছাড়া বর্ধমান জেলার জনাব গোলাম রব্বানী সাহেব, কাটোয়ার এম, আঃ রহমান সাহেব, বর্ধমানের ওয়ারী গ্রামের আবদুল মওদুদ সাহেব এম, এ প্রভৃতি ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তিরাই ইতিহাসে কম বেশী ছাপ রেখে গেছেন। কিন্তু মাঝখানে কিসের যেন হতাশা, কিসের যেন অমনোযোগ অবহেলা, কিসের যেন অবক-অলস নিদ্রা। লেখকদের লেখনীসমুদ্রে পড়ল ভাঁটা।

প্রবাহিত হল অমনোযোগীতার স্রোতধারা। আবার এক সময় আচম্বিতে প্রবল জোয়ারের ন্যায় দুকূল প্রাবিত করে আলস দুমে অচেতন লেখকদের চেতনার সঞ্চারণ করতে অমনোযোগিতার যবনিকা টানতে তথা ইনকেলাব আনতে ধুমকেতুর মত আত্মপ্রকাশ করল 'পুস্তক সম্রাটের মত আরও কিছু জাতীয় ইতিহাস। তবে উপরের পুস্তক-পুস্তিকা ও গ্রন্থাদির দ্বারা একথা সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে, প্রতিটি শিক্ষিত মানুষেরই অধিকাংশ লেখা আরব, ইসলাম ও মুসলমান কীর্তিকলাপকে কেন্দ্র করে। কিন্তু কেন? এর অন্যতম প্রধান কারণ শিক্ষিত মুসলমানগণ বুঝতে পেরেছিলেন যে ইংরেজের বিষবৃক্ষ ফলে ফুলে মজবুত হয়ে ভারতের মাটিতে শিকড় গেড়েছে। হিন্দু জাতি মহোদয়গণ দিন দিন যেন বুঝতে শিখছেন যে, মুসলমান বিদেশী আর তারা হিন্দুদের শত্রু! অতএব শত্রুর বীরত্ব, বড়ত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও কৃতিত্বকে বিকৃত বা পাচা দেয়া স্বাভাবিক অথচ এ বিষাক্ত প্রতিকূল আবহাওয়াকে অনুকূলে পরিণত করাও প্রতিবেশী মুসলমানদের শক্তির বাইরে। সুতরাং দ্বিতীয় পথই তাঁরা বেছে নিলেন; নিজাদের ঐতিহ্য ইতিহাসকে সঠিকভাবে বাঁচাতে নিজেরাই কলম ধরেছিলেন শত্রু আগুলে। এক্ষেপে, ধর্ম গ্রন্থ গুলোতে কতটুকু ইতিহাসের ইন্ধন মিলতে পারে, সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক।

বেদ সম্বন্ধে হিন্দু ভাই-বোনদের বিশ্বাস যে, "ইহা আদি গ্রন্থ, ইহার কোন পরিবর্তন বা বিকার আজ পর্যন্ত সংঘটিত হয় নাই। বেদ মন্ত্রগুলো দীর্ঘকাল ধরিয়া আর্য মুনিঋষিগণের কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া আসিয়াছে এবং শিক্ষার্থী গুরু গৃহে অবস্থান করিয়া, তাহার বর্ণিত ঐ মন্ত্ৰগুলো কণ্ঠস্থ করিয়া আনিয়াছে।" কিন্তু বেশীর ভাগ পণ্ডিত গবেষণাভে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, আসল বেদের অস্তিত্ব আমাদের দেশে নেই বরং যেটুকু যেখানে আছে তা বাড়তে বাড়তে মূল বিষয় বস্তুর মধ্যে বড় বাক্যের ব্যবধানের সৃষ্টি হয়েছে।

এক্ষেত্রে বিরোধীপক্ষ কোন ব্যক্তির বক্তব্যের অবতারণা না করে স্বয়ং ঋষিদের জাম্ব্যকার পণ্ডিত শ্রী মহেন্দ্র চন্দ্র রায় তত্ত্বনিধি বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের ভাষ্য থেকে কিছু অংশ তুলে ধরা হল—“এতাদৃশমূল্যবান বেদের আজ কেন এত অল্প প্রচার একটু প্রাণধান করিলেই বোধগম্য হইবে। কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে ভারত মহা শাশানে পরিণত হইয়াছিল। মহা যুদ্ধের সহিত আর্য গৌরব রবি (বেদ বা ধর্ম গ্রন্থগুলি) যে চিরতরে অন্তাচলে গমন করিয়াছিল সে বিষয়ে বোধ হয় মতদ্বৈদ নাই।” তিনি আরও বলেন, “দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে প্রবল পরাক্রান্ত মগধের রাজ বংশীয় মহানন্দীসূত, সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যবিশেষ হইতেই রাজ্য বিলোপ হইয়া ক্ষত্রিয় ধর্ম ভারত হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে।” রায় মহাশয় আরও লিখেছেন, “পরবর্তীকালে বঙ্গে তাত্ত্বিক ধর্ম প্রচারের পৃষ্ঠপোষক মহারাজাধিরাজ বল্লাল সেনের নিয়োজিত আগমোক্ত শাস্ত্র বাণী 'কলিতে বৈদিক মন্ত্রশক্তি লোপ পাইয়াছে,' 'বেদমন্ত্র কার্যকারী নহে'। 'মাগমন্ত্র নিষ্ফল' ইত্যাদি প্রবচনে বেদের আলোচনা একেবারে রহিত হইয়া গেল। ধর্ম নিরত নিষ্ঠাবান বৈদিক ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধতাত্ত্বিক ধর্মের আবরণে প্রাণপণে যে গ্রন্থগুলো অতি সংগোপণে রক্ষা করিয়াছিলেন তাহাও গ্রীক, রোমান, পারসিক, তুরাণ, আফগান প্রভৃতি বৈদেশিকগণের বারংবার আক্রমণে বিলুপ্তিত ও ভস্মীভূত হইয়া বিলুপ্ত গিয়া হইয়াছিল বলিলেও অতুক্তি হয় না।”

বেদের মধ্যে ঋগ্বেদই সর্বাপেক্ষা অধিক নির্ভরযোগ্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় এর আসল রচয়িতা কে বা কারা তা মানুষের কাছে নানা পরস্পর বিরোধী মন্তব্যের ঘুরপাকে আজও অবধি অজ্ঞাত থেকে গেছে। যেমন :

ক) “হে হরি আমরা তোমার উদ্দেশ্যে নূতন স্তোত্র রচনা করিয়াছি।” (১০মঃ/১৬/২১)

খ) “হে ইন্দ্র তোমার স্তুতির জন্য গৌতম বংশীয় কবিগণ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন।” (১/৯/৬৩)

গ) “গৌতম এই নূতন বেদ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন।” (১ম-৩৩/৬২)

ঘ) “হে ইন্দ্র তুমি আমাদের রচিত নূতন ইবাথে (মন্ত্রে) সন্তুষ্ট হইয়া, আমাদেরকে ক্ষমা কর।” (১ম— ১০/১৩০)

ঙ) “এই স্তুতি বিষয়ক বেদ মন্ত্র আমি মান্দার্য ঋষির রচিত।” (১ম—৩৩/৬২)

চ) “পুরুভুজ ঋষি এই বেদমন্ত্র রচনা করিয়াছেন।” (৮ম— ১৭/৮)

ছ) “হে ইন্দ্র! বিমদ বংশীয় ঋষিগণ তোমার উদ্দেশ্যে এই বেদ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন।” (৭/৯/২২)

জ) “হে ইন্দ্র! কি পূর্বাকালীন প্রাচীন ঋষিগণ কি একালের ঋষিগণ সেই সকল “বিপ্ররাই” হইতেছে বেদমন্ত্রের রচয়িতা।” (৭/৯/২২)

উপরোক্ত ‘ক’ থেকে ‘জ’ পর্যন্ত উক্তিগুলো একটু মনযোগ সহকারে পড়লেই মন হতাশার বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে এবং ঋগ্বেদের স্বরূপ প্রকৃতি আমাদের সামনে পরিষ্কার ও পরিষ্কৃত হয়ে যায় শুধু তাই নয়, A spirations from a fresh world, by Shakuntala Rao Shastri (P.P. 1 —2) থেকে পাওয়া যায় —“ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, বেদের মন্ত্রগুলো বহু দিন যাবত ভারতে বসতি স্থাপনকারী আর্যদের মধ্যে ইতস্তঃ বিক্ষিপ্তভাবে ছিল। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন লোক এ মন্ত্রগুলো রচনা করিয়াছেন এবং তাঁহাদের বংশধর ও শিষ্যগণ উহা সংরক্ষণ করিয়াছেন। যখন মন্ত্রগুলোর সঙ্গে সঠিক পরিচয় করিয়া আসিয়াছে, এমনই এক অন্ধভক্তির যুগে উহাকে ঐশী বাণী বলিয়া গ্রহণের প্রবণতার উৎপত্তি হইয়া থাকিবে।

এসব যুক্তি তর্ক ছাড়াও স্বয়ং বেদের মন্ত্রগুলোই মানুষের দ্বারা রচিত হওয়ার প্রমাণ বহন করিতেছে। বহু মন্ত্র রচনাকারী তাঁহার নাম মন্ত্রের সহিত যোগ করিয়া দিয়াছেন। মন্ত্র রচনাকারী ঋষিগণের স্বগতোক্তি হইতেছে। —আমরা বহু পরিশ্রমে এবং নিজেদের জ্ঞান ও সাধ্যানুসারে এই শ্লোকগুলি রচনা করিয়াছি।”

সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য ‘ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে (১ম—৩৪/১১) দেবতাগণের স্তুতিতে দেবগণের সংখ্যা মাত্র তেত্রিশটি দেখা যায়, কিন্তু দশম মণ্ডলে (১০— ৫/৬) সে সংখ্যা বৃদ্ধিত হইয়া তিন হাজার তিন শত নয় জনে পরিণত হইয়াছে।”

অতএব নীতি অনুসারে মানুষের রচিত একটিই ইতিহাসে একাংশের একই বক্তা অন্যংশে বিপরীত রূপধারণ করলে তাকে যদি ইতিহাস বলে গ্রহণ না করা যায়, তবে নিঃসন্দেহে এই প্রকার গ্রন্থের বিচার ধর্মগ্রন্থ রূপে অনাবশ্যক হলেও বিজ্ঞ ও বুদ্ধিজীবীদের কাছে অন্তত ইতিহাস হিসেবে এগুলো গ্রহণ করান যায় না মোটেই।

অনুরূপ রামায়ণ ও মহাভারতকেও হিন্দু ধর্মের পবিত্র পুস্তক বা ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলা হয়। কিন্তু নিরপেক্ষ সূক্ষ্ম সমালোচক এবং প্রতিভাদীপ্ত ঐতিহাসিকগণ এ দুটি গ্রন্থকে ইতিহাস বলে স্বীকার করেন নি। উদাহরণ স্বরূপ বিখ্যাত ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন এম, এ, পি, এইচ, ডি, আর, এস, ডিলিট মহোদয় বলেন, “রামায়ণ ও মহাভারত কিন্তু কাব্যের বই ইতিবৃত্ত নহে। সত্য সত্যই রাম ও যুধিষ্ঠির নামে কোন রাজা ছিল কিনা তাহা বলা যায় না।”

এমনিভাবে ধর্মীয় পবিত্র পুরাণ সম্বন্ধেও এ একই কথা। পুরাণ যে একটা ইতিহাস এবং তা যে নির্ভুল একথা ঐতিহাসিকগণ এবং বিশ্ববরেণ্য হিন্দু পণ্ডিতগণ অনেকেই স্বীকার করেন না। ভারতের বিখ্যাত মনীষী এবং আন্তর্জাতিক পরিচিত পণ্ডিত স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, “স্মৃতি পুরাণাদি সামান্য বুদ্ধি মানুষের রচনা; ভ্রম, প্রমাদ, ভেদবুদ্ধি ও দ্বেষবুদ্ধিতে পরিপূর্ণ। তাহার যেটুকু উদ্ধার ও প্রীতিপূর্ণ তাহাই গ্রাহ্য, অপরংশ ত্যাজ্য।” — (স্বামী বিবেকানন্দ ‘পত্রাবলী’ ৩য় ভাগ ৭৪ পৃষ্ঠা।)

স্বামী বিবেকানন্দ বুঝেছিলেন এরূপ ধর্মগ্রন্থকে সম্বলকরে বা তাকে সঠিক ইতিহাস বলে ভারত তথা হিন্দু জাতিকে রক্ষা করা যাবে না। বরং রক্ষা করা যেতে পারে যদি ইসলাম ধর্মকে বৈদিক ধর্মের সাথে মিশান হয় তবেই। প্রমাণ স্বরূপ বিবেকানন্দ বলেছেন, “আমাদের মাতৃভূমির পক্ষে হিন্দু ও ইসলাম ধর্মরূপ এ দুটি মহান মতের সমন্বয়ই বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামী দেহ একমাত্র আশা। আমার মাতৃভূমি যেন ইসলামীয় দেহ এবং বৈদান্তিক হৃদয় রূপ এ দ্বিবিধ আদর্শের বিকাশ করিয়া কল্যাণের পথে আশ্রয় হয়েন। (দ্রষ্টব্য, বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৮ম খণ্ড)

এবার আসুন প্রকৃত ইতিহাস ও ঐতিহাসিকদের সম্বন্ধে বিশ্ব মনীষীদের অমূল্য বক্তব্যকে নিয়ে কিছু কিছু আলোচনা করা যাক।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক মিঃ ব্রাউন বলেন, “আরবীয়ানরা বিশ্বকে সর্বপ্রথম ইতিহাস লিখন শিক্ষা দেয়। তাদের ইতিহাস লেখার বৈশিষ্ট্য ছিল যে, প্রকৃত ঘটনার সাথে কাল ও অবস্থা সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞাত হওয়া যেত। যেহেতু তাদের ইতিহাসের মত উপযুক্ত ইতিহাস কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপেও পরিদৃষ্ট হয় নাই।”

আর একটি মূল্যবান উদ্ধৃতি খুবই উল্লেখযোগ্য বলা যেতে পারে—“অতি বাস্তব ও প্রকৃত ঘটনা এটাই যে, মুসলমানরাই বিশ্বের সর্ব প্রথম ইতিহাস লেখার সূত্রপাত করে। ইহার পর এরূপ ত্বরিত গতিতে উন্নতি ও সমৃদ্ধি লাভ করে যে, ইউরোপ অদ্যাবধি উহার সমপর্যায় আসিতে সক্ষম হয় নাই। কারণ মুসলমানেরা ইতিহাস লিখনে অতিমাত্রায় সতর্কতা অবলম্বন করত প্রকৃত ও সত্য বিষয়বস্তু বিনা স্বার্থে, সত্যের অপলাপ না করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু বর্তমান ইউরোপ ও অন্যান্য দেশের ইতিহাস উল্লিখিত দোষ সমূহ হইতে মুক্ত হইতে পারে নাই।” (কোঃ প্রাঃ পঃ)

R.A. Nicholson বলেন :—

The sacred book offered many difficulties both to the Arabs and especially to persians and other Muslims of foreign extraction. For their right understanding of the Holy

Quran, a knowledge of Arabic grammar and philosophy was assential and this involved the study of ancient pre-Islamic poems, The study of those poems entailed researches into genealogy and history, which in course of time become independent branches of learning.

অর্থাৎ : পবিত্র গ্রন্থ (কুরআন) আরববাসীগণ এবং বিশেষ করে পারস্যবাসীগণ ও বিদেশী বংশের অন্যান্য মুসলমানদেরকে বহু অসুবিধার মধ্যে নিষ্ক্ষেপ করেছিল। পবিত্র কুরআনের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝার জন্য আরবী ব্যাকরণ ও দর্শনে জ্ঞান লাভ অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়েছিল এবং তজ্জন্য প্রাচীন প্রাগৈসলামিক কবিতা সকল পাঠ করতে হত। এ কবিতাবলী পাঠের নিমিত্ত বংশ বিবরণ ও ইতিবৃত্ত পাঠ করার প্রয়োজন হত, যার ফলে কালক্রমে ইতিহাস বিদ্যা এক বিশেষ ও স্বতন্ত্র শাখাতে পরিণত হয়েছিল।

Mr. Draper বলেন : In Whatever direction we look, we meet in various pursuit of peace and war, of letters and science, saracenic vestiges.

অর্থাৎ : আমরা যেদিকে দৃষ্টিপাত করি না কেন যুদ্ধ ও শান্তির বিভিন্ন কার্যকলাপে এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন সাধনায় আরবীয় পদচিহ্ন বা নিদর্শন সমূহ দেখতে পাই।

আমরা নানা মনীষীদের মতবাদকে নিয়ে গবেষণা শেষে এ সিদ্ধান্তে উপনীত থেকে বাধ্য হব যে, মুসলামন তথা আরববাসীরাই বিশ্বে ইতিহাসের সূত্রপাত করেছে। এদের পূর্বে জগতে ইতিহাস লেখার কোন সুনিয়মিত ব্যবস্থা ছিল না। বলাবাহুল্য, ইসলাম গগনে এমন অসংখ্য মনীষীর আবির্ভাব ঘটেছে যারা দেদীপ্যমান নক্ষত্র রাজীর ন্যায় জগতের বিভিন্ন মণ্ডলকেই প্রভা বিকিরণ করেছেন। মুসলিম স্বনামখ্যাত ঐতিহাসিক ও ইতিহাসের জন্ম হয়েছে যাদের নাম আমরা পূর্বেই কিছু কিছু উল্লেখ করেছি এবং এখানেও কিছু সুখ্যাতি সম্পন্ন ইতিহাসের নাম লিপিবদ্ধ করছি।

বিখ্যাত মুসলমান ঐতিহাসিক বালাজুরী দুখানি বৃহৎ ইতিহাস লিখেছেন; একটি 'ফাতুহুল বুলদান' এবং দ্বিতীয়টি 'আনসাবুল আশরাফ ও যা আখবারোহা' নামে বিখ্যাত। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে কাভীবাহ একখানি বিখ্যাত ইতিহাস লিখে গেছেন যার নাম 'ওয়ুনুল আখইয়ার'। আহমদ বিন আবু ইয়াকুব বিন জাফর 'তা-রিখ ইয়াকুবী' নামক এক গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস লিখেছেন যার মধ্যে ৯৬৯ সালের পর্যন্ত ইতিহাস বর্ণিত আছে। ইতিহাসটি কতটুকু প্রশংসার দাবী রাখে তা প্রশংসার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, লগুনে বিভিন্ন প্রকাশক দ্বারা বার বার এটি ছাপা হয়েছে। সর্বশেষ বার ছাপা হয় ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে লগুনেই। পৃথিবীর প্রায় সব ভাষাতেই এর আংশিক অনুবাদ করা হয়েছে কিন্তু পরিপূর্ণ অনুবাদ করা হয়েছে নিশ্চিত সূত্রে পঁচিশটি ভাষায়। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক আবু হানিফা আহমদ দিনাওয়ারী তাঁর রচিত 'কিতাবুল আখবারিতি ওয়াল' নামক গ্রন্থে পারস্য দেশের সুবিস্তৃত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেন। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক হযরতের জীবনী রচনা করে সর্বপ্রথম ইতিহাস লেখার দ্বারোদঘাটন করে

বিশ্বকে ইতিহাস রচনার প্রতি অনুপ্রাণিত করেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইমাম তাবারী বিশ্বশ্রেষ্ঠ ইতিহাস লেখক। তিনি ৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। তাঁর লেখা 'তারিখে-তাবারী' মোট বার খণ্ডে ছাপা হয়েছিল। বইটির পাতা ছিল বার খণ্ডে আট হাজারেরও বেশী। তিনি আখবারুল-রসুল ওয়াল মুলুক' নামক বিখ্যাত ও সুবৃহৎ ইতিহাস গ্রন্থখানিতে বিশ্বের সৃষ্টি থেকে ৯২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ের ইতিহাস লিখে গেছেন। এবার খণ্ড বইও ইংলণ্ডে ছাপা হয়েছিল। বিখ্যাত ঐতিহাসিক মাসযুদী একজন বড় ভূগোলজ্ঞ ছিলেন এবং ভূ-পর্যটকও ছিলেন। তিনটি বৃহদাকার ইতিহাস তাঁকে অমর করে রেখেছে। (১) 'আখবারুজজামান', (২) 'মারওয়াজুজ জাহাব' ও (৩) 'তানবিহুল আশরাফ' তিনটি বই খুব সুখ্যাতি অর্জন করেছে তন্মধ্যে ২নং বইটি পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল। 'কামিল' নামক সমগ্র বিশ্বের ইতিহাস (১২৩১ খৃঃ পর্যন্ত) রচয়িতা ইবনুল আসীর ত্রয়োদশ শতাব্দীর সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক রূপে খ্যাতি লাভ করেন।

প্রায় ৭৫০০ জন সাহাবার (হযরতের অনুচরবর্গ) জীবন চরিত অবলম্বনে তিনি 'উসদুল-গাবাহ' নামে এক অভিনব ইতিহাস প্রণয়ন করেন। আসসওলী লিখিত বিখ্যাত 'আখবারুল-আব্বাস' এক অতি বিশেষ বিশ্বাস্য ইতিহাস। তাঁর দ্বিতীয় সৃষ্টি "কিতাবুল ফিদ-আ" যা একটি প্রামাণ্য এবং প্রাণবন্ত ইতিহাস। ইবনে তাইমিয়া নামক স্বনামধন্য ও সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ১২৬২ খ্রীষ্টাব্দে জন্মে ১৩২৭ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। তাঁর সামগ্রিক জীবনে সর্বমোট ৫৯১ খানা গ্রন্থের প্রণেতা হিসেবে তিনি ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তথা জগতে এক অক্ষয় কীর্তিও এক অবিস্মরণীয় কৃমিকা রেখে গেছেন। ইবনে খালদুন নামক বিখ্যাত স্পেনীয় ঐতিহাসিক জগতের ইতিহাসে ইতিহাস রচনার এক নূতন প্রণালী প্রবর্তন করেন। তাঁর মত রহস্য উদঘাটনকারী ও গভীর অথচ সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন ঐতিহাসিক দার্শনিক পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। Prof. Hitti তাঁর সম্বন্ধে বলেন : Ibn Khaldun was the greatest historical philosopher Islam produced and one of the greatest of all times. প্রাচ্যের একজন প্রখ্যাত ভূগোল বিশেষজ্ঞ 'মুয়াজ্জামুল বুলদান' নামে যে ভৌগোলিক বিশ্বসুখ রচনা করেন তাতে ইতিহাস পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির ইতিবৃত্ত এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞান আলোচিত হয়েছে।

এমনিভাবে আনুনাতিম আলর জি, আবুল ফারজ, ইবনে মাসবুদ, ইবনে হেজাম, ইবনে আসাকীর, আল জাওজির প্রমুখ প্রখ্যাত ঐতিহাসিকগণ বিশ্বের বই পুস্তকে বেঁচে থাকলেও আমাদের মনমগজে প্রবেশ করতে পারেন নাই। কেন, সে কারণেই অনুমেয়।

এ অবসরে ভারতের ইতিহাসের অবস্থাটা একটু পর্যবেক্ষণ করে দেখা যাক।

ভারতবর্ষ প্রাচীন যুগ থেকেই ইতিহাসের ক্ষেত্রে পিছিয়ে ছিল। অবশ্য পুঁথি, উপন্যাস ও কাব্যের কথা বলছি না কিন্তু এ যুগে ইতিহাস লেখার লেখক ডজন ডজন শহরে পল্লীতে পাওয়া যাচ্ছে যারা কাগজে কালি দিয়ে অবিরত লিখে যাচ্ছেন ঐতিহাসিকতার বাজারে। কিন্তু আগেই বলেছি আবারও বলছি, কাগজের উপর লেখা

সুন্দর হবে শুধু কাগজ পরিষ্কার থাকলেই নয় বরং মগজ পরিষ্কার থাকলে তবে। অথচ মগজে এখনও বেশীর ভাগ ইংরেজদের পক্ষিল প্রভাব পরিচ্ছন্ন। তদুপুরি অনেকেরই যোগ্যতার অভাবও অস্বীকার করা যায় না।

আসুন এবার উপরোক্ত মন্তব্যের সাক্ষী স্বরূপ সুবিখ্যাত লেখক, সাহিত্যিক, সমালোচক এবং ইতিহাসবিদ শ্রী হেমেন্দ্র কুমার রায় মহাশয়ের লেখা থেকে কিছু অংশ তুলে ধরা হল—‘ভারতবাসীরা ইতিহাস রচনার জন্য সুখ্যাতি লাভ করেন। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস দুর্লভ। মুসলমানরা এদেশে এসে ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করেন এবং তাঁদের দেখাদেখি অল্প কয়েকজন হিন্দুও কিছু কিছু ঐতিহাসিক রচনা রেখে গেছেন। কিন্তু সে রচনাগুলো প্রায়ই নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত হয় না। এদেশে নিয়মিতভাবে ইতিহাসে রচনার সূত্রপাত করেন পাশ্চাত্য লেখকরাই। যদিও সে সব হচ্ছে বিজ্ঞতার লিখিত বিজিত দেশের ইতিহাস। তবু তাঁদের মধ্যে অল্পবিস্তর পাওয়া যায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এবং প্রচুর মূল্যবান তথ্য এবং একথা বললেও ভুল বলা হবে না বাঙালীরা ইতিহাস রচনা করতে শিখেছে ইংরেজদের কাছ থেকেই। আমরা কিন্তু ইতিহাসের বাজারে খুবই নতুন লোক। তাই হেমেন্দ্র বাবু পরেই বলেছেন—“বাংলা গদ্য সাথেকোর প্রথম গুরু বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের দিকে বাঙালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং তাঁর যুগেই বাঙালীরা বিশেষভাবে ইতিহাস রচনায় নিযুক্ত হন। কিন্তু আমাদের ইতিহাস রচনার প্রাথমিক প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য হয়েছিল বলে মনে হয় না। অনেকেরই সম্বল ছিল কেবল ইংরেজদের লিখিত ইতিহাস। অনেকের রচনা হচ্ছে অনুবাদ। অনেকে স্বাধীন চিন্তা শক্তির পরিচয় দিতে পারেন নি। অনেকের ভিতর ছিল না সত্যিকার ঐতিহাসিক সুলভ মনোবৃত্তি। অনেকেই নন নিরপেক্ষ সমালোচক। অনেকে অল্প বা বিনা পরিশ্রমে থেকে চাইতেন ঐতিহাসিক।”

তারপর শ্রী হেমেন্দ্র বাবু আরও বলেছেন—“বঙ্কিমোত্তর যুগে বাংলার ঐতিহাসিক সাহিত্য ধীরে ধীরে উন্নত থেকে লাগল। কিন্তু সে উন্নতিকে সর্বোতভাবে আশাপ্রদ বলা যায় না। সে সময়ে এমন ঐতিহাসিক ছিলেন, যিনি মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত এবং গুপ্ত বংশীয় চন্দ্রগুপ্তকে অভিন্ন ব্যক্তি বলে মনে করেছেন। ঐতিহাসিক নিখিল চন্দ্র রায়ের নাম সুপরিচিত। কিন্তু তিনি ইতিহাস রচনায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারেন নি এবং তার রচনাও ভূরি ভূরি ভ্রম প্রমাদে পরিপূর্ণ।” তিনি আরও অগ্রসর হয়ে বলেছেন—“সত্য কথা বলতে কি আমাদের মাতৃভাষায় আজ পর্যন্ত নিখুঁত ইতিহাস রচিত হয় নি। মাতৃভাষায় যা হয়নি ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে একজন বাঙালী ঐতিহাসিকের দ্বারা সে দুরূহ কাজটি সম্পাদিত হয়েছে। স্যার যদুনাথ সরকার হচ্ছেন বাংলা দেশের প্রথম ঐতিহাসিক।” (‘যদুনাথ সরকার’ দ্রষ্টব্য)

অতএব এসব আলোচনার পর একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, আজ জগতের ইতিহাসে যত বড় বড় ইতিহাস আর ঐতিহাসিকের নামই থাকুক না কেন মুসলমান ঐতিহাসিকরাই প্রকৃত ইতিহাসের জন্মদাতার ভূমিকায় চির ভাস্বর হয়ে আছেন ও থাকবেন। শুধু তাই নয় মুসলমানেরাই ইতিহাসের আবিষ্কারক, নিয়ামক ও স্রষ্টারূপে বিশ্ব ইতিহাসের পাতায় বরণীয়, স্মরণীয় ও গ্রহণীয় হয়ে থাকবেন চিরকাল একথা আজ একটু তমসাস্ফন্ন বোধ হলেও অদূর ভবিষ্যতে তা প্রকাশ্য দিবালোকের অবশ্যই মত পরিস্ফুট হয়ে যাবে।

হিন্দু ও মুসলমান দুটি জাতির মধ্যে ভেদবুদ্ধি ও শত্রুতার প্রচার ও প্রসারের পরিপ্রেক্ষিতে ইংরেজ এক নূতন চাল অবলম্বন করেছিল। সেটি হচ্ছে এটাই যে ‘আদালতে পার্সি ভাষার চালচলন এবং চিঠি পত্র, বই পুস্তক ও কাব্য কবিতায় হিন্দুদের মুসলমানদের মত আবরী ও ফার্সী ব্যবহার করার পদ্ধতিটা সহ্য করা ঠিক নয়। তোমরা উর্দুভাষা অঞ্চলে উর্দুর যত প্রভাবই থাক মৃত প্রায় হিন্দি ভাষার উপর জোর দাও, আমরা পিছনে তোমাদের সাহায্যকারী।’ এভাবে ভারতের বুক থেকে নিরপরাধ উর্দু ভাষাকে গলাটিপে তার স্থলে সংস্কৃত ভাষার প্রবর্তনের জন্য আমাদের হিন্দু ভাইদেরকে নানা প্রলোভনে এবং যুক্তি তর্কে উত্তেজিত করাতে লাগল। অবশ্য পরিপূর্ণ কৃতকার্যতা লাভ করলেও পরিশেষে ভাষার রূপ যা দাড়াইল তা একটু পরেই অনুধাবন করা যাবে। প্রসঙ্গতঃ একটি কথা অবশ্যই আমাদের মনে রাখতে হবে যে, উর্দু ভাষা কোন বিদেশী ভাষা নয়। অবশ্য আরবী ফারসী ভাষা ভারতের বাইরে থেকে এসেছে, কিন্তু উর্দু ভাষা মুসলমান রাজারা ভারতের হিন্দু মুসলমান প্রজাদের সাথে পরামর্শক্রমে নিজেদের আদান-প্রদানের সুবিধার জন্য নানা ভাষার সংমিশ্রণে সৃষ্টি করেছিলেন। ইংরেজরা ভারতের হিন্দু ভ্রাতাদের শুধু একথাই মনে করিয়ে দেয়নি যে, আর্য জাতি ও আর্য ভাষা সবই ভারতের বাইরে থেকে আমদানী।

যাহোক, খৃষ্টান সাহেবরা অবিভক্ত বাংলাদেশের বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত। ছাচে ঢেলে সাজানোর মত করে চালু করার ব্যবস্থা পুরাপরি গ্রহণ করল। এককথায় ভারতের হিন্দু-মুসলমান মিলেমিশে যুগ যুগ ধরে যে শব্দগুলো ব্যবহার করছিল তাতে তৎসম আর ‘তদ্ভব’ শব্দ দিয়ে আরবী বা ফারসী শব্দের চিরতরে মৃত্যু ঘটানর চক্রান্ত চলল। হিন্দি ভাষাটিতে মোটামুটি ‘তদ্ভব’ আর ‘তৎসম’ সংস্কৃত শব্দ মিশিয়ে দিলেই প্রায় বাংলা হিন্দি সমান হয়ে যাবে। অবশ্য উদূতে ক্যারতা হ্যায়, ক্যারেগা শব্দগুলোর ‘হ্যায়,’ ‘গা’ প্রভৃতি লেজগুল থাকবে আর দেহটি থাকবে শুদ্ধ বাংলা মানেই “তৎসম” ও “তদ্ভব” ছাপ মারা সংস্কৃত শব্দ। আজ ইংরেজদের সে স্বপ্নসাধ ফলপ্রসূ হয়েছে।

বাংলাদেশের দিকে ইংরেজরা এত খেয়াল দিয়েছিল কেন? পাঠক মনের এ স্বাভাবিক প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতেই বলা যেতে পারে যে, বিশ্বনিয়ন্তা এদেশের অধিকাংশ লোককে এত স্বাধীনচেতা, স্বতন্ত্র বিশ্বাসী, বিদ্রোহী মনোভাবাপন্ন বীজ এবং কূটনীতি পরায়ণ এককথায় এত বিভিন্মুখী প্রতিভাধারী রূপে সৃষ্টি করেছেন যে, এদের চলন্ত, দূরন্ত ও ছটন্ত গতিকে যদিকেই মুখ ঘুরিয়ে দেয়া হবে সে দিকেই দুর্বীর গতি নিয়ে ছুটবে। হারবে, জিতবে, মরবে, বাঁচবে পরোয়া নাই তবু ছোট্টা চাই। তাই দেখা গিয়েছিল ইংরেজদের অনশাসন কালেও এ বঙ্গ দেশই ছিল ভারতের প্রাণকেন্দ্র অর্থাৎ কলকাতাই ছিল ভারতের রাজধানী। অতএব এ অবিভক্ত বাংলার বিরাট সংখ্যক মুসলমান জাতিকে দুর্বল করার চক্রান্ত শুরু হলে। সৃষ্টি হল ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ আর তার কেন্দ্র হল শ্রীরামপুরের মিশন। ১৮০০ সালে মে মাসে শ্রীরামপুরে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্ম হল। ‘ফোর্ট’ মানে ‘দুর্গ’। সত্যিই মুসলমান শক্তিকে দুর্বল করার জন্য ঐ ‘ফোর্টে’ বহু সৈন্য তৈরী থেকে লাগল যাদের হাতিয়ার হবে কামান গোলা নয়; বিষাক্ত কাল কালি আর পালকের কলম।

ইংরেজ চক্রান্তকারীদের সর্দার মিঃ কেরী হলেন বাংলা আর সংস্কৃত বিষয়ের প্রধান অর্থাৎ যাকে বলে Head of the department. বাকী প্রফেসার সাহেবদের মধ্যে ছিলেন মিঃ ওয়ার্ড, মিঃ মার্শম্যান, মিঃ বার্নস্ ডন প্রভৃতি এবং এ সাথে টাকায় কেনা কিছু আমাদের দেশীয় বাঙ্গালী ভ্রাতা। মিঃ কেরী সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় ব্যাকরণ তৈরী করেন যেটা দেখলেই বোঝা যায় যে কড়া পাকের সন্দেশ।

মিঃ কেরী সাহেবের চক্রান্ত প্রমাণের জন্য তাঁর এ বাংলা ব্যাকরণের প্রথম সংস্করণের ভূমিকা থেকে কিছু অংশ আমার বিচক্ষণ ও জ্ঞানসম্পন্ন সূক্ষ্মদর্শী পাঠক-পাঠিকা বৃন্দের উদার দৃষ্টির সামনে তুলে ধারা হল। যা থেকেই তাঁদের সাম্প্রদায়িক মনোভাবের যথেষ্ট পরিচয় মিলবে।

"The language in which the classical books of the Hindoos are written is principally derived from Sanskrit. This is called pure Bengali, but multitudes of words, originally Persian or Arabic, are not constantly employed in common conversation, which perhaps ought to be considered as enriching rather than corrupting the language."

হিন্দু সমাজের উচ্চ শ্রেণীর পুস্তকাদি যে ভাষায় লেখা হত তা প্রধানত সংস্কৃত ভাষা থেকেই উৎপত্তি সিদ্ধ এবং এটাকেই বিশুদ্ধ বাংলা বলে অভিহিত করা হত। কিন্তু ফার্সী অথবা আরবীয় কোন শব্দ সমষ্টিকে সাধারণ কথোপকথনে অবিরতভাবে ব্যবহার করা হত না, হয়ত এগুলো ভাষাকে উর্বর করার ক্ষেত্রের প্রতিবন্ধক বলে বিবেচিত হত। বরং সত্য বলতে কি এগুলো ছিল ভাষাকে দূষিত কারক।

এদিকে আরবী ও ফারসী বিভাগও খোলা হল, উদ্দেশ্যে শুধু সর্বনাশ সাধন, কারণ সেখানে কোন মুসলমান পণ্ডিতেরা মাথা গলিয়ে সুবিধা করতে পারে নি। তবে ইংরেজ বাহাদুরেরা সত্যিই বাহাদুর। তারা এ ভূমিকা নেয়ার আগেই বহু বিখ্যাত লোক বহু বছর ধরে বহু শ্রম সাধনা করে আরবী, ফারসী ও উর্দু শিখেছিল, সে সাথে বাংলা ও সংস্কৃত। তবে খুব ভালভাবে শেখা যে তাদের হয় নাই সে প্রমাণ একটু পরেই আসছে। তাতেই তাদের বাংলা ভাষায় আগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যাবে। তবে তারা ছিল শাসক সম্প্রদায়। প্রচুর টাকা পয়সার বিনিময়ে ভাড়াটে লোক এনে যে পুস্তক যে ভাষার প্রয়োজন হয়েছে অনুবাদ করে কাজ সমাধা করে নিয়েছে। আসলে তো আর তাদের বাংলা প্রতি ছিল না অথবা বাংলা ভাষায় পুত্র, কন্যা, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয় স্বজনদের সাথে প্রাণের কথা, প্রণয়ের কথা; গোপন কথাও তারা বলত না, শুধুমাত্র শাসন আর শোষণের জন্য এবং খৃষ্ট ধর্ম প্রচার প্রসারের জন্য যতটুকু দরকার ততটুকু মাত্র।

যাহোক, তের, চৌদ্দ বছরের মধ্যেই ইংরেজরা এব্যাপারে কৃতকার্যতা লাভ করল। প্রমাণ স্বরূপ, প্রফেসার শ্রী বিনয় সরকারের লেখার আংশিক তুলে ধরছি—
“পাদ্রী কেরী, মার্শম্যান প্রভৃতির সহায়তায় হিন্দু পণ্ডিতবর্গ সংস্কৃত মেশান বাংলা পদ্য ভাষা সৃষ্টি করিয়া গদ্য গ্রন্থ প্রণয়নে যত্ববান হইলেন। নব আবিস্কৃত এই গদ্য ভাষায়

মুসলমানগণ সহসা প্রবেশ করিতে পারেন নাই। ফলে প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল তাঁদের লেখনী অচল হইয়া রহিল। সুদীর্ঘ ছয় সাত বৎসর কাল যে মুসলমান বাংলা তথা ভারতবর্ষ শাসন করিয়া আসিয়াছে তাহারা অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝা-মাঝি সময়ে রাজ্যদ্রুত হইয়া একেবারে দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছিল। এই সময়ে নানা দিক হইতে আক্রমণাত্মক আঘাত-স ঘাতে মুসলিম সমাজ জর্জরিত হইয়া উঠিয়াছিল। ফলে সমাজের ভিত্তিমূল অনেকখানি শিথিল হইয়া পড়িল।”

আজ যে হিন্দি রাষ্ট্র ভাষা তাও ইংরেজদের কারখানার কল্যাণে। বিহারে ইংরেজ সরকারের মোটা মাইনের চাকুরী প্রাপ্ত শ্রীযুক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায় ওপর মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন যে, হিন্দিকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করতে হবে। প্রমাণ স্বরূপ এক জন হিন্দি সমর্থক ভ্রাতা ভূদেব বাবুর জন্য যা লিখেছেন তাই তুলে দিচ্ছি এখানে—

“একদা তিনি বিহার প্রদেশে শিক্ষা বিভাগে কর্ম করিতেন। সেখানে তিনি দেখিলেন, হিন্দি অঞ্চলে সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের উর্দু ভাষা চলিতেছে— তাহার নিপুণ হস্তক্ষেপের ফলে তাহা উঠিয়া গেল। বিহারে হিন্দি ভাষা চালু হইল। এজন্য বিহারের গ্রাম্য কবিগণ তাঁহাকে প্রশংসা করিয়া কত গান লিখিয়াছিলেন। আজ হইতে বহু দিন পূর্বে তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন হিন্দি ভাষাই ভারতের রাষ্ট্র ভাষা হইবার উপযুক্ত।”

অথচ আগেই বলেছি যে হিন্দি ভাষার অর্ধেকটা সংস্কৃত মার্কা বাংলা আর অর্ধেকটা ‘হায়’, ‘গা’, ‘গি’ প্রভৃতি। তবে বিরুদ্ধবাদীদের আনন্দ শুধু এতটুকুই যে, হিন্দির অক্ষরগুলো আর সংস্কৃতের অক্ষরগুলো প্রায় একই। অন্তত আরবী, ফারসী ও উর্দুর অক্ষর ‘আলিফ’, ‘বে’ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া গেছে। কিন্তু আর একটু ভাল থেকে গেছে। বোধ হয় চোখে পড়েনি অনেকের। ভাষার নামটি হিন্দি না দিয়ে ‘ভারতী’ নিলেই ভাল হত। এখন না এ ‘হিন্দি’ শব্দটিও মুসলমানদের সৃষ্টি, তাঁদেরই দেয়া নাম। ‘সিন্ধু’, ‘হিন্দু’ প্রভৃতি তাঁদেরই রাখা স্নেহের নাম। আজকের বাংলা অভিধান খুললেই পাওয়া যাবে ‘হিন্দু’ মানে ‘জাতি বিশেষ, হিন্দু, বৈদিক ধর্মচারী ভারতবর্ষবাসী। ফার্সী (সিন্ধু) বি।’

এমনিভাবে শ্রীযুক্ত বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত মৃতঞ্জয় বাবু প্রমুখ লেখকগণ এ ব্যাপারেই চলতে লাগলেন। কিন্তু শ্রী বঙ্কিম চন্দ্র প্রথমে বিরোধীতা করেছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লেখার বিরুদ্ধে, মতের বিরুদ্ধে এবং তাঁর সুখ্যাতির বিরুদ্ধে। এ প্রসঙ্গে বঙ্কিম বাবু যা বলেছেন হুবহু তাই উদ্ধৃতি দিচ্ছি। বঙ্কিম চন্দ্র বলেছেন “বিদ্যাসাগর কঠিন সব সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করে বাংলা ভাষার ধাপটা খারাপ করে গেছেন। তাহাড়া শ্রী সজনীকান্ত দাস মহাশয়ের লেখার দিকে তাকালেই আরও প্রমাণ হবে প্রবাহমান পর্যালোচনা। দাস বাবু লিখেছেন, “১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে হালহেড এবং পরবর্তীকালে হেনরি পিটফোর্ডার ও উইলিয়াম কেরী বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত জননীর সম্ভান ধরিয়া আরবী ফারসীর অনধিকার প্রবেশের বিরুদ্ধে রীতিমত ওকালতি করিয়াছেন এবং প্রকৃতপক্ষে এ তিন ইংলণ্ডীয় পণ্ডিতের যত্ন ও প্রচেষ্টায় অতি অল্পদিনের মধ্যে বাংলা ভাষা সংস্কৃত হইয়া উঠিয়াছে।”

১৭৭৩ সালে ইংরেজদের নিয়ামক আইন (Regulating act) সৃষ্টি ও কার্যকরী হবার পরেই আরবী ফারসী হত্যার খরগ তথা হিন্দু মুসলমানদের মৈত্রী ছেদনে অস্ত্র তৈরীর কারখানা এ দুই প্রতিষ্ঠান ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও শ্রীরামপুরের মিশন ও তার সঙ্গে বিলেতী প্রেসটির চাকা ঘুরিয়ে আমাদের মগজ গুঁড়িয়ে পরিবেশ বেশ যখন অনুকূল হয়ে উঠল তখনই ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে আইনের সাহায্যে সারা দেশময় ঘোষণা করা হল যে, সরকারী আদালত শহর বা গ্রামে কোন স্থানেই ফারসী ভাষা ব্যবহার চলবে না। ব্যবহার চলবে ইংরেজী আর বাংলার, কিন্তু মাতৃহারা সন্তানের যে অবস্থা হয় পার্সকে হারিয়ে নবোদ্ভূত বাংলার অবস্থাও হল তদ্রূপ শ্রীহীন। অবশ্য একথাও মনে রাখতে হবে যে, ইংরেজরা শত চেষ্টা করেও পার্সীকে বাংলার হৃদয় থেকে সম্পূর্ণ মুছে দিতে পারে নি। আর বাস্তবিক তা পারা সম্ভবও নয়। আজও আমাদের সাধের বাংলায় অসংখ্য পার্সী শব্দ এখানে ওখানে লুকিয়ে রয়েছে। কিন্তু ইংরেজ বাহাদুররা তা বোঝেনি তাই পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করতে গিয়ে যে ধরণের বাংলার সৃষ্টি করেছিল তাতেও অনিচ্ছাসত্ত্বেই বহু আরবী, পার্সের, উর্দু শব্দ থেকে গিয়েছিল। ফলে ইংরেজী ডিজাইন আর আরবী পার্সীর সংমিশ্রনে নূতন বাংলা ভাষা যে রূপ পরিগ্রহ করেছিল তা সত্যই অনুধাবনযোগ্য। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিচে সাহেবদের হাতের নূতন বাংলার কিছু নকল দেয়া হল :

“আমি এই অবধি বুঝিয়াছি বিশ্বয়ের সহিত। যে কোন কেতাব অদ্যাবধি প্রকাশ না পাইয়াছে শিখাইতি তোমাদিগকে হুসরাজি কথা আর অনায়াসে তাহাতে লইয়াছে আমারে সংগ্রহ করিয়া তরজমা করিতে এই কেতাব।”

শুধু লেখনীর জগতেই নয় অনুবাদের জগতেও আমাদের ইংরেজ বাহাদুরের কতদূর অবদান ছিল তারও কিছু নমুনা নিম্নে দেয়া হল :

“Now the wages of sin is death -but the gift of God is eternal life. Through Jesus christ our lord.

বঙ্গার্থ : “গোনার মাহিনা মিত্তু কিন্তু খোদার দেওয়া চিরপ্রমাই জিজছ ক্রাইষ্ট হইতে।”

এগুলো সব ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের আইন প্রণয়নের পূর্বের নমুনা। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দের আইন প্রণয়নের পূর্বের নমুনা। ১৭৮৩ খৃঃ পর্যন্ত এন, বি, এডমন সাহেব যখন ইংরেজ সরকারের ফারসী অনুবাদকের পদে ভূষিত হলেন তখন তাঁর নিজের হাতের তরজমা বা অনুবাদের নমুনা দেখুন তাতে কত ফারসী ও আরবীর সংমিশ্রন! পাঠক-পাঠিকাদের সুবিধার্থে আরবী ও ফারসী শব্দগুলোকে নিচে দাগ দিয়ে চিহ্নিত করা হল।

সেওয়ায় মাহালাতে মুতালুক সহর মুরসিদাবাদ ও আজিমাবাদ ও জাহাগির নগর জে এই তিন মকামে আদালতের সিরিস্তা আলাহিদা মোকারর হইল আর এই তিন এলাকার সবঙ্গ সাহেব জেলাদিগের তজবিদ মতে হইবে মঞ্জুর হইল। এবং সেওয়ার সহর কলিকাতা জে বড় আদালতেরতাবে আছে জারি থাকিবে।”

আমুন আরও একটা দৃষ্টান্তের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি—“আমার সন্তান রহিত। অস্ত্রোপাধিকার্য তগদি করাইয়া সাকীম তফশীল জমি আবাদ তবদুদ করিয়া ও শিষ্য সেবক লহাল রাখিয়া পুত্র পৌত্রাদি কমে পরম সুখে বোগ করিয়া ইহার দান বিক্রয়ের সম্ভাবিকার তোমার। আমি কিংবা আর কেহ দাওয়া করে সে ঝুট ও বাতিল। ইত্যাদি ইত্যাদি আরও অনেক দৃষ্টান্তের অবতারণা করা যায় কিন্তু বাহুল্য জ্ঞানে তা পরিত্যাগ করলাম। আহোক, আগেই বলেছি হিন্দু মুসলমান একে অপরের ভাব ভাষায় মিলন-মৈত্রীর পরিপ্রেক্ষিতে সাকীর্ণতার দৃষ্টি না দিয়ে নিজেদের ভাষাকে পরস্পর পরস্পরের মধ্যে খাপ খাইয়ে নিয়ে এক অপরূপ নূতন ভাষার আবিষ্কার করেছিল। যার জোয়ারে ভারতীয় জন জীবন নূতন আশ্বাদে প্লাবিত হয়েছিল। কিন্তু ইংরেজ মনিবদের কল্যাণে বঙ্গ ভাষায় সংস্কৃত মিশে প্রথমে যা সৃষ্টি থেকে যাচ্ছিল তা সংস্কৃতের মত সমাজে ব্যবহারের অনুপযুক্ত। শ্রী মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের ‘প্রবোধ চন্দিকা’র একটু অংশ তুলে ধরলেই এ সত্য প্রমাণিত হবে।

“কোকিল কলালাপ বাচলে যে মলয়া নিল সে উচ্ছলচ্ছী কয়াত্যাচ্ছ নির্বারাণ্ড কনাচ্ছন হইয়া আসিতেছে।”

একটি পত্র পাওয়ার পর প্রত্যুত্তর লিখবার বহরখানা কেমন ছিল তারও এক উৎকট উদাহরণ লিপিবদ্ধ করা হল :

“পরম প্রণয়ার্ণবু গভীর নবীর তীর নিবসিত কলেবরাস্ত্র সম্মিলিত নিতান্ত লগ্নয়াশ্রিত শ্রী অঙ্গমোহন দেব শশ্মনঃ ঝটিত ঘটিত বাঞ্জিতান্ত বরণে বিজ্ঞপনাধাদৌ শ্রী মতীর শ্রী করকমলাঙ্কিত কমল পত্নী পটিত মাত্র শুভবিশেষ।” (প্রাচীন শিশু বোধকের ভাষা)

আমাদের শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ও ঐ সংস্কৃত রঙে রঞ্জিত করেছেন তার পদ্যকে। কিন্তু গড়ার পরে তা হয়ে গেছে সংস্কৃত মাথা পদ্য। মনুনা স্বরূপ :-

“রে পায়াও যণ্ড এই প্রাকাও ব্রাহ্মণ্ড দেখিয়াও কাণ্ডজ্ঞান শূন্য হইয়া বকাও লাত্যাশার ন্যায় লণ্ড ভণ্ড হইয়া ভণ্ড সন্যাসীর ন্যায় ভক্তি ভাণ্ড ভঞ্জন করিতেছে এবং গাবাপণ্ডের ন্যায় গণ্ডে জমিয়া গণ্ডকীস্থ গণ্ডশীলার গণ্ড না বুঝিয়া গণ্ডগোল করিতেছে।”

বাবু বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, “সংস্কৃত প্রিয়তা এবং সংস্কৃতানুকরীতা হেতু বাঙ্গালা সাহিত্য অত্যন্ত নীরস, শ্রীহীন দুর্বল এবং বাঙালী সমাজে অপরিচিত হইয়া রহিল।”

কিন্তু লজ্জা ও দুঃখের কথা, সাহিত্য সম্রাটের ব্যবসাদারী মনোভাব নিজের নীতি থেকে তাকে অনেক দূরে ঠেলে দিয়েছিল। তিনি বুঝেছিলেন সংস্কৃত ভাষা মিশিয়ে কঠিন শব্দ সৃষ্টি করলে সকলে বুঝুক বা না বুঝুক প্রশংসা পাওয়া যাবে যথেষ্ট। কার মূর্খ অর্দ্ধমূর্খের সংখ্যাই সমাজে অধিক। তারা যা জানে না বা বোঝেনা তারই উপর আমাদের দাবী তারা সব জানে সব বোঝে। ভাল না লাগলেও তারাই প্রশংসায় লগ্নমুখ হবে। পক্ষান্তরে শিক্ষিতগণ মনে করবেন এঁরা আমাদের চেয়েও শিক্ষিত বেশী কারণ এই কঠিন দুর্বোধ্য বিষয়ের রহস্য আর আনন্দের পরিচয়ে তাঁরা আমাদের অপেক্ষা বিপুল ভাবে অগ্রণী ও জয়যুক্ত। তাই শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র সোজা পথ ছেড়ে বাঁকা পথেই পাড়ি দিলেন অর্থাৎ সংস্কৃত শব্দ দিয়ে বাংলা ভাষাকে তিনিও কঠিন করে তুললেন।

প্রকৃষ্ট উদাহরণ তাঁর লেখায় পাতায় পাতায় বিদ্যমান। এখানে শুধু মাত্র নমুনা স্বরূপ সামান্য একটু অংশ তুলে ধরছি।

‘প্রাবিট সম্মুত নবদুর্বাদল তুল্য, অথবা ততোধিক মনোজ্ঞকান্তি বসন্ত প্রসূত নব পত্রাবলীতুল্য বর্ণোপরি কবচাদি রাজপুত জাতির পরিচ্ছদ শোভা করিতেছিল।’

“সোম প্রকাশ” পত্রিকার সম্পাদক শ্রী দারকানাথ বিদ্যাভূষণ বঙ্কিম বাবু ও তার অনুসরণকারীদের উপহাস করে সমালোচনা করতেন। “শব পোড়া মরাদাহের দল” বলে। আর বঙ্কিম বাবু প্রতি পক্ষ দলকে গালি দেয়ার সাথে বলতেন ভট্টাচার্যের চানা”।

তাই সর্বশেষে বলব, আমরা প্রত্যেকটি মানুষ সারাদিনে আমাদের ভাষার মধ্যে যেমন ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করি এবং তখন আভিজাত্য ও শিক্ষাসুলভ পরিচয় বহন করে, তেমনি আরবী, ফার্সী ও উর্দুর বেলাতেও তাই হওয়া উচিত ছিল। তাই কবি ভরতচন্দ্র মুসলমানদের ভাল চক্ষে না দেখলেও মুসলমান সাথেকের ধারাকে বর্জন করতে নিষেধ করে এমন তিনি বলেছেন :—

“না রবে প্রসাদ গুণ না হবে রসা।

অতএব কহি ভাষা যবনি মিশাল”

সাম্প্রদায়িকতার ইন্ধনে

কুকুর বিড়াল দেখলে তাড়া করে, বিড়াল ইদুর দেখলে তাড়া করে আর সাপব্যাঙ দেখলেই তাড়া করে কেন না একটি অপরটির খাদ্য বস্তু। প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতেই একটির আরেকটির উপর ইদৃশ আক্রমণ। কিন্তু দুঃখ বা আশ্চর্যবোধ হয় তখনই যখন দেখা যায় মানুষ মানুষকে আক্রমণ করার জন্য অস্ত্র শান দিতে দ্বিধাবোধ করে না। আমাদের মতে প্রধানতঃ দোষী সংখ্যা গুরু সম্প্রদায় বা শাসক সম্প্রদায়। কেন না লঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের লোকদের সাথে দাঙ্গা বাধাতে চায় না, তাতে মারার পরিবর্তে মরতেই হয়। পাকিস্তানে যদি উর্দু ও বাংলা ভাষী লোকদের ভিতর দাঙ্গা হয় তবে দোষ অবশ্যই উর্দু ওয়ালাদের দেওয়া যায় কারণ তারা সংখ্যা গুরু এবং শাসক দলের ভূমিকায় আছে। ঠিক তেমনি আরবে যদি ইহুদীদের সঙ্গে সাম্প্রদায়িক কলহ হয় দোষ হবে আরবের মুসলমানদের। আবার ইস্রাইলে যদি মুসলমানদের সাথে লড়াই হয় ইহুদীর মুখ্যতঃ দোষ হবে ইস্রাইলের। ঐ রকম বাংলাদেশে যদি হিন্দু মুসলমানে দাঙ্গা হয় তাহলে প্রধানতঃ দোষ মুসলমানদের বলা চলে কারণ তারা সংখ্যা বা শক্তিতে অপেক্ষাকৃত ভাবে বেশী। তদ্রূপ ভারতে যদি হিন্দু মুসলমানে দাঙ্গা হয় মূলতঃ বা মুখ্যতঃ দোষ আসবে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর স্বভাবিক ভাবেই, তার কারণও ঐ একই।

ভারতে কতবার যে হিন্দু মুসলমানে রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা হয়েছে, কতবার যে হিন্দু মুসলমানের তাজা রঙ্গে ভারতের বুক রক্তাক্ত হয়েছে, কত মা সন্তান হারা হয়ে চোখের জলে পৃথিবী ঝাপসা দেখেছে, কত স্ত্রী স্বামী হারা, কত শিশু পিতা-মাতা হারা হয়ে অসহায় এতিম হয়েছে সে ইতিহাস পরে আসছে।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ইন্ধনে ভারতের হিন্দু মুসলমানের যে অশোভনীয় আচরণ তা সত্যিই বিস্ময়কর। বুকের রক্ত টেলে শোষক সম্প্রদায়ের কাছ থেকে স্বাধীনতালব্ধ ভারতেও যে হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি জাতির মধ্যে লড়াই ঝগড়া হবে একথা ভাবা যায় না; কিন্তু তবুও তা সত্য, ইতিহাস তার সাক্ষ্য। সাম্প্রদায়িকতার পশ্চাতে যা কিছু কারণ থাকে তার মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষ সুলভ মনোভাব বোধ হয় অন্যতম প্রধান। আমাদের ভারতের হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে এ ব্যাধি অত্যন্ত ব্যাপক ছিল বা আজও আছে। ফলে আজও আশঙ্কা হয় আবার হয়ত কখন ভারতের হিন্দু মুসলমান অবতীর্ণ হবে এ নিষ্ঠুর ও পৈশাচিক ভূমিকায়।

আমাদের দেশে মুসলিম হিন্দুকে, হিন্দু মুসলিমকে যথাক্রমে ‘কাফের’ ও ‘যবন’ বলেন। ‘কাফের’ আরবী শব্দ, অর্থ হচ্ছে অবিশ্বাসী। যে বা যারা ইসলাম ধর্মের বিশ্বাসী নয় তাদের কাফের বলা হয়। যথা খৃষ্টান, হিন্দু, ইহুদী, জৈন প্রভৃতি প্রত্যেক ভিন্ন ধর্মাবলম্বী। কিন্তু অনেক মুসলমানের ধারণা কাফের মানেই হিন্দু, আবার অনেক হিন্দুরও ধারণা কাফের মানে হিন্দু অথবা গালিবাচক ঘৃণ্য কোন চক্রান্তপূর্ণ শব্দ। আসল কথা হচ্ছে এটাই, যদি কোন মুসলমান এমনকি ডিগ্রীধারী কোন মাওলানাও বলেন, ‘আমি কুরআনের সব বাক্য স্বীকার করি শুধু একটু বাক্য মিথ্যা মনে করি তবে ইসলামের আইনে ডিগ্রীধারী ঐ মাওলানা সাহেবকেও ঐ আখ্যায় অতি সহজে আখ্যায়িত কর হয়। এমনকি কুরআনের কোন বাণীকে সন্দেহযুক্ত মনে করলেও তারও ঐ একই অবস্থা। ইসলামিক কোন নীতিকে কাজে পরিণত না করলে পাপী বা অপরাধী হয় কিন্তু অস্বীকার করলে তাকে কাফের বা অবিশ্বাসী বলে চিহ্নিত করতে হবে তাতে অবাক বা আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

অপর দিকে হিন্দু ভাইয়েরা মুসলমানদেরকে বলেন ‘যবন’। ‘যবন’ শব্দের অর্থ গ্রীক জাতি। অনেকের মতে, ভারতে মুসলমান আগমের পূর্বেও ‘যবন’ কথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু ভাগ্যের কি ফের এখন ‘যবন’ বলতে মুসলমানদের বোঝায়। ভাষা শিখতে হলে অভিধানের তা অবশ্যই প্রয়োজন আছে। কিন্তু আমাদের দেশের পণ্ডিতদের কল্যাণে অভিধানে ‘যবন’ শব্দের অর্থ যা পাওয়া যায়, অনেকের বিচারে তাও বিষাক্ত এবং দুর্গন্ধময়—দেশের ভবিষ্যত গঠনের বাধা স্বরূপ। নূতন বাঙ্গালা অভিধানে আছে ‘যবন’ মানে ‘অহিন্দু জাতি বিশেষ; স্লেচ্ছজাতি; বিধর্মী; অসদাচারী; গ্রীক আফগানিস্তান আরব পারস্য প্রভৃতি দেশের অধিবাসী।’ তারপর ‘কথিত আছে’ বলে যে তথ্যটি ঢুকানো হয়েছে তা যেন সারকুড়ের আবর্জনা ছাত্র ছাত্রীদের পরিচ্ছন্ন হৃদয়ে বুলিয়ে দেওয়া হয়েছে মাত্র। যেমন—‘বশিষ্ঠের আশ্রমদ্রোহী বিশ্বামিত্রের সমস্ত সৈন্য পাভূত করিবার নিমিত্ত তাহার কামধেনু শবলার যোনিদ্বার হইতে এই জাতি উৎপন্ন হয়।’ তাতেও আশা মেটেনি লেখক তখন ধর্মের বুলি শুনিয়াছেন “বিষ্ণু পুরাণে যবন জাতির অন্যবিধ উক্তি আছে—সাগর রাজা কতকগুলো লোককে গুরু অপরাধে জন্য মস্তক মুণ্ডন করাইয়া ভারতবর্ষ হইতে দূরীকৃত করিয়া দেন; তাহারাই পরে যবন নামপ্রাপ্ত হইয়াছে।” কিন্তু উইলসন সাহেবের মতে, ‘ব্যাকট্রিয়া হইতে আয়োনা বা গ্রীক পর্যন্ত সমগ্র গ্রীক উপনিবেশের অধিবাসী গ্রীকদিগকে হিন্দুরা যবন বলিতেন এবং Jonia শব্দটি হইতে যবন শব্দের উৎপত্তি।’

অভিধানে তার পরের শব্দটি আছে ‘যবনারি’। মানে—শ্রীকৃষ্ণ। যবন+অরি। অরি মানে শত্রু; অতএব কৃষ্ণও মুসলমানদের শত্রু। সুতরাং হিন্দু জাতিকে মুসলমানের শত্রু না সাজালে কৃষ্ণ ভক্ত হওয়া যায় কি করে?

দেশকে বাঁচাতে হলে কলম আর কালিকে সংযতভাবে খরচ করতেই হবে, নইলে এক কলম কালি যা ক্ষতি করবে একটা পারমানবিক বোমা ক্ষতি করবে তার চেয়ে অনেক কম।

আমাদের স্বদেশের লেখক ও কবিগণ এ অমৃতপ্রায় ‘যবন’ শব্দটিকে কেমন ভাবে ব্যবহার করেছেন তার কিছু নমুনা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর সুকুমার সেনের লেখা থেকে প্রমাণ স্বরূপ তুলে ধরা হচ্ছে—

“ব্রাহ্মণের জাতি ধ্বংস হেতু নিরঞ্জন।

সাম্বাইল জাজপুর হইয়া যবন।” ইত্যাদি।

ভারতের বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক নদীয়ার শ্রী শ্রী চৈতন্য দেব। ধর্মগুরু পণ্ডিত সভাসদ মুসলমান জাতিকে যবন বলতে ভোলেন নি।

“শ্রীবাসে বস্ত্র সিয়ে দরজী যবন,

প্রভু তারে নিজ রূপ করে দরশন।”

সাম্যের স্বয়ং মূর্তি শ্রী চৈতন্য দেব নিজেও মুক্ত মনের পরিচয় দিতে পারেন নি। তিনি তাঁর মুসলমান ভক্তের নাম দিয়েছিলেন ‘যবন হরিদাস।

‘প্রাচীন বঙ্গ সাংখ্যিকো’ লেখা আছে,—

‘যবন হইয়া করে হিন্দুর আচার,

ভালমত তারে আনি করহ বিচার।” ইত্যাদি।

এ ছড়াও আরও অনেক দৃষ্টান্ত এ ধরনের সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন উক্তির প্রমাণ করে। ‘মধ্য যুগের বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী’ পুস্তকে লিখিত আছে,—

“যবনেহ যার কীর্তি শ্রদ্ধা করি শুনে,

ভজ হেন রাঘবেন্দ্র প্রভুর চরণে।”

‘প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য’ পুস্তকে ২৮ পৃষ্ঠায় আলিবর্দী খাঁয়ে উড়িষ্যা আক্রমণে ভুবনেশ্বরের রক্ষীর বর্ণনায় আছে,—

“মারিতে লইয়া হাতে প্রলয়ের শূল।

করিব যবন যত সমূল নির্মূল—”

আলিবর্দী খাঁয়ের আক্রমণের নিন্দা করে কবি ভরতচন্দ্র লিখেছেন,—

“পলাইয়া কোঠে গিয়া নবাব রহিল।

কি কহিব বাংলার কি দশা হইল—

লঠিয়া ভুবনেশ্বর যবন পাতকী।

স্পোবে তিন সুবা হইল নারকী—”

মহাভারতে আছে—“হিন্দুরাজ সযাতি একবার গোমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। তাঁর সংসযমী পুত্র লোভবশতঃ এক টুকরো গোমাংস খেয়ে ফেলে তখন থেকেই পিতার অভিশাপ ক্রমে ঐ আগের ভ্রষ্ট পুত্র থেকেই গো-খাদক স্লেচ্ছ বংশ আরম্ভ হয়। সাধারণের ধারণা ঐ গো-খাদক মুসমানরাই ঐ স্লেচ্ছ বংশীয় যবন।”

কিন্তু আসল কথা তা নয়। মুসলমান জাতি বিশ্বাস করে তাদের আদি পিতা ও ধর্ম প্রবর্তক হচ্ছেন হযরত আদম (আঃ) তাই আদম সন্তান আদম বলে গণ্য হয়। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) ইসলাম ধর্মের প্রথম প্রবর্তক নন বরং তিনি ইসলাম ধর্মের পরিপূর্ণকারী শেষ পয়গম্বর।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও গবেষক শ্রী ডাঃ কালিদাস নাগ এবং ঐতিহাসিক সুরেন্দ্রনাথ সেন মহোদয়ের মতে, ব্যাকট্রিয়ান গ্রীকদেরই উপাধি হচ্ছে যবন। কেবল তাদের ক্ষেত্রের যবন শব্দের প্রয়োগ সম্ভব। কিন্তু উপরোক্ত অসত্য উক্তির উদাহরণ নিরপরাধ মুসলমানদের ক্ষেত্রে অপপ্রয়োগ করলে তা হবে নিতান্ত অপরাধজনক ও সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির পরিচায়ক।

যাই হউক, স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যে দলিল থাক “প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য” পুস্তকের ২৯/৩০ পৃষ্ঠায় স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, “যবন হচ্ছে গ্রীকদের নাম, এই নামটার উপর অনেক বিবাদ হয়ে গেছে; অনেকের মতে ‘যবন’ এই নামটা য়োনয়া (lonia) নামক স্থান বাসী গ্রীকদের উপর প্রথম ব্যবহার হয়। এজন্য মহারাজা অশোকের লেখা নামায় ‘যোন নামে গ্রীক জাতি অভিহিত। পরে যোন থেকে সংস্কৃত যবন শব্দের উৎপত্তি। আমাদের দেশীয় কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিদের মতে ‘যবন’ শব্দ গ্রীক বাচনীয় নয়। কিন্তু এ সমস্তই ভুল যবন শব্দটাই আদি শব্দ, কারণ শুধু যে গ্রীকদের যবন বলত তা নয়। বরং প্রাচীন মিশরীয় ও ব্যাবিলীয়ানরাও গ্রীকদের যবন নামে আখ্যাত করত।”

মোটমুটি উপরের আলোচনা থেকে একথাই আমাদের কাছে পরিষ্কার যে, আমাদের দেশের বেশীর ভাগ অমুসলমান লেখক তাঁদের লেখায় মুসলমান সমাজের উপর অনেক ক্ষেত্রে নানা কুৎসিত শব্দ প্রয়োগ করে বিরূপ মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন।

যবন, স্লেচ্ছ, পাতকী ছাড়াও পাষণ্ড, পাপিষ্ঠ, পাপাত্মা, দুরাত্মা, দুরাশয়, নরাধম, নরপিষাচ, বানর, নেড়ে, দেড়ে, ধেড়ে, এঁড়ে, অজ্ঞান ও অকৃতজ্ঞ প্রভৃতি শব্দগুলো তাঁরা স্থান কাল ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন।

বদ্বিম বাবু ‘রাজ সিংহে’ হিন্দু প্রজাবন্দ কর্তৃক জগদীশ্ব উপাধি প্রাপ্ত সম্রাট আকবর বাদশাহের দাড়িতে একটি যুবতী নারী দিয়ে ঝাড়ু মারিয়েছেন এবং মুসলমান ধর্মনেতা ঔরঙ্গজেব বাদশাহের মুখে কল্লিতা সাথী ও স্ত্রীলোকদের দ্বারা লাথি মারারও ব্যবস্থা করেছেন। বদ্বিম বাবু তাঁর ‘মুগালিনী’ বইয়ে বখতিয়ার খলজীকে ‘আরণ্য’ বানর বলতেও বর্ণনা করেন নি। এছাড়া তিনি তাঁর কবিতা পুস্তকে মুসলমান জাতিকে উদ্দেশ্য করে লিখেছেন, “আসে আসুক না আরজী বানর, আসে আসুক না পারশী পামর।”

কবি ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত লিখেছেন প্রতিবেশী মুসলমান পাঠকদের জন্য।

“বড় বড় ধেড়ে দেড়ে, ছাগল দেড় নেড়ে পানে রুকে,
চোড়ে ঘাড়ে, কোলে দেয় হাড়ে হাড়ে ঠুকে।

পশ্চিমে মিয়া মোল্লা, কাচা খোল্লা তোবা তাল্লা বোলে,
কোলে মরজী তেড়া তেড়া, কাজে ভেড়া নেড়া মাথা যত

নরাধম নীচ তাই নেরাদের মত।” ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রখ্যাত কবি দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় লিখেছেন—

“আল্লা বলরে ভাই নবী কর সার,
মাজা দুলায়ে চলে যাবা ভব নদী পার।
মুখ ঘামছে বুক ঘামছে বিবির ভেসে যাচ্ছে হিয়ে,
খসম যদি থাকত কাছে পুঁথেকে নুমাংল দিয়ে।
পিড়সে কাঁদছে বিবি ডুবি আখির জলে,
মোলআরে ধরেছে ঠেসে খসম খসম বলে।”

আরও এগিয়ে আসুন। “... উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুর সব সময়েই মুসলমানদের নিম্ন বর্ণের হিন্দুর সমান জ্ঞান করতেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগেও সম্মানিত মুসলমানেরা হিন্দুদের ঘরে প্রবেশের অনুমতি পেতেন না।”

(দ্রঃ R.C. Majumder, History of Freedom Movement in India.)

“এমন কি স্বদেশী আন্দোলনের উন্মাদনার যুগেও মুসলমান যুবককে হিন্দু যুবকের দাওয়া থেকে নেমে যেতে হত বন্ধুর জলপানের সুযোগ করে দেবার জন্য—এমন ঘটনা রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন।”

(দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথ, “লোকহিত”, “লোকান্তর”, রবীন্দ্র রচনাবলী ২৪ খণ্ড, পৃঃ ২৬২)

এমনিভাবে সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্ত সুলভ লেখক শ্রেণীর বিষাক্ত লেখনীরূপ বজের প্রভাব সামান্য চার রূপে বিকশিত হলেও এক সময় তা বিরাট মহীৰুহে পরণত হয়ে শিকড় গেড়েছিল হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষ ভারতবাসীর হৃদয়ে। আর তার আনিবার্য ফল স্বরূপ শুরু হল রক্তের হোলিখেলা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা।

১৯৬৪তে কি ভয়ানক রক্তাক্ত দাঙ্গা কলকাতায় হয়েছিল তার সাক্ষী ইতিহাস। ৯ই জানুয়ারী কলকাতার যাদবপুর, টালীগঞ্জ, বাশদ্রোস, জমিদার পাড়া, মোল্লা পাড়া প্রভৃতি স্থানে হত্যা, লুণ্ঠন আর অগ্নি সংযোগের ফলে নিদারুণ বিভীকার শ্রোত বয়ে গিয়েছিল। এছাড়া বেলেঘাটা, এন্টালি, করেয়া, বেনেপুকুর, তালতলা, ওয়াটগঞ্জ, একবারপুর এলাকায় হত্যা, লুট আর আগুনে জ্বালানো হয়েছে মুসলমানদের যথা সর্বস্ব। পুলিশের সহযোগীতায় এ হত্যা কাণ্ড হয়েছে। কিন্তু দায়ী কে? গুজহ? না- তা নয়। প্রকৃতপক্ষে দায়ী মিথ্যা ইতিহাস আর বিষাক্ত লেখক শ্রেণী ঠিক তেমনি পূর্ব

বাংলায় ও পাকিস্থানে হিন্দু নির্যাতনের প্রমাণের প্রাচুর্যের অভাব নেই। পূর্ব পাকিস্থানে (বর্তমানে বাংলাদেশ) যে ভাবে হিন্দু হত্যা করা হয়েছিল তা বাগ-সিংহের বিগ্রহটাকেও অতিক্রম করেছিল। যার জন্য সেখানকার মুসলমান বংশধরকে বহু যুগ পর্যন্ত নির্লজ্জ জনক ও ঘৃণিত অপরাধের ধিক্কার বহন করতে হচ্ছে এবং হবেও। ১৭ই ফেব্রুয়ারী একজন ভারতীয় এম, পি, দাঙ্গার বিরুদ্ধে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তা এখানে লিপিবদ্ধযোগ্য। “... মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঘটনা স্থলে অবিভূত হয়েছিলেন, তাঁর বিমান ৮টা ৪০ মিনিটে বিমান ঘাটী স্পর্শ করেছে। তিনি তার নিজের চোখে দেখেছেন অধিকাংশ মুসলম সবতি এলাকা যেমন মতিঝিল, কলাবাগান, জালিয়া টোলা, চিহড়িহাটা, ট্যাংরা’ বিবি বাগান ও অন্যান্য মুসলমান এলাকা জ্বলছে। যদি আর তিনি মাত্র ১২ ঘণ্টা পরে পৌছাতেন, তাহলে এমনকি জ্যাকেরিয়া স্ট্রীট, বলুটোলা যেখানে হাজার হাজার মুসলমান আশ্রয়ের জন্য উঠেছিলেন, মাটিতে মিশে যেত। এমনকি তালতলা অবস্থিত বেকার হোস্টেল, এলিয়ট হোস্টেল, কলিকাতা মাদরাসা, বিপিনস্ট্রীট যেখানে মুসলমানেরা জমায়েত হয়েছিল, সে সব হয়ত কশাই থানায় পণিত হত।”

এমনিভাবে ১৯৬১ তে জব্বলপুরে, ১৯৬২তে মালহদী, মুর্শিদাবাদে প্রভৃতি স্থানেও ভয়াবহ রূপ নিয়েছিল। তাছাড়া জামসেদপুরে সীমাতিরিক্ত খুনখারাবী করা হয়েছিল। রাওরকেল্লা, গুজরাট প্রভৃতির হত্যাকাণ্ড তো কল্পনাই করা যায় না। অথচ এ সময়ই স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর। স্বাধীনতার আগে যে হিন্দু মুসলমানে কত রক্তারক্তি হয়েছে তার কোন সঠিক হিসেবে নেই। তবে নিঃসন্দেহে তা ভয়াবহ এবং উভয় জাতির জন্য লজ্জাকর। কিন্তু দেশ স্বাধীন হবার পর পাকিস্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্য দায়ী মুসলমানগণ এবং ভারতে দায়ী হবেন হিন্দু ভ্রাতাগণ। অবশ্য একথা স্বীকার করতে হবে যে, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছু কিছু শুভবুদ্ধি সম্পন্ন ও ন্যায়নিয়ম নিরপেক্ষ মানুষ আরজও আছেন, পূর্বেও ছিলেন এবং আগামীতেও থাকবেন। যে খৃষ্টান জাতি আমাদের ভেদবুদ্ধির শিক্ষাগুরু তাদের মধ্যেও সাধু সজ্জন নিরপেক্ষ মহামানুষ নেই বললে শুধু অপরাধ বরং সত্যের অপলাপ করা হয়।

শুধু সংকীর্ণতা ও ভেদবুদ্ধি আমাদের পথে ঠেলে নাই। বরং আমাদের পরস্পরের ধর্মের ভিতরেও তার মহাপ্রবেশ ঘটেছে ফলে ধর্ম কেন্দ্রীয় ভারতবাসী পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষের মত ফেটে পড়েছে। “নৃসিংহ পুরাণে”র শ্লোক উদ্ধৃতি করে লেখক যা বলেছেন তাতে দেশবাসী মুসলমান ও হিন্দুর কি উপকার হবে তা চিন্তার বিষয়। “দংষ্ট্রিদংষ্ট্রাহত ম্লেচ্ছো হারামো পতি পুনঃ পুনঃ। উক্তাপি যুক্তিমাশ্রুতি, কিং পুনঃ শ্রদ্ধায় গুণন” অর্থাৎ —“দাঁতাল শূকরের দন্তাহত হইয়া মেচ্ছ যবন বাবংবার হারাম হারাম শব্দ উচ্চারণ করিয়া মুক্তি লাভ করিয়া থাকে, তখন শ্রদ্ধা পূর্বক রায় শব্দ উচ্চারণ করলে যে মুক্তি লাভ করিতে পারবে ইহাতে অসম্ভব কি আছে।” ঠিকাকার বলেছেন—“যবনেরা প্রচলিত বাক্যে অপবিত্র শব্দের পরিবর্তে যে হারাম শব্দ বলে তাহা হারাম এই উচ্চারণ হওয়াতে ঐ নাম নামাভাস হইল এই নামাভাবেই যবনগণ অনায়াসেই মুক্ত হইবে।” (চৈতন্য চরিতামৃত থেকে ৫৭৩, ৭৪ পাতায় দ্রষ্টব্য)

এই অলীক, অসত্য, অযৌক্তিক কল্পনাকে প্রত্যেক শিক্ষিত মানুষই ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করবে। যেহেতু মুখের মূখ্যমী মুখ খুললেই প্রকাশ পায়। হারাম আরবী শব্দ যা অবৈধ বস্তুকে নির্দেশ করে। আর লেখকের ভাষা হচ্ছে বাংলা বা সংস্কৃত। একেই বলে 'উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘারে'। যেমন বাংলায় 'বাগ' মানে সুযোগ কিন্তু উর্দুতে 'বাগ' মানে বাগান আর ইংরেজীতে 'বাগ' মানে ছারপোকা। এদেরকে একাকার করে ফল যা হবার হয়ে গেছে। কিন্তু আগামীতে সাবধান না হলে আমাদের স্বাভাবিক শেষ হয়ে যেতে পারে না কি?

যাই হোক, এত আলোচনার পর একথা ভুললে চলবে না যে ভারতের মাটিতে হিন্দু মুসলমান এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে তথা সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধনে গ্রথিত। মুসলমান হিন্দুর চরিত্রে সমাজে, ইতিহাসে এমন কি ভাষার ক্ষেত্রেও উন্নতির জোয়ার এনে দিয়েছে। বঙ্গের বাংলা ভাষা আজ যত উন্নতই হো না কেন এখনো তাতে সহস্র সহস্র, পারসী ও উর্দু শব্দ যুক্ত হয়ে সমৃদ্ধশালী হয়ে রয়েছে। বিখ্যাত গবেষক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন রায় বাহাদুর এম, এ, পি, এইচ, ডি, মহাশয় লিখেছেন—
“বঙ্গ সাথেক্যেক্যে একরূপ মুসলমানদের সৃষ্টি বলিলেও অতুক্তি হইবে না।

.....মুসলমান সম্রাটগণ সাথেক্যের এরূপ জন্মাদাতা বলিলেও অতুক্তি হয় না। তাঁহারা বহু ব্যয় করিয়া শাস্ত্রগুলিকে অনুবাদ করাইয়াছিলেন।” দীনেশ বাবুর কথায় অনেক কিছু প্রমাণত হলেও দরিদ্র ভবঘুরে শ্রেণীর পুঁথি লেখক সাহিত্যিক মুসলমানদের পরিশ্রমেও বাংলা সাহিত্য গৌরবান্বিত হয়েছে। যেমন মুসলমান আলওয়াল, মুসলমান মাগন ঠাকুর প্রভৃতি নামের সাথে ঠাকুর শব্দের যোগ আছে বলে অনেকের ধারণা হয়ত এরা মুসলমান নন। কিন্তু আমাদের কাছে তার তথ্য মজুদ আছে যে এঁরাও মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত।

মুসলমান রাজা বাদশাগণ এদেশে এসে তাঁরা প্রতিবেশী সুলভ মনোভাব পোষন করতেন এবং হিন্দুদের সাথে যথেষ্ট পরিমাণে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়েছিলেন। হিন্দুদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ও উৎসবকে তাঁরা যে সমর্থন করতেন তা বড় বড় উদারচিত্ত ঐতিহাসিকদের লেখায় প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন লিখেছেন—
‘মুসলমানগণ ইরান, তুরান প্রভৃতি যে স্থান থেকে আসুন না কেন এদেশে আসিয়া সম্পূর্ণ বাঙালী হইয়া পড়িলেন, তাঁহারা হিন্দু প্রজা মণ্ডলী বেষ্টিত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। মসজিদের পার্শ্বে দেব মন্দিরের ঘন্টা বাজিতে লাগিল, মহরম, ঈদ, সবেরবাত প্রভৃতির পার্শ্বে দুর্গোৎসব, বাসুদেব উৎসব চলিতে লাগিল।’

আজ আশ্চর্য লাগলেও প্রমাণিত ঐতিহাসিক সংবাদ এটাই যে, হিন্দু ধর্মের পবিত্র পুস্তক সমূহ যেমন রামায়ণ মহাভারত, গীতা, পুরাণ প্রভৃতি আকাশের ছায়া পথের মত দূর থেকে দৃষ্ট হতা ব্রাহ্মণ ছাড়া এ সমস্ত গ্রন্থাদি অপর কেউ পড়তে পারতেন না অর্থাৎ পড়ার অধিকারই ছিল না। আর সাধারণ মানুষ পড়তে পারা তো দূরের কথা এর অর্থই বুঝতে না। এমনকি যারা পুরোহিত তাঁরাও অধিকাংশ জন অর্থ বুঝতেন না কারণ ঐ সব বেদ বা ধর্মগ্রন্থগুলি অনুবাদ করা শাস্ত্রে নিষেধ ছিল।

(শ্রী রমেশ চন্দ্র মজুমদারের ইতিহাস দ্রষ্টব্য)।

কিন্তু ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেনের উক্তিতে পরিষ্কার উল্লিখিত আছে যে মুসলমান রাজা হুসেন শাহের সময় তাঁর সেনাপতি পরগাল খাঁ ও তার পুত্র ছুটি খাঁ রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদ করেন। সেটি শুধুমাত্র প্রাথমিক অনুবাদ হিসাবেই উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক সংবাদ নয়; বরং আজ বহু ভাষায় বহুরূপে ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ করার ও সর্ব শ্রেণীর পড়ার অধিকারের ওটা হচ্ছে গোড়াপত্তন, ওটাই হচ্ছে হিন্দু ধর্মকে প্রকাশ ও প্রচারের ভিত্তিস্থাপনা। তেমনি বাবু গিরিশ চন্দ্র ঘোষের ‘কুরআন তরজা’ ও আমাদের কাছে প্রশংসনীয়।

অতএব দেখা যাচ্ছে হিন্দু মুসলমানের মিলিত প্রচেষ্টাতেই ভারত সমাজ সংস্কৃতি ও সভ্যতা এতখানি উন্নত করার কোন অবদানের কথা ভুলে গেল চলবে না। বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথের অবদান যদি আমাদের মধ্যে বেঁচে থাকে তাহলে নজরুলের বিদ্রোহিতার সুরও ঝংকৃত হবে ভারতবাসীর হৃদয়-তন্ত্রীতে। স্বাধীনতা সংগ্রামরূপে বিনয়, বাদল, দীনেশ প্রভৃতির নাম যদি স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকে তবে হযরত মাওলানা ওলিউল্লাহ, মহম্মদ শহীদ ইসমাইল, মাওলানা আবদুল আজিজ, ওবাইদুল্লাহ সিন্ধী, হুসাইন আহম্মদ মাদানী (রাঃ), আহম্মদ ব্রেলবী প্রভৃতি স্বাধীনতাকামী বীরদের নামও লেখা থাকবে রক্তাক্ত ইতিহাসের পাতায় রক্তের তুলি দিয়ে সে ইতিহাস পরে আসছে। মীরজাফর সিরাজ হত্যার পিছনে দায়ী বলে সারা মুসলমান সমাজ যদি হয় বিশ্বাসঘাতক তবে হিন্দু সমাজও বিশ্বাসঘাতক, নরহন্তা রূপে চিহ্নিত হবে কেননা তারাও সন্তান নাথুরাম গড স্বাধীনতা সংগ্রামী অন্যতম নেতা গান্ধীজীর বুকে গুলি বিদ্ধ করে হত্যা করেছিল। কারবালার রক্তাক্ত ইতিহাস যদি হয় দুঃখের তবে কুরু পণ্ডবের যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ হিন্দুর প্রাণহানিও অনুরূপ বেদনাদায়ক। অতএব দোষ গুণ আমাদের সবলের আছে একথা ভুলে গেল চলবে না।

পরিশেষে বলব, আজ ভারতের হিন্দু মুসলমানে সাম্প্রদায়িকতায় মেতে থাকার দিন নয়। আজ উভয় সম্প্রদায়ের কোটি কোটি হস্তকে এক করে এগিয়ে যেতে হবে উন্নতির পথে; সংগ্রাম করতে হবে যাবতীয় অন্যায় অত্যাচার আর কলুষতার বিরুদ্ধে। তবেই হবে ভারতের কল্যাণ—তবে প্রতিষ্ঠিত হবে অনাবিল সুখ শান্তি। অতএব হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে প্রত্যেক ভারতবাসীকে যাবতীয় অসভ্যতা আর কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আপোষ হীন সংগ্রামে মিশে যেতে হবে। তাহলেই আমরা আমাদের অস্তিত্ব লাগে অগ্রসর থেকে পারব বিপুল সম্বর্ধনা আর সাফলতার সাথে এবং অচিরেই ভারতের ভাগ্যাকাশে উদিত হবে নিষ্কলুষ সৌভ্রাতৃত্ব রবি যা দেশকে উন্নতির পথে এগিয়ে দিতে অপরিহার্য পাথেয় চিহ্নিত হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মুসলমান আগমনের পূর্বে ভারতের সংক্ষিপ্ত রাজনৈতিক অবস্থা

আমরা পূর্বেই ভারতের প্রাচীন যুগের ধর্ম, ইতিহাস ও বিবর্তনের বিষয় সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করেছি, এখন ভারতে মুসলমান সম্প্রদায়ের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করব। প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান ইতিহাস থেকে উদ্ধৃতির জন্য আমরা 'ভারত জনের ইতিহাস' টিকে বেছে নিলাম। তার অনেকগুলো কারণের মধ্যে একটি কারণ হচ্ছে এটাই যে, এটি ধর্মনিরপেক্ষ ভারতবর্ষের মস্তিষ্ক স্বরূপ পশ্চিম বঙ্গের শিক্ষা পর্ষদ এর সিলেবাস অনুযায়ী নবম, দশম ও একাদশ শ্রেণীর অর্থাৎ স্কুল ও কলেজের উপযুক্ত ইতিহাস। যেহেতু একাদশ শ্রেণী পূর্বে কলেজেই পড়তে হত। মাঝে স্কুলেই একাদশ শ্রেণী চালু হয়েছিল, পুনরায় তা কলেজেই চালু হয়েছে। ইতিহাসটি বেছে নেয়ার আরও একটি কারণ হচ্ছে এটাই যে, ইতিহাসটির লেখক যে একজন সুবিখ্যাত ব্যক্তি তা তার বইয়ে প্রমাণ পাওয়া গেছে। যেমন—

‘বিনয় ঘোষ’ : ‘এম, এ; রকফেলার রিসার্চ ফেল ও বিদ্যাসাগর-লেকচারার (১৯৫৬-৫৭), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; মেম্বার, হিস্টোরিকার রেকর্ডস, কমিশন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার; ‘পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি’, ‘বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ’, ‘সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজ চিত্র’ প্রভৃতি প্রধান ইতিহাস গ্রন্থের লেখক; সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনার জন্য রাজ্য সরকারের শ্রেষ্ঠ সম্মান “রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার” প্রাপ্ত।’

বর্তমানে যাদের কালি কলমের উপর ভারত নির্ভর করেছে সেই শিক্ষিত পুরুষ ও নারীর বর্তমান স্বরূপও উপলব্ধি করতে পারা যাবে এই ইতিহাসটির দ্বারা। কারণ, ডেকচির ভাত একটা টিপলেই বোঝা যায় শক্ত না নরম। এবার আসুন আলোচনা শুরু করা যাক।

“বেদের বিরুদ্ধে বিরাট আক্রমণ শুরু হয়েছিল একদল লোকের দ্বারা, তাঁদের বলা হত ‘লোকাযত বা চার্বাক’। বৌদ্ধ গ্রন্থে এদের নাম আছে, মহাভারতে এদের নাম ‘হেতুবাদী’। তাঁরা আসলে নাস্তিক। তাঁরা বলতেন পরকাল, আত্মা ইত্যাদি বড় বড় কথা বেদে আছে কারণ ভগু, ধূর্ত ও নিশাচর এই তিন শ্রেণীর লোকই বেদ সৃষ্টি করেছে, ভগবান নয়। বেদের সার কথা হল পশুবলি। যজ্ঞের নিহত জীবন নাকি স্বর্গে যায়। চর্বাকরা বলেন, যদি তাই হয় তাহলে যজ্ঞকর্তা বা যযমান নিজের পিতাকে হত্যা করে সোজা স্বর্গে পাঠান না কেন? ইত্যাদি। (ভাঃ জঃ ইঃ দ্রষ্টব্য)।

ঐ ঝগড়া বাড়তে বাড়তে বেদ ভক্তদের সঙ্গে বৌদ্ধদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ঝাঁপ দিতে হয়। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা যে নামিআ চার্বাকদের উজ্জিতই প্রমাণ হয়েছে। অতএব বৌদ্ধরা মূর্তিপূজা যজ্ঞবলি বা ধর্মাচার নিষিদ্ধ করে প্রচার করেছিল পরকাল নেই, জীব হত্যা পাপ প্রভৃতি। মোটকথা হিন্দুধর্ম বা বৈদিক ধর্মের বিপরীত ধর্ম বৌদ্ধ ধর্মে জাতিভেদ ছিল না। (ভাঃ জঃ ইঃ)

বৌদ্ধ ধর্মের বিশেষ “বিশিষ্ট ধর্ম সংগঠন ও সন্ন্যাস সংঘ। হিন্দু ধর্মের বিধান হচ্ছে জীবনে প্রথম দিকে ব্রহ্মচারী, তারপর গৃহী বা সংসারী, তারপর বানপ্রস্থ আর বার্দ্ধক্য বা বয়সের শেষাংশে সন্ন্যাস। আর হিন্দু সন্ন্যাস সংবিধানে সংঘ সৃষ্টির কোন নিয়ম নেই। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মে সংঘ সৃষ্টি একটি বিশেষ চিত্তাকর্ষক মূল্যবান ব্যবস্থা। কিন্তু পরে দেখা যায় শঙ্কর থেকে শ্রী চৈতন্য, শ্রী রামকৃষ্ণ পর্যন্ত প্রত্যেকেই বৌদ্ধের ঐ নীতি গ্রহণ করেছেন। যদি আজও ভারতে হিন্দু জাতির মধ্য থেকে সংঘগুলি বাতিল করা হয় তাহলে জাতি সামাজিক শৃঙ্খলা ও উন্নতি থেকে বহু দূরে ছিটকে পড়বে। (ভাঃ জঃ ইঃ) ঐতিহাসিক ডিসেন্ট স্মিথ বলেছেন, The Sanga of monks developed in to a highly organized. wealthy and powerful fraternity.....

যাহোক, হিন্দু ধর্মের সাথে বৌদ্ধ ধর্মের লড়াই চলতে লাগল, পরস্পর পরস্পরকে গ্রাস করার চেষ্টা করতে লাগল। ছল, বল, বল, কৌশল প্রভৃতি সব অস্ত্রেরই প্রয়োগ থেকে লাগল। একে অপরের প্রতি ঐ লড়াইটিও ছিল নিঃসন্দেহে সাম্প্রদায়িক লড়াই। অনেক উত্থান পতনের পর অনুনত হিন্দু ধর্ম বৌদ্ধ ধর্ম থেকে অনেক শিক্ষা গ্রহণ করে উন্নত হয়েছিল আর বৌদ্ধরা নানা চক্রান্তের শিকার হয়ে বৌদ্ধ দলকে দুই ভাগে ভাগ করেছিল। প্রাচীন পন্থীরা ‘হীনযান’ আর ‘অধুনিকরা হল ‘মহাযান।’ মহাযান নূতন দল হিন্দু বা বৈদিক সম্প্রদায়ের সমর্থন বা প্রয়োজনীয় প্রশংসা পেয়ে মূর্তিপূজা শুরু করে। ফলে বৌদ্ধ ধর্মের ভিত্তি ওখানেই নড়ে যায়, পরে হিন্দুদের অত্যাচার ও অনাচারে ভারতে সৃষ্ট বিশাল বৌদ্ধ সমাজ হিন্দু শক্তির কাছে পরাজয় স্বীকার করে ভারত থেকে বিতাড়িত ও বিদূরিত হয়েছে, শুধু পড়ে আছে বুদ্ধদেবের ছোট বড় গোটা কতক বুদ্ধমূর্তি। ব্রহ্মদেশ, জাপান ও সিংহল প্রভৃতি বহিঃভারত বা অপর রাষ্ট্রে বৌদ্ধ ধর্ম বেঁচে থাকলেও ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্ধদলকে নিষ্ঠুর ভাবে বিদায় থেকে হয়েছে। ভারতজনের ইতিহাস - এ ১০০ পৃষ্ঠায় আছে — “হিন্দু ধর্মের কাছে নতি স্বীকার করিয়া তাহাকে নিজের শ্রেষ্ঠ নীতি ও গুণগুলি দান করিয়া বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষ হইতে বিদায় লইয়াছে।’

এখানে মনে রাখবার কথা, কোন জাতি তার মৌলনীতির পরিবর্তন সাধন করে অপর জাতির সংস্কৃতি ও সভ্যতার কাছে নতি স্বীকার করে তাহলে তাকে স্বাতন্ত্র্য বিহীন হয়ে ধ্বংসের অতল তলে তলিয়ে যেতে হয়। একথা অব্যর্থ সত্য।

যাহোক, শির ঠাকুরের শৈব ভক্ত শ্রেণী বা প্রাচীন হিন্দু সম্প্রদায় যে বৌদ্ধদের উপর বেপরোয়া অত্যাচার করেছিল তার বহু ইতিহাসে পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ আছে। শ্রী রমেশ মজুমদারের ইতিহাস গ্রন্থেও পাওয়া যায় হিন্দু রাজা শশাঙ্ক বিদেহবশে

বুদ্ধদেবের স্মৃতি বিজড়িত পবিত্র 'বোধিদ্রুম বৃক্ষ' যা গয়াতে ছিল তাহা সমূলে উৎপাটন করেন এবং পাটলিপুত্রে বৌদ্ধদের ভক্তির বস্তু বুদ্ধদেবের পদচিহ্ন সম্বলিত পবিত্র পাথরটিকে গঙ্গায় ফেলে দিয়েছিলেন। তাছাড়া কুশী নগরের একটি বৌদ্ধ বিহার থেকে বৌদ্ধদিগকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং গয়ার বৌদ্ধ মন্দিরে বুদ্ধদেবের মূর্তিটি অসম্মানের সঙ্গে নিক্ষেপ করেছিলেন এবং সেই স্থানে স্থাপন করেন শিরমূর্তি 'আর্য্যামুকুন্দী মূলকল্প' নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে শুধু বৌদ্ধ ধর্মে নয় জৈন ধর্মের উপরও উৎপীড়ন এবং অত্যাচার তিনি প্রায় সমান ভাবেই করে গেছেন।

জৈন ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্মে অনেক মিল আছে। উভয় ধর্মেই জীব হত্যা নিষেধ এবং পরকাল ও ঈশ্বর স্রষ্টা সম্বন্ধে তাদের ধারণা নেতিবাচক। এবার প্রশ্ন হচ্ছে বৌদ্ধ ধর্ম ধ্বংস হল, আর মহাবীরের জৈন ধর্ম টিম টিম করে বেঁচে রইল কেন? তার কারণ হচ্ছে এটাই যে, জৈন বেচারারা হিন্দু সম্প্রদায়ের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করে চুপচাপ তাদের সঙ্গে নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে ফেলেছে, ফলে তাদের মৌনতায় পরিণত হয়ে আসল সত্তা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে মুছে গেছে। তারা ব্যবসায়ে নতুন খাতা, গণেশ ঠাকুরকে সম্মান প্রদর্শন, দুর্গা, কালি, সরস্বতী প্রভৃতি প্রত্যেক পূজা পার্বনে খুশী হয়ে অংশ গ্রহণ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তারা মূর্তি পূজারীর ন্যায় যে অবস্থায় এসে পৌঁছেছিল তা তাদের মুছে যাওয়ারই পূর্বাভাস। প্রমাণ স্বরূপ 'ভারত জনের ইতিহাসে' পাওয়া যায় যে, "হিন্দু মতে যদিও জৈন ও বুদ্ধ উভয়ে নাস্তিক তাহা হইলেও হিন্দু ধর্মের সহিত উভয়ের সংগ্রাম তীব্র ও ব্যাপক হয় নাই।.... হিন্দুদের বর্ণাশ্রম হিন্দু দেবদেবী এবং হিন্দুর আচার নিয়ম তাঁহারা অনেকটা মানিয়া লইয়াছেন ও রক্ষা করিয়াছেন।"

তারপর মৌজা সাম্রাজ্য, শিশু নাগবংশ এবং নন্দবংশের উল্লেখ ইতিহাসে আছে। কিন্তু সাল তারিখ ও ঐতিহাসিক তথ্যের অস্পষ্টতা হেতু মূল উপাদানের অভাবে বহু মতভেদে পরিপূর্ণ হয়ে আছে ঐ অধ্যায়। এর পর খৃষ্টপূর্ব ৫০০ বছর আগে পারস্য সম্রাট তাঁর সৈন্য ভারতের দিকে চালনা করেন। খৃষ্টপূর্ব ৩৩৬ সালে গ্রীসদেশের ম্যাসিডন রাজ্যের রাজা হন আলেকজান্ডার। তিনি পারস্য আক্রমণ করে সেখানকার রাজাকে পরাস্ত করেন। রাজার মৃত্যুর পর সমগ্র পারস্য দেশ আলেকজান্ডারের কবলিত হয়। এরপর খৃষ্টপূর্ব ২৭ সালে বীর বিক্রমে আক্রমণ করে সিন্ধু নদীর পার্বত্য এলাকার লোকদেরকে হাজার হাজার আহত নিহত করে আলেকজান্ডার ভারতে প্রবেশ করলেন। ভারতের পুরু নামীয় রাজার সাহসের পরিচয়ে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে তাঁর রাজ্য ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। নিশ্চয়ই উভয়ের সংগ্রাম ও উদারতা প্রশংসার দাবী রাখে। ঐ সময়ে গ্রীক সভ্যতার সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ হয় এবং সেখানকার ঠাকুর দেবতার মূর্তির নমুনা গুলিও ক্রমে ক্রমে ভারতে আমদানী করা হয়। শ্রী বিনয় ঘোষের ইতিহাসে ১২৩ পৃষ্ঠায় আমাদের এই মতের সমর্থন আছে। যথা "ভারতের গন্ধার শিল্প ও ভাস্কর্য শিল্প গ্রীক শিল্পের কাছে অত্যধিক ঋণী। গ্রীক দেবতাদের মডেলে ভারতের দেব দেবীর মূর্তি গঠিত হয়েছে।"

তাহলে এটা লক্ষণীয় বিষয় যে, আর্য, মুসলমান, গ্রীক, ইরাণী, তুরাণী সবই বিদেশী। এমনকি ঠাকুর দেবতার মূর্তিগুলি পর্যন্ত বাইরের প্রভাব বহন করে।

তারপর এল মৌর্য সাম্রাজ্য বা চন্দ্রগুপ্তের ভূমিকা। চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করে প্রজাদের শেয়াল কুকুরের মত অর্থাৎ পশুর মত মনে করে দূর্ব্যবহার করেন এবং হত্যাশ্রম করে প্রজাদের রক্তে হাত রাঙা করেন। প্রজাদের তিনি ক্রীতদাস শ্রেণীতে পরিণত করেছিলেন। (রোমান ঐতিহাসিকদের লেখা দ্রষ্টব্য)। তিনি নাকি জৈন ধর্মে দীক্ষা নিয়ে শেষে সিংহাসন ছেড়ে উপবাস ব্রত পালন করতে করতে মৃত্যু মুখে পতিত হন। তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র বিন্দুসার পিতার রাজ্যের সংরক্ষণ ও আরও পরিবর্ধন করেন।

বিন্দুসারের মৃত্যুর পর তার পুত্র অশোক মগধের সিংহাসনে বসলেন। ইংরেজ মহাশয়ের কৃপায় 'The great' শব্দের অনুবাদে আমরা তাঁকে মহামতি বলে ডেকে থাকি। তিনি যৌবনে বল্লাহীন ও অননুত চরিত্রের মানুষ ছিলেন। নিষ্ঠুরতার পরিচয়ে তিনি অনেককে টপকে গেছিলেন। সিংহাসন দখল নিয়ে প্রত্যেক ভাইকে তিনি শৃংখলাবদ্ধ করে হত্যা করে রক্তস্নাত সিংহাসনে সমাসীন হলেন। তিনি জীবনে প্রথম যুদ্ধ করলেন কলিঙ্গকে কেন্দ্র করে। অবশ্য তিনি জয়ীও হয়েছিল। সেই প্রথম যুদ্ধই তাঁর জীবনের শেষ যুদ্ধ। কারণ সহস্র সহস্র নয়, লক্ষ লক্ষ প্রজার মুণ্ডহীন দেহ চারিদিকে ছড়িয়ে থাকা, কাটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, প্রাণহীন অজস্র দেহের পাশে কুকুরে মাংস নিয়ে মারামারি, শকুনের কর্কশ স্বর তাঁকে দিয়েছিল চমকে। আর তিনি যুদ্ধের পথে চলতে চাইলেন না। থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন। সকলকে অভয় দিয়ে পালিয়ে যাওয়া প্রজাদের ফিরিয়ে আনলেন। প্রজাদের জন্য রাজকোষের দ্বার খুলে দিলেন। নিজে বৌদ্ধধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করলেন। শুধু অনুশোচনা আর পূর্ব কর্ম তাঁকে বার বার আঘাত করতে লাগল। এবার দয়ার প্রতীক বৌদ্ধ ধর্মকে রাজ ধর্ম করে ভারতকে বৌদ্ধ রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করলেন। প্রচুর শিলালিপিতে সারা রাজ্যে বুদ্ধদেবের বাণী খোদাই করলেন। সেই সংগে নিজের জীবনের অপরাধ অনুশোচনার চিহ্ন স্বরূপ পূর্ব কাহিনী গুলিও লিপিবদ্ধ করতে তাঁর নির্ভেজাল সারল্য ও সাধুতায় বাধেনি। অশোকের আদর্শ সিংহাসনে প্রণিধানযোগ্য সারা বিশ্বের লোকের জন্য। তবুও বলব, এইসব সিংহাসন কেন্দ্রীক রক্তাক্ত ইতিহাস প্রত্যেক পাঠক পাঠিকাকে মুসলমান রাজাদের বিশেষতঃ উরঙ্গজেবের ইতিহাস পড়ার সময় অবশ্য মনে রাখ উচিত।

প্রায় খৃঃ পূঃ ২৩২ সালে আশোকের মৃত্যু হয়। কিন্তু তাঁর সন্তান ও উত্তরাধিকারীগণ ছিলেন অযোগ্য, ফলে সিংহাসনকে কেন্দ্র করে বিবাদ শুরু হয়। মৌর্য বংশের শেষ রাজা বৃহদ্রথকে ব্রাহ্মণ সেনাপতি হত্যা করে নিজে সিংহাসনে বসলেন এবং অশোকের স্মৃতি লোপ করে নতুন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করলেন। মেগাস্থিনিসের বিবরণ মতে, ভারতের অনেক প্রশংসার উল্লেখ আছে, আবার দুর্নামও আছে তেমনি। যোমন—হিন্দু জাতির মধ্যে কোন দল বা শাসক ছিল না। আর রাজাগণ যে নারী নিয়েই অধিকাংশ সময় অপব্যয় করতেন তারও উল্লেখ আছে। রাজা লোক লক্ষর নিয়ে

শিকারে যাবার সময় সুন্দরী নারী বেষ্টিত হয়ে যেতেন এবং উচ্চ মঞ্চ তৈরী করে রাজা সেখান থেকে তীর নিষ্ক্ষেপ করতেন। সেখানে শুধু কয়েকজন সুন্দরীই রাজার সহযোগিতা থেকে।

ভারতের শাসকগণ কর আদায় করতেন যথাযথ ভাবে। ব্যবসাদারেরা বিক্রয়লব্ধ অর্থের দশ ভাগের এক ভাগ কর হিসাবে দিতে বাধ্য থাকতেন। অনাদায়ে শাস্তি হত। এমনকি প্রাণদণ্ডও পর্যন্ত দেয়া হত। এখানে ঔরঙ্গজেবের জিয্ইয়া কর প্রসঙ্গ পড়ার সময় পাঠকবৃন্দকে এগুলো না ভুলতে অনুরোধ করি।

পূর্বেই বলেছি অশোকের পর তাঁর সন্তানরা ছিল অযোগ্য। তাই তাদের অযোগ্যতার সুযোগ নিয়ে নূতন শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। বহু দিন থেকে মৌর্য শক্তির সঙ্গে হিন্দু শক্তির ছোট বড় লড়াই চলে আসছিল। অবশেষে শেষ রাজা বৃহদ্রথকে হত্যা করে ব্রাহ্মণ পুষ্যমিত্র খৃঃ পূঃ ১৮৭ সালে সুঙ্গ রাজ বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। পুষ্যমিত্রের মৃত্যুর পর তাঁর বংশধরেরা সিংহাসন আর ক্ষমতার লড়াই করে অবশেষে দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। তার পর রাজা দেবভূতির মন্ত্রী বসুদেব রাজাকে হত্যা করে কাম্ব বংশের প্রতিষ্ঠা করলেন। আবার তেলেগুভাষী সাতবাহন বংশ প্রবল শক্তি নিয়ে কাম্ববংশকে অস্ত্র বলেই একেবারে ধ্বংস করেন।

তারপরেই ‘শক’দের আক্রমণ। আক্রমণের ফলে সাত বাহন বংশ কাহিল হয়ে পড়ে। কিন্তু শ্রীযজ্ঞ সাত কর্নির আমলে আবার সাত বাহন বংশ শক্তিশালী হয়ে উঠে।

আমাদের অনেকের ভুল ধারণা আছে যে, বুদ্ধদেব, মহাবীর প্রভৃতি ধর্ম প্রচারকগণের দলবল মৌর্য বংশ তথা উপরের আলোচিত রাজ্যগণ সকলেই হিন্দু বা ব্রাহ্মণ বংশের লোক। শুধু ভারতে ইংরেজ আর মুসলমানরাই হচ্ছে অহিন্দু বা বিদেশী। এটা এক বিরাট ত্রুটি বা অজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই নয়। বিনয় ঘোষ মহাশয়ের ইতিহাসে ১৬৮, ১৬৯ পাতায় আছে—“পূর্বে ভারতে মগধে শৈশু নাগ, নন্দ, মৌর্য রাজবংশের প্রতিষ্ঠা লাভের ফলে এই সব বেদ বিরোধী ধর্মমত যে রাজ্য পোষকতা লাভ করে তাহাতে বেশ কয়েক শতাব্দীর জন্য হিন্দু ধর্মে প্রসার ও প্রতিষ্ঠার পথ অবরুদ্ধ হইয়া যায়। অবশ্য প্রকাশ্যে মৌর্য রাজারা হিন্দু ধর্মের বিরোধীতা করেন নাই, চন্দ্রগুপ্ত হইতে অশোক কেহই ব্রাণ বিদ্বেষী ছিলেন না। কিন্তু তাঁহাদের মত সম্রাট যে বেদ বিরোধী ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন ইহাই যথেষ্ট।” শক বংশে মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামনই হচ্ছেন শেষ রাজা। ১৫০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

তারপর ভারতের বাইরে থেকে কুশান নামে আর এক শক্তিশালী জাতির আবির্ভাব ঘটল। ইউটি নাম তাদেরই। কুশন বংশের শেষ রাজার নাম কণিষ্ক। আমরা কিন্তু একটা মজার জিনিস দেখতে পাই কণিষ্ক কুশান বংশীয় রাজা, মোটেই ‘শক’ বংশীয় নন অথচ ৭৮ খৃঃ থেকে তিনি নূতন অন্ধ গুরু করেছিলেন। কণিষ্কের এই অন্ধ কণিষ্কান্দ বা কুশানান্দ নাম না দিয়ে নাম হয়েছে শকান্দ। যদিও তিনি শক নন তবু আমাদের সাধের সাথে তিনিও শকের মত চিহ্নিত।

এক্ষেত্রে আমাদের অনেকেই মনে করে থাকেন তিনিও হিন্দু। অতএব দেখা যাচ্ছে মুসলমান প্রতিষ্ঠিত হিজরী সন গণনা করলে সম্মান যেতে পারে অথচ বিদেশী কুশান বংশকে মনে মনে হিন্দু ও স্বদেশী কল্পনা করে শকান্দকে গ্রহণ করে ধন্য হলে ক্ষতি নেই। কণিষ্কও বৌদ্ধ ধর্মে শুধু বিশ্বাসী ছিলেন বললেই হবে না। বরং অশোকের মত তিনিও তাঁর রাষ্ট্র বৌদ্ধ ধর্মকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দিয়েছিলেন এবং রাষ্ট্রের তরফ থেকে বহু অর্থ ব্যয় করে তাকে সবল করে তুলেছিলেন। এমনকি বৌদ্ধ ধর্মের উন্নতির জন্য কণিষ্ক যা করেছিলেন মহামতি সম্রাট অশোকও অতটা করতে পারেন নি। বিনয় ঘোষের লেখায় আছে “অশোক বৌদ্ধ ধর্মের উন্নতি ও বিস্তারের জন্য যে কাজ করিয়াছিলেন কণিষ্ক তাহা আরও সুবিন্যস্তরূপে সম্পাদন করার চেষ্টা করেন।” কণিষ্কের সময়ে চীনে সেই দেশীয় পণ্ডিতদের সহযোগিতায় বৌদ্ধ ধর্মের অনুবাদ করে অনেক লোককে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত করার ব্যবস্থা করেছিলেন। এমনি ভাবে জাপানেও বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার ঘটে।

অতপর আসে গুপ্ত যুগ। প্রথম রাজা চন্দ্রগুপ্ত। ইনি মৌর্য বংশীয় চন্দ্রগুপ্তের ন্যায় প্রতাপশালী ছিলেন। ৩৭৮ খৃঃ ইনি মারা যান। ইনিও অশ্বমেধযজ্ঞ করেন এবং চারিদিকের রাজা প্রজার মধ্যে সন্তোষের সৃষ্টি করেছিলেন। তার উপাধি হয়েছিল সর্বোব্রাহ্মজ্যেষ্ঠতা’ অর্থাৎ সকল রাজ্যের উচ্ছেদ সাধনকারী। তার পর আসেন ২য় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য। তারপর এলেন একে একে কুমার গুপ্ত, ব্রহ্মগুপ্ত ইত্যাদি। সর্বশেষে এলেন রাজবুধ গুপ্ত।

এরপর ভারতের বাইর থেকে গুরু হল হুন জাতির আক্রমণ। সারাদেশে মারধর, লুট, অগ্নিসংযোগ, হত্যাকাণ্ড প্রভৃতিতে এক বিভীষিকাময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল। তারপর ঐ জাতি ভারতে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করে ভারতীয় দুই জাতির সংমিশ্রনে রাজপুত বংশের সাথে মিশে যায়।

গুপ্ত যুগেরই সব পূজার প্রবর্তন হয়। “গুপ্ত যুগে শৈব ধর্মেরও বিকাশ হইয়াছিল।” (ভাঃ জঃ পৃঃ) গুপ্ত যুগে একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটে। হিন্দু ধর্মের চিরদিনের বিষ্ণু হঠাৎ কৃষ্ণতে পরিণত হয়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই তিন ভগবানের মধ্যে বিষ্ণু কৃষ্ণ হয়ে সমাজে প্রচারিত থেকে থাকেন। (ভারত জনের ইতিহাস দ্রঃ ২০৮ পৃঃ)

একদিকে হুন জাতির প্রবল আক্রমণে হিন্দু গুপ্ত বংশ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়ে। ঐ সময়ে রাজা শশাঙ্ক প্রবল প্রতিভাশালী হয়েমত প্রকাশ করেন এবং বৌদ্ধ ধর্মের উপর নির্মম ব্যবহার করেন। তার পর দিল্লীর নিকটে থানেশ্বরে পুষ্যভূতি রাজার আবির্ভাব হয়। তারপর রাজনীতির মধ্যে আসেন রাজা হর্ষবর্ধন। তাঁর ভাই রাজা গ্রহবর্ধন নিহত হয়েছিলেন। হত্যাকারী শশাঙ্ক হর্ষবর্ধনেরও শত্রু হয়ে উঠলেন। তাঁর ভাইকে হত্যার অপরাধে তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যত দিন ভ্রাতৃ হত্যার পতিশোধ না নিতে পারবেন তত দিন তিনি ডান হাতে খাবে না। অবশ্য তিনি বাম হাতে খেতেন। শশাঙ্ক কিন্তু প্রবল শক্তি ও প্রভাব মণ্ডিত অবস্থাতেই স্বাভাবিক ভাবে পরলোক গমন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর হর্ষবর্ধন ও ভাস্করবর্মা সব অঞ্চল দখলে আনেন।

এত আলোচনায় দেখা গেল শুধু আক্রমণ, হত্যা, মারামারি আর জয়-পরাজয়ের ইতিহাস, শুধু রক্ত আর রক্ত। আমাদের মতে ওগুলি তত দোষণীয় নয়, কারণ সিংহাসনের জন্য রাজ্যের জন্য লড়াই তখন বীরত্ব বলেধরা হত। আজকের অবস্থার পরপ্রেক্ষিতে তখনকার দিনের কীর্তিকলাপকে বিচার করা উচিত নয়। বর্তমানে মুষ্টি যুদ্ধে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বীর মহাম্মদ আলীকে। তিনি কোটি কোটি টাকা পুরস্কার পাচ্ছেন আর তাঁর খেলা দেখার জন্য পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ টেলিভিশন সামনে করে বসে থাকেন। খেলা শেষে দেখা যায় প্রবল ঘৃষির আঘাতে প্রতিদ্বন্দ্বী হয়তো বা নাক ভাঙ্গা, চোখ উৎপাটিত কিংবা হাড় ভাঙ্গা হয়ে হাসপাতালে যাচ্ছেন। কিন্তু সেদিন অদূরে না হলেও সুদূরে যে ভীষণ খেলা অসভ্যতায় পরিগণিত থেকে পারে। তখনকার সমলোচকগণ যদি বিশ্ববিজয়ী মহাম্মদ আলীকে আর ভারতের বিশ্ববিজয়ী কুস্তগীর গামা এবং রামমূর্তিকে বলেন অসভ্য তাহলে তা বিরাট ভুল করা হবে। বরং সে যুগে বীরত্ব ও বুদ্ধির প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল বললে বেশী কিছু আসে যায় না।

যাই হোক, হর্ষবর্ধনের পর ভারতের বুকে 'চেত বংশের' আবির্ভাব হয়। ঐ বংশের শেষ রাজা খরবেল এবং রাজ্যের নাম ছিল কলিঙ্গ। খৃঃ পূঃ ১৬৫ সালে তিনি তামিল দেশের রাজ্যগুলি আক্রমণ করেন। শেষে 'পাণ্ড দেশ' থেকে মনি-মুক্তা, সোনা-রূপা, হাতী-ঘোড়া বহু কিছু নিয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। মোট কথা, হর্ষবর্ধনের রাজত্ব তাঁর মৃত্যুর পরে আস্তে আস্তে ভেঙ্গে চূর্মীর হয়ে গেল।

তারপর এল চালুক্য বংশ ও পল্লব বংশ। যথাক্রমে প্রথম পুলকেশী, দ্বিতীয় পুলকেশী প্রভৃতি ছোট বড় অনেক রাজার আবির্ভাব ঘটে ক্রমে পাল বংশের সূচনা হয়। পাল বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ধর্মপাল।

তারপর ৮৫০ থেকে ১২০০ সাল পর্যন্ত 'চোল বংশ' আত্মপ্রকাশ করে টিকে থাকে। রাজবাজ, রাজেন্দ্র প্রভৃতি চোল রাজাদের ভূমিকাও শক্তি দীপ্ত ছিল। ঐ চোল রাজাদের সময়ে ভারতের বেশ উন্নতি হয়েছিল। বড় বড় স্থাপত্য শিল্পে নৈপুণ্যের সর্গর্বে প্রমাণিত হয়েছে।

তারপরেই পাল বংশ ও সেন বংশের আবির্ভাব। গোপাল, ধর্মপাল, দেবপাল, মহীপাল, ১ম নহাপাল ও ২য় মহীপাল প্রভৃতি রাজা গণ ছিলেন পাল বংশের মধ্যে। দ্বিতীয় মহীপাল তার ভাই সুরপাল ও রামপালকে জেলের মধ্যে বন্দী অবস্থায় রেখেছিলেন। কারণ আতঙ্ক ছিল ভবিষ্যতে যদি সিংহাসন নিয়ে লড়াই হয়। তাই পূর্বাঙ্কেই পাকাপাকি ব্যবস্থা। যাই হোক, পাল বংশে আরও অনেক নরপতির আগমণ ঘটেছিল। যেমন নারায়ণ পাল ৫৪ বছর রাজত্ব করেছিলেন, রাজ্যপাল ৩২ বছর রাজত্ব করেছিলেন। ২য় গোপাল ১৭বছর, ২য় সুরপাল ২৬ বছর, রামপাল ৪২ বছর, গোপাল (৩য়) ১৪ বছর, মদনপাল ১৮বছর ও গোবিন্দপাল ৪৮বছর রাজত্ব করেছিলেন। এমনি ভাবে সেনবংশের মধ্যেও বিজয় সেন ৬২ বছর মতান্তরে ৩২ বছর, বল্লাল সেন ১১ বছর, লক্ষণ সেন ২৭ বছর বিশ্বরূপ সেন ১৪ বছর, কেশব সেন ৩ বছরকাল প্রভৃতি।

এর মধ্যে কৈবর্ত বংশ একবার শক্তিশালী রূপে আত্মপ্রকাশ করে মেরুদণ্ড সোজা করতে চেয়েছিল। কৈবর্ত রাজার নাম ছিল ভীম। সমস্ত সম্ভ্রান্ত রাজাগণ ঐ সময় একতাবদ্ধ হয়ে জোট বাঁধলেন যে, কৈবর্ত রাজ্য প্রতিষ্ঠিত থেকে দেয়া যেতেই পারে না। কৈবর্ত রাজা ভীমের সেনা বাহিনীও ছিল দূরন্ত এবং রণানুগ। কিন্তু যুদ্ধে সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বী দলের মিলিত শক্তির কাছে তাঁকে পরাজিত হত হল। ভীমরাজা বন্দী হলেন এবং জীবিত অবস্থায় তাঁকে ধরে আনা হলো। তাঁর মন্ত্রী-হরিসে এবং যুদ্ধের পর অনেককে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে কৈবর্ত শক্তিকে দমন করা হয়েছিল। ভীমরাজার আত্মসমর্পিত সৈন্যদের রামপাল নিজের সৈন্যদলে সংযুক্ত করেন। তারপর রামপালের পুত্র রাজ্যপাল ও সবশেষে গোবিন্দপাল রাজা হন, কিন্তু রামপালের মত এদের উপযুক্ত ছিল না।

এবার সেন বংশের রাজারা এগিয়ে এলেন শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বীতায়। পাল রাজাদের বিদায় পর্ব এবং সেন রাজাদের উদয় পর্ব শুরু হয়ে গেল।

বল্লাল সেন খুব উহুদয় সম্পন্ন মানুষ ছিলেন না। যুগের তালে ব্রাহ্মণ শূদ্রাদি পাশাপাশি বসবাস করার ফলে ছুতমার্গি হিন্দু সমাজে কমে আসছিল। কিন্তু বল্লাল কেন শক্ত হাতে তা দমন করলেন। ব্রাহ্মণদের ভদ্র ও কুলীন শ্রেণীতে এবং অব্রাহ্মণ ও অনুন্নত শ্রেণীকে নীচ বা ছোট লোক ও অস্পৃশ্য শ্রেণীতে পরিণত করেন। "রাজা বল্লাল সেন বলেন যে, কুলীনদের নয়টি গুণ থাকা উচিত। যাদের এই সব কটি গুণ আছে তাদের শ্রেষ্ঠ যাদের আটটি গুণ আছে তাদের 'সিদ্ধ গোত্রীয়' ও যাদের সাতটি গুণ তাদের আছে 'সাধ্য শ্রোত্রীয়' বলে অভিহিত করেন। বাকী কুলীনদের তিনি নাম দেন 'কাষ্ঠ শ্রোত্রীয়'।..... বল্লাল সেন সব কুলীনকেই সমান স্থান দিয়েছিলেন। তিনি তাদের অকুলীন কন্যা বিবাহেও কোন বাধা আরোপ করেন নি।"

(বিনয় ঘোষের লেখা 'ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর' পুস্তকের ১০৯ পৃঃ থেকে)

ঐ পুস্তকে ১১০ পৃষ্ঠায় আরও লেখা আছে "..... ব্রাহ্মণের এই কৌলিণ্য প্রথার দোহাই দিয়ে সামাজিক সুবিধা আদায় করতে লাগলেন। ক্রমে এই কৌলিণ্য প্রথা থেকে সৃষ্ট হল কন্যাকে উচ্চবর্ণে বিবাহ দেয়ার রীতি—যার অবশ্যজাবী ফল হল বহু বিবাহ। এক একজন কুলীন ব্রাহ্মণ বহু কন্যার পানি গ্রহণ করতে লাগলেন।

..... ঋতুমতী হবার আগে কন্যার বিবাহ দেয়ার বাধ্য বাধকতা ও বিবাহ দিতে না পারলে পিতা মাতার যে সামাজিক অমর্যাদা হত তা থেকে নিষ্কৃতি দেয়ার জন্য কুলীন ব্রাহ্মণেরা এই সব কন্যাদের বিবাহ করতেন। অতএব বিবাহ বেশ লাভ জনক পেশা হয়ে উঠল। কুলীন ব্রাহ্মণ কন্যাদের অসহায় পিতা মাতার দু'তিন ডজন স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও ৭০/৮০ বছরের বৃদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণদের উপযুক্ত পাত্র বলে বিবেচনা করতেন। মৃত প্রায় আশি বছরেরও অধিক বয়স্ক বৃদ্ধের সঙ্গে নিতান্ত বালিকা কন্যাদের বিবাহ হত মৃত্যুর আগে সে বৃদ্ধের লাভ হত সামান্য কয়েকটি টাকা।"

কুলীন ব্রাহ্মণদের মধ্যে যারা অনেকে এ প্রথার বিরোধিতা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে পূর্ববঙ্গের (বর্তমান বাংলাদেশ) রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় ছিলেন বিশেষ

উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁর জীবন চরিতে যা লিখেছেন সামান্য একটু তুলে ধর হল। তিনি লিখেছেন, “.... পিতাঠাকুর মহাশয় আমাকে অতি শৈশবাস্থায় রাখিয়া স্বর্গারোহণ করেন। তখন পিতৃব্য শ্রীযুক্ত তারক চন্দ্র মুখোপধ্যায় মহাশয় আমার আবিভাবক ছিলেন। দারিদ্র্যবশত আমাকে অল্পকালের মধ্যেই তিনি ৮টি বিবাহ করান। বহু বিবাহে সম্মতি থাকিলে বোধহয় আমাকে শতাধিক রমণীর পানি গ্রহণ করিতে হত—অনন্যপায় হয়ে আরও চয়টি পরিণয় করিতে হয়, তাহাতে আমার ঋণ পরিশোধ ও পরিবার বর্গের কিস্তি কালের ভরণ পোষণের সংস্থান হইলে আমি হুসেন শাহীর জমিদারদিগের আশ্রয় গ্রহণপূর্বক তহশীলদারী কর্মে নিযুক্ত হই। (রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত)। এছাড়া আরও অনেক দৃষ্টান্তদ্বারা প্রমাণ করা যেতে পারে যে কৌলীন্য প্রথা সমাজে কত ভীষণ আরাধনা করেছিল। যেমন (ক) “একটি ব্রাহ্মণের যদি ত্রিশটি স্ত্রী থাকে তবে প্রতি মাসে কয়েক দিনের জন্য স্বস্তুরালয়ে গিয়ে থাকলে আর খেয়ে ও উপহার পেয়ে এবং জীবিকা অর্জনের কোনও চেষ্টা না করে তাঁর সারা বৎসর কেটে যেতে পারে। বহু বিবাহ প্রথার ফলে কুলীন ব্রাহ্মণেরা এক নিষ্কমা, পরভুকশ্রেণী হয়ে উঠেছে এবং বিবাহের মত একটি সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে নীতি হীনতার উৎস করে তুলেছে।”

(খ) “অতএব অনেক কুলীন ব্রাহ্মণের জীবন ধারণের একমাত্র অবলম্বন বহু বিবাহ কর।”

(গ) “কুলীনরা বৃদ্ধ বয়সেও বিবাহ করে। অনেক সময় স্ত্রীদের সংগে তাদের সাক্ষাতই হয় না অথব বড় জোর ৩/৪ বছর পরে একবারের জন্য দেখা হয়।”

(ঘ) “এমন কথা শোনা যায় যে একজন কুলীন ব্রাহ্মণ এক দিনেই ৩/৪টি বিবাহ করেছেন।”

(ঙ) “কোনও কোনও সময়ে একজনের সব কয়টি কন্যার ও অবিবাহিত ভগিনীদের একই ব্যক্তি সংগে বিবাহ দেয়া হয়।”

(চ) “কুলীনের ঘরের বিবাহিত বা কুমারী কন্যাদের খুব দুঃখের মধ্যে দিন কাটাতে হয়। কুলীনদের এ ধরণের বহু বিবাহের ফলে ব্যভিচার, গর্ভপাত, শিশুহত্যা ও বেশ্যাবৃত্তির মত জঘন্য সব অপরাধ সংঘটিত হয়।” (উপরের ‘ক’ থেকে ‘চ’ পর্যন্ত উদ্ধৃতি গুলো শ্রী বিনয় ঘোষের লেখা ঐ ‘ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর’ নামক পুস্তক থেকে নেয়া হয়েছে। (আর জানার জন্য দেখুন মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহর বিধবা গঞ্জনা ও হিন্দুধর্ম রহস্য ও দেবলীলা নামক পুস্তক দুটি) উক্ত একাডেমী দুটি পুস্তক প্রকাশ করেছে।

এছাড়াও এমন ব্যক্তিদের কথা জানা গেছে যারা ৮২, ৭২, ৬৫, ৬০ ও ৪২টি কন্যার স্বামী। এবং এ সমস্ত স্ত্রীদের যথাক্রমে ১৮, ৩২, ৪১, ২৫, ও ৩২টি করে পুত্র সন্তান এবং ২৬, ২৭, ২৫, ২১৫ ও ১৬টি করে কন্যা সন্তান ছিল। মোটকথা কৌলিন্য প্রথা এক শ্রেণীকে একশত খণ্ডে বিভক্ত করে বিভেদের প্রাচীর রচনার ফলে মানুষের মানবিকতাকে দারুণভাবে অপমানিত করা হয়েছিল এবং মানুষের স্বাধীন অধিকারের মূলে কুঠারাঘাত করা হয়েছিল।

তারপরেই রাষ্ট্রমধ্যে লক্ষণসেনের পদার্পণ। তাঁর সময়ে দেশের একতা আরও নষ্ট হয়ে যায়। ছোট বড় প্রত্যেক রাজাই যেমন সিংহাসন, রাজ্য ও স্বার্থকর করে দেখেছেন, দেশ, সমাজ ও জাতির কল্যাণ কামনায় উদারতা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে তেমন কাউকে অগ্রবর্তী থেকে দেখা যায় না—তার উপর তিনি বৃদ্ধ হয়ে শারীরিক ও মানসিক দুর্বতাবোধ করেছিলেন। এমন সময় নিত্য নূতন সংবাদ মুসলমান জাতি সম্বন্ধে শুনতে লাগলেন। তাঁরা নাকি তিন ঈশ্বরে বিশ্বাসী নন। এমনকি তাঁদের ধর্মে মূর্তি পূজা মোটেই নেই। তাঁরা নাকি মূর্তি পূজার খুব বিরোধী। তাঁদের আধ্যাত্মিক ক্ষমতা এত বেশী যে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর শিষ্যরা আল্লাহর শক্তিতে প্রথমেই কোন দেশ আক্রমণ করার আগেই জানতে পারেন সে রাজ্যের সমস্ত অবস্থা। তার পরেই হয় আক্রমণ। তাঁরা নাকি অল্প সৈন্য নিয়ে বিশাল বিশাল সৈন্য বাহিনীর সাথে লড়াইয়ে জয়লাভ করেন ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে একথা ঠিক যে “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ” পতাকা তলে একত্রিত হয়ে তথা কুরআন ও হাদীসের মর্মকেন্দ্রে সমবেত হয়ে আধ্যাত্মিক বা আসমানী ক্ষমতায় ক্ষমতাবান মুসলমানেরা যে দিকে আগমন করেছে জগতের সে অংশই হয়েছে জ্ঞান-গরিমা, শিক্ষা-সভ্যতা, তাহাযিব ও তামাদ্দুনে অতুলনীয়।

আমাদের দেশের প্রচলিত ইতিহাসের মধ্যে রমেশ মজুমদারের ইতিহাস ও ঐতিহাসিকতায় অনেকেই আস্থাশীল। সে ইতিহাস অবলম্বনে লক্ষণ সেনের হাত রাজশক্তি কেমনভাবে মুসলমানের হাতে এল এখন সে প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা করা যাক।

তিনি তাঁর ইতিহাসে অবশ্য ঐতিহাসিক মিনহাজুদ্দিন সিরাজ সাহেবের লেখার অনুবাদ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। উদ্ধৃতিটি নিম্নরূপঃ—

“এই সময় লখমনিয়া রাজধানী ‘নুদীয়া’তে অবস্থান করিতে ছিলেন। তাঁহার পিতার মৃত্যুর সময়ে তিনি মাতৃগর্ভে ছিলেন। তাঁহার জন্মকালে দৈবজ্ঞগণ গণনা করিয়া বলিল যে, যদি এই শিশুর এখন হয় তবে সে ৮০ বৎসর রাজত্ব করিবে। এই কথা শুনিয়া রাজমাতার দুই পা বাঁধিয়া মাথা নিচের দিক করিয়া তাঁহাকে নামান হয়, কিন্তু পুত্র প্রসবের পরেই মৃত্যু হইল। তিনি হিন্দুস্থানের এক জন প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। বখতিয়ার কর্তৃক বিহার জয়ের পরে তাঁহার বীরত্বের খ্যাতি নুদীয়ায় পৌছিল।”

তাহলে উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকে এও জানা গেল, ভাগ্য ভবিষ্যতের যে ফল ব্রাহ্মণ ও দৈবজ্ঞগণ বলতেন সামান্য থেকে স্বয়ং রাজা পর্যন্ত তা বিশ্বাস করতেন। নচেৎ ঐ প্রসব কালের যন্ত্রণাদায়ক সময়ে এ রকম নিষ্ঠুর ভূমিকা প্রতিপালিত থেকে পারত না।

পূর্বেই বলা হয়েছে মুসলমান সৈন্য, সেনাপতি ও রাজাগণ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রিতে কঠোর সাধনা এবং দিনে সৈন্য চালনা কাতেন। তাঁরা ঘুমাবার পূর্বে পড়তেন তার নাম ছিল ‘ইস্‌তিখারা’ নামায। তার পর দুআত তুলে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতেন; হে আল্লাহ! আমরা আমাদের জন্য নয় তোমার জন্য যুদ্ধ করে যাচ্ছি এবং

তোমার জন্য মরতেও আমরা প্রস্তুত। এখন আমাদের আগামী অভিযান কেমনভাবে কৌশলিক করা হবে তুমিই জানিয়ে দাও, সাহায্য কর তারপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়তেন। স্বপ্নযোগে প্রার্থনার ফলাফল জানতে পারতেন এবং সে মত যুদ্ধের ময়দানে ও জীবনের সর্বত্র দুর্বীর গতি নিয়ে ছুটে যেতেন; সাফল্য তাদের সাদর অভিবাদন জানাত। এখনো খুব ধার্মিক শ্রেণীর মুসলমানেরা নিজেদের ব্যক্তিগত কাজেও ঐ নামাযের মাধ্যমে নির্দেশ লাভ করে থাকেন। এ বিষয়ে খুব পরীক্ষিত এমনি বহু তথ্যপূর্ণ ঘটনা আমাদের হাতে আছে, কিন্তু বর্তমান বিশ্বের নীচ থেকে উপর পর্যন্ত বেশীর ভাগ মুসলমানকে ধর্মের মত বাণীই বলেন না কেন, অনেক মানুষের অবস্থায় ঘৃণ ধরেছে। এর কারণ পরিবেশ ও উৎকট শিক্ষার প্রভাব।

যাই হোক, নুদীয়ার বৃদ্ধ রাজা কতগুলো সৈন্যকে স্বপ্নে দেখলেন তাঁরা নদীয়া আক্রমণ করেছেন, ঘুম ভাঙ্গার পর যারপর নাই বিচলিত হয়ে পড়লেন। তার উপর মহম্মদ বখতিয়ার তুর্কী মুসলমান বীরের সুখ্যাতি নানা ভাবে শুনে আসছেন। তখন ঐ বড় বড় দৈবজ্ঞ যারা তাঁকে বিধান দেন তাদের ডাকলেন। তাঁরা গণনা করে বললেন আক্রমণের সম্ভাবনা। দৈবজ্ঞগণ এবং রাজা অনেক চিন্তা ভাবনার পর অপশেষে এক সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, গুপ্তচরগণ ভিক্ষুক বেশে গিয়ে দেখে আসুক তুর্কী সৈন্যদের চেহারা পোশাক পরিচ্ছদ কেমন। তারপর যদি স্বপ্নে দেখা রূপ বেহারার সাথে মিলে যায় তাহলে স্বপ্ন সত্যিই বলতে হবে। তাই করা হল। কিছুদিন পরে সংবাদ এল—তাঁদের দাড়ি আছে, গোঁফ কামানো, মাথায় 'উন্নত শিরস্থান, সৈন্যরা লৌহবর্ম পরে থাকে। কথায় কথায় 'আল্লাহ' আর 'ইনশাআল্লাহ' শব্দ উচ্চারণ করে। একতাবদ্ধ হয়ে উপাসনা করে, তারপর সমবেত হয়ে হাত তুলে নিজের ভাষায় কি যেন প্রার্থনা করে এবং উপাসনা শেষে শিশুর মত সকলে কান্নাকাটি করে। এই সংবাদ শুনেই দৈবজ্ঞ বললেন, "হ্যা, শাস্ত্রেও ঐ রকম লেখা আছে।" তারপরই ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে রাজা লক্ষণসেন জানালেন আমার স্বপ্নে দেখা তুর্কবীরদের চেহারা আর গুপ্তচরদের আনা সংবাদ একেবারে মিলে গেছে। তখন দৈবজ্ঞগণ পরামর্শ দিলেন আপনার চুপিচুপি সম্মান নিয়ে নদীয়া থেকে সরে পড়াই ভাল, আমরাও আপনার সঙ্গে যেতে প্রস্তুত।

এ সম্বন্ধে শ্রী রমেশ মজুমদারের ইতিহাসে শুধু ইঙ্গিত আছে মাত্র। যেমন—
“গুপ্তচর পাঠাইয়া বখতিয়ারের আকৃতির বিবরণ আনান হল, দেখা গেল যে, শাস্ত্রের বর্ণনার সহিত ইহার সম্পূর্ণ ঐক্য আছে। তখন বহু ব্রাহ্মণ ও বণিকগণ নদীয়া থেকে পলায়ন করিলেন।”

যাহোক' লক্ষণসেনের মত রাজার 'গুঠ বললেই কাঁধে ঝুলি'র মত পলায়ন সম্ভব নয়। বছর খানেক পরেই মুহাম্মদ বখতিয়ার ১৮জন অশ্বারোহী সৈন্যসহ বিপুল বেগে নদীয়ার রাজদরবারে এসে উপস্থিত হলেন। তার পূর্বে রাজধানীতে রাজার সৈন্যদের বাধা দেয়া কর্তব্য ছিল; কিন্তু প্রত্যেকের আতঙ্ক ছিল 'যুযুয়' ভয়' যেখানে স্বয়ং রাজা আতঙ্কিত; ফলে বখতিয়ার আগমণ করলেন। লক্ষণসেনের পুত্র এবং খুব অল্প সংখ্যক

দেহরক্ষীরা এতক্ষণে বুঝতে পারল এঁরা বণিক নন, সে স্বপ্নে দেখা তুর্কী সৈন্য। দীর্ঘবিজ্ঞানে একবার বাধা দেয়ার চেষ্টা করে লক্ষণসেন পিছনের দরজা দিয়ে আত্মগোপন করে পূর্ববঙ্গে পলায়ন বা প্রস্থান করলেন।

রমেশ মজুমদার 'বাংলা দেশের ইতিহাস' এ ২৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, “যে সময়ে তুর্ক সেনা কর্তৃক দেশ আক্রান্ত হইবার পূর্ণ সম্ভাবনা বিদ্যমান সে সময়ে রাজধানীর দ্বাররক্ষীরা ১৮জন অশ্বারোহী তুর্কীকে বিনা বাধায় নগরে প্রবেশ করিতে দিল এবং অল্প সময়ে সজ্জিত সৈন্যকে অশ্ব ব্যবসায়ী বলিয়া ভুল করিল।”

ঐতিহাসিকগণের নিজের জ্ঞান দিয়ে সমালোচনা করা একটা চিরন্তন স্বভাব ধর্ম। যেমন অমুক রাজা অমুক বাদশার পতনের কারণ ইত্যাদি। যদি তিনি এ ভুল না করতেন তবে পরাজয় বরণ করতে হত না ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু একটা কথা মনে রাখার প্রয়োজন যে, যদিও প্রচলিত আছে 'সাবধানের নিবাশ নাই'। কিন্তু তবুও এর চেষ্টা শক্তিশালী পরীক্ষিত সত্য কথা হচ্ছে এ যে বিনাশের সাবধান নাই। অতএব যখন স্রষ্টার সদিচ্ছা অনুকূলে থাকবে তখন সব ভুলই ঠিকে পরিণত হবে আর যখন বিশ্ববিধাতা পক্ষি না থেকে বিপক্ষি প্রতিকূলে ভাব পোষণ করবেন তখন সব ঠিকই ভুলে রূপ নেবে—যদিও এ বিশ্বাস শুধু মাত্র আন্তিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এক্ষেত্রে হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দলভুক্ত মহাম্মদ বখতিয়ার খিলজীরকে ঘোড়া ব্যবসায়ী নামে আখ্যায়িত করার বা মনে করার পিছনে এ একই সত্যের ইঙ্গিত রয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়

মুসলমানদের ভারত আগমনের পূর্ণ তথ্য

মুসলমানদের ভারতে প্রথম পদার্পণ সম্বন্ধে দেশের প্রচলিত ইতিহাসে পাওয়া যায়, ভারতে সর্ব প্রথম মুসলমান জাতির আগমনকাল মুহাম্মদ বিন কাসিমের সময় থেকে। আসল ইতিহাস কিন্তু তা নয়। বরং আরও বহু তথ্যপূর্ণ ইতিহাস লুকিয়ে আছে ইতিহাসের ইতিহাসে। যা প্রমাণ এবং উপস্থাপনের কারণে অনেকেই জানেনা।

আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রে শ্রী বিনয় ঘোষ ও তাঁর স্ত্রী ইতিহাসের সিনিয়র শিক্ষয়িত্রী শ্রী বীনা ঘোষ এম, এ, বি-টি'র সহযোগিতায় লেখা 'ভারত জনের ইতিহাস' থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছি। তাতে তাঁদের জ্ঞান, বুদ্ধি, বিদ্যা, নিরপেক্ষতা ও দূরদর্শিতার যে পরিচয় পাওয়া গেছে তাই যথেষ্ট। কারণ বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতির ইতিহাসে বিদ্বেষতার চিহ্ন পাওয়া যায় নাই যদিও তাঁরা সকলে হিন্দু ছিলেন না, বরং অহিন্দু বা তাঁর ভাষায় নাস্তিক প্রভৃতি। কিন্তু মুসলমানদের ক্ষেত্রে শ্রী ঘোষ মহাশয় নিরপেক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন না বলে অনেকের বিশ্বাস। তার প্রমাণ একটু পরেই আসবে।

আমরা আগেই আলোচনা করেছি ইংরেজগণ তাঁদের স্বার্থরক্ষার তাগিদে ইতিহাসে মুসলমান চত্রিকে বিকৃত করেছিলেন এবং করিয়েছিলেন। আর হিন্দু মুসলমান বিরাট দুটি জাতির মধ্যে ঘৃণা ও বিদ্বেষের বিষবৃক্ষ রোপন করতে পারলেই তাঁদের কৃতকার্যতা তাঁদের উদ্দেশ্যে সিদ্ধি। তাই মুসলমানদের ইতিহাস লেখার সময় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে অনেকে তাঁদের লেখ্য প্রমাণ দিয়েছেন। তাঁরা মুসলমান জাতিকে কে কোন চোখে দেখেন! পুরস্কারপ্রাপ্ত বিনয় ঘোষও তার ব্যতিক্রম নন বলেই অনেকে মনে করেন। তিনি একজন ইতিহাস লেখক ও সরকারের দায়িত্ব বহনকারী এবং শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের বা স্বামী বিবেকানন্দের ভক্ত। তাঁর স্ত্রীও একজন উচ্চশিক্ষিতা এবং তিনিও দেশের ভারী নাগরিক গড়ে তোলার জন্য নির্বাচিতা নাম করা শিক্ষানিকেতনের শিক্ষায়িত্রী। এখন তাঁদের লেখাও যদি নির্ভেজাল দোষ মুক্ত না হয় তবে সাধারণ লেখক-লেখিকা, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর অবস্থা যে আরও ভয়াবহ হবে তাতে আশ্চর্য বা অবাক হবার কি আছে? তবে আবশ্যকীয় অবতারণার প্রয়াস।

শ্রী ঘোষ তাঁর 'ভারত জনের ইতিহাসে' একাদশ' অধ্যায়ে ২৭৭ পাতায় শুরু করেছেন 'ইসলামের অভিযান'। সেখানে মোটা অক্ষরে যা লেখা আছে একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে দেখলেই তা গভীর সাম্প্রদায়িকতা যুক্ত না মুক্ত তার বিচারের দায়িত্ব সূক্ষ্ম দর্শী 'পাঠক-পাঠিকার উপরেই অর্পণ করলাম।

ইতিহাসে লিখিত আছে —হযরত মুহাম্মদের মৃত্যুর পর যাঁহারা ইসলাম ধর্মের দারাক হইলেন তাঁহাদের বলা হয় খলিফা। এই খলিফাদের শাসনকালে ক্রমে একটা সুসংহত মুসলমান রাজশক্তির বিশালতা এবং তাহা আরবের বাহিরে পরিব্যাপ্ত হইল। বাদমীদের বিরুদ্ধে 'জিহাদ' (ধর্মযুদ্ধ) ঘোষণা করা এবং তাহাদের ছলে বলে কৌশলে পরাস্তরিত করা ইসলামের প্রসার ও প্রতিষ্ঠার যুগে অন্যায় বলিয়া গণ্য হইত না।

তার পূর্বেই ইতিহাসের এ পাতাতেই ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে লেখক বলেছেন, "৬৩২ খৃষ্টাব্দে মুহাম্মদের মৃত্যুর পর তাঁহার উচ্ছসিত তরঙ্গ আরবের ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করিয়া প্রচণ্ড বেগে চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। হিন্দুধর্ম বহু প্রাচীন, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের দুর্বীর প্রাণশক্তি অন্ততঃ সাময়িকভাবে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের বেশে বিভ্রান্ত ও বিপর্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছিল।"

যাই হোক বাচ্চাদের বইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বই পর্যন্ত পড়ে এ টুকুটাই সাধারণতঃ বলা হয়ে থাকে ভারতে মুসলমানদের প্রথম অভিযান মুহাম্মদ বিন কাসিমের সময়। ভারতের উপর লোভলালসার বশবর্তী হয়ে হিন্দু রাজা দাহিরের সময়ে মুসলমানগণ যেন বিনা কারণেই আকস্মিক আক্রমণ করেছিলেন, ইত্যাদি। কিন্তু বর্তমান সূক্ষ্মদর্শী গবেষক পণ্ডিতদের মতে, হিন্দুস্থান বা ভারতবর্ষ মুসলমানদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় স্বতন্ত্র স্থান। সিন্দু বা হিন্দু নামটি মুসলমানদেরই দেয়া। হযরত মুহাম্মদের (সাঃ) সময়েই ভারত সম্বন্ধে একদিন তাঁর বিখ্যাত শিষ্য হযরত আবু হোরাইরা (রাঃ) জানিয়েছিলেন, "হিন্দু বিজয়ের সুসংবাদ"। সাহাবী বা শিষ্য হযরত আবু হোরাইরা (রাঃ) বর্ণিত হাদীস গ্রন্থে আছে, "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে হিন্দু অভিযানে নিশ্চিতওয়দা (প্রতিশ্রুতি) দিয়েছেন।" তিনি আরও বলেছেন, "যদি আমি সে সময় জীবিত থাকি তবে আমি প্রাণ ও সম্পদ-সম্পত্তি বা অর্থাধি ব্যয় করতে কুষ্ঠাবোধ করব না। আর যদি নিহতই হই তো সম্মানীয় শহীদের সম্মান পাব, আর যদি নির্বিঘ্নে বিজয়ীর বেশে ফিরে আসি তাহলে আমি থেকে পারব আল্লাহ্‌নাম মুক্ত-আবু হোরাইরা (রাঃ)।" (নাসায়ী হাদীস গ্রন্থ থেকে)

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবদ্দশায় খালেদ ইবনে ওয়ালিদ (রাঃ) ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনিই ইসরাইল, আফগান ও নিজের গোত্রের লোকদের পত্র দিয়ে জানান যে, "সমস্ত ধর্মের প্রতিশ্রুত প্রতিশ্রুত নবী 'মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' সারা বিশ্বের পাপীদের পরিত্রাণের পাথয়ে নিয়ে, শেষ নবী হয়ে ইসলাম ধর্ম প্রচার করছেন। আমি নিজে সেই শান্তি সাম্যের স্বয়ং সম্পূর্ণ ধর্মে দীক্ষিত হয়েছি এবং আপনারাও সুচিন্তিত পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন আশা করি। আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন সৃষ্টির কাছে নতিস্বীকার করাকে ইসলাম চিরতরে বন্ধ করেছে। সংশোধিত চরিত্রবান এবং সভ্য ও উন্নত হয়ে জান্নাতের অধিকারী হওয়ার পূর্ণ পণ্ডিত আমরা উপলব্ধি করে উপকৃত হচ্ছি। তাই আপনাদেরও মঙ্গল কামনায় এ পত্র প্রেরণ।" ('তারিখে জাহাঙ্গীর', মজমাউল আনসার' এবং আছনাফুল মখলুকাত' ইতিহাস গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)

অনুরূপ একটি পত্র পেয়ে ‘কয়স’ নামে একটি প্রভাবশালী নেতার নেতৃত্বে আফগানিস্থান থেকে একটি দল মদীনায় হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সংগে সাক্ষাত করলেন এবং অনেক আলোচনার পর স্বেচ্ছায় ইসলামধর্ম গ্রহণ করেন। সেই সংগে ‘কয়স’ ও হযরতের হাতে হাত দিয়ে ইসলামের উপর আত্মসমর্পণ করলেন। হযরত যখন কয়েসের নাম পরিবর্তন করে নূতন নাম রাখলেন আবদুর রশিদ। কারণ প্রত্যেক মুসলমানের নাম মুসলমানের মত হওয়া একান্তই আবশ্যিক। এবার আবদুর রসিদ (রাঃ) সাথে আর একজন সাহাবা বা সঙ্গী দিয়ে আদেশ দিলেন ইসলামের বাণী প্রচার করতে। তিনি নিজের দেশ অর্থাৎ আফগানিস্থানে ইসলাম ধর্ম প্রচার করে বহু গোত্রীয় অগোত্রীয় লোককে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে ৭৮ বছর বয়সে পরবর্তীকালের কাজের দায়িত্ব মুসলমানদের উপর ন্যস্ত করে পরলোক গমন করলেন।

মুসলমানরা একহাতে তলোয়ার আর অপর হাতে কুরআন নিয়েই নাকি ইসলাম প্রচার করেছে বলে যে মিথ্যা অপপ্রচার আমাদের মধ্য প্রচারিত তা কত অসার, অবাস্তব এবং পরিকল্পনা প্রসূত ভারতে ইসলাম আগমনের প্রথম অভিযাত্রার ইতিহাস পাঠ করলেই প্রমাণিত হবে।

ভারত রাষ্ট্রের মাদ্রাজ তামিলনাড়ু প্রদেশের একটি জেলার নাম ‘মলাবার’ বা ‘মালাবার’। এ ‘মালাবার’ ঘাঁটিটি আরবদের জন্য এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল কারণ, মাদ্রাজের এ বন্দরের উপর দিয়েই আরবরা চীন যাতায়াত করতেন। যেমন করেই হোক সারা বিশ্বের প্রত্যেক স্থানে ইসলামের বাণীকে পৌঁছে দেয়া তাঁরা ‘ফরয’ বা অবশ্য কর্তব্য বলে জানতেন। অবশ্য প্রত্যেক দেশ বা জাতিতে মুসলমান করা ‘ফরয নয়, তবে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর বাণী শুনিয়া দেয়া ফরয। তাই আরবেরা রাতে নামায সাধনায় থাকতেন আর দিনে সিদ্ধান্ত শেষে বিশাল কর্ম-সমুদ্রের চালাতেন তাঁদের অব্যর্থ অভিযান। যাই হোক, আরবরা এ জায়গাটিকে বলতেন ‘মাবার’; আরবীতে এর অর্থ অতিক্রম করে যাবার স্থল-পারঘাট। আরব বণিক ও নাবিকেরা এ ঘাট পার হয়েই মাদ্রাজ ও মক্কার কাছে হেজাজ প্রদেশে যাতায়াত করতেন এবং মিশর থেকে চীনে যাত্রাপথের নগর ও বন্দরগুলোতে যাতায়াত করতেন। এজন্যই ‘মাবার’ নাম রেখেছিলেন তাঁরাই। এ দায়িত্ব তাঁরা যথাযথ ভাবে পালন করতেন। ফলে তাঁদের হাতেই বহু মানুষ মসলমান ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল।

বিশ্বকোষের সম্পাদক শ্রী মশাই তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন, “পরাবৃত্ত পাঠে জানা যায় যে চেরব রাজ্যের (ভারতের) শেষ রাজা চেরুমাল পেরুমাল ইচ্ছা করিয়া সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া মুসলমান ধর্ম গ্রহণ অভিলাষে মক্কা নগরীতে গমন করেন।”

(দ্রঃ, বিশ্বকোষ ১৪ঃ ২৩৪ পৃ)

তাছাড়া একজন মুসলমান ঐতিহাসিক লিখিত তোহফাতুল মহাহেদিন ‘গ্রন্থেও পাওয়া যায়, “একজন রাজার মক্কা গমন, তাঁর হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর নিকট উপস্থিত হওয়া এবং স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণের বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। রাজা কিছুকাল হযরতের কাছে থেকে দেশে প্রত্যাবর্তনের সময় ‘শহর’ নামক স্থানে পরলোক গমন করেন।”

(তোহফাতুল মুজাহেদীন দ্বষ্টব)

এখানে দেখা যাচ্ছে উভয় লেখকের বক্তব্যের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে সামঞ্জস্য রয়েছে। অতএব অব্যর্থ ভাবে প্রমাণিত হচ্ছে মাদ্রাজেই প্রথমে ভারতের রাজা স্বেচ্ছায় মুসলমান হবার জন্য মক্কা গিয়েছিলেন। আরও প্রমাণ হয়, তরবারী দিয়ে ইসলাম প্রচারের মিথ্যা ঘৃণ্য অভিযোগটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তদুপর আরও প্রমাণ হয়, রাজার মুসলমান হবার আগেই হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মহাত্মা, মহানুভবতা ও মর্যাদার কথা মুসলমান নাবিক বা তবলীগ জামাতের (ধর্মপ্রচারক দল) নিকট জ্ঞাত হয়ে, সাধারণ মুসলমানের মত তিনি তাঁদের হাতে দীক্ষা না নিয়ে মূল কেন্দ্রে গিয়ে মুখ্য আলোক উৎসে পৌঁছেছিলেন। অর্থাৎ সাধারণ নাগরিকেরা অনেকেই মুসলমান হয়েছিলেন অনেক পূর্বে।

একজন প্রাচীন ঐতিহাসিক ভারতীয়দের মুসলমান হবার কারণ প্রসঙ্গে বলেছেন—“..... তাহার মধ্যে প্রধান হইতে বৌদ্ধ ও জৈনদের মতবাদ, তাহাদের উপর হিন্দু পণ্ডিতগণের নিষ্ঠুর অত্যাচার এবং পক্ষান্তরে কয়েকজন মুসলমান সাধু পুরুষের সাক্ষাৎ লাভ ও তাহাদের মুখে হযরতের ও ইসলামের ধর্মের পরিচয় লাভ।”

‘সাধু পুরুষদের সাক্ষাৎ লাভ’ কথাটি অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য। মুসলমান ‘ফকির’ ও আওলিয়া’গণের পরিত্র তাঁদের আধ্যাত্মিক অলৌকিক প্রভাবেও অনেকে মুসলমান হয়েছিলেন। সে সম্পর্কে পূর্ণ ঐতিহাসিক তথ্য পরিবেশন করতে হলে গ্রন্থ আরও বেড়ে যাবার ভয়ে এখানেই সংযত থেকে হচ্ছে।

মাদ্রাজের মালাবারের অধিবাসীদের ‘মোপলা’ বলা হয়। তাঁদের প্রধান কাজ ছিল তবলীগী বা ধর্ম প্রচার। মোপলাদের সম্বন্ধে বিশ্বকোষ সম্পাদক মহাশয়ের লেখা থেকে কিঞ্চিৎ তুলে ধরা হচ্ছে—“ইহারা অধ্যবসায়শীল, কর্মক্ষম এবং বর্দ্ধিষ্ণু ইহাদের অবয়র সুগঠিত ও বলিষ্ঠ ইহারা দেখিতে সুশ্রী..... ইহাদের ন্যায় পরিশ্রমী তৃতীয় জাতি ভারতবর্ষে আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। সাহসীকতায় ইহারা চির শ্রাসিন্দ আরবীয় ধর্ম মতে দীক্ষাদানই ইহাদের প্রধান কর্ম। ইহারা শাশ্রু (গোঁফ দাড়ি) ধারণ করে, কেশ কর্তন করে। সকলেই মস্তকে টুপি দেয় ইহারা সভাবত পরিকার পরিচ্ছন্ন।”

(বিশ্বকোষ ১৪ঃ ৬১৭ পৃঃ দ্রঃ)

তাহলে আমরা বেশ বুঝতে পারছি ভারতে মুসলমান অভিযাত্রীদের আগমনের সময়, পদ্ধতি, কারণ ও রহস্য যেন হজম করে একটা গোলক ধাঁধা সৃষ্টি হয়েছে। তবে এর পশ্চাতে কি কোন পূর্ব পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র ছিল না? অবশ্যই ছিল। যার ইঙ্গিত পূর্বেই করা হয়েছে এবং পরে আলোচনায় আরও পরিষ্কার হয়ে উঠবে বোধকরি।

মসালবারেরই প্রাচীন নাম চেরর বা কেরল। ওখানে সেই যুগেই দশটি মসজিদ তৈরী করা হয়েছিল। যথাক্রমে কোবঙ্গ নুরে, কুইলনে, হিলধায়া পর্বতে, পাক দূরে, মঙ্গল নগরে, দরফতন নগরে, শালিয়াত নগরে, কুণ্ড পুরমে, যান্দারিনায়, জজকোর্ট প্রভৃতি স্থানে। বিশ্বকোষ প্রণেতা বলেন, “মসজিদ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই এতদ্দেশে মুসলমান প্রভাব বস্তুত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

(দ্রঃ ১৪ঃ ৬১৮ পৃঃ)

হযরত মুহাম্মদের (সাঃ) পরলোক গমনের মাত্র কয়েক বছর পর থেকেই আরবদের ভারত যাতায়াত শুরু হয়। অবশ্য প্রমাণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করি। মহারাজা মণীন্দ্র কলেজের প্রিন্সিপ্যাল শ্রী অনিল চন্দ্র খিত ইতিহাসে পাওয়া যায়— “ভারতবর্ষে মুসলমান আক্রমণ বহুদিন পূর্বেই আরম্ভ হয়েছিল। মুহাম্মদের মৃত্যুর আশি বৎসর যাইতে না যাইতেই আরবেরা ভারতের পশ্চিম সীমান্তে সিন্ধুদেশে অধিকার করে। সিন্ধু দেশ আরবদের অধিকারে আসিবার তিনশত বৎসর পরে গজনীর সুলতান মাহমুদ ভারতবর্ষ আক্রমণে করিয়া উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং পাঞ্জাব অধিকার করেন। তখনও সিন্ধুদেশ আরবদের অধীন ছিল, কিন্তু উত্তর ভারতে অন্যান্য প্রদেশ সমগ্র দক্ষিণ ভারতে হিন্দু রাজা স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন।”

(ভারত ও পৃথিবী, ৯১ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

সিন্ধু বিজয়ের আলোচনা করলেই মনে আসে হিন্দু রাজা শ্রী দাহির আর মুসলমান সুলতান মুহাম্মদ বিন কাসিমের কথা। কিন্তু মুহাম্মদ বিন কাসিমের অনেক পূর্বেই হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সময়ে হিজরী সনের ১৫ সালেই সিন্ধু অঞ্চল অভিযানের প্রয়োজন হয়েছিল। মুহাম্মদ বিন কাসিমের পূর্বে সিন্ধু অঞ্চলে অনেক আরবীয় তবলীগ জামাত বা অভিযাত্রীদল আগমন করেছিলেন। বিখ্যাত ইতিহাস ‘ফাতহুল বুলদান’ এর মূল্যবান তথ্যে জানা যায় যে, ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রাঃ) এর সময়ে ওসমান নামের এক বিজ্ঞ বীরকে ‘বাহরায়েনস’ ও ‘আম্মানের’ গভর্ণর নিযুক্ত করা হয়। ওসমান নিজের ভাইকে ‘বাহরায়েনে’ নিজের পদে বহাল রেখে আম্মান হইতে একটি সৈন্য বাহিনী ভারত সীমান্তে পাঠান। ওখান থেকে অভিযান সমাপ্তির পর তাঁর ভাই মুগীরাকে দেবল বা করাচীতে পাঠান। মুগীরা যদিও সাফল্য লাভ করেন তবুও করাচী অঞ্চলে তাঁকে বিপুল বাধার সম্মুখীন থেকে হয়েছিল।

এবার তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রাঃ) (যিনি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর জামাতা) আবদুল্লাহ ইবনে আমরকে ইরাকের শাসনকর্তা করে পাঠান এবং তদানীন্তন ভারতের পূর্ণ সংবাদ সংগ্রহের আদেশ দেন। হাকেম নামক জনৈক ব্যক্তিকে ভারতের সংবাদ প্রেরকের দায়িত্ব প্রাপ্ত পদে নিয়োগ করা হয়। তিনি যে বিবরণ দেন তার ভাবার্থ হচ্ছে যে, ভারতে আরব সৈন্য না যাওয়া উত্তম কারণ সেখানে তখন খাদ্য ও পানীয়ের অভাব ছিল। তাই হিজরী সন ৩৮ পর্যন্ত ভারতে অভিযান স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

এরপর চতুর্থ খলিফা হযরত আলীর (রাঃ) অনুমতিতে হারিস সিন্ধু সীমান্তে অভিযান করেন। ভারতে প্রবেশ ও প্রতিষ্ঠা লাভের বিরুদ্ধে ভারতের নেতাগণ প্রবল বাধা দান করেন কিন্তু সে বাধা দুর্দমনীয় আরব সেনাদের কাছে টেকেনি। তুমুল যুদ্ধ হয়। উভয় পক্ষের হতাহতও হয়েছিল অনেক। অবশেষে মুসলমানদেরই জয় হল। বহু মাল সম্পদ আরবদের হস্তাগত হয় এবং বহু ভারতীয় সৈন্য আরব সেনাদের হস্তে বন্দী হয়। বন্দীদের হত্যা না করে তাদের খাওয়া পরার এবং আরও অন্যান্য

দায়িত্বসহ একহাজার বন্দীকে আরব সৈন্যদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হয় অপর দিকে ‘কায়য়ান’ নামক স্থানে মুসলমান বাহিনী যখন আকস্মিক ভাবে আক্রান্ত হয়। সে সময়ে যুদ্ধের কোনও সন্ধান নাই দেখে মুসলমান সৈন্যরা গর্বে ভরে কাল ক্ষয় করছিল। তাই আক্রমণ ও আঘাতের বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ করার মত কোন প্রত্যাশাই আরবদের ছিলনা। তাই পাজিত থেকে হয়েছিল ভীষণ ভাবে! কিন্তু দুঃখের বিষয় যুদ্ধ শেষে সমস্ত মুসলমান বন্দীদের নিষ্ঠুর ভাবে নিহত থেকে হয়েছিল।

তার পর ৪৪ হিজরী সনে আমীর মোয়াবিয়ার (রাঃ) শাসনকালে মোহালাব ভারত সীমান্তে অভিযান করেন। তাঁর সাথে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ সংঘটিত হয় কিন্তু তাঁর অগ্রসর অগ্রসরের সঠিক সংবাদ ইতিহাসে পাওয়া যায় নাই বলে এখানে আন্দাজ অনুমানে গ্রন্থকে কলঙ্কিত করা অপ্ৰয়োজন মনে করি।

যাইহোক, মোহালাবের মৃত্যুর পর মোয়াবিয়া (রাঃ) আবদুল্লাহ ইবনে সওয়ারকে ভারতের দিকে পাঠালেন। তিনি কয়েকটি যুদ্ধে জয়লাভ করে বেশ কিছু মালপত্র উপাট্টিকন নিয়ে আমীরের কাছে ফিরে গেলেন। পরে ডাকাত কর্তৃক তিনি শহীদ হয়েছিলেন।

তারপর রাশেদ একবার ভারতের দিকে ধাবিত হয়েছিলেন। অবশেষে ‘ময়দ দেবল’ নামক স্থানের যুদ্ধে তিনি নিহত হন, কিন্তু তাঁর স্থানে সেনান এঙ্গে পুনরায় এ অঞ্চলে যুদ্ধের ডাক দেন। যুদ্ধে জয়ী হয়ে তিনি ওখানেই দুই বছর কাল অবস্থান করেন।

তারপর জিয়াদের পুত্র ভারত আক্রমণ করে বীরত্বের পরিচয় দেন। এরপর মুগীর ইবনে জরুদ আকদীও ভারত সীমান্তে যুদ্ধ পরিচালনা করে বিজয় মাণ্ডে কুণিত হন। বিজয়ী ও বীরত্ব এই জন্যই বলছি যে তখনও এক রাজ্য থেকে অপর রাজ্য আক্রমণ করা বীরত্ব বলেই ববেচিত হত। শুধু তাই নয় বরং কোন রাজা কোন রাজাকে আক্রমণ না করলে অথবা কারোর আক্রমণ প্রতিহত করতে না পারলে তাঁকে কাপুরুষতার কলঙ্ক বহিতেই হত। তাই সেকালের নীতির উপর এ যুগের নীতিকে কেন্দ্র করে মন্তব্য করার সময় সাবধানতা অবলম্বন করা একান্তই প্রয়োজন।

বিখ্যাত মুসলিম ঐতিহাসিক বালাজুরীর বর্ণনায় জানা যায়, ইউসুফ ছকফরি পুত্র হাজ্জাজ ইরাকের শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন। হাজ্জাজ সিন্ধু অভিযানের জন্য হারুণের পুত্র মুহাম্মদ, উবায়দুল্লাহ ও বোদায়ালক পর পর সিন্ধু অভিযাত্রী হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন। প্রত্যেকেই বিক্ষিপ্ত ভাবে ও অপূর্ণ ভাবে বিজয়ী হলেও সামগ্রিক না ব্যাপক বিজয়ের দিকে তাঁরা মনোনিবেশ করেননি।

আরবের উমাইয়া বংশের খলিফা আল ওয়ালিদের সিংহাসনে উপবেশন করার পরেই তাঁর বিখ্যাত সেনাপতি মুসার বীরত্ব ও সাধনার ফলস্বরূপ আল্লাহর উপর নির্ভর করে আফ্রিকাসহ অন্যান্য দেশের দিকে ধাবিত হলেন। রাখে সাধনায় সঞ্চিত শক্তি নিয়ে দিনের বেলায় বীরবিক্রমে আক্রমণের ফলে সমগ্র আফ্রিকা দখল করে নিলেন, অর্থাৎ ইসলামের মানবতা, উদাতা ও শক্তি সাহসের সাথে আফ্রিকাবাসীগণ পরিচিত হয়ে ধন্য হল।

এবার বীর মুসা হঠাৎ দিনের বেলায় 'সালাতুল হাজাত' নামে একপ্রকার নামায সম্পন্ন করে আল্লাহর দবারে হাত তুলে কেঁদে বলেন, "ওগো প্রতিপালক! ওগো পরিচালক তুমি আমার উপর সঙ্গীদেরকে সাহসী ও বলশালী কর এবং তাঁদের দ্বারা ইসলামকে সারা বিশ্বে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা কর।" তারপর তাঁর সৈন্যদের মধ্যে সেরা সৈনিক 'তাকি'কে আলিঙ্গন করে দোয়া করে স্পেনের দিকে পাঠালেন। অনায়াসেই স্পেন দেশ তারিকের অধীনে এসে গেল। শত্রু মিত্র সকলেরই মুখে একই কথা 'মুহাম্মদ (সাঃ) এর দাবী সত্যই সঠিক।'

তারপরে 'কুতাইবা' রাত্রির অন্ধকারে ইবাদাদান্তে আর দিনে 'সিয়াম' সাধনা অর্থাৎ আল্লাহর উদ্দেশ্যে উপবাস অবস্থায় অভিযান শুরু করলেন প্রাচ্য ভূমির উপর। কুতাইবা দিনের বেলায় উপবাস থেকেও যুদ্ধ চালিয়ে যেতেন কিন্তু সৈন্যদের বলতেন "আল্লাহ নামের কৃতজ্ঞতা কর আর খানাপিনা কর। ইসলাম ধর্মে যদিও বেশী খাওয়া, বেশী শোওয়া, বেশী কথা বলা ভাল নয়, কিন্তু প্রিয় নবীর আইনের অনুকূলেই আমি তোমাদেরকে বেশী বেশী করে খেতে বলছি। কারণ যোদ্ধাদের জন্যই এ আইনটির পরিবর্তন আছে।"

যাই হোক, অল্প কিছু দিনের মধ্যে বিশাল এশিয়া মহাদেশের মধ্য পর্যন্ত আসিয়া ইসলামের আলো জ্বলে উঠল। নতুন সভ্যতা, শিক্ষা ও ভাবধারার সংগে পরিচিত হল। এশিয়া মহাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল সে বিখ্যাত কুতাইবার কত কামনা ও গবেষণার শেষে ডাঃ ঈশ্বরী প্রসাদ তাঁর ইতিহাসে লিখেছেন—

The earliest Muslim invaders of Hindustan were not the Turks but the Arabs, who issued out from their desert homes after the death of the great Prophec to spread their doctrine throughout the world which was, according to them. "The key of heaven and hell" Whenever they Went, there intrepidity and vigour roused to the highest pitch by their proud feeling of a common nationality and their zeal for athe faith enabled the Arabs to make themselves msters of Syri? Palestine, Egypt, Persia within the short space of twenty years. The conquest of Persia made them think of their expansion eastword and when they learnt of the fabulous wealth and idolatry of Inkia from the merchants who Sailed from Sharza and Hurmuz and landed on the Indian coast. They dis counted the difficulties and obstacles which nature placed in their way, and determined to lead and expedition to India which at once received the sanction of religious enthusiasm and political ambition. The first

recorde expedition was sent from Uman to pillage the cost o India in the year 636-37 A. D. during the Khilafat of Umar.

হিন্দুস্থানের প্রথম মুসলমান বিজয়ীগণ তুর্কী ছিলেন না; বরং তাঁরা ছিলেন আরব জাতি। মহান নবীর পরলোক গমনের ঠিক পরেই এ আরব জাতি ইসলামের মতবাদের প্রচার ও প্রসারকল্পে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েন। তাবলীগ বা ধর্ম প্রচারের মধ্যেই ইসলাম পরকালের ভাল মন্দ এ ছিল তাঁদের বিশ্বাস। এ আরবগণ যেখানেই গেছেন বিক্রমপূর্ণ দুর্জয় সাহসের পরিচয় দিয়েছেন সেখানেই এবং জাতীয়তাবাদের গৌরবোজ্বল প্রেরণাকে কেন্দ্র করে এ ভাবে সত্যের অনুসন্ধানপ্রাপ্ত আরবগণ মাত্র বিশ বছরের মধ্যে সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, মিশর ও ইরানের অধিকারী থেকে পেরেছিলেন। পারস্য বা ইরান বিজয়ের পর আরবগণ তাঁদের এ বিজয়কে পূর্ব দিকে আরও সম্প্রসারিত করতে প্রয়াস পান। সিরাজ ও হরমুজের ব্যবসাদারগণ তখন ব্যবসায়ী কার্যোপলক্ষে ভারতের উপকূলবর্তী অঞ্চলে গমনাগমন করতেন। আরবগণ তাঁদের মুখ থেকেই ভারতের ধর্মনৈতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংবাদ পেয়েই ভারত অভিযানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এবং প্রথমে ৬৩৬-৩৭ খৃষ্টাব্দে উমারের (রাঃ) খিলাফত কালে 'ওমান' থেকে ভারতে প্রথম অভিযান করেছিল।

আরবী ৪০ হিজরীতে মুসলিম ধর্ম প্রচারকগণ (তাবলীগ জামাত) ভারতবর্ষে পৌঁছেন। তাছাড়া ভারতের পশ্চিম উপকূলে বনি উমাইয়াদের আমলে খলিফা ওম্মালীদের সময় ৭০৫ খৃষ্টাব্দে মোহাম্মদ বিন কাসিম কর্তৃক সিন্ধু বিজয় হয় এবং সেটা খোরাসান প্রদেশের অংশ রূপে একটি গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত এলাকায় পরিণত হয়।

যাঁরা ভারতে এসেছিলেন তাঁরা বেশীর ভাগ 'তাবেয়ীন' বা 'তাবেতাবেয়ীন'। অর্থাৎ তাঁরা হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর শিষ্য বা প্রশিস্যের সঙ্গ লাভের সুযোগ পেয়েছিলেন। হযরতের বাণী শুধু প্রচারে নয় তার প্রসারে এবং নিজেদের ভারতের অধিবাসী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে তাঁরা এখানে স্থায়ী বসবাসও করেছিলেন।

প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দী খুব ভালভাবেই কেটেছিল, তৃতীয় শতাব্দীতে মুসলমান নামধারী 'বাতেনী' দলের প্রভাবে মুসলিম জাতি মুসলিম জগতের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

পঞ্চম শতাব্দীতে সুলতান মাহমুদ গজনবী খাইবার গিরিপথ দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন পাঞ্জাব ও সিন্ধু দখল করেন। ফলে ভারতের সাথে পুনর্বীর মুসলিম জাতির যোগাযোগ স্থাপিত হয়।

তারপর সপ্ত শতাব্দীতে ভারতের প্রায় সকল অংশই মুসলমানদের দখলে আসে। তাঁরাই সর্ব প্রথম দিল্লীকে ভারতের রাজধানী নির্বাচিত করেন। এ সময় এশিয়ার অন্তর্গত খোরাসান, তুরস্ক প্রভৃতি স্থান থেকে বহু সৈনিক ব্যবসায়ী, আলেম ও বুজুর্গ স্থায়ীভাবে বাস করতে থাকেন। আলেমদের সিদ্ধান্ত ও পরামর্শে বাদশাহদের রাজনীতি, সৈন্যদের বিশ্রাম, পীর বুজুর্গদের ইবাদত, সাধনা, চরিত্রবল ও আদর্শ

স্থাপনা সব একত্রিত হয়ে ইসলাম ধর্ম সারা ভারত তথা এশিয়া তথা বিশ্বে ক্ষিপ্ৰ গতিতে ছড়িয়ে পড়ে। দেহের এক অঙ্গের সাথে অন্য অঙ্গে যেরূপ নিরবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক, ঠিক তেমনি উপরোক্ত আগতদের বেলাতেও অনুরূপ এক নিগূঢ় সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল।

সত্যের অপ-প্রচার

আমরা শুধুমাত্র সমালোচক পুস্তক প্রণয়নেই এ গ্রন্থ সংকলনে অগ্রসর হইনি বরং চাপা পড়া সব ইতিহাসকে মানুষের সামনে তুলে ধরতে এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। তবুও সত্য রক্ষার খাতিরে কিছু সমালোচনা না করলে ছাত্র-ছাত্রীদের সমালোচনা যোগ্য শক্তি ও উৎসাহ আসবে না। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও এ প্রচেষ্টা।

শ্রী বিনয় ঘোষ লিখেছেন, “খলিফাধীন পারস্য সাম্রাজ্যের শাসক হাজ্জাজ মনে প্রাণে সাম্রাজ্যলোভী ছিলেন এবং কাশগড়ে চীনাগের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হন। অতপর কাবুল ও সিন্ধুদেশ অভিযান আরম্ভ হয়।

সিংহলের রাজা কিছু মূল্যবান উপটৌকন নাকি খলিফা ও হাজ্জাজের সন্তুষ্টির জন্য পাঠাইয়াছিলেন কিন্তু তাহা পথে সিন্ধুর দেবল অঞ্চলের জলদস্যুরা লুট করিয়াছিল, অতএব দেবলের দস্যুদের শায়েস্তা করা দরকার এই ছিল হাজ্জাজের সিন্ধু অভিযানের অজুহাত।”

(দ্রষ্টব্য ভারত জনের ইতিহাস)

বলাবাহুল্য, শ্রী ঘোষের লেখায় আর শ্রী বজায় থাকছে না বরং বিশী বস্তুর দুর্গন্ধে নিরপেক্ষ পাঠক-পাঠিকাদের কাছে সাম্প্রদায়িকতার নির্দশন রূপে গণ্য হবেনা, একথা শপথ করে সকলে বলবে বলে মনে হয়না। অবশ্য অনেকের মতে, শ্রী ঘোষকে আসলে দোষ দেয়া যায় না। কারণ স্বামী স্ত্রীর যুগ্ম প্রতিভাতে যে ইতিহাস তাঁরা লিখেছেন তা ইংরেজী ইতিহাস আর আমাদের দেশের হাটে পাওয়া সহজ ইতিহাসকেই অবলম্বন করে। কিন্তু আগেই বলেছি প্রকৃত ঐতিহাসিক থেকে হলে আরবী, ফারসী প্রভৃতি বিদেশী ভাষা না জানলে মূল ইতিহাস বোঝা বা বুঝে উদ্ধার করা সম্ভব নয়। হয়ত শ্রী এবং শ্রীমতী ঘোষের পক্ষে ওকালতি করে কেহ বলতে পারেন—তাঁরা যে আরবী ফারসী জনতেন না তারই বা প্রমাণ কি? প্রমাণ তাঁদের লেখা এ ইতিহাসের ২৭৯ পৃষ্ঠায় মৌজুদ আছে। তাঁরা ‘মুহাম্মদ বিন কাসেম’ এর নামের পরিবর্তে বারবার ব্যবহার করেছেন শুধু ‘কাসিম’। কোন পাঠক হয়ত বলবেন যে এত বড় নামের পরিবর্তে শুধু মাত্র ‘কাসিম’ ব্যবহার করে একটু সংক্ষেপ করা হয়েছে তাতে ক্ষতি কি? ক্ষতি হচ্ছে এটাই যে, আযোধ্যার ইতিহাস লিখতে গিয়ে রাম চন্দ্রের স্থানে দশরথচন্দ্র লিখলে যা হয় তাই। শ্রী ঘোষকে শ্রদ্ধার সাথে দেশের ছাত্র সমাজ যদি প্রশ্ন করেন—সিন্ধু বিজয়ে ভারতে প্রথমে কোন মুসলমান এসেছিলেন? উত্তরে প্রথম ভুল হয়ত হবে এটাই যে যারা এ ইতিহাসের পাতায় সিন্ধু অভিযানের জন্য অমর হয়ে আছেন তাঁদের নামোল্লেখ না করেই বলবেন—‘কাসিম’। কিন্তু প্রশ্নকর্তা ও উত্তরদাতা নির্বিশেষে প্রত্যেক ইতিহাস অনুরাগীকেই জেনে রাখা

আবশ্যক যে, সিন্ধু বিজয়ী মুসলমান ব্রাহ্মণ রাজা দাহিরের প্রতিদ্বন্দ্বীর বাবার নাম ‘কাসিম’। তাঁর নিজের নাম ‘মহাম্মদ’। মুহাম্মদ বিন কাসিমের অর্থ হল—মুহাম্মদ কাসিমের পুত্র। অর্থাৎ কাসিমের পুত্র মুহাম্মদ। এখন যদি নামের সংক্ষেপ করতে হয় তাহলে মুহাম্মদ লেখা উচিত ছিল। ‘বিন’ বা ‘ইবন’ মানে ছেলে। আরবদের নিয়মযোগ্য পিতার নামে নিজের নাম যুক্ত করা।

বিখ্যাত ইতিহাস “আববোঁ কী জাহারগী”, “ফাতহুল বুলদান” প্রভৃতি আরও বহু আরবী, ফারসী ও উর্দু এবং ইংরেজী ও বাংলা ইতিহাস সামনে রেখে আসল তথ্য আমরা তুলে ধরছি নিরপেক্ষ অনুসারে সিন্ধুদের জন্য। হাজ্জাজের সিন্ধু অভিযানের অনেক কারণ ছিল।

প্রথমত, হাজ্জাজ ইরান বা পারস্যের যুদ্ধে প্রাণপণে যখন সৈন্যদের নিয়ে লড়াইলেন তখন ভারত থেকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিশেষ ভাবে সাহায্য করা হয় ফলে মুসলমানদের মনে একটা গভীর পাচা দুঃখ বা জ্বালা এবং প্রতিশোধ প্রবণতা জাগ্রত ছিল। আজ বিংশ শতাব্দীতেও কোন যুদ্ধের সময় অপর রাষ্ট্র শত্রুকে সাহায্য করলে সে রাষ্ট্রের সাথে তৎক্ষণিক কূটনৈতিক সম্পর্কে ছেদ করা হয়।

দ্বিতীয়ত, হাজ্জাজের শাসনকালে পারস্য থেকে একটি বিদ্রোহী দল ভারতে আসে এবং তদানীন্তন ব্রাহ্মণ রাজা দাহির তাঁদেরকে সাহায্য ও আশ্রয় দিয়েছিলেন। অবশ্য পিছনে রাজনৈতিক কারণও ছিল।

তৃতীয়ত, আরবের কিছু সাধক পুরুষ ও মহিলা এবং অনেক সাধারণ নরনারী সমেত কয়েটি আরবীয় জাহাজ সিন্ধু অঞ্চলে লুট হয়ে যায় এবং পুরুষ নারী নির্বিশেষে সকলকে পাইকারী হারে হত্যা করা হয়। তখন হাজ্জাজ সিন্ধুরাজ দাহিরের কাছে দস্যুদের শাস্তি দিতে এবং ক্ষতিপূরণ করার জন্য দাবী করলেন। দাহির জানিয়ে দিলেন ক্ষতিপূরণ দেয়া তার পক্ষে সম্ভব নয় আর দস্যুদের শায়েস্তা করার দায়িত্বও তিনি নিতে বাধ্য নন।

এবার ক্রোধের বশবর্তী হয়ে হাজ্জাজ একদল সৈন্যসহ একজন বিচক্ষণ সেনাপতিকে পাঠালেন সিন্ধু অঞ্চলে। এযুদ্ধ আরব সভ্যতা, শিক্ষা ও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর বাণী প্রচারের জন্য করা হয়েছি বলা যাবেনা, বরং ক্রোধের উপর নির্ভর করেই ছিল এ অভিযান। যুদ্ধ হল সিন্ধুবাসীদের সাথে মুসলমানদের। প্রাথমিক অবস্থায় সিন্ধুরা পরাজয়ের দিকে যাচ্ছিল, ইঠাৎ তাদের ধর্মের বিধানদাতাদের পরামর্শে বেদমূর্তি যুদ্ধ ক্ষেত্রে বহন করে নিয়ে যাওয়া হলে যুদ্ধে কিন্তু মুসলমানদের ভাগ্য দারুণ পরাজয় নেমে এল। যুদ্ধ শেষে বিরাট সৈন্য বাহিনীর এমনকি সেনাপতিকে পর্যন্ত প্রত্যেক মুসলমানকে ঠাকুরের সম্মুখে নির্মম ভাবে টুকরা টুকরা করার সৌভাগ্য কোন মুসলমান সেনার হয়ে উঠেনি।

শ্রী বিনয় ঘোষও তাঁর ইতিহাসের ২৭৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, “কিন্তু এ অভিযান ব্যর্থ হয়। সিন্ধীদের প্রবল প্রতিরোধে আরব সেনাপতি পর্যন্ত নিহত হন।”

অতপর হাজ্জাজ তাঁর আর এক অল্প বয়স্ক সুদর্শন বীরকে সেনাপতি নির্বাচিত করে পুনরায় সিন্ধু অভিমুখে মুসলমান বাহিনী পাঠালেন। তিনিই ইতিহাসে মুহাম্মদ বিন কাসিম নামে পরিচিত। এ তরুণ সেনাপতি হাজ্জাজের আপন জন, পিতৃব্য পুত্র। শুধু তাই নয় আরও গভীর সম্পর্কে এ যুবক তাঁরই জামাতা।

‘সালাতুল হাজত’ (প্রয়োজনের নামায) নামক শেষে উলামা ও আওলিয়াদের পরামর্শ ও শুভাশীষ নিয়ে মুহাম্মদ বিন কাসিম এবার ধর্মনৈতিক কারণেই অভিযান চালালেন। মুহাম্মদ বিন কাসিম জলপথে এবং স্থলপথে উভয় দিক থেকে সে সময়ের বিখ্যাত কেন্দ্র দেবল মন্দির আক্রমণ করলেন। সিন্ধীরা ব্রাহ্মণ রাজা দাহিরের আদেশে প্রবল বাধা দেয়ার জন্য বীর বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। আবার পূর্ব সমরের ন্যায় জনসাধারণ ঠাকুরদের নামে জয়ধ্বনি দিতে লাগলেন। কিন্তু এবার নিমেষে দাহিরের সৈন্যরা মনোবল হারিয়ে ফেললেন। মুসলমান সৈন্যরা ‘আল্লাহু আকবার’ (আল্লাহই মহানতম) বলে চীৎকার করতে লাগলেন। যুদ্ধ পুরোদমে চলতে লাগল। রাজা দাহির হাতীর উপর উপবিষ্ট হয়ে যুদ্ধ করছিলেন এমন সময় বিপক্ষ বাহিনীর একটা তীর রাজার হাতীর পিঠে হাওদায় পড়ে হুহু করে আগুন জ্বলে উঠে। হাতী প্রাণের ভয় ও আতঙ্কে জলাশয়ে নেমে পড়ে। দাহির মাটিতে দাঁড়িয়েই যুদ্ধ করতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর সৈন্যদল আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। একটা কথা যা লেলীহান শিখা নিয়ে জ্বলে উঠে। শ্রী বিনয় ঘোষ ও তাঁর ইতিহাসে এ বিষয়ে একটু আলোকপাত করেছেন। যেমন তিনি লিখেছেন, “দাহিরের হাতীর হাওদায় আরবদের একটি অগ্নিতীর বিধিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠে, হাতী দৌড়াইয়া জলের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়ে।”

(ভারত জনের ইতিহাস)

অনেকের মত, অলৌকিক ঘটনা বা দৈব ঘটনা ওটা যাই হোক দাহির যুদ্ধে বাধা দিতে গিয়ে নিহত হলেন। দাহিরের স্ত্রী সৈন্যদের সাহস যোগাতে এবং পুনঃ একতাবদ্ধ হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উৎসাহিত করেন। কিন্তু রাণীর কথায় কোন লাভ হয়নি। অবশেষে রাণী ও তাঁর সঙ্গিনীগণ বিপদগ্রস্ত হবার পূর্বেই আগুনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করলেন।

৭১২ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে ব্রাহ্মণ রাজা দাহির সাহসের সাথে যুদ্ধ করেও নিহত হলেন। তারপর এক বছরের মধ্যেই দাহিরের গোটা সাম্রাজ্য মুহাম্মদ বিন কাসিমের দ্বারা মুসলমানদের অধিকারে আসে।

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ৬৩২ সালে পরলোক গমন করেন। আর কাসিমের পুত্র মুহাম্মদ ৭১২ খৃষ্টাব্দে এই ঐতিহাসিক যুদ্ধে ইসলামের বিজয় কেতন ভারত ভূমিতে উদ্ভীন করেন। তাঁরা ইচ্ছা করলে হয়ত ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল করতলগত করতে পারতেন। কিন্তু অনেকের কাছে এ যুদ্ধ খুব গুরুত্বপূর্ণ হলেও আরবদের কাছে সেটা সাধারণ একটা যুদ্ধ ছিল মাত্র। কারণ পৃথিবীর প্রত্যেক দিকেই তাঁদের অভিযান আরও নাটকীয় ও আশ্চর্যজনক ঘটনা যা মারাত্মক প্রতিকূল অবস্থাতেও নিশ্চিত পরাজয় থেকে গিয়ে মুহূর্তের মধ্যে তা জয়ে পরিণত হয়েছিল।

এখানে উল্লেখযোগ্য ঘটনা এটাই যে, ব্রাহ্মণদের ধর্মীয় সংকীর্ণতা তথা পক্ষপাতিত্ব ও অবিচারের ফলে ভারতের ‘জাঠ’ সম্প্রদায় এবং ‘মেড’ সম্প্রদায় রাজার উপর অসন্তুষ্টই ছিল; তদুপরি তথাকথিত নীচ জাতি বা শোষিত অবহেলিত, অনুন্নত সম্প্রদায় এমনকি হিন্দু ছাড়া ভারতীয় প্রায় প্রত্যেক সম্প্রদায় রাজাদের উপর ভাল ধারণা পোষণ করত না। যুদ্ধের সময় তাদের সহযোগীতা স্বাভাবিকভাবে পাওয়া যায় নাই। তবে ‘জাঠ’ ও ‘মেড’ সম্প্রদায় অত্যন্ত সাহসী ও বলিষ্ঠ জাতি। তারা মুসলমানদের পক্ষ প্রকাশ্য ভাবে সমর্থন করে দাহিরের বিরুদ্ধে; প্রত্যেকভাবে সাহায্য করে। দাহিরের শোচনীয় পরাজয়ের এটিও একটি কারণ।

মুহাম্মদ বিন কাসিমের মন্দির আক্রমণের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন যে, মুহাম্মদ বিন কাসিম মন্দির আক্রমণ করতে গেলেন কেন? কারণ মুহাম্মদ বিন কাসিমের পূর্বে ভারত অভিযানকারী পরাজিত মুসলমানগণ নির্মূল হয়েছিলেন। তাতে জনসাধারণের তো ধারণা হয়েছিল যে, দেবল মন্দিরের ঠাকুরের দ্বারা এই জয় সম্ভব হয়েছে। তার উপর নতুন মুসলমান যারা হয়েছিলেন তাঁদেরও ধর্ম বিশ্বাস শিথিল হয়ে গিয়েছিল। তাই মানব জাতিকে সৃষ্টির কাছে মাথা নত না করিয়ে বা ঠাকুর দেবতার কাছে যথা সর্বস্ব বলিয়ে না দিয়ে স্রষ্টার কাছে মাথা নত হবার প্রেরণা যোগানোর জন্যই এ মন্দিরের সম্মুখে যুদ্ধ আয়োজনের প্রয়োজন হয়েছিল।

ব্রাহ্মণদের দেবতা ঠাকুরের উপর অনুগত্য স্বাভাবিক ভাবেই ছিল। তার উপর গত যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয়ের কারণে তাঁরা স্বাভাবিক ভাবেই এ মন্দিরে ঠাকুর দেবতার উপর আরও নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলেন। তাই রাজার মূল্যবান ধনাগার স্থানান্তরিত করা হয়েছিল এ মন্দিরে। ফলে যুদ্ধ শেষে বহু মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী মুসলমানদের হাতে অতি সহজেই এসে গিয়েছিল।

মুসলমান ধর্মে বহু হিন্দু আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন দেবতার পূজা নিষ্ফল মনে করার কারণে। অতএব মুহাম্মদ বিন কাসিম যদি এ মন্দিরের প্রাঙ্গণে তথা পক্ষান্তরে দেব শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে বিজয়ী না থেকে তাহলে এ সব নব মুসলিমদের ধর্মান্তরিত হওয়া ব্যর্থ বলে প্রমাণিত হত।

আগেই বলা হয়েছে ব্রাহ্মণ রাজা দাহিরের মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী ও অন্যান্য মহিলারা মৃত্যু বরণ করেন। এ ঘটনাও সত্য। তাই বলে বিকৃত ব্যাখ্যা করে মুসলমানদের চারিত্রিক দুর্বলতার কারণ বলে বর্ণনা করা নিঃসন্দেহে তা পক্ষপাতিত্ব দোষে দুষ্টামি ও নষ্টামি। আসল কারণ হচ্ছে, হিন্দু ধর্মের বিধান মতে সম্ভ্রান্ত হিন্দু মহিলাদের আগুনে পুড়ে মৃত্যু বরণ করাটা খুবই মহৎ কাজ বলে বিবেচিত হত। যেমন সতীদাহ প্রথার প্রাবল্যে স্বামীর মৃত্যুর পর জ্বলন্ত চিতায় ঝাঁপ দেয়া। এক্ষেত্রে স্বামীর মৃত্যুর পর সম্ভ্রান্ত, শ্বশুর, দেবর ও ভাসুরদের চারিত্রিক দুর্বলতার কারণে তাদের পুড়ে মরতে হতনা। আসলে দুর্বলা নারীদের চারিত্রিক দুর্বলতা ও দুশ্চিন্তার উপর ধর্মীয় সংবিধানের পরিপ্রেক্ষিতে স্বর্গের কথা মনে করেই নিজেদের আত্মহত্যা করা ছিল বীরাজনার পরিচয়। আর তাই দেখে দুর্বল মুহূর্ত মৃত্যু বরণের হিড়িক পড়ে যেত। অবশ্য এ প্রথা যে একটা অসভ্যতা বর্বরতা ও কাপুরুষতা ছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

যাই হোক, মুহাম্মদ কিন কাসিম যুদ্ধান্তে কিছু দিন নিজের মুখ্য পদগুলোতে নিজেদের নিয়োজিত লোককে বহাল করেছিলেন। কিন্তু কিছু দিনের পর দাহিরের সময়ে যে হিন্দু কর্মচারী যে পথ নিয়ে থাকত তাকে সে পদে পূর্ণবহাল করে চরম উদারতার পরিচয় দিয়েছিলেন এবং উল্লেখযোগ্য ঘটনা এটাই যে, ব্রাহ্মণদের উপর রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব দেয়া হইয়াছিল।”

এখানে মনে রাখার কথা হচ্ছে এটাই যে, এ সময় ভারতে কুরআন শরীফ ও হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর বাণী বা হাদীস হিন্দুদের মধ্যে বিশেষ ভাবে পরিচিত, পঠিত ও সমাদৃত হয়। সে সময় মুসলমান রাজার প্রবল আগ্রহে ভারতের পুরাতন পুঁথিপত্র এবং ধর্ম গ্রন্থাদি অনুবাদের দ্বারোদঘাটনও সম্ভব হয়। শুধু তাই নয় হিন্দু ধর্মের পুস্তক পত্র আরবেও নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁদের ধারণা ছিল যে দেশে থাকতে হবে সে দেশের পরিবেশ, ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে না জানতে পারলে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা। তাই অত্যন্ত অধ্যবসায়ী আরবেরা ভারতীয় প্রাচীন ভাষা শিক্ষা লাভের জন্য বেনারসে এসেছিলেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক আমীর খসরু লিখিত ইতিহাসে রয়েছে—‘আবু মুসা’ দশ বছর ধরে হিন্দু ধর্মশাস্ত্র পড়ার জন্য পরিশ্রম করেছিলেন।

আরও আসুন, শ্রীঘোষ তাঁর ইতিহাসের ২৭৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, “দাহিরের দুই কন্যাকে বন্দী করিয়া কাসিম খলিফার হারেমের জন্য পাঠাইয়া ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা খলিফার কাছে অভিযোগ করেন যে কাসিম তাহাদের ইজ্জত নষ্ট করিয়া খলিফার কাছে পাঠাইয়াছেন। ইহাতে খলিফা ক্রুদ্ধ হইয়া হুকুম দেন যেন কাঁচা গোচর্মে আপাদ মস্তক মুড়িয়া সেলাই করিয়া কাসিমকে তাঁহার কাছে অবিলম্বে পাঠান হয়। খলিফার আদেশ আল্লাহর আদেশের মত, কাজেই কাসিম নিজেই ঐ ভাবে মৃত্যু বরণ করেন। এই কাহিনীর সবটুকু হয়ত ঐতিহাসিক হত্যা নয়। কিন্তু কাসিমের জীবনের করুণ পরিণতির কথা অনেকেই স্বীকার করেন।”

শ্রী ঘোষ ভারতের সুশীল ছাত্র-ছাত্রীদের মাথায় একটা কিংবদন্তীর ছাপ কেমন ভাবে একে দেয়ার চেষ্টা করেছেন তা লক্ষ্য করার বিষয়। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন কাহিনীটির সবটুকু ঐতিহাসিক সত্য নয়, অথচ সন্দেহজনক ও সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধিকর এ মারাত্মক কথা ইতিহাস বলে চালিয়ে যাবার পিছনে লাভ কতটুকু তা দেখা দরকার।

এর উত্তরে স্বরণ করা যেতে পারে যে, ইতিহাসের দিকে তাকালেই দেখা যায় অনেক জাতির মধ্যে রাজারাণীদের বিপদের সময় আত্মহত্যা করার ঘটনা আছে। কিন্তু একমাত্র মুসলমান রাজত্বে আত্মহত্যার ইতিহাস দেখতে পাওয়া যায়না। কারণ ইসলাম ধর্মে আত্মহত্যা তার পক্ষে পরকালে বেহেশতে যাওয়া সহজে সম্ভব নয়। তাই মুসলমান জাতি এ কাপুরুষতা থেকে মুক্ত। অবশ্য ইদানিং ভারতে সাধারণ মুসলমান দু একজন আত্মহত্যা করলেও প্রথমতঃ তারা ধর্মের তত ধার ধারেনা। দ্বিতীয়ত তারা প্রতিবেশীর প্রভাবেই প্রভাবিত। কিন্তু এ সময় মুহাম্মদ বিন কাসিমের পক্ষে আত্মহত্যা করা কোন মতেই সম্ভব ছিলনা।

এছাড়া আরও এক কারণে এরূপ ঘটনা মিথ্যা বলে বিবেচিত হচ্ছে। সেটা হচ্ছে যে, ইসলাম ধর্মের সংবিধানে আসামী, বাদী ও সাক্ষী ছাড়া অপর কারো মুখ থেকে কিছু শুনে (সত্য মিথ্যা যাই হোক) আসামীর বক্তব্যকে ব্যক্ত করতে না দিয়ে দূর থেকে আদেশ বা নির্দেশ পাঠিয়ে কোন কিছু নির্ধারণ করা সম্পূর্ণ নীতি বহির্ভূত। অতএব যদি এ ঘটনা সত্যই হত তাহলে মুহাম্মদ বিন কাসিমকে জানান হত এবং তার কি অভিযোগ তা জানিয়ে সে পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর বক্তব্য শোনার পর সুবিচার অবিচার যাইহোক থেকে পারত। কিন্তু তাঁকে জীবন্ত আসতেই দেয়া হলনা বরং কাটা গোচর্মে মুড়িয়ে তাঁর মৃতদেহ আনানো হল—এটা সবই অবিশ্বাস্য ও ভ্রান্ত। আবার যদি শূকরের চামড়া মুড়িয়ে আনার নির্দেশ থাকত তবে খলিফার ক্রুদ্ধ হবার প্রমাণ হত। কিন্তু মিথ্যা ইতিহাসে অর্থাৎ ইংরেজ ও তাদের দালাল দ্বারা লিখিত ইতিহাসে গরুর চামড়ার কথা বলা হয়েছে। অথচ গরুর চামড়া মুসলমানদের কাছে অপবিত্র নয় যেমন অপবিত্র নয় খাসি বা হরিণের চামড়া ঠিক তেমনিই।

আসল কথা মুহাম্মদ কাসিম স্বাভাবিক ভাবে মারা গিয়েছিলেন। তাঁর ন্যায় বিখ্যাত বীরের মৃতদেহ রাজকীয় মর্যাদার সাথে উপযুক্ত স্থানে কবর দেয়ার জন্যই ম্যামি করার মত চামড়া সদৃশ মূল্যবান সাদা মখমল কাপড়ে মুড়া অবস্থায় কাঠের বাগ্রে করে পৌঁছেছিল।

শ্রীঘোষ আরও লিখেছেন, “নারীর মর্যাদা কলঙ্কিত হইতে পারে এই আশঙ্কাই তিনি (রাণী) এবং দুর্গের ভিতরে অন্যান্য মহিলারা অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া জীবন বিসর্জন দেন।” এখন আলোচনায় আসা যাক। যদি এটা সত্য হয় তাহলে দাহিরের সুন্দরী কন্যাদ্বয় মৃত্যুর পরে কি আবার বেঁচে উঠেছিল? নতুবা তাঁরা তো অগ্নিতে ঝাঁপ দেন নাই। তাহলে ইজ্জত নষ্ট হইতে পারে, এই আশঙ্কাই যদি সত্য হয় তবে তাঁদের বোঝা উচিত ছিল আমাদের যেখানে পাঠানো হবে সেখানেও এই কাজের পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে। অতএব বিধবা মা অপেক্ষা কুমারী কন্যাদের আগেই মৃত্যু বরণ করা উচিত ছিল। কিন্তু তা যখন হয়নি তখন নিঃসন্দেহে এহেন এক ঘৃণ্য ধারণার অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন হয়।

লেখক আরও লিখেছেন, “খলিফার আদেশ আল্লাহর আদেশের মত”। এটি মুসলমানদের মনে গভীর দুঃখ দিতে বাধ্য। কারণ আল্লাহর মত কোন কাউকে মনে করা বা বিশ্বাস করাকেই ইসলাম “শিরক্” (অংশীদারত্ব) বলে। আর এই “শিরক্” সমস্ত অপরাধের চেয়ে মারাত্মক আর তা মার্জনার অযোগ্য প্রায়। অতএব “খলিফার আদেশ আল্লাহর আদেশের মত” এ উক্তির মধ্য দিয়ে বিশ্বমুসলিমকে অমুসলিম দাব্যস্থ করার পশ্চাতে কোন মনোভাবের পরিচয় নিহিত আছে পাঠকবর্গই তা চিন্তা করবেন।

(শ্রী ঘোষ আরও জানিয়েছেন, “হিন্দুদের কাছ থেকে তাঁহারা রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থা শিক্ষা করিবেন।”)

যদি উপরোক্ত মত সত্য হত তবে ভারতবাসী অর্থাৎ আমরাই আরব জয়

করতাম, জয় করতাম আফ্রিকা, ইউরোপ, আমেরিকা। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তা সম্ভব হয়নি, বরং আমাদের ভারতের সাথে আরবের তুলনা করলে দেখা যাবে আরব সভ্যতাই সারা বিশ্বে প্রভাব সৃষ্টি করেছে ও ধর্মমত প্রচার করেছে। কি ইতিহাসে, কি বিজ্ঞানে, কি ভূগোলে, কি গণিতে, কি সংস্কৃতে, কি দর্শনে, কি চিকিৎসা বিজ্ঞানে, কি মানচিত্র অঙ্গনে, কি জ্যোতির্বিজ্ঞানে, কি রাষ্ট্র বিজ্ঞানে কি সমাজ বিজ্ঞানে মুসলমানরাই ছিল সারা বিশ্বে গুরু। আরব ভূমিই ছিল বিশ্বের জ্ঞান সাগরের উৎসকেন্দ্র। অতএব মুসলমানেরা হিন্দুদের কাছে জ্ঞান শিক্ষা করেছে একরূপ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। তাছাড়া নিজের ধর্ম ও সমাজ মানুষ তখনই ত্যাগ করে যখন সে বোঝে আমাদের আমার চাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে যা পাওয়া দরকার তা এর দেয়ার ক্ষমতা নেই। আর নূতন ধর্ম যখন গ্রহণ করে তখন এ কথাই বোঝে আমি যা পাইনি তা পাব এ পন্থায়। কিন্তু হিন্দু ধর্ম অপরকে নিজের মধ্যে টেনে নিতে পারেনি বরং অপর ধর্মকে ভারত থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। যেমন বৌদ্ধ ধর্ম অথবা নিজেরা মুসলমান ও খৃষ্টান প্রভৃতি ধর্ম ও সমাজে প্রবেশ করে তাদের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করেছে। এতএব বলা যায়, “তাহারা রাষ্ট্রশাসন শিক্ষা করিলেন” কথাটা কল্পনা প্রসূত।

ইংরেজী ইতিহাসের সব কিছু বর্জন করার বস্তু তাও যেমন আমাদের মত নয়, তেমনি একথাও বিশ্বাস্য যে সুযোগ বুঝে ইংরাজী ইতিহাসের উদ্ধৃতি দিয়ে মিথ্যা ইতিহাসের প্রচারে অপচেষ্টাও অনুচিত।

মুহাম্মদ বিন কাসিমের বিজয়কীর্তি যখন পৃথিবীর উপর সূর্যালোকের মত ছড়িয়ে গেল তখন তাঁর বয়স মাত্র ১৭ বছর। এত বড় বৃহৎ বৈশিষ্টময় বীরের বীরত্বকে ম্লান আর মিথ্যায় পরিণত করতে তাঁর মৃত্যু নিয়ে মিথ্যা কল্পলোকের গল্প আর কিংবদন্তীকে ইতিহাস বলে খাপ খাইয়ে দেশের উন্নতি নয় বরং অবনতির ইন্ধনের যোগান দেয়ার উৎকট প্রচেষ্টাকে আজকাল সুধী সমাজ বরদাস্ত করতে পারেন না কোন ক্রমেই। ইতিহাসকে যাঁরা উপন্যাস আর ছায়াছবি, নাট্যক্ষেত্রের ভিতর দিয়ে পাল্টাতে চান তাঁদের মনে রাখা উচিত যে ইতিহাস নিয়ে কলম ধরার অধিকার তাঁদের নেই। কারণ এ উলট-পালট বা পরিবর্তন ইতিহাসের ক্ষেত্রে দুর্গন্ধময় গলিত কুষ্ঠ। দস্তুর মত ঐতিহাসিক দলিল নিয়ে প্রমাণ করা যায় যে, মুহাম্মদ বিন কাসিমের মৃত্যু হয়েছিল রাজনৈতিক কারণে নয় বরং আকস্মিক ভাবেই।

অবশ্য তাঁর মৃত্যু সম্বন্ধে আধুনিক ঐতিহাসিকগণ আজও এক মত নন। কেহ কেহ মনে করেন মুহাম্মদ বিন কাসিম আততায়ীকর্তৃক নিহত। আবার কেহ খলিফার চক্রান্ত হত্যা বলে মনে করেন। মোটকথা অল্প বয়সে তাঁর আকস্মিক মৃত্যু হয় তাতে কারো সন্দেহ নেই। সন্দেহ শুধু এ পদ্মা দেবী আর সূর্য দেবীর কিচ্ছা কাহিনীতে। এ মিথ্যা ঘটনায় এও উল্লেখ আছে মুহাম্মদ বিন কাসিমের প্রাণদণ্ডের পর সুন্দরীদ্বয় খলিফার কাছে স্বীকার করেছিলেন যে, “মুহাম্মদ সাধু চরিত্রের লোক, আমাদের আত্মীয় স্বজনদের মৃত্যুর প্রতিশোধের জন্য আমরা তাঁর উপর মিথ্যা অভিযোগ করেছি।” তখন খলিফা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে দুই বোনকেই হত্যার আদেশ দিলেন।

ফলে তাঁদের উভয়কেই প্রাণদণ্ড দেয়া হয়েছিল। শ্রী ঘোষ তাঁর ইতিহাসে লিখেছেন, “দাহিরের দুই কন্যাকে বন্দী করিয়া কাসিম খলিফার হারেমের জন্য পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।” অর্থাৎ আপনা আপনিই অক্ষরে অক্ষরে ফুটে উঠছে, খলিফা ব্যভিচারী বা নারীভোগী ছিলেন, তাই কুমারী নারী পেলেই সেনাপতিরা খলিফার ভোগের জন্য পাঠাইয়া দিতেন। কিন্তু শিক্ষিত সমাজ আজ চিন্তা করতে শিখেছে; তাই তাঁরা বেশ বুঝতে পারছেন, নারীভোগী মুসলমান অবিবাহিতা রাজকুমারীর মত দুইজন সুন্দরী শিকার হাতে পেয়ে তাদের মায়াকান্না আজ অভিমানের বায়না মিটাতে গিয়ে মুহাম্মদ বিন কাসিমকে মৃত্যু দণ্ড দিতে পারেন—এটা যদি সত্য হয় তাহলে মুহাম্মদ বিন কাসিমের মৃত্যুর পর যখনই এ সুন্দরীদ্বয়ের স্বীকারোক্তিতে বুঝতে পারলেন যে, তারা মুহাম্মদ বিন কাসিমের উপর মিথ্যা অভিযোগ করেছিল সাথে সাথেই তাদের মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত করলেন। লম্পট চরিত্রের স্বাভাবিক নিয়মে তা হয়না। লম্পট ব্যভিচারীদের বিজাতি, কুমারী অকুমারী ভোদাভেদ থাকেনা। আর যেখানে ঐ রাজকন্যাদের রূপের মোহে পাগল হয়ে বাদীপক্ষের কোন মন্তব্য, কোন কৈফিয়ত না শুনেই খলিফা মুহাম্মদ বিন কাসিমের প্রাণ দণ্ড দিতে পারলেন তখন এ রূপলাবন্য, আভিজাত্যের অভিনব জীবন্ত প্রতীক সুন্দরীদের হত্যা করা লম্পট চরিত্রের পক্ষে অবশ্যই অস্বাভাবিক। সুতরাং খলিফার চরিত্রের উপর অভিযোগ এবং মুহাম্মদ বিন কাসিমের প্রতি নারী সরবরাহের অভিযোগ কল্পনার ইতিহাস মাত্র।

অতএব এ প্রকার ঐতিহাসিকতা অনেকের মতে ভারতের উন্নতির পরিপন্থী এবং অবনতি আর অঘটনের একমাত্র কারণ।

আমাদের মনে রাখতে হবে, ইংরেজ বা তাঁদের পোষা বান্ধব বা দালাল দ্বারা লিখিত ঐতিহাসিক তথ্য যেমন পরিহারযোগ্য তেমনি এও মনে রাখতে হবে, প্রত্যেক জাতি বা গোত্রের প্রত্যেক ঐতিহাসিক একই ছাঁচে ঢালা নন। তাছাড়া একজন দুষ্ট ঐতিহাসিকের সমস্ত তথ্য বা বাক্যই পঙ্কিল পরিকল্পনা প্রসূতও নয়। তবে ঐতিহাসিকতা পরিবেশনের সময় অবশ্যই মনে রাখা দরকার আমি যা লিখছি তা পড়ে দেশ জাতি তথা সারা ভারতের মানুষ উপকৃত হবে না অপকৃত হবে? যদি হিন্দু মুসলমান বা এক জাতি অপর জাতির মাঝখানে সাম্প্রদায়িকতার প্রাচীর খাড়া করা যায় তাহলে প্রাচীরের সংখ্যা যতবেশি হবে ভারত তত টুকরা টুকরা বা খণ্ডিত হবে আসলের বিরাট ভারত আজ ত্রিভাগে বিভক্ত। তারজন্য সম্পূর্ণ দায়ী সমাজের সে সব লোক যারা নেতা বলে পরিচিত হয়ে সরল, সবল, স্বচ্ছ ও সুন্দর নেতৃত্বের পরিবর্তে দেশকে দিয়েছেন নির্লজ্জ সাম্প্রদায়িকতা, সংকীর্ণতা, ছুতমার্গতা আর দালালীপূর্ণ নকল নেতৃত্ব। অনেকের মতে তাঁদের অপরাধ অমার্জ্জনীয় আর অনেকের মতে, যা হবার হয়ে গেছে তার পুনরাবৃত্তি না ঘটতে দিয়ে অশুদ্ধ ও বিষাক্ত ইতিহাসকে বিশুদ্ধ ও উপযোগী করে সত্যের সঠিকতা বজায় রেখেই ভারতের উন্নতির পরিপ্রেক্ষিতে এমন তথ্য ছাত্র-ছাত্রী বা দেশবাসীর সামনে তুলে ধরা যা এক জাতি অপর জাতিকে তথা এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়কে বন্ধু বলে মনে করতে পারে। যিনি বা যাঁরা এ অসাধ্য সাধন করতে পারবেন তাঁরাই হবেন প্রকৃত ইতিহাস বিজ্ঞানী।

চতুর্থ অধ্যায়

সম্রাট আকবর ও ঔরঙ্গজেব সম্পর্কিত বিকৃত
ইতিহাসের পর্যালোচনা

অনেক অখ্যাত বা কুখ্যাত ঐতিহাসিকরা ভারতে মহান দুই জাতি হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিভেদের বা বিবাদের দেয়াল রচনার চেষ্টা করেই ক্ষান্ত হয়নি, তারা জানত, হিন্দুধর্মে বহু মত, বহু পথ, বহু দেবদেবী ও বহু কুসংস্কার আছে তাই তাদের ধর্মাস্তরিত করে খৃষ্টান করে নেয়া অত্যন্ত সহজসাধ্য, যেহেতু অনেককে তারা পূর্ণভাবে অথবা অর্দ্ধভাবে খৃষ্টান করতে সক্ষম হয়েছিল। এছাড়া তারা আরও লক্ষ করেছিল, সহস্র সহস্র নয় বরং অজস্র হিন্দু মুসলমান রাজাদের সময় স্বধর্ম ত্যাগ করে মুসলমান হয়েছে। কিন্তু মুসলমান দলে দলে খৃষ্টান হয়েছে কিংবা হিন্দুত্ব কিংবা জৈন ও বৌদ্ধ হয়েছে এ দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল। অতএব মুসলমান জাতিকে খৃষ্টান করতে হলে এমন এক জায়গায় ছুরিকাঘাত করতে হবে যাতে গোটা শরীরটা অচল অবশ হয়ে মৃত্যুর দ্বারদেশে পৌঁছে যায়। সেটা হচ্ছে এটাই যে, মুসলমানদের মধ্যে যারা ধার্মিক, বিজ্ঞ পণ্ডিত, মাওলানা, হাফিজ প্রভৃতি নেতৃস্থানীয় নরপতি তাঁদের চরিত্রে কলঙ্ক সৃষ্টি করে ইতিহাসের পাতায় তাঁদের চরিত্রহীন লোভী, হিন্দু বিদ্বেষী, লুণ্ঠনকারী অথবা পাগল ইত্যাদি বলে প্রতিপন্ন করা আর যারা চরম মাত্রায় চরিত্রহীন, ইসলাম ধর্মে উদাসীন মদ্যপায়ী, অদূরদর্শী, চক্রান্তকারী ও স্বৈচ্ছাচারী রূপে খ্যাত তাঁদের চরিত্রে প্রশংসার ঢাক পিটিয়ে এত বড় ও মহান করে তুলে ধরা যার ফলে ভবিষ্যতে শিক্ষিত মুসলিম সমাজ যেন সুনামও প্রশংসা পাবার জন্য স্বধর্মে অবিশ্বাসী আর স্বৈচ্ছাচারী হয়ে উঠে। তারই জন্য উদার ও মহানুভব আওরঙ্গজেবের চরিত্রকে করা হয়েছে দুর্বিসহ অভোযোগের প্রভাবে কলঙ্কিত আর চরিত্রহীন, আকবরকে দেয়া হয়েছে "The great" উপাধি অর্থাৎ "মহামতি"।

আসল ইতিহাস সমাজের সামনে তুলে ধরতে গেলে আমাদের মধ্যেও সম্প্রদায়িকতা আছে বলে মনে হবে কারণ প্রচলিত ইতিহাসের বিরুদ্ধে কিছু বলা বড়ই কঠিন। শুধু বিপরীত মতামত উপস্থাপন করলেই চলবে না বরং প্রমাণ দিতে হবে প্রামাণ্য ইতিহাস বা দলিল থেকে, তাও আবার সবজায়গায় শুধু নামী-দামী মুসলমান ঐতিহাসিকদের ইতিহাস থেকে উদ্ধৃতি দিলেই চলবে না কারণ অনেকে মনে করতে পারেন যে, মুসলমান ঐতিহাসিকেরা মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষ টেনে বলতে বা তাঁদের গোত্রের দুর্নাম ছড়িয়ে যাবার ভয়ে কিছু তথ্য গোপন করতে পারেন। অতএব সে জন্য অনেক মুসলিম ঐতিহাসিক পরিবেশিত তথ্যের পাশে ইংরেজ ঐতিহাসিকদের দলিল এবং ভারতীয় নামকরা শিক্ষিত হিন্দু লেখকদেরও উদ্ধৃতি দেয়ার আবশ্যিকতা স্বীকার করছি অনেক ক্ষেত্রে।

সুতরাং মুসলমানদের জন্য অনেক কথা লিখতে হচ্ছে ওকালতির জন্য নয়—প্রয়োজনের তাকিদেই। যেমন অনেক দিন থেকে শুনে আসছি ও পড়ে আসছি চাঁদ সুন্দর। চাঁদের এ সৌন্দর্য প্রমাণের জন্য লম্বা কোন দলিলের প্রয়োজন নেই, কিন্তু চাঁদ অসুন্দর বললেই প্রমাণ করতে হবে চাঁদের নৈপুণ্য চাঁদের বৈশিষ্ট্য ও তার আকার উপাদান, পরিবেশ ও বর্তমান পরিস্থিতি—পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব—বর্তমানের চন্দ্রাভিযাত্রীদের অভিজ্ঞতা প্রভৃতি অনেক আলোচ্য বিষয় বস্তুকে। পরে প্রমাণ হবে চাঁদের কোন জ্যোতি নেই বা তার কোন আলো নেই—সূর্যের আলোয় আলোকিত হয়, আসলে চন্দ্র একটা অন্ধকারময় অসমান্তরাল, অস্বাস্থ্যকর, অসুন্দর স্থান ইত্যাদি ইত্যাদি। ঠিক তেমনি আকবরকে আমরা ভারতের স্কুল, কলেজ ও ইউনিভার্সিটির আটপাছরে আধুনিক ইতিহাস পড়ে জানতে পেরেছি, তিনি নাকি মুসলমান রাজা বাদশাদের মধ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী মহান থেকে মহানতম সম্রাট। অপর দিকে আওরঙ্গজেবের ইতিহাস পড়লে মনে হয় এত বড় হিন্দু বিদ্বেষী গোঁড়া ভ্রাতৃহত্যা দুষ্কর্মী সংকীর্ণমনা বাদশাহ মুসলমান যুগের কলঙ্ক ছাড়া আর কিছুই নয়। অথচ প্রকৃত ইতিহাস এ সমস্তের বিপরীত।

এখন যদি আকবর আর ঔরঙ্গজেবের ইতিহাস সঠিক ভাবে আলোচনা করা হয় তাহলে আমরা ভারতবর্ষের ভাবী বা বর্তমান বংশধর কল্যাণকামী পদক্ষেপে আসল ইতিহাসের পিছনে অনুসন্ধিৎসু হয়ে মৃত ইতিহাসের দেহের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করে নিতে পারব বলে বিশ্বাস।

মুঘল সম্রাট আকবর

পিতার মৃত্যুর সময় আকবরের বয়স ছিল মাত্র তের বছর। এ বয়সেই ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে ১৪ জানুয়ারী তাঁর প্রধান সহায়ক বৈরাম খাঁ তাঁকে সিংহাসনে বসালেন। আসলে আকবরের নামে শাসনকার্য পরিচালিত হলেও সমস্ত কাজ কর্ম ও দায়-দায়িত্ব বৈরাম খাঁকেই পালন করতে হত। পাঁচ বছর পরে আকবর বৈরামের একাধিপত্যে অসজ্ঞাবোধ করলেন এবং তাঁর হাত থেকে সমস্ত দায়িত্ব নিজেই ছিনিয়ে নিলেন এবং জানিয়ে দিলেন 'আমি এখন উপযুক্ত আপনি বরং হজ্ব করতে যান।' এ আদেশ জারী হওয়াতে বৈরাম খাঁ নিজেকে অপমানিত বোধ করলেন এবং শেষে বিদ্রোহী রূপে আত্ম প্রকাশ করলেন। আকবর তাঁকে পরাজিত করলেন কিন্তু কারারুদ্ধ বা প্রাণদণ্ড না দিয়ে তাঁর হজ্জে যাবার ব্যবস্থা করে দিলেন। যেহেতু বহু দিক দিয়ে তাঁর থেকে তিনি উপকৃত ছিলেন। কিন্তু হজ্ব থেকে ফিরে এসে বৈরাম খাঁর ভূমিকা কি হত বলা যায় না। হজ্জে যাবার পথে গুজরাটে তিনি আততায়ী কর্তৃক নিহত হন। কারো ধারণা এটা ঠিক কর্তৃক, আবার কারো ধারণা আকবরের অঙ্গুলী হেলনেরই এ নিষ্ঠুর পরিণাম।

আকবর বুঝে দেখলেন, এতবড় ভারতবর্ষে প্রভাব বিস্তার করতে হলে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু জাতিকে হাতে রাখলেই কাজের সুবিধা হবে। তাই রাজপুত ও হিন্দু জাতিকে নিজের দিকে আকর্ষিত করতে বন্ধপরিকর হলেন। অবশ্য তা আন্তরিকতার আলোকে না রাজ্য বিস্তারের আশায় সুমিষ্ট টোপ নিক্ষেপ তা বিচার করবেন সুধী সমাজ।

তিনি হিন্দুদের উপর থেকে জিজিয়া কর তুলে দিলেন এবং হিন্দুদের বড় বড় পদে ভূষিত করলেন। রাজপুত বীর মানসিংহকে অন্যতম সেনাপতি নিযুক্ত করলেন। রাজস্ব বিভাগ ছেড়ে দিলেন। বহুদিনের যবন অস্পৃশ্য মুসলমান আকবর এত সহজে হিন্দুদের প্রিয় পাত্র হলেন যে, কেহ আপন বোন কেহ ঘরনী, কেহ বা নিজের কন্যাকে রাজার হেরেমে প্রবেশ করিয়ে দিতে কুষ্ঠাবোধ করলেন না। অম্বর এবং জয়সালমীরের হিন্দু রাজকুমারীদ্বয়কে আকবর বিয়ে করলেন এবং অহরের পরবর্তী রাজা ভগবান দাসের কন্যা এবং মড়োয়ার রাজা উদয় সিংহের কন্যার সাথে পুত্র সেলিমের বিবাহ দিলেন। প্রায় সকলেই বশে আসল শুধু ব্যতিক্রম মেবারের রাণা। বাধ্য হয়ে আকবর মেবার আক্রমণ করলেন। তখন মেবারের রাণা ছিলেন সংগ্রাম সিংহের পুত্র উদয় সিংহ। তিনি সেনাপতি জয়মল্লের হাতে রাজ্য রক্ষার ভার নিয়ে আরাবল্লী পর্বতে আশ্রয় নিলেন। জয়মল্ল নির্ভর অকারণ আক্রমণের শিকার হয়ে আট হাজার সৈন্য নিয়ে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করেও পরাজয় বরণ করলেন। অধঃপতিত থেকোর দখলে এল বটে কিন্তু সমগ্র মেবার হাতে এল না। উদয় সিংহ উদয়পুরে রাজধানী স্থাপন করে রাজত্ব করতে লাগলেন। উদয় সিংহের মৃত্যুর পর প্রতাপ সিংহ আকবরের সাথে যুদ্ধ করতে থাকেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন যতদিন না থেকোর পুনরুদ্ধার হয় ততদিন তিনি রণক্ষেত্র ছাড়া আহা করবেন না এবং শয়ন করবেন শুধু তৃণশয়্যা। হলদিঘাট নামক গিরিসঙ্কটে তুমুল যুদ্ধ হয় ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে প্রতাপ পরাজিত হলেন আর মেবারের হল অনিবার্য পতন। প্রতিজ্ঞা পালনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতাপ বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। কিন্তু প্রিয় রাজধানী থেকোকে আর উদ্ধার করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি তাঁর জীবদ্দশায়।

পূর্বে যে সমস্ত দেশ স্বাধীন হয়েছিল আকবর সে সব রাজ্য একে একে জয় করে চললেন। ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে গুজরাট দখল করলেন তখন সুলাইমান কারবানী ছিলেন বাংলার সুলতান। তিনি যুদ্ধের পথে পা না বাড়িয়ে সন্ধি করতে আগ্রহী হলেন কিন্তু তাঁর স্বাধীনচেতা সন্তান দাউদ বিদ্রোহী হয়ে বিহার আক্রমণ করলেন। আকবর অনেক সৈন্য সামন্ত পাঠিয়ে দাউদের স্বাধীনতার সাথ মিটিয়ে তাঁকে হত্যা করে নিশ্চিন্ত হলেন। আর বাংলা ও উড়িষ্যা নিজের দখলে আনলেন। তারপর ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীর ও ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে সিন্ধুদেশ জয় করে সমগ্র আর্যাবর্তের দণ্ডমুণ্ড কর্তা হয়ে দাঁড়ালেন।

উত্তর ভারতের সাথে সাথে দক্ষিণ ভারতের দিকেও দৃষ্টি দিলেন। এ সময় বাহমণী রাজ্য ছোট ছোট অনেক রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। আহমদনগরের রাজার মৃত্যুর পর রাজ্যে অশান্তি ও বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। বিদ্রোহীরা আকবরের সাহায্য প্রার্থনা করলে ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে আকবর তাঁর পুত্র মুরাদকে এক দল সৈন্য দিয়ে আহমদ নগরে পাঠালেন। আহমদ নগরে নাবালক বাচ্চা রাজার অভিভাবিকা বিদূষী নারী বীরাঙ্গনা চাঁদ সুলতানা বিপুল বিক্রমে বাধা দিয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করলেন। মোঘল সৈন্যরা আহমদ নগর করায়ত্ত্ব করতে পারলেন না। পর বছর আকবর স্বয়ং

নারী এবং শিশুর বিরুদ্ধে বিপুল সৈন্য ও শক্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। চাঁদ বিবি এখানেও প্রাণপণে যুদ্ধ চালনা করলেন। রসদ ও গুলি বাকীদের স্বল্পতাহেতু শুধু বন্দুক এবং মস্ত্রযোদ্ধাদের মামুলী অস্ত্রনিয়েই রুখে দাঁড়ালেন, কিন্তু আকবরের গুপ্তচর পিছন থেকে সুলতানাকে হত্যা করার ফলে আহমদ নগরে পরাজয়ের অন্ধকার নেমে এল। আহমদ নগরের একাংশ বাদশার হাতে এল। তারপর বাদশাহ খন্দেশত আকিরগড় দুর্গে আক্রমণ চালিয়ে বাকি অংশগুলোকে দখল করলেন। এমনি ভাবে আকবর এক বিশাল সাম্রাজ্যের সর্ববিস্তারী রাজাধিরাজ বাদশাহ বলে বিবেচিত হলেন।

আকবর সম্বন্ধে প্রশংসা ও উদারতার উদারণ ইতিহাসে এতবেশী স্থান পেয়েছে যা মুসলমান বাদশা কারো ভাগ্যে সম্ভব হয়নি। ইতিহাসের শুষ্ক পাতা সরস ও জীবন্ত হয়ে যেন চিৎকার করে বলে উঠে—‘মহামতি আকবর! মহামতি আকবর!’! পাঠশালা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত এ একই শব্দ ‘ধন্য আকবর! ধন্য আকবর!’!

আকবরের জন্মদাতা পিতা হুমায়ূনের উপর যখন বিপদের বিরাট বন্যা এসে পড়েছিল, সে সময় হুমায়ূনের এতবড় বন্ধু আর সুহৃদ কেহ ছিলেন না যিনি নিজের প্রাণ, সম্পদ-সম্পত্তি ও সম্মান সবই দিতে কুষ্ঠাবোধ করেননি হুমায়ূনের জন্য—তিনিই হচ্ছেন বৈরাম খাঁ। হুমায়ূন তাঁর মৃত্যুর সময় পর্যন্ত হারিয়ে যাওয়া জায়গাগুলো পুনরুদ্ধার করতে পারেননি-সামান্য কিছু ভূ-খণ্ড ছাড়া। এ সময় সিকিন্দারশূর এবং ইবরাহিম শূরের মধ্যে খুব শক্তির প্রতিযোগিতা চলছিল। কিন্তু আদিলশাহের এক হিন্দু মন্ত্রী হিমু তাদানীতন সময়ে শক্তি সামর্থ্য ও জ্ঞান বুদ্ধিতে প্রধান ছিলেন। তিনি এত শক্তিশালী হয়ে পড়লেন যে, দিল্লী ও আখা অধিকার করে বিক্রমাদিত্য নাম ধারণ করে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করলেন। আবার আকবরের ভাই আবদুল হাকিমের অধীনে কাবুল, বাংলাদেশ, মালব, গুজরাট, গণ্ডোয়ানা, উড়িষ্যা, কাশ্মীর, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও দাক্ষিণাত্য তখন স্বাধীন হয়ে পড়েছিল। রাজপুত্রগণও প্রথম মুঘল আক্রমণের আঘাত সামলে নিয়ে শক্তিশালী হয়ে পশ্চিম উপকূলে নিজেদের প্রাধান্য বিস্তারে মেতে উঠল। এমন কি পারস্য সাগরে ও আরব সাগরে তাদের প্রভুত্বের ফলে মক্কা শরীফে হজ্জযাত্রীদের ভীষণ বিপদ-ও বাধার সম্মুখীন থেকে হত।

একে তো এতগুলো বিপদ তার উপর আকবর সিংহাসন আরোহণ করেছেন নালক বয়সে। অতএব বৈরাম খাঁই এরূপ বিপদে আকবর নওজোয়ান বা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত আকবরকে প্রতিষ্ঠিত রেখেছিলেন। আকবরের পিতা হুমায়ূন তাই অকৃত্রিম বন্ধু বৈরাম খাঁর দুটি হাত ধরে অশ্রুসজল নয়নে বলেছিলেন—‘আমাদের পরিবারের দুঃখ দুর্দশার মধ্যে আপনার ন্যায় সাহায্যকারী আর কেহ নাই’ তাই হুমায়ূন যখন কান্দাহার দখল করলেন তখন কৃতজ্ঞতার সাক্ষী স্বরূপ বৈরাম খাঁকে সেখানকার শানকর্তা করে দিয়েছিলেন। তাছাড়া তাঁকে সিংহিন্দের জাইগীর প্রদান করেছিলেন এবং মৃত্যুর পূর্বে তিনি আকবরের অভিভাবক নির্দ্ধারিত করেন। এ বৈরাম খাঁকেই (খান-ই-খানানা)। আকবর পিতার কাছে শিখে ছিলেন তিনি বাবার মত। তাই তাঁকে ডাকতেন খান-ই বাবা সম্বোধন করে।

এ বৈরাম খাঁকে অসম্মানিত আর পরাজিত হয়ে যে বহিস্কৃত থেকে হবে গুনমুগ্ধ বন্ধুবান্ধবদের সভা থেকে, রাজ্য থেকে এবং পৃথিবী থেকে একথা ভাগ্যহারা বৈরাম খাঁ কোন দিন কল্পনাও করেন নি, কল্পনা করেনি অতীত ইতিহাসের পাঠক। আকবরের জীবনের শুরুই কি তাহলে চক্রান্তের বেড়া জাল গোলক ধাঁধার চোখ ধাঁধান পথে?

সহজলভ্য ইতিহাসে পাওয়া যায়, আকবর হিন্দু বা রাজপুতদের বিশেষত বৈবাহিক সম্বন্ধ করিয়ে নিয়েছিলেন বা আয়ত্বে এনে বন্ধু জ্ঞাতি ও বন্ধু জাতিতে পরিণত করেছিলেন। অপরদিকে হিন্দু প্রজাবর্গও তাঁকে খুব আপনজন বলে মনে করতেন। ইতিহাসে হিন্দু প্রজাবর্গ তাঁকে 'দিল্লীশ্বর' উপাধিতে ভূষিত করেই ক্ষান্ত হননি, অনেকে আবার তাঁকে 'জগদীশ্বর' উপাধি দিতেও বিচলিত হননি। দালাল মার্কী ইংরেজ ঐতিহাসিকরা প্রশংসা করতে গিয়ে অনেকে চরমমাত্রায় পৌঁছে গেছেন। যথা ইংরেজ ঐতিহাসিকরা আকবরের জন্য লিখেছেন, "ব্রিটিশ যুগের ডালহৌসির সাম্রাজ্য প্রসার নীতির সাথে আকবরের তুলনা করলে মনে হয় যেন মোঘল বাদশাহ ভারতের আকাশে প্রথর সূর্যের মত দিগুমান আর ডালহৌসির ক্ষুদ্র তারকাটি তার পাশে মিটমিট করে জ্বলেছে। "A strong and stout annexationist before whose sun the modest star of Lord Dalhousie place." আকবর আসলে দেখতে সুন্দর ছিলেন না, তাঁর রং ছিল কাল তদুপরি আকবর ছিলেন খর্বাকৃতি কিন্তু ইংরেজ প্রভুর(?) দেয়া সনদ হচ্ছে—"He looked every inch a king" অর্থাৎ—পা থেকে মাথা পর্যন্ত প্রতি ইঞ্চিই আকবরের রাজার মত। আবার কোন কোন প্রভু(?) বলেছেন—"He was a great with the great lowly with the lowly." শক্তির সাথে শক্তি প্রয়োগ আর নরমের নম্রতা ব্যবহার ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য। আবার কোন ঐতিহাসিক বলেছেন—তার চক্ষুর চাহনী ছিল সূর্যকরোজ্জ্বল সমুদ্রের মত। Vibrant like the sea in sun shine ইত্যাদি।

তিনি হিন্দু নারীদের বিবাহ করেছিলেন। শুধু তিনি কেন পৃথিবীর বহু মুসলমান অমুসলমানদের মেয়ে বিয়ে করেছেন বা করলেও সেখানে নিশ্চয়ই ইসলাম ধর্মে কোন বাধা নেই। তবে শর্ত হচ্ছে সে নারীকে প্রথমে মুসলমান থেকে হবে, তার পর ইসলাম অনুযায়ী বিয়ে থেকে পারে। বিবাহ আর ব্যভিচারের পার্থক্য এটুকুই। কিন্তু আকবর তার হিন্দু পত্নীদের রাজ অন্তঃপুরে হেমাঙ্গি জ্বালিয়ে রাখবার ব্যবস্থা করেছিলেন এবং যিনি যে ঠাকুরের পূজারিণী ছিলেন তাঁর তেমনই ব্যবস্থা করা হয়েছিল রাজ অন্তঃপুরের অন্তঃস্থলে। তার ফলে তাঁর স্ত্রী ও পুত্রদের তথা রাজবাড়িতে অনৈসলামিক কুপ্রথা প্রচলন হয়। যথা—মদ্যপান, ব্যভিচার, গীতবাদ্য প্রভৃতি এবং তাঁর সন্তানগণ এত বেশী ব্যভিচারী হয়ে উঠেছিলেন যে, আকবরের জীবদ্দশাতেই তাঁর দুই পুত্র মুরাদ ও দানিয়াল অত্যন্ত মদ্যপানে মৃত্যুমুখে পতিত হন। জ্যেষ্ঠপুত্র সেলিম বা জাহাঙ্গীরও চরম মাতাল ছিলেন বলা যেতে পারে, মহামতি আকবরের পুত্রদের মধ্যে মদ্যপান এত চরমে উঠে, যে মদে আর নেশা হত না তখন মদের সাথে ভাং নামক মাদকদ্রব্য মিশ্রিত করে পান করতেন।

যাই হোক, ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দে পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে হিন্দু রাজা হিমুকে বৈরাম খাঁর কৌশল কীর্তির কারণে পরাজিত করা সম্ভব হয়। হিমু বন্দী হন কিন্তু আকবরের শাসনের প্রারম্ভে আকবরের সামনেই তাঁর মুণ্ডটি দেহচ্যুত করা হয়। আকবরকে মহামতির অভিনয় করতে হলে এ অশোভনীয় কাজটুকু ধামাচাপা দেয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আবার অন্যদিকে এত বড় এক নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে বাদ দেয়া যায়না তাই এ ভারতজনের ইতিহাসে লেখা হয়েছে—"বন্দী হিমুকে আকবরের কাছে ধরিয়ে আনিয়া বৈরাম হত্যা করিতে বলিলে তিনি তাহা করেন নাই। শেষে বৈরাম নিজেই হিমুর মুণ্ডটি কাটিয়া ফেলেন।" লেখক এ ঘটনাটি প্রমাণ দেয়ার জন্যে কিছু ইতিহাস ও ঐতিহাসিকের নাম দিয়েছেন যারা এ ঘটনা সত্য বলে উল্লেখ করেছেন। যেমন আবুল ফজল, জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী ইত্যাদি। তবুও বাজারের ঐতিহাসিকদের প্রমাণ প্রয়োগ শাস্তি না পেয়ে পরক্ষণেই লিখেছেন, "ডিসেন্ট স্মিথ কেন যে আকবরকে কিশোর বয়সেই এ নিষ্ঠুর হত্যার দায়ে দোষী করিয়াছেন তা রাহস্যজনক মনে হয়। হিমুর পরাজয়ে মোঘল রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা এবং আফগান শক্তির অবসান হয়।"

এক্ষেণে, প্রথম পক্ষের উপরোক্ত প্রমাণের পরিপ্রেক্ষিতে মনে হয় দোষ যেন আকবরের নয়—বৈরাম খাঁর। দ্বিতীয় পক্ষের বক্তব্য হচ্ছে—আকবরই হত্যাকারী কারণ কাউকে হত্যা করতে হলে সিংহাসন বা শয়ন পালঙ্কে সম্ভব নয়। হত্যা কারার নির্দিষ্ট স্থান প্রত্যেক রাজার থাকে এখানেও তাই ছিল। আকবর তাঁকে (হিমু) হত্যার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং হত্যাকাণ্ড চোখের সামনে দেখতে ইচ্ছুক ছিলেন। শুধু হত্যা করার উদ্দেশ্য থাকলে বৈরাম খাঁ তার আগেই কাজ সমাধা করতে পারতেন। হিমুকে বন্ধাভূমিতে আনার পর আকবরকে মনে করিয়ে দিলেন তাঁর বাচ্চা মনে আচ্ছা খেলালের কথা। তারপর আকবরের অনুমতি ও আদেশেই তাঁকে হত্যা করা হয়। রাজ সিংহাসনে আরোহিত আকবর, তাঁকে আদেশ করার অধিকার বৈরাম খাঁর থাকতে পারেনা। যিনি যখন নেতৃত্ব দেন সাধারণ নিয়ম হত্যাকাণ্ড তাঁর দ্বারা, তাঁর সঙ্গী বা কর্মী দ্বারা তাঁর আদেশ, সমর্থন বা মৌনতা প্রভৃতি নেতারই ইঙ্গিত বলে বিবেচিত হয়। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে, যেহেতু আকবরের আদেশ বা নির্দেশেই এ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। এবার যারা আকবরের দোষ গোঁণ এবং বৈরাম খাঁর দোষ মুখ্য বলেছেন তাঁরা হলেন আবুল ফজল, জাহাঙ্গীর আর আবদুর রহিম প্রভৃতি। কিন্তু মনে রাখতে হবে যারা ঐতিহাসিক তারা নবী বা অবতার নন যে তাঁদের সাধারণ মানসিকতা প্রত্যেক মুহূর্তে সতেজ থাকবে। কোন কোন ক্ষেত্রে লোভ-লালসা, ক্রোধ অভিমানের কবলেও পড়তে হয়। এক্ষেত্রে এটাই কারণ। যেহেতু আবদুর রহিম হচ্ছেন পিতার অবাধ্য সন্তান, পিতা-পুত্রের কলহের প্রমাণ আছে। আর জাহাঙ্গীর হচ্ছেন আকবরের গুরসজাত সন্তান, সেখানে যা স্বাভাবিক তাই হয়েছে। এমনভাবে আবুল ফজল ও আকবরের মধ্যেও এক গুরুত্বপূর্ণ সম্বন্ধ ছিল—গুরুর পুত্র। অতএব এক্ষেত্রে তাঁদের কিছু দুর্বলতা বোধহয় আশ্চর্যের নয়।

শেষের কথা আকবরের মা ও বাবার স্বপ্ন 'আমার ছেলের নাম ও রাজ্য বিস্তার-
যেন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।' যেমন মৃগনাভীর গন্ধ ছড়িয়ে যায় অনুরূপ। আকবর
তাই বলেছিলেন, ছলে বলে, কলে--কৌশলে, হত্যা, মিথ্যা, শঠতা যেমন করেই হোক
তাকে রাজ্য বিস্তার করতেই হবে। অতএব আপনি আমার ধর্ম বাবা, খান-ই-বাবা,
সুতরাং যতক্ষণ না আমি মজবুত হই আপনি যা ভাল হয় করুন। হত্যার জন্য দায়ী
বন্দুক না বন্দুকধারী সেটাই আজ সিদ্ধান্তের বস্তু। অতএব আফগান শক্তি নির্মূল
করতে হলে হিমুর ধ্বংসের প্রয়োজন। তাই হিমুর মৃত্যুর সংগেই দিল্লী ও আধা
আকবরের হাতে এসে যায়।

অপরদিকে আদিল শাহও অন্যত্র নিহত হন। সেকেন্দার শূর আকবরের বশ্যতা
স্বীকার করেন। ইব্রাহিম শূরও বহু দিন যাবত ঘুরে ঘুরে শেষে উড়িষ্যায় হলেন
নিহত। ১৫৫৮ থেকে ১৫৬০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে গোয়ালিয়র, আজমীর ও জৈনপুর
আকবরের অধীনে এসে যায়। এ সবই বৈরামের বীরত্বের ফল আর আকবরের
ভাগ্যের জোর বলতে হবে। অবশেষে ১৫৬০ খ্রিষ্টাব্দে বৈরাম খাঁকে পদচ্যুত করে
তাঁর অপেক্ষা বহু গুণে সর্ববিষয়ে অনভিজ্ঞ পীর মহম্মদ এবং আদম খাঁকে সেনাপতি
নিযুক্ত করেন। এটা বৈরাম খাঁর ব্যক্তিত্বে যে কত চরম আঘাত ও পরম বেইজ্জতী তা
আজ চিন্তার বিষয়। তবুও তো এক এক পক্ষের কাছে আকবর মহামতি।

বৈরাম খাঁর মৃত্যুর পর এক সময় আকবরের মা হামিদা ও ধাত্রীমাতা
মহিমঅনাগা আকবরকে অশ্রুপুত নয়নে বলেছিলেন, "আকবর, বৈরাম খাঁ আর
নেই। তোমাকে সং পরামর্শ দিয়ে সঠিক পথ দেখাবে তেমন কেহ নেই। তাছাড়া
তুমি নিজেও লেখাপড়া জান না। সুতরাং যখন ভালমন্দ বুঝতে পারবে না আমাদের
মতামত নেয়ার চেষ্টা করবে।" কিন্তু আকবর নিজেকে খুব বেশী গণ্ডিত বলে মনে
করতেন। পরে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। তবে ছোট ছোট ব্যাপারে মাকে খুশী করার
জন্য মহামতি মাতার মতামত নিতেন। তাও আবার বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ছিল তা
অরাজকীয় বিষয়।

১৫৬১ খ্রিষ্টাব্দে নূতন সেনাপতি আদম খাঁ ও পীর মহম্মদ মালব জয় করেন।
পরের বছর ১৫৬২ খ্রিষ্টাব্দে আকবর সেনাপতি আদম খাঁকে হত্যা করেন। অপরাধ
ছিল মন্ত্রী শামসুদ্দিনকে তিনি হত্যা করেছিলেন। মহামতি যে আদম খাঁকে হত্যা
করেছিলেন সে আদম খাঁ ছিলেন ধাত্রী মাতা মহিমঅনাগার পুত্র। তাই পুত্রের শোকে
বৃদ্ধ মাতা বাঁথেকে পারলেন না, বুক ফাটা শোকে দেহ ত্যাগ করলেন। এ যেন এক
নিষ্ঠুর তথা পৈচাশিক ইতিহাস।

তারপর পীর মহম্মদকেও পুরস্কার দিলেন মৃত্যুদণ্ড। এরপর আকবর তাঁর একজন
অন্যতম মামা খাজা মোয়াজ্জুমকে মিথ্যা হত্যার অভিযোগে প্রাণদণ্ড দিলেন। নানা
কারণে সারা মুসলমান সমাজ আত্মীয়--অনাত্মীয় প্রত্যেকেই অসন্তুষ্ট হয়ে উঠলেন।
আকবর বুঝতে পারলেন একদল ভেসে গেছে। অতএব অন্য কূল আর ভাসতে দেয়া
হবে না। যেমন করেই হোক হিন্দু রাজপুতদের হাতে রাখতেই হবে। তাঁর এ প্রস্তাবে

রাজপুতরা সাড়া দিলেন। সাড়া দেয়ার কারণ ঐতিহাসিকদের মতে প্রধানত দুটি।
প্রথমত, পূর্ব থেকেই রাজপুতরা মুসলমানদের শক্তি ও প্রভাবে প্রভাবিত ছিলেন।
দ্বিতীয়ত, তারা এর মাধ্যমে নিজেদের শক্তি সঞ্চয়, আধিপত্য লাভ ও ভবিষ্যতে হিন্দু
সাম্রাজ্য স্থাপনের আশার আলোক প্রত্যক্ষ করতে পেরেছিলেন। যাই হোক, ১৫৬২
খ্রিষ্টাব্দে অম্বর (জয়পুর) রাজ্যের রাজা বিহারী মল্ল আকবরের আনুগত্য স্বীকার করেন
এবং তাঁর সুন্দরী কুমারী এক কন্যা আকবরকে দান করেন। সেলিম বা জাহাঙ্গীরের
জন্ম এ কন্যার গর্ভেই হয়েছিল। "সেলিম চিন্তি" নামে এক মুসলমান সাধক দোয়া
করেছিলেন তাই তাঁরই নাম অনুসারে নাম রাখা হয়েছিল 'সেলিম'।

তারপর মানসিংহ আকবরকে তাঁর আপন সহোদরা বোনকে দান করেন। আকবর
নিজে বিয়ে না করে সেলিমের সাথে তার বিয়ে দেন। মানসিংহের বোন ছিলেন
বিহারী ভগবান দাসের কন্যা। এ কন্যারই গর্ভজাত সন্তান খসরু। যোদপুরের রাজা
উদয়ের কন্যাকেও বিয়ে করেন আকবর পুত্র জাহাঙ্গীর। রাণী যোধবাইয়ের গর্ভেই জন্ম
নিয়েছিলেন সম্রাট শাহজাহান। বিকামীরের রাজা রায় সিংহও তাঁর সুন্দরী কন্যা দান
করলেন মহামতির হেরেমে। তাঁকেও বিয়ে করলেন জাহাঙ্গীর। যশলমীরের রাজা
আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন, কিন্তু শুধু বশ্যতাই নয় সে সাথে দিতে বাধ্য
হয়েছিলেন তাঁর প্রিয়তমা কন্যাকেও।

মোটকথা মহামতির আসল ইতিহাস আমাদের মনে করিয়ে দেয় তাঁর অসংখ্য স্ত্রী
অস্ত্রী আর পত্নী উপপত্নীর কথা যাঁদের দ্বারা মহামতির মহল সব সময়ই জমজমাট
থাকত। কিন্তু এসব কীর্তি ইতিহাসে প্রকাশ করলে মহামতি নামের সার্থকতা থাকে
না। তাই অপ্ৰকাশ্য ছিল এতদিন।

আকবরের বহু সংখ্যক উপপত্নী ছিল.....ইত্যাদি। এ সব নূতন তথ্যের সন্ধান
মুসলমান লিখিত ইতিহাসে পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে। কিন্তু এক্ষেত্রে বিখ্যাত হিন্দু
ঐতিহাসিক শ্রী রামপ্রসাদ গুপ্তের লেখা 'মোঘল বংশ' পুস্তকের ১৭৮ পাতার মন্তব্য
বিশেষ স্মরণযোগ্য। উপপত্নির সংখ্যা ছিল পাঁচ শতের বেশী। যিনি পাঁচ শত নারী
ধর্মক রাজা বলে ইতিহাসে উল্লেখ আছে যদি এটা সত্য হয় তাহলে তাঁকে মহামতি
আমরা বললেও আগামীকালের ইতিহাস বলবে কি করে সেটাই চিন্তার কথা।
ভারতের বিখ্যাত Vindication of Aurangz গ্রন্থের ১৪৩ পাতায় এর পরিষ্কার
প্রমাণ পাওয়া যাবে, যথা-Akber had over five woifes Hanrat
আকবরের পাঁচ শতেরও বেশী স্ত্রী ছিল.....ইত্যাদি। আর যাঁরা কন্যা দিয়েছিলেন
স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়েই দিয়েছিলেন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই। ফলে তাঁরা বাদশার অনুগ্রহে
ধন্য হয়ে অর্থ, সম্পদ, সম্পত্তি ও সম্মান পেয়েছেন এবং সার্বিক উপকারের মধ্যে
রাজপুতদের হাতে রাজকীয় শক্তির মোটামুটি একটা অংশ এসে পড়েছিল। আর
স্বাভাবিকভাবেই হয়েছিল তাই।

একপক্ষ বলেন, আকবর ও রাজপুতদের উদারতার সাক্ষ্যবহন করেছে কন্যা
প্রদানের ক্ষেত্রে। অপর পক্ষ বলেন, নারী লোলুপতা আর চরিত্র হীনতার প্রকাশ

পেয়েছে মহামতির দিক থেকে আর রাজপুতদের দিক থেকে এক নীচতা, হীনতা ও দীনতা প্রকাশ পেয়েছে। পার্থিব উন্নতির জন্য যারা নিজেদের কন্যা ও বোনকে চরিত্রহীনের হাতে স্বেচ্ছায় অর্পণ করতে পারেন তাঁরা নিঃসন্দেহে জঘণ্য, ঘৃণ্য ও নগণ্য।

তবে একথা সত্যিই যে, প্রত্যেক রাজপুতই পাইকারী ভাবে এ পাপ-পঙ্কিলে নিমজ্জিত হয়েছিলেন তা নয়। বরং বহু রাজপুত বীর তাঁদের বীরত্বের মহিমাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে উল্টা নজীর সৃষ্টি করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ ১৫৬৪ খ্রিষ্টাব্দে আকবর যখন মধ্য প্রদেশের গণ্ডোয়ানা দখল করেন এবং সেখানকার বিধবা রাণী দুর্গাবতী যুদ্ধে পরাস্ত হন, কিন্তু তিনি আত্মহত্যা করেন তবুও আকবরের হাতে পড়েন নি। মেবারের রাণী সংগ্রাম সিংহের পুত্র উদয় সিংহ আকবরের প্রস্তাব সত্ত্বেও তাঁর কন্যাকে সমর্পণ করেন নি। যার ফলে আকবর কর্তৃক থেকোর আক্রান্ত হয় ১৫৬৭ খ্রিষ্টাব্দে। উদয় পলায়ন করেন কিন্তু রাজপুত সৈন্যগণ জয়মল্ল ও পুত্তের নেতৃত্বে যুদ্ধ করে অবশেষে পুত্ত ও জয়মল্লকে আকবরের হাতে নিহতভাবে নিহত থেকে হয়। ফলে থেকোর আকবরের হাতে এসে যায়। যুদ্ধে পরাজিত রাজপুতদের প্রাণ দিতে হল মহামতি আকবরের হাতের ইশারায়। আর নারীরা হাল চাল বুঝতে পেরে ‘জহর ব্রত’ অর্থাৎ আগুনের চিতার মত করে তৈরী করে তাতেই ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ বিসর্জন করলেন। তার প্রমাণ আজ ভুরি ভুরি বিদ্যমান। ১৫৭২ খ্রিষ্টাব্দে উদয়ের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র প্রতাপ সিংহ পিতার স্থলাভিষিক্ত হলেন। তিনি পিতার চেয়েও সাহসী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। ১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দে হলদীঘাটের যুদ্ধে আকবরের হাতে তিনি পরাজিত হলেন। তার পর বনে জঙ্গলে লুকিয়ে অর্ধাহারে অনাহারে কাটিয়ে বহু যুদ্ধ করে অনেক কিছু পুনরুদ্ধার করতে পেরেছিলেন কিন্তু তাঁর সাধের থেকোর অধিকার করা আর সম্ভব হয়ে ওঠেনি। প্রতাপের এ পরাজয় বিজয়েরই নামান্তর। তিনি বশ্যতা স্বীকার ও কন্যাদানের চিন্তা মুহূর্তের তরেও তাঁর মস্তিষ্কে আসতে দেন নি।

প্রতাপের জন্য অনেকে গোঁড়া সংকীর্ণমনা হিন্দু বলে অভিযোগ করেন। কারণ, একবার আকবরের শ্যালক, আকবরের আত্মীয় আবার সেনাপতি মানসিংহ প্রতাপের বাড়ী বেড়াতে গিয়েছিলেন। প্রতাপ মোটেই অতিথির আপ্যায়ন বা সম্মান প্রদর্শন কিছুই করেন নি বরং অপমানের সুরে বলেছিলেন, যারা মুসলমানকে পিসি, বোন বা কন্যা দিয়েছে তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।” মানসিংহের মান নষ্ট হওয়ায় তিনি বলেছিলেন, “এর কেমন করে প্রতিশোধ নিতে হয় আপনাকে দেখাতে পারি জানেন?” তদন্তের প্রতাপ বলেছিলেন, “যাও যাও, তোমাদের পিসে মশাই, ভগ্নিপতি, জামাইদা আকবরকে গিয়ে সব বল এবং তাকেও সাথে করে নিয়ে এস।

প্রতাপের এহেন বীরত্ব আমাদের মতে নীরেট গোঁড়ামী নয় বরং একনিষ্ট বীরের বীরত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব তাঁকে গোঁড়া হিন্দু না বলে নিষ্ঠাবান বীর প্রতাপ সিংহ বলা উচিত।

তারপর বনে জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে প্রতাপ সিংহকে এক হৃদয়বিদারক ঘটনার সম্মুখীন থেকে হল। তিনি দেখলেন তাঁর আদরের কন্যা ক্ষুধায় কাঁদতে কাঁদতে হুটফুট

করতে লাগল। তখন আর ধৈর্যধারণ করতে না পেরে আকবরকে এক লিখিত পত্রে জানালেন আপনার কাছে আমি আত্মসমর্পণ করতে সম্মত। পত্র পেয়ে খুশী হয়ে আকবর সভাসদকে ডেকে বলেন, প্রতাপের উপর অত্যাচার করতে নিষেধ করে দিন। ঠিক এ সময় সভাসদগণের মধ্য থেকে জাহাঙ্গীরের স্বশুর বিকানিরের রাজা রায় সিংহের কনিষ্ঠ সহোদর পৃথ্বীরাজ মর্মাহত হয়ে প্রতাপকে এক পত্রে বলেন—“আমরা রাজপুতরা আকবরের অধীনতা স্বীকার করেও এবং তাঁকে কন্যা দিয়ে অধপতিত হলেও আপনার জন্য আমরা গর্ব করি। সম্রাট আকবরকে একদিন মারতেই হবে তখন আমাদের দেশে খাঁটি রাজপুত বীজ বপনের জন্য আমরা আপনার কাছেই উপস্থিত হব। রাজপুত জাতি আপনার মুখের দিকে চেয়ে আছে।” পত্রটি যে একটি ঐতিহাসিক গবেষণামূলক চিন্তাভিত্তিক দ্বিধাবিদূরক দলিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাছাড়া পত্রটির দ্বারা তদানীন্তন রাজপুত জাতির বিশ্বাসঘাতকতার এক জঘণ্য চরিত্রের পরিচয় প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু মহামতি ছিলেন তখন গভীর মোহ নিদ্রায় অচেতন। পিতা-মাতার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করাই ছিল তার জীবনের লক্ষ্য দেশ রসাতলে যাক আর থাক তাতে কিছুই এসে যায় না।

যাই হোক, এ পত্র পাবার সাথে সাথে প্রতাপ নূতন করে রূপ ধারণ করলেন। রাজপুতগণ আকবর দ্বারা ভারত ভূমি কর্ষিত করে রাজপুত জাতির প্রতিষ্ঠার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতীক্ষা করছিলেন বীজ বপনের। কিন্তু কালেরচক্র পরিচালিত হয় বিশ্বনিয়ন্তার ইঙ্গিতেই।

মহামতির স্বধর্মে বিরোধিতা

বড় বড় আলেম, উলামা, মোল্লা, মুফতি বাদ দিয়ে মহামতি একজন কপট, বিভ্রান্ত মুসলমান মোবারক নাগুবীকে তার উপদেষ্টা পদে নিয়োগ করেছিলেন। আর তাঁরই সন্তানদ্বয় আবুল ফজল ও ফৈজীকেও করেছিলেন উপদেষ্টা। আকবরের ভুলভ্রান্তি চারিত্রিক দুর্বলতা ছেলেদের কাছে ধরা পড়া যে সম্ভব নয় অথবা প্রকাশিত হবার পথেও যে অনেক বাধা তা আকবরের জ্ঞানানুবিক্ষণে ধরা পড়েনি। তাই তিনি এক নূতন ধর্ম সৃষ্টি করলেন, যার নাম ‘দীন ইলাহি’। এক পক্ষের কাছে দারুণভাবে প্রশংসিত আর অপর পক্ষের কাছে তা নীরেট ভগামী ও আবর্জনার ন্যায় পরিত্যাজ্য বস্তু। মোটকথা নিরপেক্ষ ভূমিকায় ‘দীন ইলাহী’ ছিল মহামতি আকবরের স্বধর্মের নিপাত সাধনের এক সুপরিকল্পিত চক্রান্ত।

ইসলাম ধর্মে আল্লাহ্ ছাড়া কোন সৃষ্টির উপাসনা করা শুধু নিষেধই নয় বরং সৃষ্টির কোন উপাসক মুসলমান নয়। তাই হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) সারা জীবন ব্যাপী পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম করে বিশ্বকে জানিয়ে গেছেন উপাসনা একমাত্র স্রষ্টারই জন্যই।

(ক) কিন্তু মহামতি তাঁর ‘দীন ইলাহি’ ধর্মে সূর্য উপাসনার উৎসাহ ও আদেশ দিয়েছেন। তিনি নিজেও সকাল, সন্ধ্যা, দুপুর ও মধ্য রাত্রিতে সূর্যের উপাসনা করতেন।

(খ) সারা বিশ্বের মুসলমানদের মূল বিধান “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ” আল্লাহ ব্যতীত কেহ উপাস্য নেই এবং হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহরই প্রেরিত নবী বা রাসূল। কিন্তু আকবর তাঁর নতুন ‘কলেমা’ চালু করলেন “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আকবর খলিফাতুল্লাহ।” এত বড় আঘাত যা মুসলমানদের উপর কোন বিরুদ্ধবাদী অন্য ধর্মাবলম্বীর পক্ষেও সম্ভব হয়নি তাইই হয়েছিল ‘মহামতি’র ক্ষেত্রে।

(গ) কুরআনে মদ ও সুদকে অবৈধ বা হারাম বলা হয়েছে। কিন্তু মহামতির নতুন ধর্মে মদ ও সুদকে বৈধ বলে নির্দেশ এবং উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

(ঘ) কুরআন শরীফে জুয়া খেলাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, কিন্তু মহামতি তাঁর ধর্মে জুয়াখেলা জায়েজ বা বৈধ করেছেন। শুধু তাই নয়, রাজ খরচে বিরাট একটা পৃথক অট্টালিকা তৈরী করে সেখানে জুয়াখেলার সুবন্দোবস্তও করে দিয়েছিলেন। তাছাড়া জুয়াখেলায় যাদের পুঁজি বা মূলধন থাকত না রাজকোষ থেকে তাদের কর্ত্ত বা দেনা দেয়ারও সুব্যবস্থা ছিল।

(ঙ) ‘দাড়ি রাখা’ ইসলাম ধর্মে, ‘সুন্নাত’ বা হযরত মুহম্মদ (সাঃ) এর নির্দেশ। না রাখলে পাপ হয়। কিন্তু দাড়ি রাখাকে বা বিশেষ কোন সুন্নাতকে উপেক্ষা কিংবা অস্বীকার করলে সে ইসলাম বিদ্রোহী বলে বিবেচিত। মহামতি দাড়ি মুগুণ বৈধ বলে আইন করলেন এবং তাঁর মাতার মৃত্যুর পরেই মাতার শোকে দাড়ি মুগুণ করে আদর্শ স্থাপন করলেন। তার পরদিন থেকে রাজদরবারে যত উচ্চ শ্রেণীর কর্মচারী ছিলেন তাঁরা অনেকে নিজের নিজের দাড়ি মুগুণ করে বাদশাহের পদ প্রাপ্তে উৎসর্গ করলেন। ফলে মহামতি আকবর নিজের ধর্মের ও বুদ্ধির সাফল্যে বেশ আনন্দ উপভোগ করতে লাগলেন।

(চ) প্রত্যেক মুসলমানের জন্য কুরআন ও হাদীসের আইন অনুযায়ী স্ত্রী সংসর্গান্তে ‘ফরয গোসল’ (এক বিশেষ নিয়মে গোসল করা) অবশ্য প্রতিপাল্য। কিন্তু নতুন ধর্মে তা রহিত করা হয় এবং নতুন এক প্রথার প্রচলন করা হয়। গোসল করা ভাল কিন্তু পরে নয় পূর্বে।

(ছ) মহামতি দেশের কল্যাণের জন্য না হলেও নিজের বা রাজপুতদের এবং সবাদবর্গের সুবিধার্থে এক অভিনব বিবাহ প্রথার প্রচলন করলেন যার নাম ‘মৃত্তা’ বা অস্থায়ী বিবাহ। যেমন দু-চার দিন বা দু-এক মাসের জন্য একটা বিয়ে করে আবার তাকে তালাক বা বর্জন করা যাবে। বিবাহের নাম দিয়ে এরূপ এক বীভৎস ব্যভিচার প্রথার প্রচলন করে নারীর নারীত্বকে কলঙ্কিত করতে মহামতির মতি কোন সময় কঁপে উঠেনি।

(জ) ব্যভিচারের সুবিধার্থে, ইসলামের সুচিন্তিত ‘পর্দা প্রথাকে’ একেবারে রহিত করেন এবং সারা ভারতের মুসলমান হিন্দু ভদ্র রমণীগণের মধ্যে ভাবগুণ্ঠন যথা টিলে পোশাক পরা, মাথার কাপড় উড়ানা ব্যবহার করা ইত্যাদি যে সভ্য নীতিগুলোর প্রচলন ছিল, মহামতি কঠোর হস্তে নির্দেশ দিয়ে তা নিষিদ্ধ করলেন। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের

মধ্যে একটা লজ্জাশীলতা বা শালীনতাবোধ ছিল। কিন্তু মহামতি নির্দেশ দিলেন—বাজারে বা বাইরে চলা ফেরার সময় মাথায় কাপড়, পর্দা অথবা অবগুণ্ঠিতা হওয়া চলবে না।

(ঝ) বার বছরের কম বয়স্ক বালকদের ‘খতনা’ দেয়া নিষিদ্ধ। সে বড় হয়ে নিজের ইচ্ছায় দিতেও পারে আবার না দিতেও পারে।

(ঞ) মৃত মুসলমানকে কবর দেয়া সারা পৃথিবীর মুসলমানের একটা সার্বজনীন প্রথা ও ইসলাম ধর্মের নির্দেশ। আর কবর দেয়ার নিয়ম মৃত দেহটিকে কবরে এমনভাবে শায়িত করা (ভারতে উত্তর দক্ষিণে) যেন মক্কার কা’বা ঘরের দিকে পা মাথা না থাকে। মহামতি নির্দেশ দিলেন মৃত ব্যক্তির দেহের একটা ইট বেঁধে পানিতে ফেলে দাও। আর যদি একান্তই কবর দিতেই হয় তাহলে ভারতের পশ্চিম দিকে কা’বা শরীফ, অতএব সেই পশ্চিম দিকে পা করে মৃত দেহটিকে শায়িত রাখতে হবে।

(ট) ইসলামের আইনে পুরুষদের জন্য প্রকৃত রেশম বা সিল্ক বস্ত্র ও সোনা পরা অবৈধ। নারীর জন্য অবশ্য বৈধ। মহামতি আইন করলেন পুরুষের জন্য সোনা এবং সিল্ক ব্যবহার করা নিষিদ্ধ নয়।

(ঠ) মহামতির নতুন ধর্মে গরু, মহিষ, মেঘ, উট খাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু বন্য জন্তু যথা—বাঘ, ভালুক, সিংহ ইত্যাদি খাওয়া চলবে। গো মাংস খাওয়া শুধু নিষেধই ছিল না এমনকি বিশ্ব মুসলিমের অতীব গুরুত্বপূর্ণ উৎসব ‘ঈদুল আজহাতেও’ গরু যবাই পর্যন্ত নিষিদ্ধ ছিল।

(ড) মসজিদ আযান ও এক সাথে (জামাতে) নামায পড়ার ব্যবস্থা বন্ধ করা হয়েছিল।

(ঢ) পবিত্র মক্কা শরীফে হজ্জ পালন যুগে যুগে সর্বদেশের স্বচ্ছল মুসলমানের জন্য একবার জরুরী, যাকে বলে ফরয। হঠাৎ আইন প্রণয়ন করে হজ্জের রাস্তাও বন্ধ করা হল।

(ণ) কুকুর ও শূকর ইসলাম ধর্মে ঘৃণ্য পশু বলে চিহ্নিত। কিন্তু মহামতি তাঁর সময়ে কুকুর ও শূকরকে আল্লাহর ‘কুদরত’ (মহিমা) প্রকাশক পবিত্র বলে ঘোষণা করেন।

(ত) মহামতি আকবর কুরআন বিশ্বাস করতে নিষেধ করতেন। অর্থাৎ মহামতির দুর্গতিপূর্ণ দৃষ্টিতে সারা পৃথিবী নাস্তিকতার শিকার হয়ে ধ্বংসলীলার কারণ হোক।

(থ) প্রত্যেক মুসলমানকে তাঁর মুসলমানীত্ব বজায় রাখার জন্য মৃত্যুর পর পুনরুত্থান এবং বিচার দিবসের উপর বিশ্বাস করা একান্ত জরুরী কিন্তু মহামতি পুনরুত্থান ও বিচারের ব্যবস্থাকে অস্বীকার করতেন।

(দ) মুসলমান ধর্মে আল্লাহ ব্যতীত কোন সৃষ্টির সম্মানের জন্য ‘সিজদা’ করা অবৈধ ও কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। কিন্তু আকবর তাঁর দরবারে প্রজাদিগকে ‘সিজদা’ করার জন্য আইন প্রণয়ন ও বলবত করেন।

(ধ) মুসলমানদের একে অপরের সাথে সাক্ষাত হলে 'আসসালামু আলাইকুম' (আল্লাহ্ আপনার উপর শান্তি প্রদান করুন) বলার নিয়ম আছে। প্রত্যুত্তরে 'ওয়া আলাইকুমুস সালাম' (আপনারও উপর শান্তি বর্ষিত হোক) বলা হয়ে থাকে। যুগ যুগ ধরে সারা বিশ্বের মুসলমানদের এ একই পদ্ধতি ছাড়া দ্বিতীয় কিছু নেই।

মহামতি সালাম দেয়ার প্রথার বিলোপ সাধন করে তার পরিবর্তে 'আল্লাহ্ আকবর' বলার নিয়ম চালু করেছিলেন। তার উত্তরে 'জাল্লা জালালাহ্' বলা হত। তখন হিন্দু প্রজাগণ তাঁর কাছে নিবেদন করলেন, সম্রাট আপনার কাজকর্ম দেখে সমস্ত হিন্দুই আপনার উপর সন্তুষ্ট। তাই হিন্দুরা আপনাকে দিল্লীশ্বর ও জগদীশ্বর বলে। কিন্তু আপনি সালাম তুলে দিয়ে আবার আল্লাহ শব্দ ব্যবহার করলেন কেন? অতএব এটাও তুলে দিন। তখন আকবর হিন্দু প্রজাবর্গের নিশ্চিন্ত করতে বললেন---মুসলমানদের জন্য আমিই স্বয়ং আল্লাহ্ হয়ে প্রকাশিত হয়েছি। 'অর্থাৎ আল্লাহ্ আকবর' মানে আকবরই আল্লাহ্। অতপর তাঁর অনুগত হিন্দু প্রজাগণ আবার অভিযোগ করলেন--আল্লাহ্ শব্দটা হিন্দু বিরোধী। অতএব এটাকেও তুলে দিন। আকবর তাই করলেন। সারা দেশে ঘোষণা করে দিলেন আজ থেকে 'সালাম' বা 'আল্লাহ্' পরিবর্তে 'আদাব' শব্দ ব্যবহার করতে হবে। এটাই হল মহামতির মহা সিদ্ধান্ত।

(ন) যীশু খ্রিস্টের সাথে যেমন 'খ্রীষ্টাব্দ' বিজরিত তেমনি 'হিজরী' সন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সাথে সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু হিন্দু প্রজাবন্দ 'দিল্লীশ্বরের' নিকট আবেদন করলেন--আমরা আপনার উদারতায় মুগ্ধ, আপনাকে হিন্দুর মত মনে করে আমরা আপনার সাথে সর্ব বিষয়ে মিল ও মিলনের পথে একমত। কিন্তু গুপ্তগোল ভারতের চিরদিনের প্রথা এ 'হিজরী' সন। যত দিন ভারতে 'হিজরী' সন থাকবে ততদিন মুহাম্মাদেরই নাম থেকে থাকবে অথচ আমরা ভারতের সংখ্যাগরিষ্ট। অতএব আমাদের জন্য এক পৃথক সালের ব্যবস্থা করা হোক। তাই করা হল। পৃথক সালের নাম রাখা হল 'ইলাহী' বছর। আমাদের বাংলা সন অনেকের মতে আকবরেরই এ সন। হিজরী সনে সাথে প্রায় এক যুগের পার্থক্য অর্থাৎ ১৪ বছর। তাতে অনেক হিন্দু প্রজাবর্গ তাদের কৃতকার্যতার দরুন মহামতির মথেকের প্রতি খুবই আস্থাবান হলেন। যদি রাজপুত বা হিন্দুদেরই কেহ দিল্লীর রাজা হয়ে এ রকম ইসলাম ধর্মের উৎপাতন করতে সাহসী থেকে তাহলেও এতটা মারাত্মক ফল দেখা দিত না। কারণ মুসলমান সম্প্রদায় তাতে বিদ্রোহী হয়ে উঠত। কিন্তু কোন মুসলমান অথবা মুসলমান নামধারী ব্যক্তির দ্বারা এ কীর্তি করাতে পারলে দোষ যা হবার মুসলমানেরই হবে।

এখানে প্রমাণ হচ্ছে আকবর আসলে ইসলাম ধর্ম বিধ্বংসী কতকগুলো চরম পন্থী মানুষের হাতের পুতুল ছিলেন।

(প) মুসলমানদের মসজিদ ইবাদতগাহগুলোকে অনেক গুদাম ঘর ও হিন্দু প্রজাদের চিত্তবিনোদনের স্থানে রূপান্তরিত করেছিলেন।

(ফ) ইসলাম ধর্ম নিঃশেষিত থেকে পারে কিনা তা পরীক্ষার জন্য কিছু মসজিদ হিন্দু প্রজারা ভেঙ্গে ফেলে সে স্থানে মন্দির নির্মাণ করেন। আকবরের কাছে প্রতিবাদ

করলে তিনি যুক্তি দেখালেন, "মুসলমানদের জন্য এ মসজিদগুলো সত্যিকারের প্রয়োজন নিশ্চয়ই ছিলনা। যদি থাকত তাহলে ভাঙ্গা সম্ভব হত না। মন্দিরের প্রয়োজন ছিল তাই মন্দির নির্মাণ করা হয়েছে। মসজিদও ধর্মস্থান আর মন্দিরও ধর্মস্থান। একটি ধর্মস্থান ভেঙ্গে অধর্মের কিছু গড়ে উঠলে প্রতিকার করা যায় কি না বিবেচনা হত। কিন্তু ধর্ম স্থানের পরিবর্তে ধর্ম স্থান গড়ে উঠেছে।" তার পরেই মসজিদ সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করে নতুন মসজিদ নির্মাণ বন্ধ করে দেয়া হয়।

(ঘ) মুসলমান ধর্মের হৃৎপিণ্ড পবিত্র কুরআন ও হাদীস শিক্ষা, শিক্ষালয় বা শিক্ষাদাতাদের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে আকবর সবচেয়ে মারাত্মক ও কুৎসিত কর্মের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। অর্থাৎ ইসলাম সংক্রান্ত শিক্ষার চির অবসানই ছিল আকবরের উদ্দেশ্য। এক কথায় হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) যা নির্দেশ বা নিষেধ করেছেন, তিনি যেন তার সঙ্গে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছেন। পৃথিবীর ইতিহাসে কোন মুসলিম বিদেষী অমুসলমান শাসকও যা কল্পনা করেন নি, মহামতি তা বাস্তবে পরিণত করার কত পাকাপাকি ব্যবস্থা করেছেন এত আলোচনার পর সে কথা সহজেই অনুমেয়।

অতএব উল্লেখিত ২৩টি উদাহরণ বোঝার কোন অসুবিধা নেই যে, আকবর 'ঘরের শত্রু বিভীষণ' ছিলেন অথবা নামধারী ছদ্মবেশী মুসলমান ছিলেন। মনে করা যাক 'ক' একজন হিন্দু কিন্তু তিনি নিজ ধর্মে উদাসীন এবং পর ধর্মের শত্রুতা করেন না। অতএব তিনি একজন উৎকৃষ্ট হিন্দু নন। 'খ' একজন হিন্দু তিনি নিজ ধর্মের ধার্মিক কিন্তু অপর ধর্মের শত্রু অতএব তিনিও একজন নিকৃষ্ট। 'গ' একজন হিন্দু। তিনি নিজ ধর্মে আস্থাবান, কিন্তু অপর ধর্ম বা সম্প্রদায়ের ধ্বংসকামী নন। অতএব তিনি একজন উৎকৃষ্ট হিন্দু ভদ্রলোক। 'ঘ' একজন হিন্দু। তিনি নিজ ধর্ম পালনকারী এবং অপর ধর্ম বা সম্প্রদায়েরও উন্নতি কামনা করেন। অতএব তিনি আরও উৎকৃষ্ট বা উচ্চতর 'ঙ' একজন হিন্দু। তিনি নিজ ধর্মে নিষ্ঠাবান। অনিষ্ঠাবান হিন্দুদের তিনি ভাল করে গড়ে তুলতে চান এবং অপর ধর্ম বা সম্প্রদায়েরও উন্নতি কামনা করেন। তিনি নিঃসন্দেহে আরো উচ্চস্থানীয় অর্থাৎ সর্বোৎকৃষ্ট। 'চ' একজন হিন্দু। পরে তিনি অপর ধর্মে ধর্মান্তরিত হন। তিনি হিন্দু জাতির শত্রু। অতএব তিনি নিকৃষ্ট। 'ছ' একজন হিন্দু। তিনি হিন্দু বলে পরিচয় দেন কিন্তু বেদ, পুরাণ বা গীতায় অবিশ্বাসী এবং পৃথিবী থেকে এগুলো মুছে ফেলার জন্য সমস্ত শক্তি অধীনস্থদের উপর প্রয়োগ করেন। তিনিই হচ্ছেন নিকৃষ্টতম এবং বিশ্বাসঘাতকের দলে শীর্ষস্থানীয়। এক্ষণে আকবরের অবস্থাও ঠিক তাই কি না নিরপেক্ষ চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবীরা চিন্তা করবেন।

কিন্তু একটা কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, উপরোক্ত তথ্যগুলো যদি সত্য হয় তবেই আকবর এ অভিযোগে অভিযুক্ত কিন্তু যদি কোন ইতিহাসে তার প্রমাণ না থাকে তাহলে অভিযোগের অধিকার আধুনিক ঐতিহাসিকদেরই বা থাকবে কি করে? কিন্তু উল্লেখ করা যেতে পারে এসবাতুন নব্যত', 'রিসালায়ে তাহলীলিয়া', 'মুনতাক্বাবুত ওয়ারিখ', 'Mujaddis conception of Towhid', 'Awn-ul-

'Mabud' এবং 'Kalematul Hoque', প্রভৃতি অসংখ্য গ্রন্থ আকবরের কীর্তিকলাপের সাক্ষী স্বরূপ আজও বেঁচে রয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন লাইব্রেরীতে। যেগুলো পড়ে অব্যর্থ সত্য ইতিহাসের উৎস সন্ধানে উৎসাহের খোরাক পাওয়া যাবে। এছাড়া আরও বহু পত্র-পত্রিকা আমাদের দেশে ছোট বড় লাইব্রেরীতেও মজুদ রয়েছে, যেগুলো হিন্দু, মুসলমান ও খ্রিস্টান প্রভৃতি ঐতিহাসিকদের তথ্য, তিরস্কার ও অনেক তত্ত্বের মিশ্রণে মূল্যবান সম্পদ।

এত কাণ্ড করেও আকবরের সমস্ত দোষ কাটাকাটি করে বিরাট ভগ্নাংশের শেষে উত্তর মাত্র '১' অর্থাৎ একটিই কথা মহামতি আকবরে বর। মুসলমান বাদশাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আকবর। কিন্তু এ কণ্ঠস্বর কাদের? আধুনিক নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকদের মতে, যারা জ্ঞাতাবস্থায় সারা বিশ্বের তথা ভারতের মুসলমানদের চরিত্রহীন 'ধর্মহীন' ব্যাচিচারী এবং ধর্মান্তরিত অবস্থায় দেখার প্রতীক্ষায় আছেন এ আওয়াজ তাঁদেরই।

আরও প্রমাণ হবে, সবচেয়ে অপরাধ, অপমান বদনাম আর দুর্গামের এভারেস্ট যাঁর মাথায় চাপিয়ে দেয়া হয়েছে সে আহত ভাগ্য আওরঙ্গজেবের ওরফে আলমগীরের ইতিহাস যদি আকবরের পাশাপাশি আলোচনা করা হয়।

মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব

একপক্ষ বলেন, আওরঙ্গজেব ছিলেন গোঁড়া হিন্দুবিদ্বেষী এবং অত্যাচারী। অত্যাচারের প্রমাণ স্বরূপ ভ্রাতাদের হত্য, বৃদ্ধ জন্মানাতাকে বন্দী এবং হিন্দু প্রজাদের ধর্মের নামে অত্যাচার যথা জিজিয়া কর গ্রহণ, হিন্দুদের মন্দির অপবিত্র করা বা ভেঙ্গে ফেলা ইত্যাদি অনেক কিছু উদাহরণ উত্থাপন করেন।

আর অপর পক্ষ বলেন, আওরঙ্গজেব বা আলমগীর সমস্ত মুসলমান নৃপতির মধ্যে শ্রেষ্ঠতম, নিষ্ঠাবান, ধার্মিক, সমগ্র কুরআন শরীফ কণ্ঠস্থকারী (হাফিজ) আলেম (বিজ্ঞ), সাধক, নিরপেক্ষ, উদার, দূরদর্শী এবং উপযুক্ত আদর্শ বাদশাহ ছিলেন। তিনি 'জিন্দাপীর' বলেও গণ্য থেকেন।

প্রথম পক্ষের বক্তব্য প্রমাণ করার জন্য স্কুল, কলেজ ও ইউনিভার্সিটির সাধারণ ইতিহাসই যথেষ্ট বলে বিবেচিত। আমাদের অনেকের মন মগজে এবং কাগজে তার প্রমাণের প্রাচুর্য অব্যর্থভাবে পরিপাক্ষিত হচ্ছে। কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষের উক্তি প্রমাণে বহু দলিল ও ঐতিহাসিক সমর্থন এবং বিজ্ঞানপূর্ণ যুক্তি-তর্ক ছাড়া মনে নেয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া উচিতও নয়।

স্কুল, কলেজ ও ইউনিভার্সিটি এ তিনটি আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্র। তন্মধ্যে মধ্যপন্থা অবলম্বন হিসেবে কলেজের ইতিহাস এ 'ভারতজনের ইতিহাস' থেকেই উদ্ধৃতি দিচ্ছে। ভারতের হাজার হাজার পাঠ্য পুস্তক ও ইতিহাসের উদ্ধৃতি দেয়াও যেমন সম্ভব নয় তেমনি সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্য ইতিহাসের সমস্ত কথা বাদ দেয়াও যায় না।

এখানে প্রসঙ্গত হৃদয় ফলকে গোঁথে নেয়ার মত একটা কথা হচ্ছে এটাই যে, শিশু অবস্থায় শিশুর কচি মনের কোমল স্মৃতিপটে যে ছবি আঁকা যায় তা বয়স বৃদ্ধির সাথে

সাথে সুস্পষ্টতর ও আরও গভীর হয়ে মস্তিষ্ক পর্যন্ত আলোকিত অথবা সংক্রামিত করে। শিশুর মা যেমন শিশুকে পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন, ঠাকুর-দেবতা, মন্দির মসজিদ অথবা ভূত-প্রেতের প্রতি যে ধারণা জন্মিয়ে দেন শিশু সাধারণতঃ বয়োপ্রাপ্ত হয়েও সে প্রভাবে আড়ষ্ট হয়ে থাকে। তেমনি স্কুলের ইতিহাসগুলো যদিও সংক্ষেপ তবুও তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অতএব শিক্ষাদাতা ও শিক্ষাদাত্রী এবং শিক্ষা গ্রহীতা ও গ্রহীত্রীকে খুবই সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। স্কুলে যদি মাথায় এ কথাটুকু প্রতিষ্ট হয় যে, আকবরকে মহামতি বলা হয়। তিনি হিন্দু মুসলমানকে সমান চোখে দেখতেন। আর আওরঙ্গজেব ছিলেন খুব ধর্ম ভীরা পণ্ডিত। কিন্তু তিনি হিন্দু বিদ্বেষী ছিলেন, হিন্দুদের উপর জিজিয়া কর চাপিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বৃদ্ধ পিতাকে বন্দী ও ভাইদের হত্যা করে সিংহাসনে বসেছিলেন ইত্যাদি। তাহলে সাধারণতঃ এক্ষেত্রে তারপর আরও বহু ইতিহাস পড়লেও বাল্যকালের এ প্রভাবটুকু কাটিয়ে উঠা কত যে কঠিন তা আজ নিরপেক্ষ চিন্তাশীল পাঠক-পাঠিকাদের চিন্তা করে দেখার দিন এসেছে এবং দেখতে হবে। আমাদের এ কথাগুলো মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করলেই আশা করি যথেষ্ট হবে।

বর্তমানে এ ভারতজনের ইতিহাসে শ্রীঘোষ বলেছেন, “শাহজাহানের মৃত্যুর আগেই ঔরঙ্গজীবের রাজ্যাভিষেক হয় (জুলাই ১৬৫৮ ও জুন ১৬৫৯) তাঁর মৃত্যুর পর ৩য় বার ঔরঙ্গজীব মহাসমারোহে আখ্যার দুর্গের সিংহাসনে অভিষিক্ত হন (মার্চ ১৬৬৬)। তিনবার অভিষেক কোন মোঘল সম্রাটের হয় নাই। কিন্তু ঔরঙ্গজীব যে মোঘল সম্রাটের মধ্যে বহুদিক দিয়ে অদ্বিতীয় হইবেন, একাধিক অভিষেক হইতে তাহার আভাস পাওয়া গিয়াছিল।”

“রাজপুতদের প্রতিরোধ ব্যর্থ হয়, ঔরঙ্গজীব মারওয়াড় দখল করেন এবং নানা স্থানে মোঘল ফৌজ নিযুক্ত করেন। তাহার আদেশে হিন্দু দেবালয় ধ্বংস করিয়া বহু মসজিদও প্রতিষ্ঠিত হয়।” (ভারতজনের ইতিহাস)

“১৬৭৯ খ্রিস্টাব্দে ঔরঙ্গজীব জিজিয়া কর পুনঃ প্রবর্তন করেন।” (ভারতজনের ইতিহাস)

“ইসলাম ধর্মের আদেশ অনুসারে মুসলমান রাষ্ট্র ভিন্ন ধর্মের কোন স্থান হইতে পারে না। পাঠান ও মোঘল সম্রাটদের মধ্যে যাহারা ভিন্ন ধর্মীদের প্রতি বিশেষ করিয়া হিন্দুদের প্রতি উদার ব্যবহার করিয়াছেন তাহারা ব্যক্তিগত মত্থেকের পরিচয় দিয়াছেন সত্য, কিন্তু ইসলামের আদর্শসেবক বলিয়া গোঁড়া মুসলমানদের কাছে শ্রদ্ধা ও প্রশংসা লাভ করিতে পারেন নাই। ঔরঙ্গজীব নিজেকে ইসলাম ধর্মের আদর্শসেবক বলিয়া মনে করিতেন এবং রাষ্ট্র, সমাজ, শিক্ষা সংস্কৃতি প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রে তিনি ইসলামের অনুশাসন বর্ণে বর্ণে পালন করিবার চেষ্টা করিতেন। সেই জন্য তাহার রাষ্ট্রনীতিতে মুসলমান ছাড়া কোন ধর্মাবলম্বীর দাবী বা অধিকার স্বীকৃত হইত না। বিধর্মীর অধিকার স্বীকার করা ইসলাম ধর্ম বিরুদ্ধ।” (ভারতজনের ইতিহাস)

এ সমস্ত সাংঘাতিক কথায় এইটাই প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে যে, ঔরঙ্গজেব পূর্ণভাবে ইসলাম মেনে চলতেন। আর ইসলাম মেনে চললেই ঠিক তাকে পশু প্রকৃতির বর্বর, অনুদার এবং হিন্দু বিদেষী থেকেই হবে। তারপর আরও যা লেখা হয়েছে তা খুব গভীর চিন্তার বিষয়। এ ইতিহাসে আরও আছে—“চিন্তামন মন্দিরে গো হত্যা করিয়া তিনি সাড়ম্বদের তাহা মসজিদে পরিণত করিয়াছিলেন। সে সময় গুজরাটে আরও বহু হিন্দু দেবালয় তিনি ধ্বংস করিয়াছিলেন।” আরও লেখা আছে, “তিনি বিধর্মী হিন্দুদের সমস্ত টোল, চতুষ্পাঠ দেব দেউল ধ্বংস করিতে বলেন। সে আদেশ অনুসারে হিন্দুদের বড় বড় তীর্থস্থানে বিখ্যাত দেব মন্দির ধ্বংস করাইয়াছেন—”

আরও লেখা হয়েছে—“গুজরাটে হিন্দুদের সমস্ত সম্পত্তি তাঁহার আদেশে বাজেয়াপ্ত করা হয়” এ বিখ্যাত ইতিহাসে লেখক আরও লিখেছেন—“আগেই বলিয়াছি যে ইসলাম ধর্ম অনুসারে মুসলমান রাষ্ট্রে বিধর্মীর বসবাসের কোন অধিকার নাই।” ইতিহাসে আরও লেখা হয়েছে—“অর্থাৎ বিধর্মী বলিয়া মুসলমানী ভারত রাষ্ট্রে তাহাদের বাস করিবার অধিকার নাই তাহা সত্ত্বেও হিন্দুদের বাস করিতে দেয়া হইতেছে বলিয়া মুসলমান সম্রাট হিন্দুদের মাথা পিছু জিজিয়া কর দিতে বাধ্য করিতেন।” তার পরেই এ ইতিহাস দ্বি ছাত্র-ছাত্রীদের উত্তেজিত করার কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে বলে অনেকের অনুমান। যেমন লেখক বলেছেন, “ভারতবর্ষ যাদের চিরকালের মাতৃভূমি সেই হিন্দুদের পরদেশবাসীর মত অপমান ও অত্যাচার সহ্য করিয়া লক্ষ লক্ষ টাকা জিজিয়া কর দিতে হইত এ দেশে বাস করিবার জন্য। ইতিহাস এত বড় নিষ্ঠুর পরিহাস সহ্য করে না।” এছাড়া ঐ ইতিহাসে আরও বলা হয়েছে—“নূতন করিয়া জিজিয়া প্রবর্তনের পর দিল্লীর বিক্ষুব্ধ জনতা সম্রাটের কাছে উহা প্রত্যাহারের জন্য আবেদন করিয়াছিল। সম্রাট ঔরঙ্গজীব তাহাতে বিচলিত হন নাই। উপরোক্ত তিনি জনতার উপর দিয়া হাতী চালাইয়া তাহাদের পদদলিত করিয়া মারিবার আদেশ দিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্যে ছিল অসহায় হিন্দুদের জোর করিয়া মুসলমান করা।”

“হিন্দুরা মুসলমান হইলে তাহাদের হাতীর পিঠে বসাইয়া শোভাযাত্রা করিয়া লইয়া যাওয়া হইত।” এতদ্ব্যতীত আরও লেখা হয়েছে—“ঔরঙ্গজীবের ধর্মান্দ নীতির ফলে রাজপুত শক্তিও মোঘলদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল।” “দাক্ষিণাত্যের বিরাট হিন্দু পুনরুত্থান হইয়াছিল মারাঠা বীর শাহজী শিবাজী শম্ভুজীর নেতৃত্বে।”

লেখক উপরোক্ত বাক্যগুলো স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় যাই লিখেছেন লেখার আসল নায়ক যিনি বা যারা তাঁদের আজ সমাজের কাছে ভুল প্রচারের অপরাধজনিত কলঙ্কের বোঝা বহন করতে হচ্ছে এবং হবেও। কারণ ইসলাম ধর্মে কোথাও বলা হয়নি যে, “বিধর্মীদের অধিকার স্বীকার করা ইসলাম ধর্মে নিষিদ্ধ” বরং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ইতিহাস এ কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় যে তিনি অমুসলমানদের পাশাপাশি বাস করেছেন এবং মিলেমিশে থাকার জন্য ঐতিহাসিক সন্ধিস্থাপন করেন। আজও আরবে বহু ধর্মের মানুষ বসবাস করছেন। সারা পৃথিবীতে কোন মুসলমান রাষ্ট্রে এ অলীক আজগুবি অবান্তর আলেখ্য দৃষ্টিগোচর হয়না।

এমনিভাবে চিন্তামন মন্দিরে গো হত্যা করাও কুচিন্তা বা কু-কল্পনার নামান্তর। ‘হিন্দুদের মন্দির ধ্বংস’, ‘সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত’, ‘জোর করিয়া মুসলমান করা’ ইত্যাদিগুলো কতটুকু সত্য আর কতটুকু মিথ্যা তা একজন অমুসলিম ঐতিহাসিকের বর্ণনায় এবার এক্ষণে পরিষ্কার হয়ে উঠবে। বাবু নগেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় তাঁর পুস্তকে লিখেছেন, “ভোগ ঐশ্বর্যের মধ্যে বাস করিয়া কেবলমাত্র পার্থিব জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতে মোঘলেম নরপতিগণ অভ্যস্ত ছিলেন না। তাঁহারা সহস্র কাজে লিপ্ত হইয়াও কখনো বিস্মৃত হন নাই যে, তাঁহাদিগকে একদিন আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কার্যকার্যের কৈফিয়ত দিতে হইবে। ইসলামের মহত আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া বাদশাহগণ ন্যায়ের সীমার মধ্যে অবস্থিত করতঃ তাঁহাদের অধীন সমস্ত প্রজাবৃন্দকে সমক্ষে দেখিতেন। নরপতির ন্যায় বিচারে প্রজার সন্তোষ এবং অসন্তোষের উপর রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত, তাঁহাদিগের অন্তঃকরণে এই সত্য যেন সুবর্ণ অক্ষরে খচিত ছিল।... ধর্মান্তর গ্রহণ সম্বন্ধে কেহ কখনও বলপ্রয়োগ করিয়াছেন—এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। মুসলমান বাদশাহদের যদি সে উদ্দেশ্য থাকিত—তাহা হইলে এতদিন রাজত্ব করিবার পর হিন্দুস্থানে হিন্দুর সংখ্যা কখনও মুসলমানের চতুর্গুণ হইতনা। হিন্দু ও মুসলমান একই দেশে একই পল্লীর ভিতর এই সুদীর্ঘকাল ব্যাপী মুসলিম রাজত্বের মধ্যে পরম সুখে পরম শান্তিতে বসবাস করিয়াছিল। বিদেশী স্বার্থক ঐতিহাসিকগণের কাল্পনিক চিত্রে অঙ্কিত মুসলমান নরপতিগণের স্বেচ্ছাচারিতা, নৃশংসতা ও ধর্মান্ধতার বিষয় পাঠ করিয়া এবং কতিপয় স্বার্থপর বিদ্বৈষপরায়ণ লোকের প্রচারিত জনবরের উপর আস্থা স্থাপন করিয়া এখনও সেইসব মহানুভব নরপতিগণের নিন্দা ও কুৎসা প্রচার করিয়া থাকেন। রাজকার্যে যোগ্য ব্যক্তিকে নিয়োগ করিয়া মুসলমান শাসনকর্তাগণ ন্যায়পরায়ণতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেন। এমনি কি হিন্দু বিদেষী বলিয়া অভিহিত সম্রাট আওরঙ্গজেব হিন্দুকেই প্রধান সেনাপতি পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। রাজকার্যে যোগ্য ব্যক্তি তাঁহার নিকট বিশেষ রূপে সমাদৃত হইত। সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্বের কলঙ্ক কেহ তাঁহার উপর আরোপ করিতে পারে নাই। রাজ্যে শুভাশুভের দায়িত্ব হিন্দুগণের উপর ন্যস্ত ছিল। তাঁর রাজত্বকালে দুইজন অমুসলিম কর্মচারী রাজস্ব বিভাগে অতি উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

কয়েকজন ধর্মাত্মক তাঁহার নিকট অভিযোগ করিয়াছিল রাজস্ব বিভাগে হিন্দুকে এইরূপ বিশ্বাস করা অনুচিত। সম্রাট তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া উত্তর দিয়াছিলেন তিনি শরীয়তের (ধর্মনীতির) বিধি প্রতিপালন করিয়া যোগ্য ব্যক্তিকে যোগ্য পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। পবিত্র কুরআনে উক্ত হইয়াছে “যাহারা বিশ্বাসের উপযুক্ত তাহাদের উপরেই বিশ্বাস স্থাপন করিবে এবং ন্যায়ের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া বিচার কার্য সম্পাদন করিবে।”

এক একজন বাদশাহের ত্যাগের দৃষ্টান্ত পাঠ করিলে শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। তাঁহারা অনেক সময় রাজভাণ্ডার মুক্ত করিয়া দান করিতেন। কি দীন-দুঃখী কি অভাবগ্রস্ত কখনো বিফল মনোরথ হইত না। কোন কোন বাদশাহ প্রাচীন যুগের খলিফাগণের অনুকরণে বিলাস বর্জিত অতি সাধারণ জীবন-যাপন করিতেন এবং কায়িক পরিশ্রম দ্বারা তাহাদের পোষ্যবর্গকে প্রতিপালন করিতেন।

বাদশাহ ফিরোজশাহ তোঘলক বহু জনহিতকর কার্যে রাজকোষ হইতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন, কৃষি কার্যে সুবিধার্থে তিনি পঞ্চাশত জাঙ্গান (বাঁধ), চতুর্বিংশৎ মসজিদ, ত্রিংশৎ শিক্ষালয়, শতাধিক পান্থশালা, ত্রিংশৎ তড়াগ, শতাধিক দাতব্য চিকিৎসালয়, এক শত স্নানাগার এবং শতাধিক সেতু ও বহু জনহিতকর কার্য করিয়া ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন। সম্রাট আওরঙ্গজেব তাঁহার কায়িক পরিশ্রম লব্ধ অর্থ দ্বারা তাঁহার সাংসারিক ব্যয় নির্বাহ করিতেন। তিনি টুপি সেলাই ও পবিত্র কুরআন শরফি লিখিয়া তাঁহার শেষ জীবনে আটশত পাঁচ টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে মাত্র চারি টাকা আট আনা তাঁহার অন্তেষ্টিক্রিয়ার জন্য রাখিয়া অবশিষ্ট সমস্ত অর্থ দীন-দুঃখীকে দান করিবার জন্য উইল করিয়া গিয়াছিলেন।.....সম্রাট বাবর তাঁহার উপাসনা বলে বিশ্ব নিয়ন্তাকে হৃদগত করিয়া তাঁহার নিজের জীবনের পরিবর্তে জীবনাধিক পুত্র হুমায়ুনের জীবন ফিরিয়া পাইয়াছিলেন। যে সমস্ত ঐতিহাসিক কি উপন্যাসিক মুসলমান বাদশাহদিগের অন্তঃপুরে সুরার তরঙ্গ প্রবাহিত করিয়াছেন তাঁহাদের মিথ্যা উক্তির প্রতিবাদ করিতে আমরা ঐতিহাসিক লেনপুল প্রণীত “আওরঙ্গজেব” পাঠ করিতে পাঠকবর্গকে অনুরোধ করিতেছি। সম্রাট নিজে কখনও মদ্য স্পর্শ করেন নাই এবং আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবগণকে সুরা পান করিতে কখনও প্রশ্রয় দেন নাই। ধর্মপরায়ণ আওরঙ্গজেব তাঁহার প্রজাবর্গের ভক্তি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন।”

অতএব নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে সম্রাট আওরঙ্গজেবের সচ্চরিত্রের উপর যাঁরা কলঙ্কের কালিমা লেপন করে ইতিহাসের পাতাকে দূষিত করেছেন প্রকৃত ইতিহাস তাঁদের কখনো ক্ষমা করবে না।

যাঁরা আজ আকবরের প্রশংসায় পঞ্চমুখ তাঁদের চমক ভাঙ্গাবার সময় হয়েছে ইংরেজদের শত শত বছর ভারত শাসন অথবা শোষণের ইতিহাস, হিন্দু মুসলিম প্রভৃতি জাতীয় ভারতীয়দের লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা তথা স্বাধীনতার গ্লানির বীজ আকবরের সময়েই অঙ্কুরিত হয়েছিল। তিনিই প্রথমে ইংরেজ পাদ্রীদের রাজ দরবারে স্থান দেন এবং ইংরেজ মহিলা হেরেমে স্থান দেন। তারপর উদারতার নামে রাজনীতির খেলা শুরু করেন। কিন্তু ব্যভিচার প্রবণতার জন্যই আকবর ইংরেজদের মতলব বুঝেও না বোঝা হয়ে কাটিয়ে দিলেন। তাঁর পুত্র জাহাঙ্গীর যখন বাবার প্রতিনিধি হয়ে দিল্লীর সিংহাসনে আসীন হলেন তখনই ইংরেজ জাতি ব্যবসার তুলাদণ্ড হাতে নিয়ে জাহাঙ্গীরের হাতের স্বাক্ষরে রাজকীয় মোহর যুক্ত পত্রে অনুমতি প্রাপ্ত হন। আর এ অনুমতিই ভারতে শোষণ শাসনের অনুপ্রবেশদ্বার—এ অনুমতিই পরামাণু হয়ে শেষে ইংরেজদের পরমাণু এবং পারমানবিক বিস্ফোরণে বিবর্তিত হয়েছে। মদ্যপায়ী বিলাসী জাহাঙ্গীর বোঝেন নি একটা স্বাক্ষরে মধ্যে কত হত্যা, মিথ্যা আর ষড়যন্ত্রের ইতিহাস লুকিয়ে থাকতে পারে।

যাই হোক, শ্রী ঘোষের লেখা এ পাঠ্য পুস্তক ইতিহাসে আওরঙ্গজেব সম্বন্ধে যত বিষাক্ত কথাই থাক তবুও এটুকু দ্বিধাহীনচিত্তে স্বীকার করা হয়েছে যে, “ভারতবর্ষ যদি

ইসলাম ধর্মের দেশ হইত তাহা হইলে সম্রাট ঔরঙ্গজীব হয়ত ধর্মপ্রবর্তক মুহাম্মদের বর পুত্র রূপে পূজিত হইতেন। বাস্তবিক তাঁহার মত সচ্চরিত্র, নিষ্ঠাবান মুসলমান ইসলামের জন্মভূমিতেও দূর্লভ।” তাতে আরো লেখা হয়েছে—“সম্রাট বলতেন বিশ্রাম ও বিলাসিতা রাজার জন্য নহে।” আরো লেখা হয়েছে—“বাস্তবিক বিলাসিতার অভ্যাস ঔরঙ্গজীবের একেবারে ছিল না। বাদশাহের বিলাসিতা তো দূরের কথা সাধারণ ধনীর বিলাস ও স্বাচ্ছন্দ্যও তিনি ব্যক্তিগত জীবনে এড়াইয়া চলিতেন। লোকে তাঁহাকে রাজবেশী ‘ফকির’ ও ‘দরবেশ’ বলিত। তা স্মৃতি নহে, সত্য। পোশা-পরিচ্ছদে ও আহারে-বিহারে তিনি সংযমী ছিলেন, সুরা, নারী-বিলাস তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই।”

শ্রীঘোষ আরও লিখেছেন—“কিন্তু ঔরঙ্গজীব বিদ্যানুরাগী তো ছিলেনই, নিজেও বিদ্বান ও সুপণ্ডিত ছিলেন।”

“তিনি আরবী ফার্সী ছাড়া তুর্কী ও হিন্দী ভাষাতেও বেশ সহজে কথা বলিতে পারিতেন। ভারতবর্ষে মুসলমান আইন গ্রন্থ প্রণয়নে ফতোয়া-ই-আলমগীরীর রচয়িতা হিসাবে তাঁহার কীর্তি শ্রদ্ধার সহিত স্মরণীয়।” এমনভাবে সম্রাটের নিজের উদর পূরণ ও উদারতার উদাহরণ স্থাপনে নিজ হাতে টুপি সেলাই আর নিজ হাতে লেখা কুরআন শরীফ পরিবেশন রাজা বাদশাহের ইতিহাসে আশ্চর্যমত ঘটনা। শ্রীঘোষের ইতিহাসে আরও আভাস আছে—“নিজের হাতে তিনি কুরআন কপি করিয়াছেন।”

আলমগীরের জন্য লেখা হয়েছে তাঁর সমস্ত ভাইদের মধ্যে তিনিই ছিলেন যোগ্যতম। অথচ এ ইতিহাসেই আছে—বড় ভাই দারাশিকোর জন্য বলা হয়েছে—“কিন্তু পিতার অত্যাধিক স্নেহের ছায়ায় মানুষ হইয়া তিনি যুদ্ধ বিগ্রহ ও রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে প্রায় অনভিজ্ঞ ছিলেন বলা চলে।” দ্বিতীয় পুত্র সুজার জন্য বলা হয়েছে—“কর্মবিমুখ (অকেজো) ও অলস। তাঁহার চরিত্রের প্রদান দোষ ছিল—স্থিরভাবে কোন কাজ করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। তৃতীয় পুত্র আওরঙ্গজেবের চরিত্র ছিল ঠিক ইহার বিপরীত। যেমন সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি, স্থিরবীর ও হিসেবী। কর্মক্ষম ও তৎপরও ছিলেন তিনি ছিলেন যথেষ্ট। রাজনীতির জটিলতা সম্বন্ধে তাঁহার যে অভিজ্ঞতা ছিল তাহা আর কাহারো ছিল না। শাহজাহানের পরিষদরা জানিতেন যে, এই তৃতীয় পুত্রই সিংহাসনের যোগ্যতম উত্তরাধিকারী এবং অন্তর্দ্বন্দ্বে হয়ত শেষ পর্যন্ত তিনিই জয়ী হইবেন। চতুর্থ ও কনিষ্ঠ পুত্র মুরাদ ছিলেন গুজরাটের শাসক, কোন দিক দিয়া তিনি ঔরঙ্গজীবের সমকক্ষ ছিলেন না।”

আশ্চর্যের কথা, যে মুখে বলা হয়েছে ‘ক’ সারা জীবন চিরকুমার ছিলেন আবার সে মুখেই বলা হচ্ছে ‘ক’ দুই সন্তানের পিতা ছিলেন। এর নাম কি ইতিহাসে না পরিহাস? এর নাম ইতিহাস না উপন্যাস? এর দ্বারা ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষিত করে গড়ে তোলা না হিংস্রতার শিক্ষা দেয়া? সে সব সঠিক সমীক্ষা সমাজেরই দায়িত্ব।

মুসলমানদের কাছে বড় অপরাধা হলেও যাঁকে হয়রত মুহাম্মদ (সাঃ) বরপুত্র রূপে পূজিত হইতেন বলে লিখতে দ্বিধা করা হয়নি, আবার সে কলমেই শিক্ষা দেয়া হয়েছে

হিন্দুদের জোর করে মুসলমান করে হাতীর পিটে চাপিয়ে বাদ্য বাজিয়ে শোভাযাত্রা বের করতেন। অথচ সকলেই স্বীকার করেন যে, মুহাম্মদ (সাঃ) বিলাস ভোগের জন্য বাজনা একেবারেই নিষিদ্ধ করেছেন। আলমগীরও মুসলমানদের মধ্যে বাজনা গীতি নিষিদ্ধ করেছিলেন। অতএব বাদ্য বাজিয়ে কি করে বরপুত্রের দ্বারা নবদীক্ষিত মুসলমানদের নিয়ে প্রকাশ্য রাস্তায় মিছিল বের থেকে পারে?

বিশ্ব ইতিহাসকে স্বীকার করতেই হবে। ইসলাম ধর্মে শাস্তি বিধান আছে নর হত্যার বদলে প্রাণদণ্ড। প্রাণদণ্ড বলতে শিরোচ্ছেদ। আর ব্যভিচারের প্রমাণে প্রাণদণ্ড এবং চোরের জন্য হস্তকর্তন ও চাবুক প্রয়োগ প্রভৃতি। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর আইনে বা তাঁর সামগ্রিক জীবনে কাউকে শূলে চড়িয়ে, না খেতে দিয়ে, বিষ প্রয়োগ করে অথবা কোন ভারী বস্তুর চাপ দিয়ে শাস্তি দেয়ার নিয়ম ছিল না বা আজও নেই। অতএব জিজিয়া করের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে হিন্দু জনতার উপর হাতী চালিয়ে দেয়ার আদেশ দিতে পারেন কি মুহাম্মদ (সাঃ) এর ভক্ত ও বরপুত্র (যোষ মহাশয়ের কথায়) আলমগীর তথা আওরঙ্গজীব?

অনেকের ধারণা এই প্রকার ঐতিহাসিকতা শুধুমাত্র আওরঙ্গজেবের চরিত্রকে কলঙ্কিত করার অপকৌশলই নয় বরং হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর সম্বন্ধেও কুৎসিত ধারণা জন্মিয়ে দিয়ে শিক্ষিত সমাজকে ইসলাম বিমুখ করে দেয়ার এক উৎকট প্রচেষ্টা এবং এক জঘন্য ষড়যন্ত্র। অতএব হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ভক্ত সারা বিশ্বে মুসলিম এরূপ চক্রান্তপূর্ণ ইতিহাস ও ঐতিহাসিকতাকে শ্রদ্ধার চক্ষে ক্ষমা করতে পারে না, পারাও উচিত নয়।

অবশ্য আকবরের জিজিয়া প্রথার বিলোপ সাধন আর ঔরঙ্গজেবের জিজিয়া করের পুনঃ প্রচলন কথাটুকু সত্য হলেও জিজিয়া কাদের জন্য, কতটুকু পরিমাণে কেন নেয়া হত তার আলোচনা কিছু পরেই করা হবে। ঐতিহাসিক শ্রীঘোষ ঐ বিখ্যাত ইতিহাসের পাতায় লিখেছেন, ঔরঙ্গজীব কেবল আলমগীর নহেন, “জিন্দাপীরও।” আবার সেখানেই লিখেছেন, “সৎনামী যাদুমন্ত্র জানে মনে করিয়া তিনি নিজের হাতে বাণী লিখিয়া যাদুমূর্তি আঁকিয়া দিলেন মোঘল সৈন্যদের পতাকাতে আঁটিয়া দিবার জন্য।”

আলমগীর যদি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর একনিষ্ঠ ভক্তই হলেন অর্থাৎ শ্রীঘোষের উক্তিতে তিনি যদি মুহাম্মদের ‘বরপুত্র’ই হলেন এবং ইসলাম ধর্মের অনুসরণকারীই হলেন তাহলে ইসলাম ধর্মে যাদু করা একেবারে হারাম বা অবৈধ। অতএব ‘যাদুমূর্তি আঁকা’ কথাটা গভীর চিন্তার বিষয়। যাদুরূপী কোন নর বা নারীমূর্তি অথবা কোন জীব-জন্তুর ছবি অঙ্কন ইসলাম ধর্মে নিষিদ্ধ। সুতরাং যাদুর প্রয়োগ এবং মূর্তি অঙ্কন এ অপবাদ দুটি যৌক্তিক না অযৌক্তিক, মিথ্যা না সত্য তার উত্তর দেবে নতুন সমাজ নতুন শতাব্দী।

এমনিভাবে ‘আওরঙ্গজেব’কে বাংলায় লেখা হয়েছে ‘ঔরঙ্গজীব’। ‘জীব’ মানে ‘জন্তু’। হযরত ঔরঙ্গজীব বলেই অনেকে শাস্তি পেয়েছেন বা পান। তাই শান্তির ধারা

সারা ভারতে ছড়াবার জন্য এই ব্যবস্থা। কিন্তু আরবী, ফারসী, উর্দু ও ইংরেজী ইতিহাস থেকে বাংলায় অনুবাদ করতে হলে ‘ঔরঙ্গজীব’ থেকে পারে না বরং ‘আওরঙ্গজেব’ হওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু মুসলমানদের নামগুলো উল্টে-পাল্টে পড়তে একটু মজাই লাগে বোধ হয়। কিছুদিন পূর্বেও শত সহস্র বাংলা বই পুস্তকে আওরঙ্গজেবই লেখা হত কিন্তু কালেরচক্রে চারিত্রিক উন্নতি বিকাশের সাথে সাথে হিন্দু ও মুসলমান অনেক লেখকই ‘ঔরঙ্গজীব’ লিখতে শুরু করেছেন।

এছাড়া আওরঙ্গজেব বা আলমগীরের উপর আরও বহু অভিযোগ রয়েছে। যথা-(১) তিনি কাকেও বিশ্বাস করতেন না, (২) তিনি হিন্দু বিদ্বেষী ছিলেন তাই হিন্দু কর্মচারীদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, (৩) হিন্দুদের মন্দির ধ্বংস করেছিলেন, (৪) বৃদ্ধ পিতাকে বন্দী ও ভাইদের হত্যা করেছিলেন, (৫) কেবল হিন্দুদেরই উপর জিজিয়া কর চাপিয়েছিলেন, (৬) তাঁর অযোগ্যতাই মোঘল সাম্রাজ্যের একমাত্র পতনের কারণ।

এ সমস্তের উত্তরে শুধু কিছু বলা যায় বা লেখা যায় তাই নয় বরং প্রত্যেকটি বিষয়ের উপর সুবিস্তৃত আলোচনা করলে দশ খণ্ড করে এক একটা ইতিহাস লেখা যায়। তাই বাহুল্য মনে করে প্রমাণ্য ইতিহাসের উদ্ধৃতি দিয়ে উপাদেয় তথ্য সংক্ষেপে সমাজের চিন্তাধারার গতি পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবেশন করা হল—

(১) ‘তিনি কাউকে বিশ্বাস করতেন না’ এ কথাই যদি সত্য হয় তাহলে তিনি কখন বা এত নামায পড়তেন, আর কখনই বা টুপি সেলাই করতেন আর কখনই কুরআন নকল করতেন আর কখনই বা তিনি রাতে এত ইবাদত করতেন আর কি করেই বা আকবর অপেক্ষা বিরাট বিচিত্রময় ভারতবর্ষ শাসন করতেন আর সামলাতেন? আর যদি তিনি কাউকে বিশ্বাস না করতেন তবে নিশ্চয়ই সকলেই তাঁর উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন; আর অসন্তুষ্ট কর্মচারীও চাকরদের নিয়ে ধমকে ধমকে কিছু দিন বা কয়েক মাস অথবা কোন প্রকারে কয়েকটা বছর গৌজামিল দিয়ে কাটান যেতে পারে। কিন্তু ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে, তিনি পাঁচ দশ বছর নয় অর্ধ শতাব্দীকাল বা পঞ্চাশটি বছর রাজত্ব করেছেন। তার দ্বারা কি প্রমাণ হয় না যে, রাজকর্মচারী কেহই তাঁর উপর ক্ষুদ্র ছিলেন না অর্থাৎ তিনি কাউকে অবিশ্বাস করতেন না।

যে যশোবন্ত সিংহ একবার নয় কয়েক বার বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন তবুও দয়ালু সম্রাট তাঁকে প্রত্যেক বার ক্ষমা করেছিলেন যদিও যশোবন্ত সিংহ মুসলমান ছিলেন না। শুধু ক্ষমা নয় উদারতার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থাপনে তাঁকে কাবুলের শাসনকর্তা পর্যন্ত করতেও দ্বিধা করেন নি।

মারাঠা নেতা শিবাজী শুধু অমুসলমানই ছিলেন না রাষ্ট্রদ্রোহীও ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাকে তিনি বিশ্বাস করে পাঠিয়েছিলেন তিনি ছিলেন একজন অমুসলমান ‘জয়সিংহ’। শিবাজী যখন আওরঙ্গজেবের দরবারে ক্ষমা চাইলেন বা আত্মসমর্পণ করলেন তখন তিনি তাঁকে ক্ষমা করলেন। ইচ্ছা করলে তিনি রাষ্ট্রদ্রোহী হিসাবে অথবা অনেক মোঘল সৈন্যকে রাতের অন্ধকারে এবং অতর্কিত আক্রমণ ও

আগুসংযোগে হত্যার অপরাধে প্রাণদণ্ড দিতে পারতেন। কিন্তু তা না করে পরম ও চরম শত্রুকে হাতের মুঠোয় পেয়েও তাঁকে ক্ষমা করে মহানুভব বাদশাহ ক্ষমাধর্মের অতুজ্জ্বল আদর্শ স্থাপন করেন। শিবাজীকে একবার নয় কয়েক বার বন্দী করেছিলেন ও ছেড়ে দিয়েছিলেন। অবশেষে তাঁকে কারারুদ্ধ করেন। কিন্তু আশ্চর্যের কথা শিবাজীর দেখাশুনার ভার দিয়েছিলেন এ জয়সিংহের উপর বিশ্বাস করে। যখন তিনি তাঁর ধর্মের দোহাই দিয়ে মিষ্টান্ন পাঠাবার অনুমতি চাইলেন, সম্রাট তাও দিলেন। আজ বিশ্বে কোন এমন রাষ্ট্র আছে যেখানে জেলখানায় কয়েদীকে আত্মীয়দের মিষ্টি পাঠাবার অনুমতি দেন? তাও এক এক ঝুড়িতে দু এক মন করে মিষ্টি। এক কিলো দু কিলো মিষ্টির ঝুড়িতে ঢুকে পলায়ন নিশ্চয়ই সম্ভব ছিল না। শিবাজীর পলায়নের পর এটাই স্বাভাবিকই ছিল যে জয়সিংহকে সন্দেহ করা। যেহেতু তাঁরই রক্ষণা-বেক্ষণ সত্ত্বেও শিবাজীর পলায়ন সম্ভব হয়েছিল। আজ অনেকেই মনে করেন, জয়সিংহের সাথে শিবাজীর গুপ্ত যোগাযোগ ছিল। বাইরে যতটা যুদ্ধ হয়েছে সেটা বাহ্যিক, ভিতরে ভিতরে যুক্তি ও চুক্তি ছিল অন্য রকম। সে যাই হোক, সম্রাট আলমগীর নিঃসন্দেহে সন্দেহ করতে পারতেন, কেননা শিবাজী ও জয়সিংহ উভয়েই ছিলেন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী। তবুও কোন অধিকারে আমরা বলতে পারি যে, সম্রাট কাউকে বিশ্বাস করতেন না।

(২) ‘তিনি হিন্দু বিদেষী ছিলেন’ কি না তার উত্তর প্রথম নম্বরেই বেশ কিছুটা অনুমেয়। তবুও আজ আমরা ঐতিহাসিকদের অনুগ্রহে জানতে পারছি তিনি নাকি হিন্দু কর্মচারীদের তাড়িয়ে দিয়ে তাঁদের স্থানে মুসলমান কর্মচারী নিয়োগ করেছিলেন। এসব কথাগুলোর অসত্যতা প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই শুধু পাশাপাশি সত্যের আলোবর্তিকা আনলেই মিথ্যার অন্ধকার নিমেষেই বিদূরিত হবে।

মুসলমান বিদেষী কোন রাজা অমুসলমান মন্ত্রী বা সেনাপতি রাখতে পারেনা, তেমনি হিন্দু বিদেষী কোন মুসলমান সম্রাটের পক্ষেও হিন্দু সেনাপতি নিয়োগ সম্ভব নয়। কেননা তাতে সেনাপতির দ্বারা সামরিক অভ্যুত্থানের আশংকাই লেগে থাকবে। কিন্তু আরঙ্গজেব তাঁর সেনাপতি পদে বরণ করেছিলেন অমুসলমান জয়সিংহ এবং যশোবন্ত সিংহকে। শুধু তাই নয় রাজা ভিম সিং যিনি উদয়পুরের মহারাজা রাজসিংহের পুত্র ছিলেন তিনিও আলমগীরের উচ্চমানের বিশ্বাসী কর্মী ছিলেন। তাঁর অধীনে পাঁচ হাজার সৈন্য ছিল। ইন্দ্রসিংহের মর্যাদাও আরঙ্গজেবের কাছে অল্প ছিল না।

রাষ্ট্রদ্রোহী শিবাজীর আপন জামাতা ‘অচলাজী’ পাঁচ হাজারী পদের অধিকারী ছিলেন। অর্থাৎ পাঁচ হাজার সৈন্য তাঁর আদেশের প্রতীক্ষায় থাকত। ‘আর্জুজী’ ইনিও শিবাজীর আত্মীয় ছিলেন। তাঁকে ‘দুই হাজারী’ পদে নিয়োগ করা হয়েছিল। এখন যদি আধুনিক ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, শিবাজীর সামান্য একজন সৈনিককে আরঙ্গজেবের অঙ্গুলি হেলেনেই নিঃশেষ করা যেত, তাই তিনি এত লোককে এত বেশী বিশ্বাস করতেন এমন কি বিধর্মী এবং শত্রুর আত্মীয়-স্বজনের হাতেও এত ক্ষমতা দিয়েছিলেন যার জন্য তাদের স্নেহ, মমতা, স্বজাতিপ্ৰীতির পরিপ্রেক্ষিতে

আওরঙ্গজেবকে কষ্ট পেতে হয়েছে, তাহলে আসল ইতিহাসটাই বাদ পড়ে গেল। আসল কথা হচ্ছে এটাই যে, আলমগীর নিজে ছিলেন ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী, তাই তিনি কাউকে বিনা প্রমাণে সন্দেহ করাকে কল্পনা করতেও পারতেন না। কিন্তু ধন্য আমাদের সৌভাগ্য। আর ধন্য আমাদের ঐতিহাসিকতা। আমরা আসল ইতিহাসটাকে হজম করে উল্টা লিখেছি “তিনি কাউকেও বিশ্বাস করতেন না।”

(৩) “তিনি হিন্দুদের মন্দির ধ্বংস করেছিলেন” বলে যে অপবাদটি নিরপরাধ আওরঙ্গজেবের মাথায় চাপিয়ে দেয়া হয়েছে তা যদি সত্য হয় তাহলে বলতে হয় আওরঙ্গজেব ইসলাম ধর্মের আইন মানতেন না। অথচ সমস্ত ইতিহাসে শত্রু ও মিত্র ঐতিহাসিক স্বীকার করেছেন যে তিনি কুরআনের নীতি মেনে চলতেন। অতএব আজ আমরা তুলে ধরছি আওরঙ্গজেবের আদর্শের উৎস এ কুরআনের বাণীর মর্মার্থ। যথা “ধর্মে জবরদস্তি নেই”। আবার কুরআনে অন্যত্র হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে বলতে বলা হয়েছে—“হে অমুসলমানগণ তোমরা যার উপাসক আমরা তার নই.....তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম আমাদের জন্য আমাদের ধর্ম।” তাছাড়া হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কোন মন্দির ভেঙ্গেছিলেন বা ভাঙিয়েছিলেন সে কথা অদ্যাবধি কোন মুসলিম-অমুসলিম কেহই প্রমাণ করতে পারেন নি। আজও প্রাচীনতম ইবাদতগাহ মসজিদ কা’বা ঘর তার জীবন্ত সাক্ষী।

এছাড়া সারা বিশ্বের প্রত্যেক মুসলমান রাষ্ট্রের কম বেশী অমুসলমান বরাবর ছিল বা আজও আছে। সউদী আরবে অনেক বিধর্মী রয়েছে এবং নাগরিকত্ব লাভ করেছেন। শুধু কা’বা ঘর এবং মুসলিম জাতির শ্রেষ্ঠতম ও তৎসংলগ্ন মসজিদ আর তার চারিপাশের কতকটা স্থান অমুসলমানদের জন্য যাওয়া নিষিদ্ধ। কারণ সারা বিশ্বের মানুষ যখন হজ্জ করতে আসেন তখন সেই ইবাদতের দৃশ্য দেখলে মনে হয় এ সীমারেখা আরও প্রশস্ত হলে বোধ হয় ভাল হত। কেননা এ স্থানে চব্বিশ ঘণ্টার একটা সেকেণ্ডও ‘তওয়াফ’ (প্রদক্ষিণ করা) বন্ধ থাকেনা। অতএব কোন নীতিতেই গ্রহণযোগ্য নয় যে ঠিক নামাযের সময় মসজিদে, পূজার সময় মন্দিরে উপসনা করার সময় গীর্জায়, অপ্রয়োজনে অ-উপাসকদের অংশ গ্রহণ করতে দিতে হবে।

বড়ই পরিতাপের বিষয় ভারতবর্ষের মস্তিষ্ক স্বরূপ বঙ্গদেশেও কয়েক বছর আগে স্কুলের পাঠ্য ইতিহাসে অনেক কিছু বেশী সত্য তথ্যের সন্ধান পাওয়া যেত। প্রমাণ স্বরূপ মাত্র সেদিন ১৯৪৬ সন পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা প্রাপ্তিস্থান থেকে এবং হিন্দুস্থান প্রেস ১০, রমেশ চন্দ্রদত্ত স্ট্রীট, কলিকাতা থেকে মুদ্রিত ‘ইতিহাস পরিচয়’ বই থেকে কিছুটা অংশ বিশেষ তুলে ধরছি—“জোর করিয়া মন্দির ভাঙিয়া মসজিদ নির্মাণের উদ্দেশ্যই যদি আওরঙ্গজেবের থাকিত, তবে ভারতে কোন হিন্দু মন্দিরের অস্তিত্বই বোধহয় থাকিত না। সেইরূপ করা তো দূরের কথা, বরং বেনারস, কাশ্মীর ও অন্যান্য স্থানের বহু মন্দির এবং তৎসংলগ্ন বহু দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি আওরঙ্গজেব নিজের হাতে দান করিয়া গিয়াছেন; সে ‘সনদ’ আজও পর্যন্ত বিদ্যমান।”

স্কুলের এ পাঠ্য পুস্তকে আরও লেখা আছে, “আওরঙ্গজেব সুদীর্ঘ ৫০ বৎসর রাজত্বের মধ্যে এমন কোন প্রমাণ রাখিয়া যান নাই যে, তিনি কোথাও কোন হিন্দুকে জোর করিয়া মুসলমান করিয়াছেন। এমনকি, শিবাজীর পৌত্র শাহুকে তিনি আট বৎসর কাল মোঘল দুর্গে বন্দী করিয়া রাখিয়াও কোন দিন তাহাকে মুসলমান করেন নাই; হিন্দুবেশেই শাহু মারাঠাদিগের মধ্যে ফিরিয়া গিয়াছিলেন।”

পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর এ পুস্তকে আরো লেখা আছে, “মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দুদিগকে উত্তেজিত করিবার জন্য যে সমস্ত মন্দিরে ব্রাহ্মণগণ প্রচারকার্য চালাইয়াছিলেন কেবলমাত্র সেইগুলিই আওরঙ্গজেব ধ্বংস করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। মন্দির তলে সমবেত হইয়া বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র করিলে দেবতার আশীর্বাদ লাভ করা যাইবে, এই প্রলোভন দেখাইয়া কুচক্রীগণ কোন কোন মন্দিরকে রাজনৈতিক কেন্দ্রে পরিণত করিয়াছিল। কাজেই তাহাদের ধ্বংসের প্রয়োজন হইয়াছিল।” কিন্তু আজকের স্কুল-কলেজের ইতিহাসের ধারা ঠিক তার বিপরীত। তাই শ্রীঘোষ তাঁহার রাষ্ট্রনীতিতে মুসলমান ছাড়া অন্য কোন ধর্মাবলম্বীর দাবী করিতেন। সেইজন্য তাঁহার রাষ্ট্রনীতিতে মুসলমান ছাড়া অন্য কোন ধর্মাবলম্বীর দাবী বা অধিকার স্বীকৃত হইত না। বিধর্মীর অধিকার স্বীকার করা ইসলাম ধর্ম বিরুদ্ধ। “...চিন্তা মন মন্দিরে গো-হত্যা করিয়া তিনি সাড়ম্বরে তাহা মসজিদে পরিণত করিয়াছিলেন।”.....“ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে জানাইয়াছিলেন যে ইসলামের বিধান অনুযায়ী তিনি কোন নতুন দেবালয় নির্মাণের অনুমতি দিতে পারেন না।” “.....তারপর আরও একটি আদেশ জারী করিয়া তিনি বিধর্মী হিন্দুদের সমস্ত টোল ও চতুষ্পাঠী দেব দেউল ধ্বংস করিতে বলেন।” ইত্যাদি ইত্যাদি আরও অনেক অবাস্তব ও অবাস্তব কথা।

উল্লেখ্য করা যেতে পারে যে, শ্রীঘোষের ঐ ‘ভারতজনের ইতিহাস’ ভারতে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক নবম, দশম ও একাদশ শ্রেণীর জন্য ১৯৬২ সন লেখা, আর পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য এ “ইতিহাস পরিচয়” বইখানি ১৯৪৬ সন লেখা। মাত্র ষোল বছরে আমাদের ঐতিহাসিকতার এত উন্নতি অথবা এত অবনতি সত্যিই বিস্ময়কর।

যাই হোক, সত্য সিদ্ধান্ত এটাই গ্রহণযোগ্য যে, হিন্দুদের ধর্মে হস্তক্ষেপ বা মন্দির ধ্বংস আওরঙ্গজেবের নীতি ছিলনা। তবে কিছু মন্দির তার সময়ে ভাঙ্গা গিয়েছিল’ অবশ্য তার পশ্চাতে কিছু কারণও ছিল। প্রথমতঃ উক্ত মন্দিরগুলো রাজনৈতিক কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল যে পূর্ব আলোচনাতেই উদ্ধৃতি সহ প্রমাণ করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ আকবরের সময় অনেক মসজিদ ভেঙ্গে সে স্থানে মন্দির তৈরী করা হয়েছিল এবং অনেক মসজিদকে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেও মন্দির তৈরী করা হয়েছিল। যেমন-‘মুনতখাবুগুয়ারিক’ ও ‘মোকতুবাতে ইমামে রব্বানী’ নামক দুটি গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ থেকে পাওয়া যায়।

“Mosques and paryer-rooms were changed into store rooms and into Hindu guardrooms”.

“A number of mosques were destroyed by Hindus and temples erected in there place”.

আওরঙ্গজেবের সময়ে সৎনামী দল নামে হিন্দুদের এক দুর্ধ্ব সন্ন্যাসী দল বিদ্রোহ ঘোষণা করে অনেক বাদশাহী সৈন্যকে নিহত করে এবং অনেক মসজিদ ধ্বংস করে। এ দলের নায়করা প্রচার করত যারা আমাদের সাথে যোগ দিয়ে যুদ্ধ করবে তারা মরবে না, আর যদি ভাগ্যচক্রে মরেই যায় তবে এক একজনে রক্তে আশি জন করে শোক তৈরী হবে। তাদের পোশাক ছিল অসভ্য ও অদ্ভুত। দাড়ি গোঁফ এমনকি চোখের ক্র পর্য়ন্ত মুণ্ডিত থাকত, তাই তাদের আর এক নাম ছিল ‘মুণ্ডিয়’। এদের পরিচয় শ্রীঘোষের লেখা ইতিহাসেও কিছু পাওয়া গেছে। যথা-“দিল্লী হইতে প্রায় ৭৫ মাইল দূরে নারলোন জেলায় সৎনামী সম্প্রদায়ের প্রধান ঘাঁটি ছিল।”

“যদি কোন বীর সৎনামীর মৃত্যু হয় তা হলে তাহার রক্ত হইতে আরও আশিজন বীরের উৎপত্তি হইবে। দেখিতে দেখিতে প্রায় পাঁচ হাজার সৎনামী অস্ত্রসজ্জ লইয়া প্রস্তুত হইল। স্থানীয় রাজকর্মচারীরা যুদ্ধ করিতে গিয়া পরাজিত হইলেন। নাবলোনের ফৌজদারকে বহু ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করিতে হইল, শহরও সৎনামীরা দখল করিয়া শূটতরাজ করিল। মসজিদ ধ্বংস করিল এমনকি শাসন ব্যবস্থাও চালু করিয়া ফেলিল।” (ভারতজনের ইতিহাস)

অতএব নিরুপায় আওরঙ্গজেব কয়েক হাজার সৈন্য পাঠিয়ে তাদের রক্তে ৮০ জন করে লোক তৈরী হওয়ার ধোকাপ্রদক অপ-প্রচারকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেন এবং তাদেরই অত্যাচারে ধ্বংস হওয়া মসজিদগুলো পুনঃনির্মাণ করেন ও তাদের প্রবর্তিত নূতন শাসন ব্যবস্থার অবসান ঘটান। কিন্তু আজ ঐ রাজদ্রোহীদের সৎনামীদের কোন অত্যাচার-অনাচার নিরপেক্ষ মানুষদের কাছে নিন্দনীয় হবার কোন কারণ নেই অথচ শ্রীঘোষের ইতিহাস লেখা হয়েছে, “মোঘল সৈন্যদের বিরুদ্ধে সৎনামীরাও বীরের মত যুদ্ধ করিয়া হাজারে হাজারে নিহত হল।”

তৃতীয়তঃ যারা স্বৈচ্ছায় নব মুসলমান হয়েছিল তারা অনেকে কার্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য প্রাক্তন ধর্মের উপর কত বিরাগী এবং নতুন ধর্মে কত আস্থাশীল তা প্রমাণের পরিপ্রেক্ষিতে কিছু মন্দিরেরও ক্ষতি সাধন করেছিল। যেমন উত্তরবঙ্গে নব মুসলমান রাজা যদুর গৌড়ামীর কথা বলা যেতে পারে। কিন্তু মহানুভব সম্রাট সেগুলোর সংস্কার বাজারের ইতিহাসে দারুণভাবে দুর্লভ বলা যায়।

(৪) আওরঙ্গজেবের প্রতি আর এক অপবাদ আরোপ করা হয়েছে, “তিনি বৃদ্ধ পিতাকে বন্দী ও ভাইদের হত্যা করেছিলেন।”

পিতাকে বন্দী করা নিঃসন্দেহে দোষনীয় কর্মের মধ্যে এক জঘন্যতম কর্ম। কিন্তু বন্দী কাকে বলে, তার স্বরূপ কি, বন্দী কেন করা হয় এবং তার উদ্দেশ্যই বা কি ইত্যাদি বিষয়গুলো সুগভীরভাবে পর্যালোচনা করা দরকার, নচেত আমরা বন্দী শাহজাহানকে ঠিক চিনতে পারব না।

বীরত্ব প্রকাশের অভিলাষে প্রতিপক্ষ বা প্রতিদ্বন্দ্বীকে শৃঙ্খলিত করে কারারুদ্ধ করার নাম বন্দী। বন্দী সাধারণতঃ নানা কষ্টের মধ্যে উপলব্ধি করে তার পরাজয় ও প্রতিপক্ষের জয়ের দাপট বন্দীদের খাওয়া, শোয়ার ব্যবস্থার পরিবর্তে থাকে অব্যবস্থা। কিন্তু শাহজাহান বন্দী কোথায় হয়েছিলেন? তেপান্তরের মাঠেও নয় আর অন্ধকূপ বা রুদ্ধকক্ষেও নয়, বরং সে সুরক্ষিত সুজ্জিত অট্টালিকায় যা ছিল আকবর, হুমায়ুন জাহাঙ্গীর ও মমতাজ প্রভৃতি খ্যাতনামা সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীদের আরাম কক্ষ, কর্মক্ষেত্র ও গার্হস্থ্য ক্ষেত্র। যেখানে ছিল শাহী পালঙ্ক, শাহী কোমল পালকের গদি-ইয়মেনী চাদরে ঢাকা। যেখানে তাঁর খাওয়া-দাওয়া, সেবা-শুশ্রূষার জন্য ২৪ ঘণ্টা ভৃত্যেরা হাজির থাকত। শাহজাহানের পিতা জাহাঙ্গীর নেই, স্নেহময়ী মাতাও নেই আর স্ত্রী মমতাজ তো বিদায় নিয়ে চলে গেছেন তাজমহলের নীচে। তাঁরা থাকলে হয়ত তাঁরাও থাকতেন এ ঐতিহাসিক পরিবেশে। আছেন শুধু তাঁর অত্যন্ত স্নেহ সিঞ্চিতা কন্যা আর আত্মীয়-স্বজন। প্রায় সমস্ত আত্মীয়-স্বজনই শাহজাহানের সাথে সাক্ষাত করতে পারতেন! আর তাঁর স্নেহধন্যা কন্যা রৌশন-আরা সংক্ষেপে ও অত্যন্ত প্রয়োজন ছাড়া প্রতি মুহূর্তে পিতার খিদমতে বা সেবায় নিয়োজিতা ছিলেন। শুধু তাই নয় আওরঙ্গজেব সারা দিন রাতে অন্ততঃ একবারও রাজকার্য সেরে স্বহস্তে পিতার পদসেবা করতেন যা আজ প্রত্যেকের মস্তিষ্কে শিহরণের পুলক সৃষ্টি করে।

শাহজাহানের জন্য যখন চারদিকে রব উঠে যায় শাহজাহান পরলোক গমন করেছেন তখন পুত্রদের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়। তারপর সর্বশেষ যখন আওরঙ্গজেবের জয় হয় তখন দেখা গেল শাহজাহান মৃত নন বরং মৃত্যুর হাত থেকে ভগ্নদেহে শাহজাহান প্রাণ ফিরে পেয়েছেন। এ অবস্থায় তাঁর সম্পূর্ণ বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু পিতার অন্ধ স্নেহ বড় দারাসিকোকেই তিনি রাজ্য দিতে মনস্থ করেন। এদিকে বেশীর ভাগ হিন্দু প্রজা দারার সমর্থক আর মুসলমানেরা আওরঙ্গজেবের সমর্থক। তবুও তিনি গভীর চিন্তাসহ সমাধানের পথ খুঁজতে যাচ্ছিলেন। এ অবস্থায় তাঁকে রাজনীতি করতে দেয়ার অর্থ জোর করে মৃত্যু পথে নিক্ষেপ করারই নামান্তর। অতএব এক্ষেত্রে পিতার পৃথক অবস্থান আধুনিক এবং পৌরাণিক বিচক্ষণ ঐতিহাসিকদের মতে অনুপযুক্ত কর্ম নয়।

দ্বিতীয় কথা শাহজাহানের সাথে সকলেই সাক্ষাত করতে পারলেও তাঁর রাজপ্রাসাদের বাইরে যাওয়া নিষেধ ছিল। তাই একদিন তিনি আলমগীরকে ডেকে বলেন, “আলমগীর!” তোর মত হাফেজ সন্তানের নিকট আমি কি বন্দী? উত্তরে আওরঙ্গজেব বলেছিলেন, “আপনি সারা জীবন রাজনীতি করে অন্তরের প্রকৃত শান্তি কি পেয়েছেন? উত্তরে তিনি বলেন, “কোনও দিন পাইনি আর আজও পাচ্ছি না। তার উপর মমতাজও নেই।” আওরঙ্গজেব তখন বলেন, “আল্লাহ তাঁর পবিত্র কুরআনে জানিয়েছেন “অন্তরের শান্তি আল্লাহর স্মরণেই সম্ভব।” অতএব আমি চাইনা যে আপনি এ বৃদ্ধ বয়সে অশান্তির রাজনীতি করুন। বরং আপনার ইবাদত-বন্দেী আল্লাহর স্মরণের জন্যই এ পূর্ণ বিশ্রামের ব্যবস্থা। শাহজাহানের কণ্ঠস্বর আরও কর্কশ

হয়ে উঠল। তিনি বললেন, “তাহলে আমার প্রিয়া, তোর মা মমতাজের স্মৃতিসৌধ তাজমহল কি আমি আমার ইচ্ছামত দেখতে পাবনা?” আওরঙ্গজেব উত্তরে খুব বিনম্রভাবে নিবেদন করেছিলেন, আব্বাজান! সত্যিই কি আপনার তাজমহল দেখার সাধ, নাকি তাজমহল দেখার নামে অন্য কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে? শাহজাহান অশ্রুপূত নয়নে বলেছিলেন, যেমন করে হোক আমাকে অন্ততঃ একবার করে প্রতিদিন তোমার মায়ের স্মৃতি সৌধটা দেখতে দাও, আমার আর কিছুর প্রয়োজন নেই। উত্তরে আওরঙ্গজেব বলেছিলেন, যদি এখানে আপনার শয়নকক্ষের মধ্যে থেকেই আপনার ইচ্ছামত তাজমহল দেখতে পান তাহলেও আপনাকে বাইরে যেতে হবে? শাহজাহান বলেছিলেন, বৎস, বাইরে যাওয়া উদ্দেশ্য নয় শুধু চোখে দেখতে চাই তাজমহল। তখন টেলিভিশন ছিলনা, শাহজাহানের ধারণা ছিল বাইরে না গিয়ে তাজমহল দেখা অসম্ভব। কিন্তু আওরঙ্গজেব পৃথিবীর এক মূল্যবান মণি বিজ্ঞানময় কৌশলে দেয়ালের সাথে সংযুক্ত করিয়ে দিলেন তার মধ্যে দৃষ্টি দিলে দূরের তাজমহল সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাওয়া যেত। এটা ইংরেজ রাজত্বের সময় ইংরেজ তা খুলে নিয়ে গেছে। তবুও নকল যে পাথরটি বিকল্পভাবে লাগিয়েছে তাতেও তাজমহল দৃষ্ট হয়।

আসল সত্য আরও উহ্য হয়ে আছে অনেকের কাছেই। যেমন শাহজাহান ভয়াবহ মৃত্যুপীড়া থেকে প্রাণ ফিরে পেয়েছিলেন বটে কিন্তু বিস্ময় বিবেক ও জ্ঞান প্রায় নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল; আর মমতাজের গর্ভ থেকে গর্ভস্থ শিশুর কান্নার স্বর শোনা গিয়েছিল (কারো মতে পেটের ভিতরের পীড়াজনিত শব্দ-শিশুর ক্রন্দন নয়)। সমস্ত চিকিৎসক ও সাধারণের কাছে ওটা ছিল এক ঐতিহাসিক ঘটনা। এ উপসর্গই মমতাজের মৃত্যুর কারণ হয়েছিল। তখন শাহজাহান শিশুর মত কেঁদে বলেছিলেন, “হে আল্লাহ আমার অর্থবল, জনবল, সবকিছুর বিনিময়েও মমতাজকে ফেরাবার কোন উপায় নেই। কারণ তোমার শক্তির সামনে আমাদের অস্তিত্ব কত অসার, কত অকেজো।” তাই মমতাজের স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য যে যুগে বিশ কোটি বার লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাইশ বছর ধরে বহু লোকের পরিশ্রমে পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্য তাজমহল তৈরী হয়েছিল। ফলে রাজকোষ প্রায় অর্থ শূন্য হয়ে পড়েছিল। তাতেও বৃদ্ধ শাহজাহান মানসিক অসুস্থতা হেতু শান্তি পাননি। তুষার শুভ্র আকাশ ছোঁয়া তাজমহল যথেষ্ট নয় মনে করে আর একটি ভ্রমর কাল (কৃষ্ণ) পাথরের তাজমহল তৈরী করতে মনস্থ করলেন। ভিতরে থাকবে পান্না-হীরা-চুনি, পদ্মরাগ মণি প্রভৃতি অমূল্যবান ধাতুর অদ্ভুত সংস্থাপন। আর শুভ্র ও কৃষ্ণ তাজমহলের মাটির নিচে দিয়ে থাকবে সংযোগ রাস্তা। শাহজাহান বিশেষ কোন প্রস্তুতি এবং পরামর্শ না করে কাজ শুরু করেছিলেন বলে কিছু ঐতিহাসিক মন্তব্য করেন। আওরঙ্গজেব বুঝেছিলেন আবার যদি দ্বিতীয় তাজমহল সৃষ্টি হয় তাহলে দিল্লীর রাজদরবার অর্থনৈতিক পতনের অতল গহবরে নিমজ্জিত হবে। তার উপর পুত্রদের কলহ বিবাদের কারণে মমতাজের মৃত্যু শোকের প্রভাবে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তিনি মুহূর্তে মুহূর্তে মত পরিবর্তন করতে এবং ভুলক্রমে

বহু অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের উপর অনুমতি দান এবং প্রয়োজনীয় বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা দিতে দ্বিধা করতেন না। তার অন্যতম কারণ ছিল শারীরিক ও মানসিক দৌর্বল্যের জন্য তিনি তদন্ত বা সমীক্ষার পরিবর্তে সংবাদদাতা যা প্রথমে শোনাতেন তাই তাঁর মনে সুদৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হয়ে যেত। তারপর তা মুছে ফেলা এবং আসল কথা বোধগম্য করান বেশ কষ্টকর ছিল। শাহজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা শাহজানকে সেবার নামে পরনিন্দা এবং নিজের পিতার প্রতি আনুগত্য এবং সারা ভারতে দারার কত জনপ্রিয়তা আছে তা বার বার তুলে ধরে পিতার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, অথচ গোটা ভারতবর্ষের মুসলিম জাতি বিশেষ করে মুসলমান মন্ত্রী সেনাপতি এবং উচ্চপদস্থ ও নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের দারার প্রতি দারুণ অনাস্থা আর অবিশ্বাস ছিল। যেহেতু তিনি তাঁদের কাছে সধর্মত্যাগী বলে বিবেচিত থেকেন। সুতরাং দারাকে সিংহাসন দিলেই বিদ্রোহের দাবানল হু হু করে জ্বলে উঠবে। সারাদেশে একাধিক বিদ্রোহ দমন করা সহজ কিন্তু নিজের দরবারের বিদ্রোহ দমন করা মোটেই সহজসাধ্য নয় বরং অসাধ্য। অতএব নানা দিক দিয়ে চিন্তা করে দেখলে এ সিদ্ধান্তই গ্রহণ করতে হয় যে, যদি শাহজাহানের বন্দী মার্কী বিশ্রামের ব্যবস্থা না করা হত তাহলে অবস্থা যা হত তা লোমহর্ষক। তাই বিচক্ষণ ইতিহাসবিদদের মতে শাহজাহানকে আরাম কক্ষে আটকে রক্ত নদীর স্রোতস্বতী গতিকে স্তব্ধ ও বন্ধ করা হয়েছে। বন্দী হবার পূর্বে শাহজাহানকে এক দুঃসাহসিক কুৎসিত পদক্ষেপ নিতে গিয়েছিলেন যা তার সদগুণ ও সুনাম যশের মৃত্যু ঘটত যদি না তিনি অসুস্থ, অতিবৃদ্ধ এবং স্ত্রীর বিয়োগ ব্যাথায় মস্তিষ্ক বিকৃত রোগী বলে গণ্য না থেকেন। তবুও তা সত্যের খাতিরে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

আওরঙ্গজেব যখন দিল্লী থেকে দূরে ছিলেন তখন তাঁরই পুত্র মহম্মদকে সিংহাসন দেয়ার লোভ দেখিয়ে বাচ্চা বয়স্ক কিশোরকে বিদ্রোহী করতে চরম চেষ্টা করেছিলেন শাহজাহান। কিন্তু শাহজাহানের এ চক্রান্ত সফল হয় নাই। আওরঙ্গজেবের সুনাম ও সদগুণাবলীর কারণে দেশ-বিদেশে ঘরে-বাইরে তিনি 'ফকির', 'জিন্দাপীর', 'দরবেশ', 'আল্লামগীর' এবং 'মহিউদ্দিন' প্রভৃতি বহুল নামে সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর চরিত্রের সুদৃঢ়তা ছিল বজ্রের মত বিশেষতঃ নারীর প্রতি আকর্ষণ হেতু তিনি কোনও দিন নমনীয় ছিলেন না। তাই দারা এবং তাঁর সমর্থকদের পরামর্শে আওরঙ্গজেবকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল। তবে পরামর্শদাতারা তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথে নতুন অগ্নি বিপ্লব ও বিদ্রোহ যে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে তা তাঁরা বুঝতে পেরে ঠিক করেছিলেন আওরঙ্গজেবকে রাজপ্রাসাদে বা হেরেমে আসতে বলা হবে। তাঁর আসার সাথে সাথেই দুর্ধ্ব তাতার যুবতীরা তাঁকে জোর করে মদ পান করার চেষ্টা করে সকলে মিলে হত্যা করবে। পরে রটিয়ে দেয়া হবে তিনি বাইরে মদ পান এবং ব্যভিচারের বিরোধী ছিলেন বটে কিন্তু হেরেমে তিনি স্বয়ং মদ পান করে উন্মত্ত হয়ে তাতার রমণীদের ব্যভিচারে বাধ্য করাতে গিয়ে নিহত হন। এর ফলে প্রমাণ হবে আওরঙ্গজেবকে হত্যা করা ঠিকই হয়েছে। হয়ত কেহ কোন প্রতিবাদ না করে এটাই

মেনে নেবে যে, "চকচক করলেই সোনা হয় না"। সমস্ত চক্রান্ত ঠিকঠাক। শাহজাহানকে শুধু শোনা হইছিল যে আওরঙ্গজেব পিতৃ হত্যার জন্য অনেক ষড়যন্ত্র করেছেন কিন্তু তাঁর সুযোগ্য পুত্র দারা এবং তাঁদের অনুচরবর্গের দ্বারা তা ব্যর্থ হয়। অতএব নিজে নিহত হবার পূর্বেই আওরঙ্গজেবের উপযুক্ত দণ্ডের প্রয়োজন আছে।

আওরঙ্গজেবকে শাহজাহানের সাক্ষর করা পত্র পাঠান হল। তিনি সেদিন অসুস্থতা সত্ত্বেও পিতার আদেশে আগমন করতে প্রস্তুত হলেন। রাজদরবারে পৌঁছেও পিতার আদেশের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনে কোন ত্রুটি হয়নি যদিও কুপরামর্শ দাতাদের পরামর্শে তিনি আওরঙ্গজেবের প্রতি অনেকবার পক্ষপাতিত্ব ও অবিচার করেছেন কিন্তু তবুও সমস্ত কিছু ভুলে পিতার পদপ্রান্তে হাজির হয়ে শুভাশীষ নেবেন আওরঙ্গজেব আর প্রত্যক্ষ শুভাশীষ নেবেন বিখ্যাত বিদূষী ভগ্নি জাহানারার। যিনি সমস্ত কুরআন কণ্ঠস্থ করেছিলেন এ সত্যের প্রতিচ্ছবি বোনদেরই কাছ থেকে।

যাঁরা আজও মৌলিক ইতিহাসে চরিত্র দৃঢ়তায় স্বচ্ছ সুন্দর তারকার ন্যায় অমর হয়ে আছেন সে পাণ্ডিত্যত্বের অধিকারিণী রওশনআরা চক্রান্তের সংবাদ অবগত ছিলেন। তবুও তাঁর সহশীলতার সীমান্ত অতিক্রম করে গিয়েছিল। যখন বুঝতে পারলেন আওরঙ্গজেবের মৃত্যু অবধারিত তখন তিনি বিশ্বস্ত দূত দ্বারা আওরঙ্গজেবকে সংবাদ পাঠালেন এবং সমস্ত চক্রান্তের ধারা জানিয়ে নিলেন। আওরঙ্গজেব চক্রান্তকারীদের উপর অতিশয় দুঃখিত হলেন এবং সাথে তাদের দমন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

প্রতিনিয়ত পিতার ঘন ঘন ভুলভ্রান্তির অবসান ঘটানর একটা পথ ছিল পিতাকে হত্যা করা অথবা বন্দী করা। কিন্তু পিতৃ হত্যা আওরঙ্গজেবের প্রাণ প্রিয় ধর্মের বিপরীত এবং মানবতা বিরোধী যা তার পক্ষে কল্পনা করাও সম্ভব ছিল না। আর বাধ্য হয়ে তাঁকে সমস্ত ফিতনা ফাসাদের মূলোৎপাটনের জন্য সহজ সরল স্বাভাবিক পথে সম্মানজনক ও আরামদায়ক ভাবে আটক রাখার ব্যবস্থা করলেন। আর এরই নাম নাকি বন্দী।

এবার কিঞ্চিৎ আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। এত যশস্বী, ফকির, জিন্দাপীর, সত্যের প্রতীক বিখ্যাত পাণ্ডিত্যের পক্ষে কিরূপে সম্ভব হয়েছিল সিংহাসনকেন্দ্রিক কোন্দল? কিরূপে সম্ভব হয়েছিল ভাইদের সাথে যুদ্ধ? আর এ কথা কি সত্য যে, তিনি তাঁর ভাইদের হত্যা করেছিলেন?

এবার আসুন সমীক্ষান্তে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাক। আওরঙ্গজেব ছোট বেলাতেই সমগ্র কুরআন শরীফ কণ্ঠস্থ করেছিলেন। ত্রিশ অধ্যায় যুক্ত সমগ্র কুরআন মুখস্থ করেই ক্ষান্ত হন নি, তিনি একজন পূর্ণ আলেম, মোল্লা ও মাওলানা হবার সৌভাগ্যও অর্জন করেছিলেন। আওরঙ্গজেব সারা দিন রাতে খুব বেশী কুরআন পাঠ করতেন, তার প্রমাণ মূল ইতিহাস। আর যুক্তি হচ্ছে তিনি নিজ হাতে কুরআন কপি করতেন। তখন ছাপাখানা ছিল না, অতএব অত্যন্ত বিশুদ্ধ এবং জোরালো স্মরণ না রাখলে তা অনর্গল লেখা যায় না, অথচ তার শুধু একটি অক্ষর নয় বরং একটি 'যবর' 'যের' অর্থাৎ আ-কার ই-কার পর্যন্ত গোলমাল হলেই সে কুরআন বাতিল বলে গণ্য হয়।

আওরঙ্গজেব চেয়েছিলেন তিনি রাজ্যনীতি পরিত্যাগ করে শুধুই ইবাদত-বন্দেগীর মধ্যে দিয়ে কাটাবেন কিন্তু শাহজাহান জানতেন সমস্ত ভাইদের মধ্যে আওরঙ্গজেবই একমাত্র সুযোগ্য। সেজন্য পিতা পুত্র যৌবনের পদার্পণের পর থেকেই এ বিষয়ে শুধু উপদেশ, আদেশ আর তিরস্কারের কষাঘাত সহ্য করতে হয়েছে আওরঙ্গজেবকে অনেকবার। শেষে জয় হল পিতা শাহজাহানের। পিতার শেষ যুক্তি ছিল এটাই—‘তুমি আমার চেয়ে ধর্মের দিকে শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে অধিক অগ্রসর। সুতরাং পিতার সে আদেশ শিরোধার্য যদি সেই আদেশ ধর্মের প্রতিকূল না হয়। অতএব রাজনীতি করা ধর্মে অনুমোদিত না নিষিদ্ধ তুমিই ঠিক করে নাও। আমার দ্বিতীয় কথা—আমার অপেক্ষাও তুমি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বেশী ভক্ত বলে আমার ধারণা। অতএব তিনি ঘর সংসার স্ত্রী পুত্র পরিজন সমাজ ত্যাগ করে ধার্মিকতা প্রদর্শন করেছেন না সমস্ত কিছুর ভারসাম্য বজায় রেখে ধার্মিকতার শ্রেষ্ঠতম কৃতি স্থাপন করেছেন। এ সুচিন্তিত এবং সূক্ষ্ম অথচ তীব্র প্রশ্নের উত্তরে আওরঙ্গজেবকে পরাস্ত থেকে হয় এবং পরাস্ত থেকে হয় এবং পার্থিব জনকল্যাণকর বিষয়ে তাঁকে মনোযোগ দিতে বাধ্য থেকে হয়।

সে সময়ে ভারত বিখ্যাত একজন মুসলমান দরবেশ এবং খুব উচ্চ পর্যায়ের সাধকের দরবারে তাঁর দোয়া নেয়ার জন্য অনেকেই যেতেন। বাল্যকালে আওরঙ্গজেব স্বয়ং তাঁর পর্ণকুটিরে পদার্পণ করে তাঁকে দেখে অবাক হলেন। ছিন্ন তালি দেয়া বস্ত্র, নির্ভয়চিত্ত। প্রফুল্লবদনে উদাসভাবে, আর প্রশ্নের সাথে সাথে অবিলম্বে উত্তর দান যেন পাগল শিশুর উত্তর প্রদানের মত।

আওরঙ্গজেব তাঁকে সালামপূর্বক বলেন আমার কিছু বক্তব্য আছে। সাধক সাথে সাথে উত্তর দিলেন আগে বস তারপর কথা। ছেঁড়া পুরাতন মখমলের উপর তাঁর পাশে বসে বলেন আমি দিল্লীর সিংহাসনের জন্য দোয়া নিতে এসেছি যেন সারা ভারত জুড়ে অশান্তি আর রক্তপাত না হয় আর আমার মধ্যে যেন রাজকার্য পরিচালনার যোগ্যতা থাকে। উত্তরে তিনি বলেন কেন? তুমি তো দিল্লীর সিংহাসন পেয়ে গেছ তার উপর তো তুমি বসে আছ—তারপর তাঁর সে ময়লামুক্ত মখমলে হাত চাপড়ে বলেন দেখ এইটাই হল দিল্লীর সিংহাসন।”

দারা সূজা, মুরাদ একে একে ঐ জীবন্ত দরবেশের কাছে হাজির হলেন। প্রত্যেকই যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন পূর্বক দিল্লীর বাদশাহী পাবার অনুকূলে দোয়া প্রার্থনা করলেন। স্বনামধন্য দরবেশ প্রত্যেককে বসতে বলেন। তখন সকলের মাটির উপর বসে পড়লেন। কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর দরবেশ বলেন তোমরা তোমাদের ভাগ্য নির্ধারণ করে নিয়েছ। তখন সকলে একবাক্যে উৎসুক হয়ে জানতে চাইলেন তাঁদের ভাগ্যের ফলাফল। দরবেশ বলেন “মাটিতে যারা বসেছে তারা বাদশাহী পাবার যোগ্য নয়।”

আওরঙ্গজেব অত্যন্ত সুযোগ্য ছিলেন বলেই সম্রাট শাহজাহান তাঁকে অনেকবার জোর তগিদে যুদ্ধক্ষেত্রে বিদ্রোহ দমনে এবং প্রশাসনকার্যে নিযুক্ত করেছিলেন। সব ঐতিহাসিকেরা একমত যে, দীর্ঘদিন যাবত আদিল শাহের সাথে শাহজাহানের যুদ্ধ

চলেছিল। শাহজাহান শিবাজীর পিতা শাহজী ও আদিল শাহের যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করে সম্রাট সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হলেন। দাক্ষিণাত্য সম্রাটের করতলগত হল। এ শত্রুভাবাপন্ন দুর্ধর্ষ দাক্ষিণাত্যের শাসনভার কোন শাহজাদাকে দেয়া যায়, অনেক চিন্তা-ভাবনার পর আওরঙ্গজেবের উপর দাক্ষিণাত্যের প্রশাসন ভার ন্যস্ত হয়। অতএব এখানে অন্যান্য ভাইদের তুলনায় আওরঙ্গজেবের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ পাওয়া গেল। শাহজাহান অন্যান্য পুত্রদেরও দায়িত্ব দিয়ে বিভিন্ন রণক্ষেত্রে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা প্রত্যেকেই অযোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন। দারা, সূজা একেবারে মাতাল ও অপদার্থ ছিলেন। অবশ্য মুরাদের মধ্যে কিছু যোগ্যতার আভাস পাওয়া যেত। ১৬৪৬ খ্রিষ্টাব্দে আলি মর্দান নামে একজন সুদক্ষ বীর সেনাপতি মুরাদের অধীনে বলথ বিজয়ে পাঠালেন। সম্রাট শাহজাহান মুরাদের ক্রটি-বিচ্যুতি সম্বন্ধে সজাগ ছিলেন, তা সত্ত্বেও যুদ্ধে অধ্যাবসায়ী ও দূরদর্শী হবার মানসে সম্রাট শাহজাহান এই সমরায়োজন করেছিলেন। আলিমর্দানের যুদ্ধ কৌশলে বলথ মুঘলদের দখলে আসে। আয়েসী মুরাদ পার্বত্য প্রদেশে থাকতে চাইলেন না। সুষ্ঠু মোঘল প্রশাসন কায়েম না করে মোঘল হেরেমে ফিরে এলেন। সাথে সাথে উজবেগগণ শক্তিশালী হয়ে মুঘলদের বিরুদ্ধে আবার বিদ্রোহ ঘোষণা করলে, বলথ মুঘলদের হাত থেকে চলে গেল। সম্রাট শাহজাহান তখন তিরস্কার করে বলেন ‘আমার আদেশ অগ্রাহ্য করে ফিরে এসে যে অযোগ্যতার পরিচয় দিয়েছ তাতে আমার চেয়ে তোমরাই ভবিষ্যত অন্ধকার হয়েছে।’

যাই হোক পুনরায় তিনি আওরঙ্গজেবকে পাঠালেন বলথ বিজয়ে। আওরঙ্গজেব পিতার আদেশে দু রাকাত নামায শেষে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে রওয়ানা হলেন। এখন বলথ হাতছাড়া, আবার নতুন করে বিদ্রোহ করে বলথ দখল সহজসাধ্য নয় তবুও আওরঙ্গজেবের উৎসাহ ও আত্মপ্রত্যয়ের অভাব নেই। ১৬৪৭ খ্রিষ্টাব্দে আবার তিনি বীরবিক্রমে পুনরায় বলথ অধিকার করে বিদ্রোহের মূলোচ্ছেদ করে দেশে আবার শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনলেন।

এদিকে আবার বুখারা থেকে আবদুল আজিজ এক বিরাট সৈন্য দল নিয়ে আওরঙ্গজেবকে আক্রমণ করলেন। আওরঙ্গজেব আবার দু রাকাত নামায শেষে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করে এক উৎসাহ ব্যাজক ভাষণে সৈন্যদের অপরাজেয় মনোবলের অধিকারী করে তুললেন। এ আক্রমণকারী দলকে প্রতিহত করে তিনি তৈমুরাবাদের দিকে সসৈন্যে ধাবিত হলেন। এ সময় তাঁর বীরত্ব বুদ্ধিমত্তা রণনিপুণতা ও দূরদর্শিতায় ভীত বা প্রভাবিত হয়ে বুখারার সুলতান সন্ধির প্রস্তাব দেন।

ঠিক এ সময়ে মুঘল বাহিনী ভারতে ফিরে যেতে চাইলে বিচক্ষণ আওরঙ্গজেব মেনে নিয়ে ভারত অভিমুখে যাত্রা করে ১৬৪৭ খ্রিষ্টাব্দে কাবুলে এসে পৌছেন। ভারত সীমান্তে পেরিয়ে এশিয়া মহাদেশের এ বিপদ সংকুল স্থানে আওরঙ্গজেবের অভিযানের কারণ সম্রাট শাহজাহান এক সময় পুত্রদের কাছে তৈমুরের বাসভূমি ও পূর্বপুরুষদের অধিকৃত সমরখন্দ দখলের অভিলাস ব্যক্ত করেছিলেন। পিতার এ মনস্কামনা পূরণের জন্য আওরঙ্গজেব মৃত্যুভয় উপেক্ষা করে সৎ সাহস ও পিতৃআনুগত্যের পরিচয়

দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সৈন্য বাহিনী সুদীর্ঘ সময় বিদেশে কাটানোর ফলে যুদ্ধ বিমুখ হয়ে দেশে ফিরতে চাইলে আওরঙ্গজেব এ পরিকল্পনা পরিত্যাগ করেন। উপরোক্ত আলোচ্যংশে মুরাদের অযোগ্যতা আর পিত্রাদেশ অবহেলা সবিশেষ লক্ষণীয়। অপরদিকে আওরঙ্গজেবের যোগ্যতা ধর্মপ্রবণতা এবং পিতৃ ভক্তির আদর্শ প্রণিধানযোগ্য। মধ্য এশিয়ায় দ্বিতীয় শাহ আব্বাস কান্দাহার পুনরুদ্ধারের জন্য বিশাল প্রণিধানযোগ্য। মধ্য এশিয়ায় দ্বিতীয় শাহ আব্বাস কান্দাহার পুনরুদ্ধারের জন্য বিশাল প্রণিধানযোগ্য। মধ্য এশিয়ায় দ্বিতীয় শাহ আব্বাস কান্দাহার পুনরুদ্ধারের জন্য বিশাল প্রণিধানযোগ্য।

আওরঙ্গজেবের এত বীরত্ব ও সুখ্যাতি অপর ভাইদের চিন্তিত করে তুলেছিল; বিশেষ করে দারাকে। তাই শাহজাহানের কানে নানাভাবে বিষ বর্ষণ শুরু করেছিলেন। ঠিক এ সময়ে এক নতুন ঘটনা ঘটে যায়। ১৬৪৯ খ্রিষ্টাব্দে ১৬ মে আওরঙ্গজেব পারসিকদের সাথে যুদ্ধে আশ্রয় চেষ্টা করেও পরাজিত হন। অমনি অপর প্ররোচনায় শাহজাহান আওরঙ্গজেবের উপর ক্রোধান্বিত হয়ে পত্র লেখেন—“পত্র পাঠ প্রত্যাবর্তন কর, আমার আদেশ এটাই তোমার ক্রটিতেই পরাজয় হয়েছে।”

আওরঙ্গজেব কোন দুঃখ অভিমান ক্রোধ প্রদর্শন না করে পিতার পদপ্রান্তে উপস্থিত হলেন। সিংহাসন, বিজয়মালা, নেতৃত্ব কিছুই রাজপুত্রের যেন প্রয়োজন নেই শুধু চান ইবাদত করার সুযোগ, পড়ার আর লেখার সময়।

সম্রাট লোকের কথা শুনে যে ভুল করেছিলেন একথা তাঁকে কেউ হয়ত বলিনি কিন্তু ঠিক তার পরেই সম্রাট নিজেও চেষ্টা করলেন একবার। কিন্তু পরাজিত হলেন। আবার তৈরী হয়ে আক্রমণ করলেন। তিনবার আক্রমণ করে ব্যর্থ হয়ে মুখে স্বীকার না করলেও বুঝতে বিলম্ব হল না যে আওরঙ্গজেব ক্রটিমুক্ত। আর জয়ের সাথে পরাজয়ও ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে, যেমন করে আলোকের পাশে অন্ধকার থাকে সম্পর্ক যুক্তভাবে।

বাই হোক, যখন সম্রাটের মৃত্যুর মিথ্যা সংবাদ রটিয়ে দেয়া হল সে সময়ে আসলে সম্রাট সত্তর বছরের বৃদ্ধ, শয্যাগত কঠিন মূর্মূষ রোগী। তাঁর মৃত্যুর কথা রটিয়ে দারা দিল্লীর সিংহাসনে বসেছেন। এ ঘটনাটি ঘটেছিল ১৬৫৭ খ্রিষ্টাব্দে।

শ্রীঘোষ তাঁর ইতিহাসে দারার প্রতি দারুণ দরদ থাকা সত্ত্বেও লিখেছেন, “কিন্তু পিতার স্নেহের ছায়ায় মানুষ হইয়া তিনি যুদ্ধ বিগ্রহ ও রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে প্রায় অনভিজ্ঞ ছিলেন বলা চলে।” দ্বিতীয় পুত্র সুজার জন্য লিখেছেন, “কর্মবিমুখতা ও আলস্য তাঁর চরিত্রের প্রধান দোষ ছিল।” আরও লিখেছেন, “স্ত্রির হইয়া কোন কাজ করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না।” অন্যদিকে আওরঙ্গজেব সম্পর্কে লেখক বহু প্রকার অশ্লীল অসংযত অপবাদ সৃষ্টি করলেও দু-একটি ইতিহাসে যা বলা আছে তা বিশ্বাস করলে লেখকের নিজের লেখা অভিযোগগুলো মিথ্যায় পরিণত হয় আর আওরঙ্গজেব সঠিক পদক্ষেপ নিয়েছিলেন বলা অপেক্ষা রাখে না। যেমন শ্রীঘোষ লিখেছেন, “ওরঙ্গজীবের চরিত্র ছিল ইহার টিক বিপরীত। যেমন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, তেমনি স্থির বীর ও

হিসেবী, কর্মক্ষম ও তৎপর ছিলেন তিনি যথেষ্ট। রাজনীতির জটিলতা সম্বন্ধে তাঁহার যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল তাহা আর কাহারও ছিল না। শাহজাহানের পরিষদেরা জানিতেন যে, এই তৃতীয় পুত্রই সিংহাসনের যোগ্যতম উত্তরাধিকারী এবং অন্তঃসন্দেহ হয়ত শেষ পর্যন্ত তিনিই জয়ী হইবেন।” তিনি মুরাদের জন্য লিখেছেন, “কোন দিক দিয়া তিনি আওরঙ্গজীবের সমকক্ষ ছিলেন না।”

মোটকথা, রিবাদ, ঝগড়া, কাটাকাটি হত্যা লুণ্ঠন ও ধ্বংসলীলা নিঃসন্দেহে দোষণীয়। কিন্তু রাজাদের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হয়। কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধের ধ্বংসলীলা, অশোকের নরহত্যা, ভ্রাতৃ হত্যা ও দেশকে শাসনে পরিণত করার ইতিহাস সাধারণ দৃষ্টিতে মন্দ হলেও রাজা-বাদশাহের ক্ষেত্রে তা বলা যায়না। বিগত ও বর্তমানের হতভাগ্য ইতিহাস সে স্বাক্ষরই বহন করছে। কিন্তু আওরঙ্গজেবের ক্ষেত্রেও এ দোহাই দিয়ে তাঁকে নির্দোষ প্রমাণ করার ওকালতি করে তাঁর উজ্জ্বল ইতিহাসকে অনুজ্জ্বল না করাই শ্রেয়।

শাহজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারার পরাজয় ও মৃত্যুর জন্য দায়ী যশোবন্ত সিং এবং রাজপুতগণের বিশ্বাসঘাতকতা প্রথমে দারার বিরুদ্ধে তিন ভাইই একমত হলেন যে, দারাকে কোন মতেই দিল্লীর সিংহাসনে রাখা যাবে না। আওরঙ্গজেব সিংহাসন লোভী ছিলেন না বরং জাতি ধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেককে অকল্যাণ থেকে রক্ষা করতেই তাঁকে প্রতিদ্বন্দ্বীতায় অবতীর্ণ থেকে হয়েছিল। অবিভক্ত বঙ্গ পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর পুস্তক ‘ইতিহাস পরিচয়’ যা ১৯৪৬ সনের সে পুস্তক এবং ইংরেজ ঐতিহাসিক Lanepole, Anals of Rajas than, প্রফেসর যদুনাথ সরকারের “History of Aurangzeb” এবং ১৯৬৩ সনে ছাপা প্রফেসর H. R. Chaudhury A. B. Siddique প্রভৃতি পণ্ডিতদের বই পুস্তক এবং ‘তারিখে আলমগীর’ ইত্যাদি পুস্তক থেকে কিছু আলোচনা করা হচ্ছে।

“দারার চঞ্চল স্বভাব এবং রক্ষ মেজাজের জন্য দরবারের অনেকেই বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন ছিলেন। তাঁহার মতবাদ (হিন্দুবাদ) অনেকের মনে বিরুদ্ধভাব এবং ঘৃণার উদ্বেক করিয়াছিল। তাঁর হিন্দুদের সাথে মিত্রতা বরং শিয়া মতবাদের প্রতি অনুরাগ সিংহাসন লাভের পথে অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। দ্বিতীয় পুত্র বাংলার শাসনকর্তা সুজা বুদ্ধিমান এবং কৌশলী শাসক ছিলেন। কিন্তু তিনি অত্যন্ত আমোদ প্রিয় ছিলেন এবং মদপানের প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি তাঁহার অনেক সদগুণ নষ্ট করিয়াছিল।”

শ্রীঘোষের ইতিহাসে উদ্ধৃতি উপরে দিয়েছি তাতে তিনি যে মদপানের চূড়ান্ত মাতাল ছিলেন এটা গোপন রাখা হয়েছে। আর শেষের উদ্ধৃতির মধ্যে তাঁর ঘোষাচারিতা নারী লোলুপতা ও ব্যভিচার দোষ গোপন করে শুধু লেখা হয়েছে ‘আমোদ প্রিয় ছিলেন’।

তারপর অধ্যাপক চৌধুরীদের ইতিহাসে ঠিক তার পরেই লেখা আছে—“সর্বকনিষ্ঠ পুত্র মুরাদ ছিলেন গুজরাটের শাসনকর্তা। তিনি একজন সাহসী যোদ্ধা ছিলেন, কিন্তু দারার দাস হইয়া পড়িয়া ছিলেন। তিনি চরিত্রহীন এবং ঘোর মধপায়ী ছিলেন। শাসকদের যে সমস্ত গুণ থাকা দরকার তাঁহার মধ্যে তাহার অভাব ছিল।” অতএব

রাজপুত্র চরিত্রহীন মদপায়ী হলে রাজ্যের সুন্দরী সতীদের কি পরিণতি থেকে পারে তা সহজেই অনুমেয়। একজন খুব ধনী বিত্তবান ধনকুবের মদপায়ী ও চরিত্রহীন হলে বাড়ির চাকরানীরও অধিনস্ত নর-নারীর ভাগ্যে কি ভয়াবহ দুর্ভোগ নেমে আসে তা অনেকের জানা আছে। অতএব আওরঙ্গজেব মাথা তুলে ভারতের ভাগ্যাকাশে সৌভাগ্য সূর্যের মত উদিত না হলে অন্যায়ের অন্ধকার ভারতের নির্মল নীলাকাশের গায়ে জমাটবদ্ধ রূপ নিত এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

দারা তাঁর পিতার স্নেহের সুযোগে আওরঙ্গজেবের উপর যে, অত্যাচারের স্তম্ভরোলার চালিয়ে ছিলেন তার সংক্ষিপ্ত নমুনা দেয়া হচ্ছে মাত্র।

(ক) ১৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দে দক্ষিণাত্য থেকে আওরঙ্গজেবকে আকস্মিক অপসারণ যা অন্য কোন রাজকুমারের পক্ষে সহ্য করা সহজসাধ্য ছিল না।

(খ) কান্দাহারের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় বার যুদ্ধের পূর্বে আয়োজন করে আক্রমণ করার ঠিক পূর্বাঙ্কে হঠাৎ সংবাদ পৌছল নিষেধাজ্ঞার। তাও তরুণ শাহজাদা মুখ বুজে সহ্য করলেন।

(গ) মুলতান শাসনের সময় সৈন্যদের খরচপত্রের জন্য পিতার কাছে অর্থ সাহায্যের আবেদন পেশ করলেন। কিন্তু অসহায় অবস্থায় তাঁকে কোন সাহায্য করা হবে না বলে জানিয়ে দেয়া হল। আওরঙ্গজেব তাও মুখ বুজে সহ্য করলেন।

(ঘ) আওরঙ্গজেব নিজের পুত্রের সাথে সূজার একটা সতী সুন্দরী কন্যার সাথে বিবাহ দেবার মনস্থ করেন কিন্তু তাতেও তিনি বাধাপ্রাপ্ত হন।

ইতিহাসে আজও মজুত আছে এ সমস্ত অপকর্মের মূলে দারার কারসাজি ছিল সাংঘাতিকভাবে। যেমন প্রফেসর এইচ, চৌধুরীদের ইতিহাসে লেখা আছে—“আওরঙ্গজেবের প্রতি শাহজাহানের এ ব্যবহারের মূলে দারার ভূমিকা ছিল অত্যন্ত প্রকট।” ‘পাক ভারতের মুসলমানের ইতিহাস’ পুস্তকের ২৮৬ পৃষ্ঠা থেকে কিছু অংশ তুলে ধরছি।

“দারা তাঁহার ভকিলগণের (Vakil) নিকট হইতে এই মর্মে আশ্বাস লাভ করিয়াছিলেন যে, দূর প্রদেশে অবস্থানরত শাহজাদাদের নিকট তাঁহারা সম্রাট অথবা দরবারের কোন সংবাদ পাঠাইবেন না। কেন্দ্রের সহিত সকল যোগাযোগ তিনি বিচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন এবং পথিকগণ যাহাতে কেন্দ্রের কোন খবর প্রচার করিতে না পারে তাহার জন্য বাংলা, গুজরাট এবং দক্ষিণাত্যের সমস্ত রাস্তা বন্ধ করিয়া দেয়া হইয়াছিল। তিনি তাঁহার ভকিলদের সম্পত্তি পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত করিয়াছিলেন। আওরঙ্গজেবের অধীনে বিজাপুরে সংগ্রাম রত কর্মচারীদের তিনি রাজধানীতে ফিরিয়া আসিবার জন্য আদেশ দান করিয়াছিলেন। শাহজাদাগণ রাজধানীতে প্রবেশের পূর্বেই তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য তিনি সৈন্যদের আদেশ দিয়াছিলেন। দারাশিকোর এই সমস্ত কার্যাবলী ভ্রাতৃসংগ্রামকে উদ্দীপ্ত করিয়াছিল।” দারাশিকোর ভিতরের এক নোংরাামী, অবিচার, অন্যায় ইতিহাসে না জানিয়ে শুধু মাত্র আওরঙ্গজেবের চরিত্রে কলঙ্ক লেপন আর তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ও শত্রুদের বীর এবং সজ্জন বলে মানুষের মনে মনস্তাত্ত্বিক ধারণা জন্মায়ে দিতে কাজ শেষ করে গেছেন অনেকেই, কিন্তু এখন সমস্ত চক্রান্ত শিক্ষিত উদারচেতা মানুষদের কাছে আস্তে আস্তে ধরা পড়ছে এবং আরও ধরা পড়তে থাকবে।

আওরঙ্গজেবের উপর এত অবিচার আর অপমানজনক অলীক অনাচার প্রয়োগ সত্ত্বেও তিনি কোন্ চরিত্রের মানুষ ছিলেন তা জানবার জন্য বিখ্যাত ইতিহাস ‘আদব-ই আলমগীরী’ থেকে আওরঙ্গজেবের নিজের হাতের লেখা একটি মূল্যবান পত্র যা তাঁর বোন হাফেজা জাহানারাকে তিনি লিখেছিলেন। সেটির অনুবাদ তুলে ধরা হচ্ছে—“যদি সম্রাট তাঁর সমস্ত চাকরদের মধ্যে কেবল আরই অবাননার জীবন-যাপন এবং অগৌরবময় মৃত্যুবরণ দেখতে ইচ্ছা করেন তাহাতেও আমি পিতার বিরুদ্ধে যেতে পারব না।.....কাজেই সম্রাটের অনুমতিক্রমে যাতে রাষ্ট্রের কোন ক্ষতি না হয় এবং অন্য লোকের (দারার) মনে শান্তি ব্যাহত না হয় সে জন্য এ বিরক্তির জীবন-যাপন থেকে মুক্তি নেয়াই উত্তম। বছর পূর্বে আমি এ সত্য উপলব্ধি করেছিলাম এবং জীবন বিপদাপন্ন বুঝতে পেরেই অন্য লোকের (দারার) ক্ষতির কারণ না হবার জন্যই পদত্যাগ করতে ইচ্ছা করেছিলাম।

শাহজাহান মৃত্যু ব্যাধি থেকে মুক্তি লাভ করে নভেম্বর মাসেই সুস্থ হয়ে উঠেন। কিন্তু তার আগেই দারা পিতার এত অন্ধ ভালবাসা পেয়েও সিংহাসন দখল করে নিজেকে বাদশাহ বলে ঘোষণা করেছিলেন। মুরাদও লোভ সংবরণ করতে পারলেন না। ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই আহমদাবাদে রাজমুকুট ধারণ করে নিজেকে হিন্দুস্থানের বাদশাহ বলে ঘোষণা করলেন। সুজাও সোজাসুজি পথ ধরলেন অর্থাৎ তিনিও বাংলাদেশের স্বাধীন রাজা বলে নিজেকে ঘোষণা করলেন। আওরঙ্গজেব তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ়, শুধু ভাবছিলেন এ অপদার্থ ভাইদের হাতে সিংহাসন যাওয়া মানেই নাজা ছেলেদের হাতে ধারাল অস্ত্র তুলে দেয়া। তাই তিনি ইন্তেখারার নামায পড়ে মুমিয়ে পড়লে স্বপ্নে তাঁকে বলা হল ‘তুমি তোমার লক্ষ্যস্থানে পৌঁছার চেষ্টা কর তোমার সাধুতা ও রাজ্য পরিচালনা দুইই এক সাথে সম্ভব হবে।

তিনি এবার সসৈন্যে মীর জুমলাকে সেনাপতি করে অগ্রসর হলেন। ১৬৫৮ খ্রিষ্টাব্দে মার্চ মাসে উজ্জয়িনীতে তিনি সৈন্য সামন্তসহ মুরাদের সাথে মিলিত হলেন। এ সময় সাধারণভাবে এটা অসম্ভব ছিল না যে মুরাদকে যুদ্ধে নিহত করে পথ নিষ্কণ্টক করা। কিন্তু কোন যুদ্ধই হল না বরং মিলনের কথাই হল।

এদিকে দারার সাথে সসৈন্যে যুদ্ধ হল ১৬৫৮ খ্রিষ্টাব্দে ১৪ই মার্চ সূজার। সুজা পরাজিত হলেন কিন্তু মুরাদ আর আওরঙ্গজেবের বাহিনীকে শায়েস্তা করার জন্য দারার সেনাপতি যশোবন্ত সিং এবং কাসেম খাঁ যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। ১৬৫৮ খ্রিষ্টাব্দে ১৫ই এপ্রিল তুমুল যুদ্ধ হয় উজ্জয়িনীর নিকট ধর্মাট নামক স্থানে। যুদ্ধে দারা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন, পরাজিত হবার অন্যতম কারণ ছিল শেষ মুহূর্তে রাজপুত সেনাপতি যশোবন্ত সিংহের বিশ্বাসঘাতকতা। মিঃ ঘোষ ও তাঁর ইতিহাসে লিখেছেন—“মোঘল শিবিরে হিন্দু সেনাপতি যশোবন্ত সিং ও মুসলমান সেনাপতি কাশেমম খাঁর মধ্যে মতবিরোধের ফলে ঔরঙ্গজেব যুদ্ধে জয়ী হন।” এই সময় যশোবন্ত সিংহ পলাতক দারার দরদে দরদী হয়ে পত্র পাঠালেন “যদি তিনি আজমীরে আসিতে পারেন তবে তিনি এবং অন্যান্য রাজপুতেরা তাঁকে সাহায্য করিবেন। এই আশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া দারা আজমীরে আসিয়া উপনীত হইলেন। কিন্তু ইত্যবসরে যশোবন্ত সিং ঔরঙ্গজেবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ঔরঙ্গজীবের পক্ষ ও ভক্ত হইয়া পড়িলেন, কাজেই দারা আজমীরে আসিয়া প্রতারিত হইলেন। (ভারতজনের ইতিহাস)

এর চেয়ে বড় বিশ্বাস ঘাতকতা ইতিহাসে আর কি থেকে পারে? সাহায্য তো দূরের কথা একেবারে শত্রুপক্ষের সাথে হাত মিলিয়ে চরম মুনাকফী প্রদর্শন করে ইতিহাসের পতাকে কলঙ্কিত করেছেন। এ অবস্থায় সৈন্য নিয়ে আর বিনা যুদ্ধে পলায়নও সম্ভব নয়। তাই যুদ্ধ হল আওরঙ্গজেবের সাথে। কিন্তু দারাকে পরাজিত হয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতে বাধ্য থেকে হল। ঠিক দারার এ দারুন সঙ্কট সময়ে দারার যাবতীয় ধন-রত্ন ও মাল সামগ্রী রাজপুতগণ লুট করে দারার প্রতি মানবতা বিরোধী বিশ্বাসঘাতকতা প্রদর্শন করা হয়।

উপরোক্ত তথ্যগুলো ১৯৪৬ সনে স্কুলের পাঠ্য পুস্তক এ 'ইতিহাস পরিচয়' থেকে নেয়া হয়েছে। তাছাড়া প্রফেসর যদুনাথ সরকার তাঁর 'History of Aurangzeb' নামক গ্রন্থে যা বলেছেন তাও গভীর কৃতজ্ঞতার সাথে পরিবেশিত হল :-

"Of all the actors in the drama of war of Succession; jasamant emerges from it with the worst reputation; he had run away from fight where he commanded in chief, he had treacherously attacked an unsuspecting friend and he abandoned an-ally whom he had plighted his word to support and whome he had lured into danger by his promises, unhappy was the man who put faith in Jasamant Singh, lord of marwar and chieftion of the Rather clan."

দারা গুজরাট পলায়ন করলেন। মুরাদ এতদিন পর্যন্ত আওরঙ্গজেবের পক্ষের লোক ছিলেন। হঠাৎ তাঁকে বিশেষ বিশেষ পক্ষ থেকে প্রলোভন ও উৎসাহ দেয়া হল। আওরঙ্গজেব তাঁকে মোটেই অবিশ্বাস করতে পারেন না। এ সুযোগে যদি তিনি আওরঙ্গজেবকে নিহত বা পরাজিত করতে পারেন তাহলে জনগণের কাছে প্রমাণিত হবে মুরাদ আওরঙ্গজেবের চেয়েও সুযোগ্য। সুতরাং তার ভবিষ্যত হবে উজ্জ্বল। মদের মাতাল মুরাদ এ বিরাট ভুলকে এক অপূর্ব সুযোগ মনে করে বিদ্রোহী হয়ে উঠলেন। আওরঙ্গজেব অবাক হলেন বটে, কিন্তু কাল বিলম্ব না করে সাহস ও নিপুণ কৌশলে মুরাদের দুঃসাহস ব্যর্থ করে তাঁকে বন্দী করেন এবং গোয়ালিয়র দুর্গে পাঠিয়ে দিলেন।

এদিকে ভ্রাতা সুজা সুলেমানের নিকট পরাজিত হয়ে পুনরায় সৈন্য সংগ্রহ করে আওরঙ্গজেবের উপর সসৈন্যে আক্রমণ করলেন। খাজোয়া নামক স্থানে দুপক্ষের তুমুল সংঘর্ষ হল। এবারে এ যুদ্ধে আওরঙ্গজেবের ক্ষমাপ্রাপ্ত যশোবন্ত সিং। এবার যশোবন্ত সিংহের নতুন কীর্তি ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়। যদিও তা যবনিকার অন্তরালে বিরাজমান। "ইতিহাস পরিচয়" থেকে তুলে দিচ্ছি- "কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যশোবন্ত সিং গোপনে গোপনে সুজার সঙ্গে যোগ দিয়া একদিন রাত্রিকালে আওরঙ্গজেবের শিবির আক্রমণ করিয়া বসিলেন। এইরূপ বিপদের মধ্যে আওরঙ্গজেব বিচলিত হইলেন না। শীঘ্র তিনি যশোবন্ত সিংকে পরাজিত করলেন। তখন যশোবন্ত সিং প্রাণ ভয়ে পলায়নপূর্বক পরিত্রাণ পাইলেন। আর সুজা আরকানে আশ্রয় লইলেন। তারপর হইতেই তাঁকে আর রাজনীতির মধ্যে দেখা যায় নাই। শোনা যায় আরকানে

আততায়ীর হাতে তাঁরা সপরিবারে নিহত হন। তাঁর মৃত্যুর জন্য আওরঙ্গজেবের উপর দোষারোপ শুধু নির্ভেজাল মিথ্যা তথ্য পরিবেশন নয় বরং ইতিহাস না জানার না বোঝার তথা অযোগ্যতার চরম পরিচায়ক।

যশোবন্ত সিংহের আসল উদ্দেশ্য কি ছিল তা গবেষক, ঐতিহাসিক সমীক্ষার বিষয়। এত অপরাধ করার পর যশোবন্ত সিংহ আওরঙ্গজেবের কাছে ক্ষমা পাওয়ার আশা না করেও ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। আওরঙ্গজেবে সাথে সাথে তার পবিত্র কুরআনের আদর্শ ও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বাণী স্মরণ করে ক্ষমা করলেন। এ সব নতুন তথ্য খুব আশ্চর্যজনক এবং কারো কারো কাছে অবিশ্বাস্য মনে থেকে পারে। বিখ্যাত ঐতিহাসিক জে, এন, সরকারের লেখা থেকে উদ্ধৃত দেয়া হচ্ছে- "এর পরও যশোবন্ত সিংহ আওরঙ্গজেবের ক্ষমা প্রার্থনা করলে তিনি পুনরায় ক্ষমা করেন এবং শাসনকর্তা রূপে তাঁকে কাবুলে পাঠিয়ে দেন।" আজ বোঝার দিন এসেছে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শুধু মৌখিক ক্ষমা নয় আন্তরিকতার নিদর্শন স্বরূপ কাবুলের শাসনকর্তা করে পাঠানো অন্ততঃ একজন হিন্দুকে কোন হিন্দু বিদ্বেষী গোঁড়া মুসলমানের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এখন দিবালোকের মত পরিষ্কার যে তাঁকে হিন্দু বিদ্বেষী ও তিনি কাউকে বিশ্বাস করতেন না হিন্দুদের রাজকর্ম থেকে অপসারণ করতেন প্রভৃতি কথা যারা বলেছেন আজ তারাই বরং ইতিহাসের "মাছিমাঝা কেরানী" প্রতিপন্ন হয়ে হয়ত কোটি কোটি হৃদয় রাষ্ট্রে কলঙ্কিত হয়ে আছেন। তবে কাঁচা লেখক অজানা না জানার কারণে যা করেছেন তা ক্ষমা পাবার দাবী রাখতে পারে।

আর মুরাদকে হত্যার সহজ অপবাদ আওরঙ্গজেবের উপর যেভাবে বরাবর চাপিয়ে যাওয়া হয়েছে তাতে এ তথ্য অনেকের কাছে সত্য বলে মনে হয়েছে। কিন্তু মূল ইতিহাস, যুক্তিতর্ক, বুদ্ধি ও বিবেকের কষ্টি পাথরে যাঁচাই না করলে ইতিহাস স্থায়ী মর্যাদা পায় না। আমাদের মনে রাখা উচিত আওরঙ্গজেব কুরআন ও হাদীসপন্থী সহজ, সরল সত্যবাদী ও সদাচারী প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তিনি কাজী বা মুফতি পদে ছিলেন না। বরং বিচার, ফতোয়া, মীমাংসা, সমাধান, ইজমা ও কিয়ামের জন্য কাজী, মুফতি আল্লামা ও উলামা কমিটি প্রস্তুত ছিল। তাঁদেরই কাজ ছিল বিচার ইত্যাদি সমস্যার সমাধান করা। আর মুরাদের মৃত্যুও ছিল এ সমস্ত বিচারকদের বিচারের পরিণাম ফল।

আওরঙ্গজেবের সময়ে একজন সাধারণ প্রজা তাঁর আত্মীয়কে হত্যা করার অভিযোগে মুরাদের বিরুদ্ধে বাদশাহর কাছে যথাযোগ্য বিচার প্রার্থনা করেন। বাদশাহ নিজে বিচার করার যোগ্যতা রাখলেও নীতি অনুসারে বিচার বিভাগীয় প্রধান নিচারণপতির কাছে মুরাদের বিচার হল এবং সাক্ষী ও প্রমাণে অন্যায হত্যা বলে নিবেচিত হল। ইসলাম ধর্মে আইনানুসারে প্রাণনাশের শাস্তি প্রাণনাশ, অবশ্যই তা প্রমাণের পূর্বাঙ্কে নয়। আজ ইতিহাসে সোজাসুজি আওরঙ্গজেব কর্তৃক মুরাদকে নিহত হবার সম্পূর্ণ তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। কিন্তু আসলে সত্য কথা হচ্ছে এটাই যে, নিচারণকের বিচারে প্রাণনাশের অপরাধে তাঁর প্রাণদণ্ড হয়েছিল। যাকে মুরাদ হত্যা করেছিলেন তার নাম ইতিহাসের পাতায় সুস্পষ্টভাবে সংরক্ষিত। সে বিশিষ্ট রাজকর্মচারীর নাম ছিল 'আলী নকী খাঁ'।

আওরঙ্গজেব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দারাকে হত্যা করেছিলেন এ রকম কথাই হেটো ইতিহাসে খুচরা-পাইকারী দরে পাওয়া যায়। দারার বিরুদ্ধে একটা ঐতিহাসিক অভিযোগ ছিল যার শাস্তি প্রাণদণ্ড। তাঁর রাজদ্রোহীতা, গুপ্তচর বৃত্তি, শত্রু রাষ্ট্রের সাথে আতঁত প্রভৃতি আরও অনেক অভিযোগে তিনি অভিযুক্ত ছিলেন। ইসলামের আইনে কিন্তু যখন তখন মনগড়া কোন শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা নেই। আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা, পানিতে ডুবিয়ে কিংবা গরম পানি বা তেলে সিদ্ধ করা, মলদ্বারে লৌহ শলাকা প্রবিষ্ট করে মাথা অবধি তা পৌছে দেয়া,, বিষপান করান ইত্যাদি শাস্তিগুলো নিষিদ্ধ। ইসলামের আইনে প্রাণনাশ করলে, বিবাহিত ব্যক্তি ব্যভিচার করলে এবং স্বধর্ম ত্যাগ করলে তার প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা আছে। দারারও প্রাণদণ্ড হয়েছিল আওরঙ্গজেবের আদেশে নয় বরং আইনের অনুকূলে জজের বিচারে। মদপান বা ব্যভিচার ও স্বধর্ম ত্যাগ একাধিক কারণে প্রাজ্ঞ বিচারকমণ্ডলী তাঁকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। অবশ্য পাঠক-পাঠিকাদের অনুসন্ধিৎসা থাকা স্বাভাবিক যে, দার সত্যই ধর্মত্যাগী ছিলেন কিনা?

হিন্দু রাজপুত জাতি যেমন আকবরকে বেশ বশ করে মুসলমান নামধারী হিন্দু অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ হিন্দুতে পরিণত করেছিলেন, যুবক অবস্থায় জাহাঙ্গীরের অবস্থাও অনুরূপ ছিল এবং পরবর্তী সময়ে দারাও তাঁদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে এ পথের পথিক হয়েছিলেন। দারা ছিলেন আকবরে মত বাইরের কাঠামোধারী ছদ্মবেশী। দারা সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য দুর্লভ নামী--দামী ইতিহাস থেকে সংগৃহীত কিছু তথ্য উপস্থাপন করা হচ্ছে--

দারারও ধারণা হয়েছিল ভারতে হিন্দু জাতি সংখ্যাগরিষ্ঠ, সুতরাং তাদেরকে হাতে রাখার অর্থই হচ্ছে দিল্লীর সম্রাট হওয়া। অতএব আকবরের নীতি অনুসরণ করে দারার নিজের ভূমিকা আরও হৃদয়গ্রাহী করতে 'দীনে ইলাহির' ন্যায় তিনিও এক নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। এছাড়া একটি ধর্মগ্রন্থও লিখলেন। বইটির নাম 'মজমুয়াল বাহরাইন'। এর অর্থ হচ্ছে 'সাগরদ্বয়ের মিলন'--অর্থাৎ হিন্দু ও মুসলমানদের ধর্ম দুটি যেন দুটি সাগর আর সে দুটির সন্ধি ঘটিয়ে খিচুড়ী তৈরী করাই ছিল দারার কল্পনা। দারা দস্তুর মত ছিলেন "সংস্কৃত সাথিকো" বিশেষতঃ উচ্চপর্যায়ের হিন্দুশাস্ত্রে পরদর্শী।

একজন হিন্দু পণ্ডিত মুসলমান বেশ ধারণ করে দারার সাথে সাক্ষাত করেন এবং তিনি নাম মাওলানা ফকির বলে পরিচয় দেন। বলাবাহুল্য এ পণ্ডিতই দারাকে বিভ্রান্ত করার জন্য মুসলমানের কিছু বইপত্র পড়ে অল্পসল্প মুসলমান হাঙ্গামা করেছিলেন। তিনি সম্রাট দারাকে উপনিষদ থেকে শিক্ষা নিতে উৎসাহিত করেন। ফকির মাওলানার কথায় তিনি বেনারস থেকে কয়েকজন বিজ্ঞ সুপণ্ডিতকে আহ্বান করেন এবং গভীর মনযোগ দিয়ে উপনিষদ শিক্ষা করেন। এখান থেকেই দারার হৃদয়ে হিন্দু ধর্ম গ্রহণের বীজ রোপিত হয়। মাত্র ছয় মাসের পরিশ্রমের ফলস্বরূপ রাষ্ট্র ভাষা ফারসীতে উপনিষদের অনুবাদ করে নিজের যোগ্যতা প্রদর্শন ও হিন্দু জাতির প্রিয়পাত্র থেকে সক্ষম হন। বইটি শুধু উপনিষদের অনুবাদ মাত্রই ছিল না তাতে ছিল তাঁর

নিজের সৃষ্ট ধর্মের নানা টীকা টিপ্সনী। আর উপনিষদও তাঁর 'সাগরদ্বয়ের মিলন' গ্রন্থকে প্রমাণিত করতে গিয়ে কষ্ট কল্পনা করে কুরআন ও হাদীসের বিকৃত ব্যাখ্যা করতেও দ্বিধা করেন নি। তাঁর 'মজমুয়াল বাহরাইন' গ্রন্থের অনুবাদ করেন ফার্সী কবি 'মুসাআবতাই দুর্পেরা'।

যুবরাজ দারা সিংহাসন দখলের জন্য লড়াইয়ের পূর্বে সমাজের নেতৃস্থানীয় হিন্দু নেতাদের সহযোগীতা ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি চেয়েছিলেন; তাঁরা তাকে সহযোগীতা করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিল। দারার প্রতি যাতে বিশ্বাস আরও গাঢ় হয় সে অভিপ্রায়ে হিন্দুদের তীর্থক্ষেত্র মথুরায় একটি মন্দির করিয়েছিলেন। মথুরার মন্দিরে বহু মূল্যবান কারুকার্য খচিত পাথরের রেলিং স্থাপন করেন। দারার দ্বারা সে সজ্জিত মন্দির এখন গুরুত্বপূর্ণ তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছিল যার ভয়াবহ একটা দিক ছিল--হিন্দুদের তীর্থস্থানে হিন্দু তীর্থ যাত্রীর ভীড় তেমন কিছু নতুন নয়। কিন্তু দারার সাহায্যপুষ্ট কেশব রায়ের মন্দির, গুজরাটের মন্দিরগুলোকে কেন্দ্র করে অনেক আশ্চর্য অলীক গল্প প্রচারিত হয়েছিল। যেমন বুদ্ধ শাহজাহান একবার খুব অসুস্থ হলে দারা ঠাকুর দেবতার স্মরণাপন্ন হন এবং এক ঠাকুরের বরে বুদ্ধ শাহজাহান আবার সুস্থ হয়ে উঠেন। তাই দেবতার শক্তিতে অভিভূত হয়ে তিনি হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করেছেন ইত্যাদি ইত্যাদি। ইসলাম ধর্মে মূর্তিপূজা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। কিন্তু সম্রাট দারার অর্ধের ঘনঘটার বহর লক্ষ্য করে সাদাসিদে রোগগ্রস্ত বিপদগ্রস্ত নর-নারীর এমন সমাবেশ থেকে থাকে যে তীর্থক্ষেত্রগুলো মুসলমান ও হিন্দুদের যুগ্ম তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল এবং এখান থেকে দারার পক্ষ থেকে রাজনৈতিক কার্যকলাপ পরিচালিত হত এ সমস্ত ধর্মীয় পুরোহিতদের দ্বারা। আওরঙ্গজেব সম্রাট হবার অনেক দিন পরে কাজী মুফতির দরবারে দারা বিরুদ্ধে মোকদ্দমা হয়। সে মোকদ্দমায় স্বহস্ত লিখিত পত্র, সনদযুক্ত লেখা এবং তাঁর পুস্তক প্রভৃতি প্রত্যক্ষ সাক্ষীদের সাক্ষ্য দারা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। সে রায় প্রকাশের সংবাদে আওরঙ্গজেব বলে পাঠিয়ে দিলেন আপনাদের রায়ের উপর কোন প্রতিবাদ করার স্পর্ধা আমার নেই। কুরআন হাদীসের আলোকে বিচারের বিরুদ্ধে কিছু বলার অর্থ হচ্ছে ইসলাম ধর্মে হস্তক্ষেপ করা।

আজ উপন্যাস মার্কা সস্তা হেটো ইতিহাসে 'সিংহাসনের জন্য ভাইদের হত্যা করিয়াছিলেন' বলে যে মতটি বহুল প্রচারিত একটু গভীর চিন্তা করেই তার অসারতা প্রমাণ হবে। কারণ সিংহাসনের জন্য হত্যা করলে তা সিংহাসন পাওয়ার পূর্বেই করা যেত। কিন্তু তাঁর সিংহাসন পাবার পরে যখন তিনি সম্রাট হয়ে সিংহাসনে সম্পূর্ণভাবে অধিষ্ঠিত এবং প্রতিদ্বন্দ্বী যখন হাতের মুঠোয় বন্দী তখন এত কলাকৌশল করে হত্যা করার প্রহসন সৃষ্টির প্রয়োজন ছিল না। এমনি রোগগ্রস্ত হয়ে মারা গেছে বললেই যথেষ্ট ছিল। অতএব সিংহাসনের জন্য ভাইদের হত্যা করার প্রচার সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং ঐতিহাসিক চরিত্রের শিক্ষা হীনতা, নীতিহীনতা অথবা অদূরদর্শিতার পরিচায়ক। ঐতিহাসিক থেকে হলে তাঁকে সত্যবাদী হওয়া যেমন প্রধান শর্ত তেমনি জ্ঞান-বুদ্ধি বিচার-বিবেচনার যোগ্যতা থাকাও দ্বিতীয় শর্ত। ঐতিহাসিক মাছিমাঝা কেরানী নয় আর ইতিহাসকে সাজিয়ে গুছিয়ে মিথ্যা মুখরোচক উপন্যাসে পরিণত করা দেশও দেশের কত ক্ষতিকারক তা অবশ্যই বিবেচ্য।

আকবর জাহাঙ্গীর প্রভৃতি বাদশাহরা জিজিয়া তুলে দিয়েছিলেন। সহজেই মনে হয় তা উদারতার কারণ। আর আওরঙ্গজেব আবার তা পুনঃ প্রবর্তন করে যেন হিন্দু বিদ্বেষের পরিচয় দিয়েছেন। আসল কথা আকবর ও জাহাঙ্গীরের জিজিয়া প্রথার বিলোপ সাধন ছিল গুরুতর ইসলাম বিরোধী কর্ম। আওরঙ্গজেব যদি তা পুনঃ প্রচলন না করতেন তাহলে তাও হত ইসলাম ধর্মের পরিবর্জন নীতি অবলম্বন। তাই তাঁকে জিজিয়া কর ধার্য করতে হয়েছিল। কিন্তু জিজিয়া শুধু হিন্দুদের দিতে হত, কোন মুসলমানকে নয়। তার আসল কারণ হচ্ছে এটাই যে, জিজিয়া একটি সামরিক কর মাত্র, এটি 'মাথাগণতি' কর নয়। কোন হিন্দু মহিলা, বালিকা, বালক, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, শিশু, অন্ধ, খঞ্জ, ভিক্ষুক ও সন্ন্যাসীকে এ কর দিতে হত না। অমুসলমানদের মধ্যে যারা যুদ্ধ করার শক্তি রাখতেন বা সক্ষম অথচ যুদ্ধ করতে অনিচ্ছুক শুধু তাঁদেরই দিতে হত জিজিয়া। কিন্তু মুসলমানদের ক্ষেত্রে প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে জোর করে যুদ্ধ করার জন্য অথবা যুদ্ধক্ষেত্রে যোদ্ধাদের সাহায্য ও সেবাশুশ্রূষা করার জন্য নিয়ে যাওয়া হত। অপরপক্ষে, ইসলাম ধর্মে এরূপ কোন সংবিধান নেই যে, জোর করে কোন হিন্দুকেও যুদ্ধে যোগদান করানো যাবে।

এছাড়া মুসলমানদের জন্য সম্পদ বা অর্থের $\frac{1}{80}$ ভাগ, একটা কর বাধ্যতামূলক ছিল। তার নাম 'যাকাত'। এতদ্ব্যতীত উৎপন্ন ফসলের $\frac{1}{10}$ অংশ 'ওশর', 'ফিতরা', 'খুমুস', 'সদকা', 'ফিদিয়া' এবং 'খারাজ' প্রভৃতি আরও ছোট বড় অনেক কর মুসলমানদের জন্য নির্ধারিত ছিল। কিন্তু এ সমস্ত করগুলো কোন অমুসলমানদের জন্য নয়—এটা ইসলামের বিধি ব্যবস্থা। তাই হিন্দুদের ক্ষেত্রে এ সমস্ত কর রেহাই দেয়া ছিল। এখানে উল্লেখযোগ্য কথা হচ্ছে এটাই যে, হিন্দু প্রজাদের কাছে যে জিজিয়া নেয়া হত তা তাঁদের স্থাবর অবস্থাবর সম্পদ সম্পত্তির রক্ষার দায়িত্বের ভিত্তিতেই হত। প্রফেসর যদুনাথ সরকার লিখিত "Mughal Administration" গ্রন্থে পাওয়া যায় আওরঙ্গজেব ৬৫ প্রকার কর তুলে দিয়েছিলেন। অপর ঐতিহাসিক অনেকেই বলেছেন, যিনি ৮০টি করের বিলোপ সাধন করলেন তখন প্রশংসা পান নি কিন্তু শুধু একটি করের জন্য চারিদিকে কলবর ধানি। J. D. A. S. এর লেখা "Vindication of Aowrangzeb" গ্রন্থে আছে—When Aowrangzeb abolished eighty taxes no one thanked him for his generosity. But when he imposed only an at not heavy at all, people began to show their displeasure.

এ জিজিয়া শুধু ভারতেই মুসলমান বাদশাহ কর্তৃক হিন্দুদের উপর ধার্য হয়েছিল তা নয় বরং বহির্ভারতেও এ কর অমুসলমানদের কাছ থেকে নেয়া হত শুধু যিনি যুদ্ধে যেতে সক্ষম অথচ অনিচ্ছুক তাঁদেরই উপর ছিল এ কর। অতএব জিজিয়া একটি হিন্দুবিদ্বেষী কর মনে করা সত্যের অপলাপ ছাড়া কিছু নয়।

জিজিয়া একটি War tax বা যুদ্ধ কর মাত্র। এ জিজিয়া কোনও দিন অত্যাচার ও উৎপীড়নমূলক আদায় করা হয়নি। সম্রাট হিন্দু নেতাদের সাথে পরামর্শক্রমে এ কর আদায় করতেন। তাই স্যার যদুনাথ সরকার তাঁর "Mughal Administration" গ্রন্থে লিখেছেন, Asses there revenue in such a way that the roy to at large mayget there dues and the government mony may be collected at the right time and no yoat may be opperessed".

কোন ঐতিহাসিক বা লেখক কি প্রমাণ করতে পারবেন যে, কোন সুস্থ সকল হিন্দু সৈন্যকেও কর দিতে হয়েছিল? অতীতেও পারেন নি আর বর্তমানেও কেউ পারবেন না তবে আগামীতে ঐতিহাসিকতার নামে ঔপন্যাসিকতা কত দূরে গিয়ে পৌছাবে তা চিন্তা করে অনেকে শিহরে উঠছেন।

আরও মনে রাখার কথা, আওরঙ্গজেব সিংহাসনে বসেই প্রথম বছরেই হিন্দুদের উপর জিজিয়া কর চাপন নি বরং ১৬ বছরের মধ্যে ৮০ প্রকার কর তুলে দিয়ে তারপর সামান্য জিজিয়া ধার্য করেছিলেন। আর তাই নিয়ে ইতিহাসে এত হৈ চৈ। এত আয়োজন। বোধহয় আসল উদ্দেশ্য অন্য কিছু। যাকে 'ইসলামী কোড' বলা হয় সেটা আরবী 'হিদায়া' আইন গ্রন্থেরই অনুবাদ বা ছায়াবলম্বিত। তাতে লেখা আছে—“জিজিয়া কর প্রবর্তনের কারণ, এ কর সে সাহায্যের পরিবর্তে যা অমুসলিম জীবন, ধন ও মান সম্বন্ধে রক্ষার দায়িত্ব নিজের স্বন্ধে নিয়েছেন” উক্ত গ্রন্থের অন্যত্র আরও আছে—“যদি তাঁরা জিজিয়া গ্রহণ করা মঞ্জুর করলেন তো তাঁদের হিফায়ত এরূপভাবেই করা উচিত। যেমন মুসলমানদের করা হয়। তাদের জন্য সে আইন প্রবর্তিত হবে যা মুসলমানদের প্রতি হয়। কারণ হযরত আলী (রাঃ) বলে গেছেন, অমুসলিম জিজিয়া এজন্য দান করে থাকেন যে, তাঁদের রক্ত মুসলিমদের রক্ত এবং তাঁদের ধন সম্মান মুসলিমদের ধন সম্মানের সমান।”

“খলিফা হযরত ওসমান গণি (রাঃ)-এর রাজত্বকালে হাবিব বিন সালমী জিজিয়াকে জয় করে নিলেন, তখন অমুসলিমগণ সৈন্যে যোগদান করে সামরিক সাহায্য করলেন তখন তাঁদের জন্য জিজিয়া বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল।”

যদুনাথ সরকারও তাঁর ইতিহাসে আওরঙ্গজেব সম্বন্ধে লিখেছেন, সমস্ত প্রকার কর আলমগীর তুলে দেয়ার জন্য সম্রাটের পাঁচ কোটি টাকার উপর ক্ষতি হয়েছিল। He Aurangzeb abolished all taxes that were not santioned by Islam the exchequer this last about five millions sterling a year.

তাই ফ্রান্সের বিখ্যাত ঐতিহাসিক পণ্ডিত ডাঃ গাস্তাওলিবান লিখেছেন, “ইসলামের খলিফারা ভালভাবে বুঝেছিলেন যে,, ইসলামকে তরবারির জোরে প্রচার করা সম্ভব নয়। কাজেই দেখা গেছে যেখানেই মুসলমানরা বিজয়ী হয়ে প্রবেশ করেছেন সেখানেই পরাজিত নগরবাসীদের প্রতি খুবই নম্র ও ভদ্র ব্যবহার করেছেন এবং তাদের সুখ শান্তিতে রাখার সর্ব প্রকার দায়িত্ব গ্রহণ করে তার বিনিময়ে

যথাক্রমে কর (জিজিয়া) গ্রহণ করতেন। অমুসলিমগণ পূর্বের রাজাকে যে কর দান করত তার তুলনায় জিজিয়া কর অতি নগণ্য ছিল।" এ অতি সত্য কথা যে, দুনিয়াতে এরূপ সংযমী ভদ্র রাজ্য বিজেতা পূর্বে কোন কালে জন্মে নাই এবং এরূপ নম্র ও দয়ালু জাতি ইতিপূর্বে কখনও দেখা যায় নাই।"

ডাঃ জে. কে. কান্টি মহাশয় তাঁর 'স্পেনের ইতিহাস' গ্রন্থে যা লিখেছেন তাতে জিজিয়া সম্বন্ধে কুধারণার পরিবর্তে সুধারণারই সৃষ্টি হয়। যেমন—“সেই শর্ত যাহা পরাজিত জাতির নিকট জয়ী মুসলমানদের তরফ হইতে আদায় করা হইত। তাহা এইরূপ ছিল যে, ইহাতে তাহাদের কোনরূপ কষ্টের পরিবর্তে বরং তাহাদের মনে পূর্ণ শান্তি বিরাজ করিত। সুতরাং পরাজিত জাতি নিজের ভাগ্যকে যাহা পূর্বে ছিল তাহা বর্তমান অবস্থার সঙ্গে তুলনা করিয়া তাহারা বুঝিতে পারিল যে, মুসলিমদের স্পেনে আসা নিজেদের সৌভাগ্যের কারণ হইয়াছে। ধর্ম কর্ম তাহারা স্বাধীনভাবে পালন করিত এবং তাহারা নিজের ধন, মান, জীবন ও গীর্জাগুলির রক্ষার ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিত জীবন-যাপন করত। তাহাদের এইসব সুখ বিজয়ী নীতির অনুগত হওয়ার ফলস্বরূপ ছিল এবং তাহাদের নিকট হইতে যে জিজিয়া কর নেয়া হইত তাহা খুবই সামান্যই ছিল। কাজেই এই স্পেনের সব অমুসলিমদের মনে আরবীয়গণের প্রতি এই বিষয়ে পূর্ণ অবস্থা জন্মিয়াছিল যে,, তাহারা ন্যায় ও সত্যের সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠাতা এবং বিচারের সময় তাহারা পক্ষপাত শূন্যভাবে ন্যায় বিচার করে।”

ভারতের প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা আবুল কালাম আজাদ দুঃখ করে লিখেছেন, “পৃথিবীর সমস্ত ইতিহাস পড়াশুনার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ভারতের হিন্দু জনসাধারণ অনেকে ‘জিজিয়া’ করকে বিরাট ভুল বুঝেছেন। আসলে এটা আসল তথ্যের অজ্ঞতা। (“সুলতানাতে দেহলী মেন্ গায়ের মুসলিম” গ্রন্থে ৬৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

“ফারসীতে 'Gajiat' শব্দের অর্থ খেরাজ যা থেকে জিজিয়া শব্দের উৎপত্তি। ইসলাম ধর্মে চৌদ্দমত বছরই মাত্র জিজিয়ার কথা বলেছে তা নয় বরং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর বহু পূর্ব থেকে বহু দেশে নানা ভাষায় জিজিয়া করের উল্লেখ পাওয়া যায়।”

(তারিখি শতাব্দে গ্রন্থে দ্রষ্টব্য)

কণৌজের গহরাওয়ার বংশে জিজিয়ার প্রচলন ছিল সে দেশের ভাষায় তার নাম ছিল ‘তুরশকী জনডা’ (Medieval Hindu India III, P-211)। তাছাড়া ভারতে ইসলাম আসার আগে রাজপুতদের মধ্যে ফীকস কর আদায় হত (Early History of India by smith গ্রন্থ দঃ)। ডাঃ ত্রিপটির ধারণা, ফ্রান্সে যে জিজিয়া ছিল তার নাম ছিল Host tax, আর জার্মানীতে যে জিজিয়া ছিল তার নাম ‘Commonpiny’ ইংল্যান্ডে এক প্রকার জিজিয়া সম কর ছিল তার নাম ছিল ‘Scontage’ (Some Aspects of Muslim Administration by Sir, Tripathy গ্রন্থে দ্রষ্টব্য)।

নজরানাবাসীদের জিজিয়া দেয়ার আশ্রয়ে এত বেশী ছিল যে, জিজিয়া দিতে না পারলে তাঁরা শান্তির নিঃশ্বাস ফেলতে লজ্জাবোধ করতেন।

অনেকে বলেছেন জিজিয়া কর পুনঃ প্রবর্তন করে আওরঙ্গজেব অসহায় হিন্দু জাতির উপর নির্মম অত্যাচার করেছেন। কিন্তু আমাদের বক্তব্য অন্য। হিন্দু প্রজাদের উপর অত্যাচার করার উদ্দেশ্যই যদি আওরঙ্গজেবের থাকত তাহলে তাঁর সুদীর্ঘ ৫০ বছর ভারতে রাজত্ব করার পর একটি হিন্দুরও অস্তিত্ব থাকত কিনা সন্দেহ। সে কথা আগেরই বলেছি। তাছাড়া শুধু আওরঙ্গজেবই নয় বরং মুসলমান রাজা বাদশাহ শত শত বছর বা প্রায় সহস্র বছর ধরে রাজত্ব করে গেছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন একটা জাতি তাদের অত্যাচারে ধ্বংস হয়ে যায় নি। অপরপক্ষে এই ভারতে এক ধর্মের চাপে অপর ধর্ম, এক সম্প্রদায়ের চাপে অপর সম্প্রদায় নিশ্চিহ্ন প্রায় হয়ে গেছে। যেমন—হিন্দু ধর্মের চাপে বৌদ্ধ ধর্ম আজ বিলুপ্ত প্রায়। তাছাড়া অনেকের মতে ভারতের বহু স্বতন্ত্র জাতির অস্তিত্ব আজ লোপ পেয়েছে বা পেতে চলেছে—এমন কি তাঁরা নিজেদের হিন্দু বলেই পরিচয় দিয়ে থাকেন। উদাহরণ স্বরূপ জৈন, বৈষ্ণব, ব্রাহ্ম, সাঁওতাল ইত্যাদি সম্প্রদায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। অতএব আওরঙ্গজেব অত্যাচারী ছিলেন অর্থাৎ তিনি হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন একতা নির্ভেজাল মিথ্যা। সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক কাফি বলেছেন, “আকবরের রাজত্বকাল অপেক্ষাও তাঁহার (আওরঙ্গজেব) সময়ে হিন্দু রাজকর্মচারী সংখ্যায় বেশি ছিল।” এছাড়া আরও বহু প্রমাণ ইতিপূর্বে উপস্থাপন করা হলেও প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে এক্ষেত্রেও কিছু কিছু উদ্ধৃতির উল্লেখ করা গেল। আওরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষ ভাগে ‘আলেকজান্ডার হ্যামিলটন’ ভারতবর্ষ পরিদর্শন করতে এসে ভারতে আওরঙ্গজেবের ধর্ম নিরপেক্ষতা ও সূক্ষ্ম শাসন পদ্ধতি দেখে যা বলেছিল তা হচ্ছে এটাই—“Every one is free to serve and worship. God in his own way.” অর্থাৎ প্রত্যেকে স্বাধীনভাবে কাজকর্ম এবং নিজস্ব নিয়মে ঈশ্বরের উপাসনায় স্বাধীন। আরও প্রমাণ স্বরূপ আলমগীরের দরবারে বড় বড় পদে ও মর্যাদাদায় স্থান পেয়েছিলেন যথাক্রমে রাজা রাজরূপ, কবীর সিংহ, অর্থনাথ সিং, প্রেমদেব সিংহ, দিলীপ রায় প্রভৃতি হিন্দু ব্যক্তিগণ। রাজা রাজরূপ সিংহকে বাদশাহ এত বিশ্বাস করতেন যে, শ্রীনগরের রাজার বিরুদ্ধে গোটা যুদ্ধটাই তাঁর অধীনে পরিচালিত হয়েছিল। কবীর সিং ছিলেন সম্রাটের খাস লোক। আসামের যুদ্ধের জন্য প্রেমদেব সিংহকেই আওরঙ্গজেব বাছাই করেছিলেন। দিলীপ রায় ছিলেন আওরঙ্গজেবের অত্যন্ত বিশ্বস্ত ব্যক্তি। এতদ্ব্যতীত পুলিশ বিভাগ, গুপ্তচর বিভাগ, রাজস্ব বিভাগ প্রভৃতি বিভাগে হিন্দু রাজ কর্মচারীর সংখ্যা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হত। রাজস্ব বিভাগে মুন্সীর পদগুলো হিন্দুদের একচেটিয়া ছিল বলা যায়। তার কারণও এ একই ছিল যে, কর আদায়ের নামে যেন হিন্দু সম্প্রদায় অত্যাচারিত না হয়। “Most of the Munsis were Hindus and the proportion rapidly increased. The Hindus had made a monopoly of the lower ranks of the Revenue department.” রসিকদাস ক্রোড়ী ছিলেন সম্রাটের অত্যন্ত বিশ্বাস ভাজন ব্যক্তি এবং রাজস্ব বিভাগে সর্বোচ্চমানের পদাধিকারী।

শুধু তাই নয় বরং এমন কোন বিভাগ ছিল না যে বিভাগে সম্ভব সত্ত্বেও হিন্দু কর্মচারী নিয়োগ করা হয় নাই। এমনকি বাদশাহ আলমগীর আইন জারী করেছিলেন

যে, প্রত্যেক বিভাগে হিন্দু কর্মচারী নিয়োগ করা আবশ্যিক। অতএব আলমগীর সত্যিই শুধু উদার নয় বরং উদারতম মহান নৃপতি ছিলেন—এটাই আধুনিক বিশেষজ্ঞদের এবং পুরাতন নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকদের সিদ্ধান্ত।

একটা প্রশ্ন থেকে যেতে পারে, তাহলে কি আওরঙ্গজেবের উপর সকলে সন্তুষ্ট ছিলেন? তার উত্তরে পরিষ্কারভাবেই বলা যেতে পারে যে সকলেই সন্তুষ্ট ছিলেন না। তার কারণও অবশ্য বিদ্যমান। রাজদরবারে যে সমস্ত গর্হিত বেআইনি কাজ চলে আসছিল এবং আকবর জাহাঙ্গীর প্রভৃতি বাদশাহ কর্তৃক যে সমস্ত বিষবৃক্ষ রোপণ করা হয়েছিল যার ফলে সারা ভারতে ধর্মের নামে, আভিজাত্যের নামে, সংস্কৃতির নামে যত আগাছা গজিয়ে ছিল আওরঙ্গজেব একেবারে থেকে তা উৎপাটন করতে যাঁদের অসুবিধায় পড়তে হয়েছে তাঁরাই অভিযোগ করেছেন। অবশ্য পরে নিজেদের ভুল বুঝে সর্বভারতীয় উন্নতি ও শান্তি দেখে অনেককেই লজ্জা ও অনুতাপের ইন্ধন থেকে হয়েছিল।

বাদশাহদের দরবারে ‘নওরোজ’ বলে একটা কুপ্রথা প্রবর্তিত ছিল যা শুধু বিলাসিতা ও অহংকার প্রদর্শনের নামান্তর ছিল আর রাজদরবারে রাজ কর্মচারীদের মধ্যে মদের মর্যাদা এতবেশী বেড়ে গিয়েছিল যা চীনের আফিং খাবার মত ভারতকেও ধ্বংস থেকে হত যদি না আওরঙ্গজেব কঠিন হস্তে তা দমন করতেন। পক্ষান্তরে মন্দির তৈরি করার একটা হিড়িক পড়ে গিয়েছিল। এক এক জায়গায় যেখানে একটি মন্দিরই যথেষ্ট যেখানে গায়ে গায়ে লাগান দশ, বিশ, পঞ্চাশ, একশত করে মন্দিরে তৈরী থেকে লাগল, আর ধর্মের এ বাড়াবাড়ি দৃষ্টিকটু লাগবারই কথা। মসজিদের ক্ষেত্রেও সম্রাটের মত ছিল, বিনা প্রয়োজনে মসজিদ তৈরী অথবা যেখানে মসজিদ আছে যতক্ষণ না পর্যন্ত সে মসজিদে স্থান সংকুলন হয় ততক্ষণ পর্যন্ত সেখানে মসজিদ সৃষ্টি করা নিষেধ। এখন অস্বীকার করার উপায় নেই যে, মুর্শিদাবাদ জেলায় বাদশাহ নবাবদের স্মৃতি স্মরণ লক্ষ্য করলে দেখা যায় শুধু চারিদিকে মসজিদ। আমাদের মতে এত মসজিদ দরকার ছিলনা। যদি কেউ যুক্তি দেখান যে, স্থান সংকুলান হতনা বলেই হয়ত সে যুগে এত মসজিদের প্রয়োজনীয়তা ছিল। কিন্তু আমরা বলব অবশ্যই তা নয়; কারণ, স্থান সংকুলান না হলে মসজিদকে বাড়িয়ে যথা প্রয়োজন লম্বা ও চওড়া করলেই তো চলত শুধু সংখ্যায় ছোট ছোট মসজিদ আর কারুকার্যের ছড়াছড়ি বা বাড়াবাড়ীর কোন সঠিক উত্তর পাওয়া যায়না। ঠিক অনুরূপভাবে মন্দিরও এই পশ্চিমবঙ্গে একস্থানে দু চারটা নয় এমনকি আমাদের বর্ধমান শহরের পাশে ছোট ছোট গায়ে গায়ে লাগান ১০৮টি মন্দির আমরা দেখেছি। মন্দিরের ক্ষেত্রে স্থান সংকুলানের তো প্রশ্নই উঠতে পারেনা কারণ মন্দিরের ভিতরে পুরোহিত বা ব্রাহ্মণ ছাড়া জনসাধারণের প্রবেশাধিকার পূর্বেও ছিলনা আর এখনও নাই, পরে কি হবে বলা যায় না।

বেনারসের শাসনকর্তা আওরঙ্গজেবকে গোপনে একটা পত্র পাঠিয়েছিলেন তাতে অনুমতি চাওয়া হয়েছিল, বেনারস একটা হিন্দুদের ধর্মীয় ঘাঁটি, উচ্চশ্রেণী ও নিম্নশ্রেণী প্রত্যেকে মনে করে সমস্ত উন্নতির কুঞ্জী এ মন্দিরেই দেবতার হাতে আছে আর

মন্দিরের নিত্য নতুন নির্মাণ ব্যবস্থা বিদ্যমান এবং বহু অর্থ ব্যয়ে তাহাতে কারুকার্য করা চলিতেছে যেন শেষ নেই, আর এক মন্দির অপর মন্দিরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জিততে চায়। যদি এখানে এই মন্দিরের পুরোহিত বা ব্রাহ্মণদের উপর কিছু শক্তি প্রয়োগ করা হয় তাহা ঠিক হবে কিনা? তবে এখানে কেউ কেউ মনে করেন ব্রাহ্মণদের উপাসনা ভিত্তি শিথিল করতে পারলে লোকে আমাদের ইসলাম ধর্মের দিকে আকর্ষিত থেকে পারে.....।”

তার উত্তরে আওরঙ্গজেব যে পত্র দিয়েছিলেন তা উল্লেখযোগ্য এবং প্রাণধানযোগ্য। “.....প্রজাদের উপকার সাধন এবং নিম্ন সকল সম্প্রদায়ের উন্নতি সাধন আমাদের সুদৃঢ় উদ্দেশ্য সেহেতু আমাদের পবিত্র আইন অনুসারে আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি যে, পুরাতন মন্দিরগুলো বিনষ্ট করা হবে না কিন্তু নতুন কিছু সৃষ্টি করাও চলবে না।কোন লোক অন্যায়ভাবে ব্রাহ্মণ অথবা তাদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ অথবা তাদের উপর কোন হামলা করতে পারবে না। তারা যেন পূর্বের ন্যায় স্ব স্ব কার্যে নিযুক্ত থাকতে পারে অথবা আমাদের আল্লাহ প্রদত্ত সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বের জন্য সুস্থ মনে প্রার্থনা করতে পারে।”

(জে, এ, এস, বি এবং ‘ওয়াকারে আলমগীরী’ গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)

আওরঙ্গজেব সিংহাসন আরোহণের পূর্বে ধর্ম বিধ্বংসী মিথ্যা ‘দীন ইলাহী’ ধর্মকে নিষিদ্ধ করেন ফলে যাঁরা গোঁড়া, মুসলমান বিদ্বেষী হিন্দু তাঁরাও দুঃখিত হলেন। তাঁরা বেশ বুঝতে পারলেন আকবর, জাহাঙ্গীর যে পথের পথিক ছিলেন ইনি সে পথের পথিক নন। তাই তাঁরা চেষ্টা করেছিলেন আওরঙ্গজেবের পরিবর্তে দারাশিকোকে আকবরের পথে পরিচালিত করার। কিন্তু তাঁদের সে সিদ্ধান্ত সার্থক হয় নি।

যাই হোক, এভাবে সম্রাট আলমগীরকে জিজিয়া করে পুনঃ প্রবর্তনকারী গোঁড়া হিন্দু বিদ্বেষী মুসলমান বলে চিত্রিত করে যাঁরা ইতিহাসের পাতাকে কলঙ্কিত করেছেন ইতিহাস তাদের ক্ষমা করবে না। প্রকৃত ও গৌরব মণ্ডিত উপকার একে বুকে ধরেই সে চিরকাল ছুটেছিল আজও যেমনি ছুটে যাবে চলমান গতি সমুদ্রের দিকে জ্রক্ষেপ না করেই। আর এরই নাম ইতিহাস।

(৬) ‘তাঁর অযোগ্যতাই মোঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ’ বলে যে অভিযোগটি বা অপবাদটি নিরপরাধ আওরঙ্গজেবের ক্ষক্ষে জোর করে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে তার অসাড়তা পূর্বাঙ্কেই প্রমাণিত হয়েছে যে, আওরঙ্গজেব অযোগ্য তো ছিলেনই না বরং তাঁর যোগ্যতাই দ্রুত পতনোন্মুখ মুঘল সাম্রাজ্যকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছে। অতএব মোঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য কারণ আওরঙ্গজেবের অযোগ্যতা নয় বরং কারণ অন্যবিধ। নিচের আলোচনায় তা পরিষ্কার হয়ে উঠবে।

সম্রাট আওরঙ্গজেবকে মোঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য দায়ী করে আধুনিক ঐতিহাসিকগণ বহু তথ্য ভুলে ধরেছেন। কিন্তু মোঘল যুগের সমসাময়িক ঐতিহাসিকগণ তাঁকে মোঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য দায়ী করেন না। বরং আওরঙ্গজেব মোঘল সাম্রাজ্যের দ্রুত পতনরোধ করেছেন এ রকম মন্তব্য পাওয়া যায়। নিম্নোক্ত তথ্যগুলো আওরঙ্গজেবকে নির্দোষ প্রমাণ করে। অমিতব্যয়ঃ—পূর্ববর্তী

সম্রাটদের আমলে সৈন্যবাহিনীর ভিতর দুর্নীতি ও বিলাসিতা প্রকট হয়ে উঠেছিল। মহামতি বলে অভিহিত সম্রাট আকবর ছিলেন নারী লোলুপ-জাহাঙ্গীর ছিলেন ব্যাভিচারী মদপায়ী সম্রাট, শাহজাহান ছিলেন আড়ম্বর প্রিয়। অবান্ত্রিত হেরেমের ব্যয় বহন, মদপান ও শাহজাহানের আড়ম্বর প্রিয়তার ফলে পানির মত অর্থ ব্যয়িত হয়। সম্পদের ও অর্থের অপব্যবহার এ দুঃস্থাব্যধি সম্রাটের হেরেম পেরিয়ে আমির ওমরাহ তথা সৈন্যবাহিনীর মধ্যে সংক্রামিত হল। ইউরোপীয় পর্যটকগণ লিখেছেন মোঘল সৈন্য শিবিরগুলো ছিল এক একটা বিলাসী শহর। বিপুল অর্থরাশি এভাবে ব্যয়িত হওয়ায় সাম্রাজ্যের আর্থিক অস্থিরতা দেখা দিল আর মোঘল সাম্রাজ্যকে দুর্বল করে তুলে। সম্রাট আওরঙ্গজেব কুরআন ও হাদীস মফিক সাম্রাজ্যের জন্য ব্যয় নীতি গ্রহণ করেন। এর ফলে পূর্ববর্তী সম্রাটের শূন্য রাজকোষ পূর্ণ হয়ে মোঘল সাম্রাজ্য শক্তিশালী হয়। (উইলিয়াম হকিন্স, স্যার টমাস রোর ভ্রমণ কাহিনী দ্রষ্টব্য)

অনুবাদ নীতি : সম্রাট আকবর উদারনীতি গ্রহণ করে হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রিয় পাত্র থেকে চাইলেন। এমন কি সকল ধর্মের সারমর্ম নিয়ে নতুন ধর্ম প্রবর্তন করলেন “দীন ইলাহী”। যুবরাজ দারাও আকবরের পদাঙ্ক অনুকরণ করে দরবারের রাজপুত্র রাজা ও বিভিন্ন গোষ্ঠী অধিপতিগণের সাহায্য ও সমর্থনপুষ্ট হবার জন্য লিখবেন ‘মজমুয়াল বাহরাইন’। যার অর্থ “সাগরদ্বয়ের মিলন” সম্রাট আকবর ও যুবরাজ দারার “উদার নীতি” নিছক শঠ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। ধর্মে এ উদার নীতি বিশাল মোঘল সাম্রাজ্যকে পতনের মুখে ঠেলে দেয়। সম্রাট আকবর ও যুবরাজ দারার উর্বর মস্তিষ্কে স্থান পেল যে, সকল ধর্মে কিছু সার থাকে এবং বাকী সব কিছু অসার বস্তু। এভাবে এ উদার নীতির দ্বারা হিন্দু ও ইসলাম ধর্ম থেকে বিভিন্ন সম্প্রদায়কে সরিয়ে আনার প্রচেষ্টা চলে। তাই প্রাক আওরঙ্গজেব যুগে ব্যাভিচার মদপান উৎকোচ গ্রহণ সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতি দুঃস্থাব্যধি সম্রাট-ওমরাহ দরবার থেকে শুরু করে প্রজাবৃন্দ পর্যন্ত সকলের মধ্যে সংক্রামিত থেকে মোঘল সাম্রাজ্যের পতনের পথ প্রশস্ত করে।

সম্রাট আওরঙ্গজেব নিজে একজন বড় আলেম এবং ধর্মে আস্থাশীল ছিলেন। দরবারে আমির ওমরাহ ও গোষ্ঠীপতিদের মদপান ব্যাভিচার অমিতব্যয় প্রভৃতি পরিহারের জন্য ধর্মীয় বিধি চালু করেন।

আওরঙ্গজেবের কটর সমালোচকগণও স্বীকার করেন যে, আওরঙ্গজেব নিষ্ঠাবান মুসলমান নিরলস কর্মী অভিজ্ঞ কূটনীতিবিদ এবং ক্ষমতামণ্ডলী শাসক ছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্র ছিল নিষ্কলুষ। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি কঠোরভাবে ইসলামের অনুশাসন পালন করেছিলেন। ঐতিহাসিক মূল্য সম্বলিত ফতোয়া-ই-আলমগীরী তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত হয়েছিল। একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান কখনও অনুদার বা পরধর্ম অসহিষ্ণু থেকে পারেন না। কটরপন্থী ঐতিহাসিকদের বর্ণিত আওরঙ্গজেবের “অনুদার নীতি” মোঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য দায়ী নয়। কারণ আওরঙ্গজেবের সময়ে মোঘল সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ব্যাহত না হয়ে চরম পর্যায়ে পৌঁছায়। ধর্মভ্রষ্ট হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায় তাঁর সময়ে ধার্মিক চরিত্রবান হয়ে জাতিকে শক্তিশালী করে তুলেছিল।

ইউরোপীয় আগমন : ভারতে মোঘল সাম্রাজ্যের পতনের মূলতঃ কারণ ইউরোপীয় জাতির আগমন। ভারতে ইংরেজ তথা ইউরোপীয় জাতির আগমনের বীজ বপন করে গেছেন আকবর আর জাহাঙ্গীর সে বীজের চারাগুলোকে শক্তিশালী করতে তাঁর যথার্থ ভূমিকা নিয়েছেন আর আওরঙ্গজেব সমস্ত চারাগুলোকে নির্মূল করতে যথাযোগ্য চেষ্টা করে গেছেন। যদি এ কথাটুকু প্রমাণ হয় তাহলে আকবরকে ভারতবাসী ক্ষমা করে মহামতি বলে মনে নেবেন কিনা তা পাঠকবৃন্দের দায়িত্বে আর আওরঙ্গজেবের ভূমিকা সত্যিই যদি ফুটে ওঠে তাহলে তার দিকে চিন্তাশীল ও নব্য ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি আকর্ষিত হওয়া স্বাভাবিক।

তাই এখানে কয়েকটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ থেকে মূল্যবান তথ্য পরিবেশন করছি। ইসলামী বিধান থেকে অমুসলমান নারীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করতে হলে প্রথমই তাকে ধর্মান্তরিতা করতে হবে এবং এটা খুব স্বাভাবিক। তাই স্ত্রীকে সহধর্মিণী বলা হয়। কিন্তু সহধর্মিণী যদি অন্য ধর্মিণী হয় তাহলে তাকে সহধর্মিণী না বলে পরধর্মিণী বলতে বাধ্য থেকে হয়। কিন্তু সারা ভারতে নয় পৃথিবীর প্রথম রাজা প্রথম বাদশা আকবর যিনি ইসরাম ধর্মের এ নীতির উপর নিষ্ঠুর উপেক্ষা প্রদর্শন ও অনাদর্শ স্থাপন করেন। খ্রীষ্টান মহিলা বিবাহ করা এবং তাকে তার ধর্ম পালন এবং তাকে তার ধর্ম পালন এবং প্রচার ও প্রসারে সহযোগীতা করার পূর্ণ অধিকার প্রদর্শন আকবরের জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এটা উদারতা না বর্বরতা তা প্রত্যেক ঐতিহাসিক ও ইতিহাস অনুরাগীর চিন্তার বিষয়।

এ বিবাহকে কেন্দ্র করেই ইংরেজ ভারতে রাজ্য বিস্তারের পথ সুগম করে। রাজ দরবারে মদপানের আক্রমণ ইংরেজ রাজনীতিবিদগণ প্রায়ই পেতেন। মোঘল সাম্রাজ্যের সমাধি রচনার কাজ আকবর শুরু করেন এবং তাঁর মদপায়ী পুত্র জাহাঙ্গীর স্যার টমাস রো ও তাঁর মূল পুরোহিত অক্সফোর্ডে শিক্ষাপ্রাপ্ত চতুর, কূটনীতিবিদ বেভারেও-ই-ফেবীকে অতিমাত্রায় প্রশয়দান করে এ সাম্রাজ্যের পতন ত্বরান্বিত করেন। আকবরের সময় ইংরেজরা নিজেদের সুরাট বন্দরে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিন বছর ক্রমাগত মোঘল দরবারে তদবির করে স্যার টমাস রো জাহাঙ্গীরের কাছ থেকে তাঁর সকল দাবী দাওয়া মঞ্জুর করিয়ে নিতে সক্ষম হন। ইংরেজরা অবশ্য কাজ ওছানোর তাগিদে মদ খেতেন কিন্তু তিনি ও তাঁর পুত্রগণ শুধু মদ খেতেন বললে সঠিক হবে না বরং বলা যায় মদই তাঁদের খেত।

খ্রীষ্টানদের মুখে তাঁদের বীরত্ব গাথা এবং প্রত্যক্ষ কিছু লক্ষ করে আকবর ও জাহাঙ্গীর ইংরেজ শক্তির উপর ভীত হয়ে পড়েছিলেন। কেউ কেউ বলেন, ইংরেজরা সুন্দরী রমণী দিয়ে মুগ্ধ করে দিয়েছিলেন বা পরাস্ত করে দিয়েছিলেন তার চেতনাকে। সে যাই হোক তারা ধীরে ধীরে খ্রীষ্টান ধর্মের প্রতি সশ্রদ্ধ আনুগত্য প্রকাশ করে চললেন এবং দেশের ভিতরে ইউরোপীয় ঘাঁটি তৈরী করতে তাদের অনুমতি ও সাহায্য দিলেন। তার ফলস্বরূপ আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর থেকে উদীয়মান ইউরোপীয় শক্তি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তথা ভারতের স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হবার জন্য দায়ী আওরঙ্গজেব নয়, দায়ী মহামতি আকবর ও জাহাঙ্গীর। (এনসাইক্লোপিডিয়া দ্রষ্টব্য)

এছাড়া ভারতের বিশালতাও তার পতনের আর এক কারণ। তখনকার যুগে তার বেতার বা টেলিভিশনের কোন আড়ম্বর ছিল না। ফলে এক স্থান থেকে অন্য স্থানের যোগাযোগ রক্ষার ব্যাপারে যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন হত। তাই বিশাল ভারতের কোন স্থানে বিদ্রোহ ঘোষিত হলে তা দমন করে আরেক স্থানে গমন করতে যে পরিমাণ সময়ের ব্যবধান হত তাতে অন্য কোন স্থানে আবার বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠতে বাধা ছিল না। কিন্তু তবুও সম্রাট আলমগীর যেভাবে অসীম সাহসিকতা ও বীরত্বের সাথে এক এক করে বিদ্রোহের অনল নিভিয়ে গেছেন তার দৃষ্টান্ত ইতিহাসের পাতায় বিরল। অতএব পূর্ব-পুরুষদের পর্বত প্রমাণ অপকীর্তির প্রভাবে টলায়মান মোঘল সাম্রাজ্যের দুর্বল ভিত্তি এক অনিবার্য প্রাকৃতিক কারণেই ধ্বসে পড়েছিল। নিরুপাধ ও নিরুপায় আলমগীর এর জন্য দায়ী নন।

সর্বশেষ দুজন প্রসিদ্ধ ও খ্যাতনামা ঐতিহাসিকের দুটি মূল্যবান উদ্ধৃতি (যাতে মোঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ পরিষ্কার রূপে ফুটে উঠেছে) দিয়েই এ প্রসঙ্গের যবনিকা টানছি।

ঐতিহাসিক প্রিন্সল কেনেডি তাঁর "The History of Mughals" পুস্তকে লিখেছেন, "The weakness of Akbar's empire was really military stoping the influx fresh blood from beyond the north western hills and acting on the principle of India for the Indians, he was the indirected that when the impire built by him was challenged by a hostile power, if turned out to be in capable of protecting itself." আকবরের গঠিত সাম্রাজ্যের দুর্বলতা তাঁর সামরিক নীতির মধ্যোই নিহিত। তিনি উত্তর পশ্চিম পার্বত্য অঞ্চলের ওপার থেকে সতেজ সবল স্বজাতীয় সৈন্য আমদানী বন্ধ করে এবং 'ভারতীয়দের জন্য' নীতির অনুসরণ করে তাঁর সাম্রাজ্যের (অর্থাৎ মোঘল সাম্রাজ্যের) পতনের জন্য পরোক্ষভাবে দায়ী হয়েছেন। তাঁর গঠিত সাম্রাজ্য যখন বিজাতীয় প্রতিকূল শক্তির দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল। তখন তাঁর আর আত্মরক্ষা করার শক্তি ছিল না।"

লাহোরের সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক আবদুল্লাহ আনোয়ার বেগ এম, এ, এল, এল, বি তাঁর "Since our ball" পুস্তকে লিখেছেন, "আত্মপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠাকামী তেজস্বী সাহসী শক্তিশালী মুসলিম বীরগণ সমস্ত উত্তর ভারত অধিকার করে এশিয়ার হৃৎপিণ্ডে আফগানিস্তানকে নিজেদের নিরাপদ সৈন্য সংগ্রহের ক্ষেত্র করেছিলেন। তাঁদের সংহতি ও সহযোগিতার কারণে তাঁরা সর্বত্রই সাফল্য লাভ করতেন। মোহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু জয় (৭১১) থেকে আওরঙ্গজেবের মৃত্যু সময় (১৭০৭) পর্যন্ত মুসলিমগণ ছিলেন প্রধানত মহা তেজস্বী মহা সাহসী, মহা শক্তিশালী, মহা কর্মী, আত্মপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠাকামী যুগ নায়ক, যুগ শাসক, মহা বীরের জাতি। তার পরবর্তী হচ্ছে মুসলিমদিগের জাতীয় চরিত্রের অধঃপতনের যুগ, মুসলিম জাতির পতনের যুগ। এমনকি এর পূর্বেই ভবিষ্যত অমঙ্গলের দুর্লভক্ষণসমূহ প্রকাশিত হয়েছিল।

শাহজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারাশিকোর সম্রাট হলে খুব সম্ভব অতি সত্ত্বরই অবস্থান্তর বা পতন ঘটত। মোঘল সাম্রাজ্যের এ পতন স্বর্গিত রাখতে কৃতকার্য হয়েছিলেন ইসলামীয় তুর্কীর শেষ তীর আলমগীর বা আওরঙ্গজেব। দারা ছিলেন আকবরের মত বিজাতীয় ভাবাপন্ন। বলাবাহুল্য, আকবরই (মোঘল সাম্রাজ্যের) পতনের বীজ বপন করেন। ইসলাম অনুরাগী মহিউদ্দিন আলমগীর আওরঙ্গজেব বিজাতীয় প্রভাব ও দুর্নীতি সমূহ থেকে সাম্রাজ্যকে সংস্কার ও সংশোধন করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন। এজন্য তিনি কারও সন্তোষ বা অসন্তোষ কিছু মাত্র গ্রাহ্য করেন নি। তাঁর চেষ্টা অনেকটা ফলবতী হয়েছিল বলেই ভারতে ইসলাম এবং জাতি হিসেবে মুসলমান এখনও টিকে আছে বা বেঁচে আছে। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর এরূপ অসাধারণ শক্তিশালী আদর্শ চরিত্র কোন ব্যক্তি আর দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন নি। এটাই ভারতস্থিত তৈমুর বংশীয় সাম্রাজ্যের ধ্বংসের প্রকৃত কারণ"-(যশোরের চিন্তাশীল লেখক শেখ হাবিবুর রহমান সাহিত্য রত্ন প্রণীত আলমগীর দৃষ্টব্য।)

অতএব এত সুদীর্ঘ আলোচনার পর একথা ভুললে চলবে না যে, আধুনিক সহজ শব্দ ইতিহাসে যা আছে তাইই সুখ্যাতির বর্ণন নয়। প্রকৃত ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এবং যুক্তি বা সত্যের মাপকাঠিতে যা গ্রহণযোগ্য তা অবশ্যই স্মরণীয় ও বর্ণনীয়। বাকী অংশ পরিত্যাজ্য বা পরিহার্য।

“দীন-ইলাহী” ও আকবরের বিদায়পর্ব

বিশ্বের ইতিহাসে ষোড়শ শতাব্দীতে ধর্মে আন্দোল ও আলোড়ন শুরু হয়েছিল। ভারতবর্ষে কবীর, নানক, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি মহা পুরুষগণ নানা ধর্মমত সৃষ্টি করে নানা সম্প্রদায় সৃষ্টি করলেন। ভক্তি ও মাহদী আন্দোলন জনসাধারণের মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। প্রতি হাজার বছরের শেষভাগে ধর্ম ভোলা মানুষকে উদ্ধারের জন্য একজন 'মসীহ' পৃথিবীতে আবির্ভূত হবেন, এটাই ছিল মাহদী পন্থীদের বিশ্বাস। আফগানিস্তানেও অনুরূপ 'রাসনী' আন্দোলন শুরু হয়। তাদের ধ্যান ও ধারণাও অনুরূপ ছিল।

১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে পারস্যের শাহ আততায়ীর দ্বারা নিহত হন। পারস্য বা ইরানে তখন একটা ইসলাম বিধ্বংসী দল তৈরী হয়েছিল, নাম 'মোলহেদ'। পারস্যে নূতন শাহ সিংহাসনে বসেই চিন্তা করে দেখলেন, এ কুৎসিত দ্বারা দলটি অদূর ভবিষ্যতে সুন্দর স্বচ্ছ ইসলাম ধর্মের কলঙ্কের কারণ থেকে পারে। তাই ঐ 'মূলহেদ' দলকে নিষিদ্ধ করেন এবং এদের বন্দী করার আদেশ দিলেন। কাম্পিয়ান সাগরের উপকূলে তাদের প্রধান ঘাঁটি ছিল। এ ঘাঁটি পারস্যের শাহ আক্রমণ করলে, তারা দলে দলে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে। সম্রাট আকবরের সাথে এ দল নেতারা দেখা করে নিজেদের মত ও পথের কথা বলতে গিয়ে বলে, "আমরা জানি এবং বিশ্বাস করি প্রত্যেক যুগে যুগে নবী আসেন। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পর আর কেউ নবী আসবেন না বটে কিন্তু ইমাম মেহদীর আগমনের কথা কিতাবে আছে। তাছাড়া প্রতি হাজার বছর অন্তর একজন মোজাদ্দের বা সার্বজনীন ধর্ম বিশারদ আবির্ভূত হন। এখন

আরবী হিজরী সালের সে হাজার বছর পূরণের যুগ। আমরা জানতে পেরেছি এই যুগ সন্ধিক্ষণে আপনিই সে ইমাম মেহেদী এবং ধর্ম প্রচারক। অতএব আপনি আগিয়ে আসুন। পালন করুন আপনার পবিত্র দায়িত্ব। সম্রাট আকবর এ রকমই একটা সুযোগের অপেক্ষায় নয় প্রতীক্ষায় ছিলেন। সাম্রাজ্যবাদী আকবর তাঁর রাজনীতির ভাল অঙ্গ হিসেবে এবং ধর্ম জগতে অমর হবার বাসনায় এ দলের নেতাদের নিজের উপদেষ্টা হিসেবে গ্রহণ করেন। (হিন্দী অব ন্যাশন্যালিজম দৃষ্টব্য)।

ভারতে তিনি এক অখণ্ড সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। ভারতে হিন্দুগণ সংখ্যা গুরু ছিল বলে হিন্দুদের প্রতি তিনি সহিষ্ণুতার নীতি গ্রহণ করেছিলেন। হিন্দুদের বন্ধুত্ব লাভের জন্য তিনি তীর্থ কর ও জিজি কর মওকুফ করেছিলেন এবং ঠিক একই কারণে তিনি বহু রাজপুত রমণীকে বিয়ে করেছিলেন। তাঁর হিন্দু স্ত্রীগণ হিন্দুরীতি নীতি ও অনুষ্ঠানের প্রচলন করেছিলেন তাঁর হেরেমে। এসব রীতি-নীতি নারী বিলাসী সম্রাট আকবরের জীবনে সুদূর প্রভাবিত হয়েছিল।

কপট সুফী ভ্রাতৃত্ব (ফৈজী এবং আবুল ফজল) এবং তাঁদের পিতার সাথে আকবরের সান্নিধ্য লাভের ফলে আকবরের ধর্ম জীবন বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। তাঁরা আকবরকে দর্শন এবং ধর্মীয় আলোচনার জন্য ফতেপুর সিক্রিতে ইবাদতখানা নির্মাণ করতে উৎসাহ দিয়েছিলেন। আকবর বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী পণ্ডিতদের তাঁর ইবাদতখানার আমন্ত্রণ করতে লাগলেন। ১৫৮০ খ্রিষ্টাব্দে আকুয়াডিভি এবং মনসারেটের জেসুইট মিশনকে (খ্রীষ্টান মিশন) আকবর তাঁর সভায় সাদরে গ্রহণ করলেন। তিনি জোরোষ্ট্রিয় ও জৈন ধর্মের পণ্ডিতদের সভায় স্থান দিয়েছিলেন। হিন্দু পণ্ডিতগণ তো সভায় ছিলেনই।

ধর্ম বিষয়ক পরামর্শ দাতা ছিলেন আবুল ফজলের পিতা শেখ মুবারক। তিনি সর্ব বিষয়ে আকবরের মনোরঞ্জনের উপায় উদ্ভাবন করতেন এবং আকবর তাঁকে খুব সমীহ করতেন। শেখ মুবারক নানা যুক্তিতর্কের অবতারণা করে আকবরকে প্রমাণ দিলেন যে উলামা ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা করেন। অপরূপ ধর্মের মধ্যেও কিছু ভুল বোঝাবুঝি আছে। যার ফলে বিদ্বেষ আর একঘেঁয়ে গোঁড়ামী এবং সম্প্রদায় গত আক্রমণের ভাব দেখা যায়।

নিরক্ষর প্রায় সম্রাট আকবরের ধর্ম প্রবণতা নতুন খাতে বইতে চাইল। সাম্রাজ্য লিপ্সু, হিন্দু নারী লোলুপ, উচ্চাভিলাষী সম্রাট আকবরের পূর্ব বর্ণিত পার্সী ধর্ম গুরুত্ব আশ্চর্য প্রভাব দেখা যেতে লাগল। এ সময়েই শেখ মুবারক তাঁকে পরামর্শ দিলেন যে, যেহেতু তিনি রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তা, সেহেতু তিনি ধর্ম নেতাও থেকে পারেন। ধর্ম গুরু হবার এ পরামর্শ আকবরের মনকে খুবই প্রভাবিত করল।

শাহী মহলে মূর্তিপূজা এবং অগ্নিপূজা যেন একটা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পরিণত হল। জালালুদ্দিন আকবর শাহ গাজী স্বয়ং কণ্ঠে রত্নাক্ষ মালা পরে চন্দন চর্চিত দেহে হিন্দু সন্যাসী বেশে দরবারে উপস্থিত থেকে লাগলেন। দরবারের হিন্দু পণ্ডিতগণ ও “সভাসদগণ সঠে সঠ্যাং” গ্রহণ করলেন। তাঁরা সম্রাটকে একেবারে আল্লাহর আসনে বসিয়ে “দিল্লীশ্বর” বা “জগদীশ্বর” এ আওয়াজে ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত

পর্যন্ত মুখোবিত করে তুললেন। সম্রাটের কৃত্রিম আনুগত্য প্রকাশ করতে লাগলেন। চণ্ডী, মাধবাচার্য ১৫৭৭ খ্রিষ্টাব্দে রচনা করলেন “বঙ্গভাষা ও সাহিত্য” তারই ৩৭২ পৃষ্ঠায় আছে—

“হেতা এক দেশ আছে নাম পঞ্চ গৌড়।

সেখানে রাজত্ব করেন বাদশাহ আকবর।

অর্জুনের অবতার তিনি মহামতি।

বীরভে তুলনাহীন জ্ঞানে বৃহস্পতি॥

দ্রোতা যুগে রাম হেন অতি সযতনে।

এই কলিযুগে ভূপ পালে প্রজাগণে॥”

হিন্দু পণ্ডিতগণের এ ধরনের টাটুকারিতা আকবরেরও ভাবান্তরের অন্যতম কারণ। আর সে যুগে কিছু স্বার্থবৈষী মৌলবী নিজেদের মধ্যে বিবাদ ও মতভেদও তাঁর ইসলাম ধর্মের উপর অবহেলার ছোট খাট কারণ। একদিন দরবারে আকবরের পাশে কে বেশী নিকটবর্তী হয়ে বসবেন তাই নিয়ে বিবাদ হয় তাতেও আকবরের ভাবান্তর হয়। আকবরের উৎসাহ ও পরামর্শ দাতারা তাঁকে বিশেষভাবে নতুন ধর্ম সৃষ্টিতে উৎসাহিত করলেও তেমন কেউ পরবর্তীকালে নতুন ধর্ম গ্রহণ করেনি। তবে ইসলাম ধর্মের সর্বনাশ সাধন যাদের উদ্দেশ্য ছিল তাঁরা কেবলমাত্র এ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য কৃত্রিম আনুগত্য প্রকাশ করেছিলেন। সময়মত তার অনেক প্রমাণ দেয়া হবে।

ধর্মগুরু হবার পথে আকবর ক্রমান্বয়ে এগিয়ে চলছেন। ১৫৭৯ খ্রিষ্টাব্দে ফতেপুর সিক্রির প্রধান মসজিদ আকবর তাঁর স্পেশাল দালাল দলকে উলামা সারিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। পরে নিজে মসজিদের গেটে আড়ম্বরের সাথে উপস্থিত হন। তার পূর্বে এ মসজিদকে জমকাল করে সাজান হয়েছিল। এবার যখনই আকবর উপস্থিত হলেন অমনি সে নকল উলামা আর বহুরূপী সভাসদগণ নামায ত্যাগ করে অত্যন্ত সম্মানের সাথে তাঁকে মসজিদের ভিতরে নিয়ে এসে মিম্বরে বসালেন।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সময় থেকে প্রতি শুক্রবার জুমআর নামাযের পূর্বে যে আরবী খোতবা হত তা বাতিল করে আকবরের গুণ-গান পূর্ণ কবিতা পাঠ করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আর সে কবিতার রচয়িতা ছিলেন ‘ফৈজী’। সেটি আকবর নিজে পাঠ করে শোনাবেন বিরাট জনতাকে আর সকলে সম্মুখে আল্লাহ আকবার বলে সাবাস দিবেন এবং সে সাথে আকবর এ নতুন “দীনি ইলাহী” ধর্মে দীক্ষিত থেকে আদেশ দিবেন।

আকবর ফৈজীর লেখা নিজ গুণ-গান সম্বলিত কবিতা হাতে নিয়ে দণ্ডায়মান হলেন। কিন্তু ঐতিহাসিক নাটকীয় সংবাদ এটাই যে, মাত্র চয় লাইন কবিতা আবৃত্তি করতে গিয়ে আকবর চোখে যেন কুয়াশাচ্ছন্ন অন্ধকার দেখতে লাগলেন। তবু মনকে চালা করে আবার আবৃত্তি করতে লাগলেন। কিন্তু তিনি যেন নিজ কানে শুনতে পাচ্ছিলেন বুকের স্পন্দন। হৃদকম্পনের কারণে তাঁর একটি হাত বুকে বুলাতে লাগলেন। একটার পর একটা উপসর্গ দেখা দিতে লাগল। প্রথমে চোখ বিদ্রোহ করল,

তারপর কণ্ঠস্বর বিদ্রোহী হয়ে উঠল। শেষে তাঁকে মিস্বারের উঁচু ধাপ থেকে নীচে নেমে আসতে হল। সকলেই হতবাক। সমস্ত পরিকল্পনাই খতম। অবশেষে কোনক্রমে বললেন, জোর করে নয় ইচ্ছা করলে যে কেউ এ নতুন ধর্ম “দীনি ইলাহী” গ্রহণ করতে পারে।

এ কবিতায় যা লেখা ছিল তার অনুবাদ—“এ বিশ্ব নিয়ন্তা আমার রাজ্যাধিপতি আর আমায় দেয়া হয়েছে সমস্ত জ্ঞান, শক্তি আর সাহসের সবটুকু। আসল সত্য, তথ্য ও প্রেম আমার বক্ষে সঞ্চিত। তিনিই আমার পরিচালক, আমার সব তাঁরই ইঙ্গিতে। কোন ভাষা এমন নেই যে তাঁর গুণগান করি। আল্লাহ আকবার সে মহান আল্লাহ।”

তাই এক ইংরেজ ঐতিহাসিক আকবরের হৃদকম্প আর মিস্বার থেকে নীচে অবতরণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে লিখেছেন, “কিন্তু এ ঘটনায় যে ভাবাবেগের সঞ্চার হইল, তাহা যে দৃঢ়চিত্ত প্রবল শত্রুর মোকাবেলায় কখনও বিচলিত হয় নাই, তাহাকে অভিভূত করিয়াছিল। যে হৃদয় সকল বিপদেও শান্ত থাকিত এখন তাহা দ্রুত স্পন্দিত হইতে লাগিল। যে কণ্ঠস্বর যুদ্ধের তুমুল হট্টনিাদ ছাপাইয়াও উর্দ্ধে শ্রুত হইত এক্ষণে বালিকার কণ্ঠের ন্যায়ই তাহা ভাঙ্গিয়া পড়িল। প্রথম তিন ছত্রের উচ্চারণ সমাপ্ত করিবার পূর্বেই এই সম্রাট নকল নবীকে সেই উচ্চ হইতে নামিয়া আসিতে হইল।” (টার্কস ইন ইণ্ডিয়া পৃষ্ঠা ৬৯ দ্রষ্টব্য)

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সময় থেকে মুসলমানদের বিচার আচার কুরআন ও হাদীসের ছায়াবলম্বনে কাজী বা মুফতিগণ দ্বারাই হয়ে আসছিল। আজও ভারতে মুসলমানদের বিষয়ে ভারতীয় কোন সংবিধানের সাথে মুসলমানদের বাধ্য করা হয়না। যেমন ফারায়েয আইন, তালাক আইন প্রভৃতি। মুসলমানদের বিখ্যাত আইন গ্রন্থ ‘হিদায়া’ যা আজ সারা পৃথিবীতে নানা ভাষায় অনুবাদ বা তরজমা করা হচ্ছে এবং প্রত্যেক রাষ্ট্রে তার পূর্ণ, অর্ধেক অথবা আংশিক গৃহীত হয়েছে। বিশেষ করে ইউরোপে ব্যাপকভাবে ‘হিদায়া’ থেকে আইন সংকলিত হয়েছে। মূল আইন বই ‘হিদায়া’ আর তার দেহ ও প্রাণ কুরআন ও হাদীস। যাই হোক, আকবর মতিভ্রমে বা মতিক্রমে ১৫৮৭ সনে কাজীর বা মুফতির বিচার ব্যবস্থার বিলোপ সাধন করেন। তার পরিবর্তে আকবরের নতুন আইন ও হিন্দু ধর্ম সংমিশ্রিত আইন পরিচালিত হল। এর ফলে স্বভাবতঃ অমুসলমান পাঠক আকবরের প্রতি শ্রদ্ধাবান থেকে পারেন। কিন্তু আকবর যদি সম্পূর্ণ হিন্দু হয়ে যেতেন তাহলে এ মারাত্মক অভিযোগ থেকে তিনি বাঁথেকে পারতেন। তিনি হিন্দুও হন নি আবার মুসলমানও বলা কঠিন। আবার দেখা যাচ্ছে তিনি ভিতরে ভিতরে মুসলমান হয়ে তওবা করে অনুতাপ ও অনুশোচনা করে নিজের জীবনে সহস্র সহস্র ধিক্কার দিয়ে প্রাণ ত্যাগ করেন। তাহলে তিনি হিন্দু এবং মুসলমান উভয় জাতির সাথে সমানভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করে গেছেন। হিন্দুদের খুশী করতে যত রকম ব্যবস্থা আছে তা তিনি করেছিলেন। আজ তাই প্রমাণ থেকে চলেছে। কিন্তু আসলে তাঁর মধ্যে কোন আন্তরিকতা ছিল না, মৌখিক ছিল সবই। তাঁর রাজনৈতিক চালাকি নিছক ভগ্নমি এবং উদারতার অভিনয় ছাড়া আর কিছু নয়।

১৫৮৮ খ্রিষ্টাব্দে রাজা ভগবান দাসের ভাগ্যা (দত্তক পুত্র) এবং উত্তরাধিকারী মানসিংহকে তাঁর নতুন ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করতে অনুরোধ অথবা আদেশ করেছিলেন। কিন্তু তিনি যা জবাব দিয়েছিলেন তা চমকপ্রদ। মানসিংহ বলেছিলেন, “যদি জীবন উৎসর্গ করিবার সংকল্পই হয় মহামান্য সম্রাটের একজন বিশ্বস্ত অনুসারী তাহার প্রমাণ আমি যথেষ্ট দিয়াছি। কিন্তু আমি একজন হিন্দু, সম্রাট আমাকে মুসলমান হইতে বলিতেছেন না। আমি তৃতীয় কোন ধর্মের কথা অবগত নই।” নবরত্নের অন্যতম সদস্য রাজা টোডরমল ও আকবরের ধর্ম প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং ১৫৯০ খ্রিষ্টাব্দে হিন্দু অবস্থাতেই পরলোক গমন করেন।

আকবরের একান্ত অনুগত কেবল বীরবল ও অন্যান্য ১৭ জন ছাড়া আর কেউ “দীনি ইলাহী” ধর্ম গ্রহণ করতে সম্মত হন নি, বীরবল সহ ১৮ জন কেবল উঁচু রাজপদ ও অর্থের লোভে এ নতুন ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। অথচ সহায় সম্মুখলীন যে কোন ফকির দরবেশ মৃত্যুর পূর্বে হাজার হাজার মুরিদ (শিষ্য) রেখে যেতে পারেন। এখানেও আকবরের হল সবচেয়ে লজ্জাকর পরাজয়। আকবরের মৃত্যুর পর আকবর অদৃশ্য হন বটে, কিন্তু তাঁর রোপিত বিষ বৃক্ষ ভারতের বুকে ইসলামেমমর শিক্ষা ও সংস্কৃতির উপর দারুণ আঘাত হানে।

আকবর এবং তাঁর পরবর্তী সময়ে আকবরের ভাবাদর্শে ও জাহাঙ্গীরের প্রযত্নে মুসলমান লেখক দ্বারা এমন কিছু বই লেখানো হয়েছিল হিন্দি ভাষায় যার ভাব ছিল বৈদিক। মুসলমান অথচ সমাজের সর্বনাশের জন্য কুরআন, পুরাণ ও রাম রহিমের খিচুড়ী ছাড়া তাকে আর কিছু বলা যায়না। যেমন পুস্তকগুলোর নাম ‘মদন শতক’, ‘সামুদ্রিকা’ ইত্যাদি। এ পুস্তকগুলোর সূচনায় লেখকগণ গণেশ, রামচন্দ্র প্রভৃতি দেবতার বন্দনা গেয়েছেন। ‘রামভূষণ’ নামক পুস্তকের লেখক ইয়াকুব খাঁ তাঁর পুস্তকে রাধাকৃষ্ণ, সরস্বতী ও গৌরীশঙ্করের অতি কীর্তন এবং এসব দেবদেবীর অতি পূজা নিবেদন করে ধর্মীয় উদারতা অথবা খিচুড়ী প্রবণতা প্রদর্শন করেছেন।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক ফিরিস্তা লিখেছেন “তারা মসজিদে প্রবেশ করে সেখানে মূর্তিপূজা করত, বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে দেবদেবীর স্তুতি বন্দনা করত, গান গাইত। এই তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাবে কনফেডারেসী অফ ইন্ডিয়া পুস্তকে।

ডাঃ স্মিথ বলেন “এ ধর্ম বিশ্বাস ছিল হাস্যকর আভিজাত্য এবং অসংযত স্বৈরাচারের স্বাভাবিক ফল।” অন্যত্র তিনি বলেছেন, “এটা আকবরের ভুলের সৃষ্টি জ্ঞানের নয়।”

আজও ভারতের হিন্দু অনেকে খামের উপর ৭৪৯ লেখেন। এর অর্থ হচ্ছে অত্যাচারী মুসলমানেরা এত হিন্দু ব্রাহ্মণ হত্যা করেছিল যাদের উপবীতের (পৈতার) ওজন হয়েছিল ৭৪৯ মন। কিন্তু কথা হচ্ছে কে সে মুসলমান অত্যাচারী ব্যক্তি? হয়ত নাম না জানলে মনে থেকে পারে আওরঙ্গজেব, হুমায়ুন, শেরশাহ, বাবর প্রভৃতি রাজা বাদশাহ কেউ; না হয় নাদির অথবা মুহম্মদ বিন কাসিম। কার উপর আন্দাজ করে ধরবে পাঠক পাঠিকা? এখন যদি বলি আকবর তাহলে অবশ্যই অবিশ্বাস্য হবে। তার উত্তর আসবে পোঁড়া মুসলমানরা আকবরকে দেখতে পারেনা। তাই তার উপর এত বিদ্বেষ ভাব।

তাই বলি “দুর্গে দুর্গে” নামক ইতিহাসে পুস্তিকার তৃতীয় সংস্করণের প্রথম পাতায় লেখক লিখেছেন “থেকেই গড়ের কথা”। তারই কয়েক লাইন ছব্ব তুলে দিচ্ছি। “সাড়ে চুয়াত্তর কথাটা শুনেছ নিশ্চয়? কথাটার ব্যবহার কেন হয়েছিল জান? চিঠি লিখে খামের পিছনে সারে চুয়াত্তর লেখা হয়। কেননা যাতে করে খামটা কেউ না খোলে। যদি খোলে তাহলে পাণের ভাগী হবে। গল্পটা ইতিহাসের। আকবর বাদশাহ হুকুম দিলেন যুদ্ধে যত লোক মরেছে তাদের পৈতাগুলো ওজন করতে। তাই করা হল। দেখা গেল ওজন হয়েছে সারে চুয়াত্তর মন। যদি পৈতার ওজন সারে চুয়াত্তর মন হয়, তাহলে অনুমান কর কত হাজার লোক মরেছিল যুদ্ধে। গল্পটা আজ হয়ত ঠিক বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়না। তবে ঘটনাটি ঘটেছিল থেকেই।”

তবুও তাঁকে মহামতি বলতে হবে যত হত্যাই করুক, হোক না ব্রাহ্মণ হত্যা। তবু তো আকবর মুসলমান ধর্মের শত্রুতা করেছিলেন। অতএব তাঁকে মহামতি বানালে অন্ততঃ মুসলমান বুদ্ধিজীবীরা আকবরের মত হিন্দু ভাবাপন্ন হয়ে যাতে ‘উদার’ উপাধি পায় সে রাস্তা পরিষ্কার হয়েছে। ইংরেজদের ইনজেকশান সত্যই সাংঘাতিক। এ ‘দুর্গে দুর্গে’ ইতিহাস পুস্তিকাটির লেখকের নাম হচ্ছে শীবেনু গঙ্গোপাধ্যায়।

একটা বিকৃত চরিত্রের পুরুষের চরিত্রে যত প্রকার দোষ থাকা সম্ভব আকবরের ক্ষেত্রে তা পূর্ণমাত্রায় অথবা অতিমাত্রায় ছিল। যেমন দাবা খেলায় মানুষ গুটি ব্যবহার করে, কারো গুটি কাঠের, কারো হাড়ের, কারো হাতীর দাঁতের গুটি আর কারো রূপার গুটি আর কারো সোনার গুটি। আকবর দাবা খেলতেন তাঁর গুটি হয়ত সোনার কিংবা মূল্যবান পাথরের হবে বলে সাধারণের ধারণা কিন্তু আগেই বলেছি তাঁর চরিত্র বিকৃতি মাত্রাতিরিক্ত ছিল। আকবরের দাবা খেলার গুটি ছিল জড় পদার্থ নয় জীবন্ত ঘোড়শী যুবতী সুন্দরী নারী। সে নারী নিয়ে হার জিত হত আর জিতে নেয়া নারীদের ব্যবহার করা হত ব্যভিচারের ইন্ধন রূপে।

ভারতে তথা পৃথিবীতে অনেক মৃত মানুষের স্মৃতি রক্ষার জন্য স্মৃতিসৌধ নির্মিত হয়েছে আগ্রার তাজমহল, কুতুব মিনার প্রভৃতি। কিন্তু অনেকে তা অর্থের অপচয় অথবা অর্থের শ্রাদ্ধ বলে অভিহিত করেন আকবর সেখানেও মাত্রা ছাড়িয়ে গেছেন। “হিরণ মিনার” তার সাক্ষী। নব্বই ফুট উঁচু আর নানারকম কারুকার্য করা দেখার মত এ মিনারের নীচে শুয়ে আছেন নিশ্চয় কোন বিখ্যাত ব্যক্তি কিন্তু না; সেটা একটি হাতীর সমাধি। (শ্রীগঙ্গোপাধ্যায় ‘দুর্গে দুর্গে’ ফতেহপুর সিক্রির অধ্যায়ে পৃষ্ঠা ৯৬)

আকবর তাঁর তৈরী বহু প্রসাদের দেয়ালে জীব-জন্তুর ছবি অঙ্কন করেছেন। ইসলাম ধর্মে অপ্রয়োজনীয় জীব-জন্তুর ছবি বৈধ নয়। আর যা বৈধ নয় তাকে বৈধ করা সম্রাট আকবরের বৈশিষ্ট্য। সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে অনেক জীব-জন্তুর নারীমূর্তির উলঙ্গ ও অর্ধ উলঙ্গ ছবির অপসারণ করা হয়। এখনও তুর্কী মহলে বংশীধারী মানুষের ছবি শ্রীকৃষ্ণকে মনে করিয়ে দেয় এবং অমুসলমান দর্শকগণ আকবরের প্রতি ভক্তিতে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। লর্ড কার্জন দিল্লী, আগ্রা, ফতেহপুর প্রভৃতি দর্শনীয় স্থানে অনেক চিত্র পুনরাক্রম করিয়েছেন। প্রস্তর নির্মিত উলঙ্গ নারী মূর্তি, ডানাওয়ালা পরী প্রভৃতি বা দেখলে সহজেই মনে হবে রাজা বাদশাহা বোধ হয় সব সময় উলঙ্গ উন্মাদনায় মত্ত হয়ে থাকতেন আসলে তা নয়।

শ্রী গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা “ফতেহপুর সিক্রি” অধ্যায় থেকে কতকগুলো উদ্ধৃতি তুলে দিচ্ছি। “এ হামাম বা স্নানাগারটি আকবর তাঁর তুর্কী বেগমের জন্য নির্মাণ করেন। একটি ছোট বীথিকার মধ্যে দিয়ে প্রবেশ পথ, তপ্ত ও শীতল পানির ফোয়ারার ব্যবস্থা ছিল এখানে। আকবরের পাঁচ মহলের বর্ণনায় লেখক বলেছেন, “এই সৌধে তিনি বেগমদের ঈদের চাঁদ দেখার ব্যবস্থা করেছেন। হিন্দু বেগমদের সূর্য প্রণামের ব্যবস্থা করেছেন। পাঁচ মহলের দক্ষিণ দিকে আকবরের খ্রিস্টান বেগম মরিয়ম জামানির মহল। সোনালী রঙে এ সৌধের দেয়াল চিত্রিত ছিল তাই এটির নাম “সোনহেরা প্রাসাদ”। ফেরদৌসির শাহনামা চিত্র, হিন্দুদের পুরাণ চিত্র, খ্রীষ্ট জীবনীর চিত্র প্রভৃতি প্রাসাদ গায়ে অলঙ্কিত ছিল।”

আকবরের কাছে বিয়ে ও ব্যভিচারের মধ্যে পার্থক্য ছিল না। তাই কোন কোন পণ্ডিতদের মতে বিকানীর রাজ কন্যাকে আকবর বিয়ে করেছিলেন এবং তাঁর সাথে খ্রিস্টানদের অবাধ মেলামেশা করতে আকবরেরও উৎসাহ ছিল। তার গর্ভে একটি সুন্দর সুস্থ সন্তান হয়েছিল। আকবর তাঁর নতুন নাম রেখেছিলেন তাঁর মদ পানের সাথী মিঃ দানিয়েলের নাম অনুসারে দানিয়েল।

তিনি লিখেছেন, “পঁচিশী কোট” সুন্দরী সুবেশা তরুণীদের দাঁড় করিয়ে ছক কাটা ঘরে পাশা খেলতেন সম্রাট আকবর।”

ইসলাম ধর্মে ভাগ্য গণনা, হাত গণনা প্রভৃতি বিশ্বাস করা মারাত্মক অপরাধ। আকবর ইসলামের প্রতি সেখানেও আঘাত হেনেছেন। একজন হিন্দু জ্যোতিষীকে বসিয়ে রাখতেন তাঁর দরবারের চবুতারা এবং তিনি যা বলতেন আকবর তাই বেনীর ভাগ ক্ষেত্রে মেনে নিতেন। যুদ্ধযাত্রা, প্রমোদ ভ্রমণ, প্রাসাদ নির্মাণ প্রভৃতি কাজে জ্যোতিষীর রায় গৃহীত হত। কিন্তু তাঁর বহু ভবিষ্যত বাণী মিথ্যায় পরিণত হয়েছিল যেমন “দীনি ইলাহী” ধর্মের সারা ভারতে জনপ্রিয়তার কথা। কিন্তু যাকে বহুদিন ধরে ভক্তি করে এসেছেন তাঁকে ভক্তি করতে ইচ্ছা না হলেও অনেককে খুশী রাখতে মৌনতা পালন ছাড়া উপায় ছিল না।

আকবরের চরিত্রের কলঙ্ক সমুদ্রের সমস্তটুকু ঢাকা দিয়ে কিছু ঐতিহাসিক এগুলো ভাগ করে প্রত্যেক মুসলমান বাদশাহ, মন্ত্রী, সেনাপতিগণের চরিত্রে কাল্পনিক বটন ব্যবস্থা করে সহজেই অনেকে ডক্টরেট উপাধি নিতে যেন মেতে উঠেছেন।

আজও ভারতে অসভ্য, অনাচার, ইসলাম ধ্বংসী কাজ, শিরুক, বিদআত, বাউল-আউল ও মিথ্যা মারফতি ও অসভ্য ফকির দলের নোংরামীর উৎস আকবরের উৎসাহ এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমর্থনেই সৃষ্টি। আওরঙ্গজেব বহু বর্বরতা দূর করেছিলেন। কিন্তু আগাছার চাষ করার প্রয়োজন হয় না, সার দেয়ার প্রয়োজন হয় না, এমনি গজিয়ে উঠে। তাই আজ এ আধুনিক যুগে মাথা উঁচু করে গজিয়েছে এ আগাছা জঙ্গল ও বিষাক্ত কণ্টক।

আকবর কিন্তু মৃত্যুর পূর্বাঙ্কে তাঁর অভিনয়ের খোলস খুলে ফেলেছিলেন। সুদীর্ঘ ৪৭ বছর রাজত্ব করার পর ১৬০৫ খ্রিষ্টাব্দে ৬০ বছর বয়সে শত শত স্ত্রীকে বিধবা করে পরলোক গমন করেন। আকবরের শেষ দশ বছরের ইতিহাস ভালভাবে পাওয়া

যায় না। কারণ তাঁর মৃত্যুর দশ বছর আগে বিখ্যাত ঐতিহাসিক বদায়ুনীর মৃত্যু হয়। আর একজন প্রতিভাধর ঐতিহাসিক আবুল ফজল আকবরের মৃত্যুর বার বছর পূর্বেই নিহত হন। আকবর নিজের মৃত্যুকে স্বাভাবিক মনে করে এবং চোখের সামনে ঐতিহাসিক প্রত্যক্ষ করে তিনি বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। যেমন—(ক) আকবরের বিরুদ্ধে জাহাঙ্গীরের বিদ্রোহ। (খ) জনৈক হিন্দু আত্মত্যাগী কর্তৃক তাঁর আবাল্য বন্ধু দার্শনিক ও উপদেষ্টা আবুল ফজলের হত্যা। (গ) তাঁর “দীনি ইলাহী” ধর্মে দীক্ষিত বীরবল আর অনুগত মহেশ দাসের আফগানদের হাতে শোচনীয় পরাজয় ও মৃত্যু। আসলে ক, খ, গ, কারণগুলো আসল নয়। মূলের শাখা কিংবা প্রশাখা। হিজরীর ৯৯৯ সালে আকবর ভাবলেন মাত্র আর এক বছর বাকী ১০০০ হিজরী সন পূর্ণ থেকে। আকবর নতুন নবী বলে খ্যাত লাভ করতে পারল কই। যিনি প্রতিজ্ঞা করে আসছিলেন ইমাম মেহেদী ও মসীহরূপে নিজেকে আত্মপ্রকাশ করতে? তিনি ১০০০ হিজরী সনে বেশ বুঝতে পারলেন তাঁর সমস্ত স্বপ্ন স্বপ্নই নয় বরং জাগরিত অবস্থায় দুঃস্বপ্ন দর্শন। তাই “টার্কস ইন ইণ্ডিয়া” গ্রন্থে মিঃ কীসি বলেছেন, “পরবর্তী বছরটি ছিল ৯৯৯ হিজরী সাল এবং তার পরেই এল ১০০ হিজরী সাল। এক সহস্র বছরের যে আশা ব্যাপকভাবে পোষণ করা হয়েছিল তার সমাধি রচিত হল এ ১০০০ হিজরী সালেই।”

আকবরের মৃত দেহ কিন্তু দাহ করা বা নদীর বক্ষে নিক্ষেপ অথবা পশ্চিম দিকে পা রেখেও সমাধি হয়নি, হয়েছিল সাধারণ মুসলমানের মতই। কিন্তু বড়ই পরিতাপ ও অবাক হবার কথা যে অমুসলমানদের জন্য তাঁর এত কাণ্ড এত পরিকল্পনা তারাই আকবরের খুঁড়ে অস্তিত্বলোকে পর্যন্ত যতদূর সম্ভব অপবিত্র করে তুলে ফেলে দেয়। হয়ত বিধাতার বিধানের ইঙ্গিতেই এসব হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়

আওরঙ্গজেব ও মারাঠা শক্তির উত্থান

শিবাজী

বড় পর্বত শ্রেণী মহারাষ্ট্রের দুদিকে বেষ্টন করে রেখেছে। পশ্চিম ঘাট পর্বতমালা উত্তর থেকে দক্ষিণে। আর সাতপুরা ও বিক্ষ্যা পর্বতমালা পূর্ব থেকে পশ্চিমে। দেশটি অতি পর্বত সঙ্কুল। তাই মহারাষ্ট্রের প্রাকৃতিক পরিবেশ মারাঠাদের রক্ষা, কঠোর ও পরিশ্রমী করে তুলেছে। পাহাড়ী গুহাপথগুলো মারাঠাদের বিভিন্ন রাজ শক্তির হাত থেকে আত্মরক্ষাও আক্রমণের জন্য এক স্বাভাবিক প্রাকৃতিক দুর্গে পরিণত হয়েছে।

১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দে তালিকোটের যুদ্ধে বিজয় নগর রাজ্যের এক ঐতিহাসিক বিপর্যয়ের পরে পরেই দক্ষিণ ভারতে মুসলমান আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। তখন থেকে মারাঠাগণ বাহমণী ও পরবর্তী আহমদ নগর, বিজাপুর, গোলকুণ্ডা প্রভৃতি সুলতানের অধীনে কাজ করত। যে কয়টি মারাঠা পরিবার সুলতানদের অধীনে রাজকর্মে আর্থিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল তাঁদের মধ্যে ভৌসলে পরিবার অন্যতম। ভৌসলেদের পারিবারিক বৃত্তি কৃষি কর্ম। শিবাজীর পিতা শাহজী ভৌসলে প্রথমে নিজাম শাহী সুলতানের অধীনে পরে বিজাপুরের আদিল শাহী সুলতানের অধীনে কাজকর্মে নিযুক্ত থেকে বেশ প্রতিপত্তি বাড়িয়েছিলেন। উত্তর ভারতে মোঘল আর দক্ষিণ ভারতে সুলতানদের যুদ্ধ বিগ্রহের সুযোগে তাঁরা সুলতানী ও মোঘল সাম্রাজ্যে দুর্গ দখল ও লুটতরাজ আরম্ভ করত। এটাই মারাঠাদের জাতীয় চরিত্র। ধর্মগুরু রাম দাসের শিক্ষায় দীক্ষায় উদ্বুদ্ধ শিবাজী মারাঠাদের জাতীয় চরিত্র আরও সুসংগঠিত করেন।

শিবাজী জুনারের কাছে শিবনের পার্বত্য দুর্গে জন্মগ্রহণ করেন। স্বামীর অনাদরের জন্য জিজাবাই ও শিশু শিবাজী দাদাজী কোন্দদের নামে এক ব্রাহ্মণের আশ্রয় গ্রহণ করেন। মারাঠাদের শৌর্য-বীর্যের ঐতিহ্য ছিল তাঁর চরিত্রের ভিত্তি। এছাড়া আর কোন শিক্ষা বিশেষ তিনি পান নেই।

শিবাজীকে সাধারণ ইতিহাসে মনে হয় তিনি আদর্শ বীর, বিরাট যোদ্ধা, সুকৌশলী এবং আওরঙ্গজেবের চরম প্রতিদ্বন্দ্বী। আরও বদ্ধমূল ধারণা হয় যেন আওরঙ্গজেব শিবাজীর কাছে বার বার পরাজয়বরণ করে নাজেহাল হয়েছিলেন। বলাবাহুল্য শিশুকাল থেকে এ ধারণা মনে ঠাঁই পায় যে শিবাজী কেবল মারাঠা জাতির গৌরব নন, বরং ভারতে প্রধানতম ফটক বোম্বাইএ তাই বীর শিবাজীর মূর্তি বীর বেশে দণ্ডায়মান।

কিন্তু অপরপক্ষ শিবাজীকে সামান্য সৈনিক দস্যু, পাহাড়ী ইঁদুর বিশ্বাসঘাতক এবং অকৃতজ্ঞ বলে মনে করেন। নিরপেক্ষ পাঠকদের কাছে সমীক্ষার প্রয়োজন। তাহলে দুই মতের মধ্যে সমন্বয় অথবা তৃতীয় মতের উদ্ভব থেকে পারে। তবে আকবরের ভুলভ্রান্তি, চরিত্রহীনতা জেনে বুঝে ঢাকা দিয়ে যাঁরা তাঁকে মহামতি, “আকবর দি গ্রেট”, “দিল্লীশ্বর” ও “জগদীশ্বর” উপাধি দিতে কুষ্ঠাবোধ করেন নি তাঁরা নিজ গুণে ঠিক বিপরীত পন্থায় আওরঙ্গজেবকে নিন্দা বা তাঁকে খাটো করে প্রকাশ করতে পারেন। মোটকথা আওরঙ্গজেবের সাথে যাঁদের বিবাদ বিসম্বাদ তাঁরাই হবেন তত বীর তত বাহাদুর। শিবাজীর ক্ষেত্রেও অনেকের মতে তাই।

আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে দাক্ষিণাত্যে এক নতুন জাতির অভ্যুত্থান হয়। এটাই মারাঠা জাতি। এ মারাঠা জাতি আসলে যাযাবর দস্যু আর দস্যুবৃত্তিতে চিরদিনের জন্য ইতিহাসে কুখ্যাতই ছিল। রাতের অন্ধকারে অতর্কিতে আক্রমণ করত নিরীহ গ্রামবাসীদের ও শহরবাসীদের উপর। তারপর লুটতরাজ ও অগ্নিসংযোগ করে ধন-দৌলত অর্থ গহনা নিয়ে চম্পট দিত। বাংলাদেশে পর্তুগীজ মগ দস্যুদের মত মারাঠা জাতিও কুখ্যাত ছিল। তাদের অত্যাচারের কাহিনী গ্রামীণ লোকগাঁথায় ইতিহাসের পাতায় মজুত আছে। তাদের নিষ্ঠুর অত্যাচারে মানুষ এত আতঙ্কগ্রস্ত ছিল যে কচি কচি বাচ্চাদের কান্না থামাবার জন্য মমা “মারাঠা বর্গীদের” অত্যাচারের আলেখ্য তুলে ধরতেন। যেমন—

“ছেলে ঘুমাল পাড়া জুড়াল।

বর্গী এল দেশে॥”

বুলবুলিতে ধান খেয়েছে।

খাজনা দেব কিসে॥”

সাতবাহানদের রাজত্বকাল থেকে মারাঠা জাতির বহু হিংস্র মানুষকে সভ্য ও শিক্ষিত করে যুদ্ধের জন্য সৈন্য বিভাগে লাগান হত। তুর্কী সুলতান ও মোঘল বাদশারাও তাদের বিভিন্ন বিভাগে চাকরী দিতে কার্পণ্য করেন নেই। শিবাজী পিতা শাহজী ভোঁসালে আহমদ নগরের উচ্চ পর্যায়ের সামরিক কর্মচারী ছিলেন। ১৬৩৬ খ্রিষ্টাব্দে মোঘলদের হাতে আহমদ নগরের পতনের পর তিনি বিজাপুরের সুলতানের অধীনে চাকরী গ্রহণ করেন। এখানে তিনি প্রভুকে সন্তুষ্ট করে কর্ণাটে এক জায়গীর লাভ করেন। ইঠাৎ উন্নতির আতিশয্যে অনেক সুন্দরীর সহজ প্রাপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে তিনি তাঁর প্রথমা স্ত্রী জিজাবাইকে উপেক্ষা করতে থাকেন। জিজাবাই শিশু শিবাজীকে নিয়ে মুসলমান বিদেষী গোঁড়া ব্রাহ্মণের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণ প্রকৃত শিক্ষিত ছিলেন না। তবে শিবাজীকে এ শিক্ষাই ভালভাবে দিয়েছিলেন তা হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতা অর্থাৎ মুসলমান হিন্দুর শত্রু। অতএব শক্তি সঞ্চয় করে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ কর। যুদ্ধে জিতলে লাভ আর মরলেও স্বর্গ। নিরক্ষর শিবাজীর বক্ষ ফলকে কোন্দেবের মন্দ কথা বিষ বক্ষ রোপণের এক বৃহৎ বুনয়াদ বলা যায়।

শিবাজী বড় হয়ে কোন্দেবের মন্দ কথা কাজে পরিণত করতে লাগলেন। সে সময় মাওয়ালী নামে সম্পূর্ণ অসভ্য পার্বত্য জাতির সাথে শিবাজীর মিল হয়ে যায়। শিবাজী তাদের সংগঠিত করলেন এ আশ্বাস দিয়ে যে, তোমরা আমার অধীনে যদি লুণ্ঠরাজ্যে সামিল হও তাহলে প্রত্যেকের অংশে মোটামোটি বখরা পড়বে। আর ভবিষ্যতে আমরা মোঘল রাজধানী পর্যন্ত লুট করতে পারব। তখন আমাদের সুদিন ও সুনাম দুটিই হাতে এসে যাবে। এ মাওয়ালী জাতির কথা এক, হ্যাঁ তো হ্যাঁ আর না তো না। শিবাজী মাওয়ালী জাতিকে নিয়ে একটি সৈন্য বাহিনী গঠন করে বিজাপুর রাজ্যে বারে বারে হানা দিলেন। বিজাপুরের সুলতান শিবাজীর উপর ক্রুদ্ধ হয়ে শিবাজীর পিতা শাহজীকে বন্দী করলেন। পিতাকে উদ্ধার করার শক্তি শিবাজীর ছিল না এবং সম্মুখে সময়ের নীতিও ছিল ছিল না মারাঠা জাতির। তাই শিবাজী সম্রাট শাহজাহানের অনুনয় বিনয় করে আবেদন রাখলেন। সম্রাট শাহজাহানের মধ্যস্থতায় শাহজী মুক্ত হন।

কিছুদিন চূপচাপ থাকার পর ১৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দে শিবাজী পুনরায় অন্যায়ভাবে এবং বিশ্বাসঘাতকতার সাথে জাওয়ালী অধিকার করেন। আওরঙ্গজেব তখন বিজাপুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন। এ অবসরে মোঘল সাম্রাজ্যের দক্ষিণ পশ্চিম ভূভাগ তিনি আক্রমণ করেন।

সম্রাট সংবাদ পেয়েই সেখানে মোঘল সৈন্য প্রেরণ করে মারাঠা হাদাদারদের বিভাড়িত করেন। শিবাজী হতমান হলেও পুনঃ আক্রমণের সংকল্প তাঁর ছিল। এ সময় ইতিহাসের রুচীশীল অনুরাগীগণের মনে রাখা অবশ্য প্রয়োজন যে আওরঙ্গজেব পিতার অসুস্থ সংবাদে দিল্লী ফিরে যান। তখন ১৬৫৮ খ্রিষ্টাব্দে। শিবাজী এক পরম সুযোগ মনে করলেন। কারণ সম্রাট আওরঙ্গজেবকে তিনি খুব ভয় করতেন। দিবালোকে সম্মুখ সমরে যুদ্ধ করার সাহস আদৌ তাঁর ছিল না।

শ্রীঘোষও তাঁর পুস্তকে ৪৬২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, “পিতার অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া আওরঙ্গজীর দাক্ষিণাত্য ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিলেন (১৬৫৮) তারপর শিবাজীর মৃত্যুর দুই বছর পরে আবার দাক্ষিণাত্যে ফিরিয়া আসেন।” শিবাজীর মৃত্যু হয় ১৬৮০ খ্রিষ্টাব্দে। অতএব ১৬৫৮ থেকে ১৬৮০ খ্রিষ্টাব্দে পর্যন্ত এ ২২ বছর আর শিবাজীর মৃত্যুর ২ বছর পর মোট ২৪ বছর পরে আবার সম্রাট আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যে আসেন। আওরঙ্গজেব শিবাজীর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হলে এ সময়ের মধ্যে সারা দাক্ষিণাত্য জয় করে নিতে পারতেন। বলাবাহুল্য শিবাজী সারা জীবনে আওরঙ্গজেবকে দেখতে পেয়েছিলেন কিনা সন্দেহ। এ সময় ১১ বছর কুমার শাহ আলম, ৬ বছর বাহাদুর খাঁ, ৪ বছর শায়েস্তা খাঁ, ২ বছর জয় সিংহ, ১ বছর দিলির খাঁ দাক্ষিণাত্যে সুবাদারি করেন। আওরঙ্গজেব দিল্লী থেকে যা ফরমান পাঠাতেন তাতেই ছত্রপতি শিবাজীর দারুণ দুর্দশা হয়েছিল। তাঁর সেনাপতিগণ বারে বারে পরাস্ত করেছেন শিবাজীকে, বার বার বন্দী করেছেন শিবাজীকে এবং সম্রাট আওরঙ্গজেব বারবার ক্ষমা করেছেন শিবাজীকে।

আবার ১৬৬৪ খ্রিষ্টাব্দে শিবাজী সুরাট লুণ্ঠন করেন, এমন কি তীর্থযাত্রীদের জাহাজ পর্যন্ত তাঁর অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতি পায় নি। এ সংবাদে সম্রাট আওরঙ্গজেব বলেন, যে সম্মুখে আসে না, মানবতার ধার ধারে না, এ রকম একটা দুসু বা পার্বত্য মুষিক না হয়ে শিবাজী যদি একজন রাজা বা বীর হত তাহলে আমি কয়েক দিনের জন্য গিয়ে সমুচিত শিক্ষা দিতাম। সম্রাট আওরঙ্গজেব জয় সিং এবং দিল্লির খাঁবে পার্শ্বাঙ্গেন পাহাড়ী ইঁদর শিবাজীকে শিক্ষা দেয়ার জন্য।

সম্রাট আওরঙ্গজেব সংবাদ পেলেন শিবাজীর পুত্র শম্ভুজী পিতার সমকক্ষ দুষ্ট ও বিদ্রোহী। শম্ভুজীর পরিচয় আওরঙ্গজেব পূর্বেই পেয়েছিলেন। যেহেতু শম্ভুজীকেও শিবাজীর সাথে বন্দী করে আশ্রা দুর্গে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং তিনিও শিবাজীর

সাথে মিষ্টির ঝুড়িতে পলায়ন করেছিলেন। তাঁর দ্বারা বহু রাষ্ট্রদ্রোহিতা প্রকাশ পেয়েছিল। এখানে আর একটা জরুরী কথা মনের রাখা দরকার দাক্ষিণাত্যে মারাঠা জাতি শুধু মাওয়ালীদের সহযোগে দৌরাঙ্ক করত তা নয়। তাঁরা পেয়েছিল আওরঙ্গজেবের এক অবাধ্য সন্তানকে, নাম আকবর। যেমন করে “মহামতি” আকবরকে প্রশংসার মালা পরিয়ে তাঁর স্বকীয়তা বিনষ্ট করা হয়েছিল, ঠিক সেরূপ উপায়ে জাহাঙ্গীরকেও প্রথম জীবনে বিভ্রান্ত থেকে হয়েছিল আর শাহজাহানের পুত্র দারাশিকোহকে এ একই কবচই পঙ্গু করা হয়েছিল। এ একই পন্থায় আওরঙ্গজেবের শত্রুবৃন্দ মারাঠা মাওয়ালী ও সাম্প্রদায়িক হিন্দু নেতৃবৃন্দ তাঁকে বুঝিয়েছিল যে, নাম আকবর কাজেও আকবর হলে সারা ভারতের হিন্দু সম্প্রদায় তাঁর সাথে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। তাই অদূরদর্শী অপরিণত বয়সের আকবর সরল মনে বিশ্বাস করে পিতার বিদ্রোহী হয়ে ত্যাজ্যপুত্রের মত দাক্ষিণাত্যে পিতার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে যোগ দিয়েছিলেন।

যাই হোক, বৃদ্ধ সম্রাট আল্লাহর উপর ভরসা করে যুবকের মত মনোবল আর সাহস নিয়ে ১৬৮৬ খ্রিষ্টাব্দে পর পর আক্রমণ করেন 'বিজাপুর' এবং 'গোলকুণ্ড'। কারণ 'বিজাপুর' এবং 'গোলকুণ্ড'র সুলতানগণ শিবাজী ও শম্ভুজীকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য করত। এ সুলতানগণের পতনের পর পরাজিত সুলতান সৈন্য শম্ভুজীর দলে যোগ দেয়। সুলতানদের পালা শেষ করে সম্রাট মারাঠাদের দিকে দৃষ্টি দেন। ১৬৮৯ খ্রিষ্টাব্দে শম্ভুজী সম্মুখ সমরে দণ্ডমান

হলেন। আওরঙ্গজেব ২ রাকাত নামায পড়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন। আওরঙ্গজেব সৈন্যদের উৎসাহবর্ধক ভাষণ প্রদান করেন। মোঘল সৈন্য উত্তাল তরঙ্গরাজির মত যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ল। যেমন শুরু তেমনি শেষ। শম্ভুজী ভীষণভাবে পরাজিত ও নিহত হলেন। ন্যায় বিচারের মাপকাঠিতে শম্ভুজী শিবাজী অপেক্ষা বড় বীর ছিলেন। কারণ তিনি অন্ততঃ একবার যুদ্ধের জন্য সাহস সঞ্চয় করেছিলেন এটাই তাঁর কৃতিত্ব। মারাঠা শক্তি বিধ্বস্ত হবার পর শিবাজীর রায়গড় সহ বহু মারাঠা দুর্গ আওরঙ্গজেবের হস্তগত হয় এবং শাহ সহ শম্ভুজী পরিবার বন্দী হন। ১৬৮৯ খ্রিষ্টাব্দে আওরঙ্গজেব কেবল উত্তর ভারতের নয় দক্ষিণাত্যেরও অধীশ্বর হন। আওরঙ্গজেব শব্দের অর্থই সিংহাসনের “শোভা”। সত্যই তাঁর নামের সার্থকতা জ্বলন্ত হয়ে রয়েছে প্রকৃত ইতিহাসের পাতায়।

শিবাজী ও শম্ভুজীর মৃত্যুর পর মারাঠারা সংগ্রাম শুরু করে। তাঁর ছোট ভাই রাজারাম মহারাত্রের নেতা হন। সেনাপতি শান্তাজী ও ধনজীর প্রযত্নে মারাঠা সৈন্য খুবই শক্তিশালী হয়। অপরপক্ষে সম্রাট মনে করেছিলেন মারাঠাদের তেমন মাথা তুলবার কেউ নেই। এ ধারণা মোঘলদের পক্ষে ক্ষতিকর হয়েছিল। ১৬৯০ খ্রিষ্টাব্দে রাজারাম মোঘলদের অতর্কিতে আক্রমণ করে কয়েকটি মোঘল ঘাঁটি দখল করে নেন। পরে মোঘল সৈন্য শান্তাজীকে হত্যা করে। ১৭০০ খ্রিষ্টাব্দে রাজারামের মৃত্যু হলে নেতৃত্ব নিয়ে মারাঠার মধ্যে লড়াই বাঁধে। শেষে রাজারামের তৃতীয় শিবাজীর রিজেন্ট হন বীরাঙ্গনা তারাবাই। বীরাঙ্গনা তারাবাই প্রভৃতি অনেকে পরিকল্পনা

করেছিলেন। তাঁদের সমস্ত পরিকল্পনা ৯০ বছরের বৃদ্ধ আওরঙ্গজেবকে এতটুকু টলাতে পারে নি। ভারত সম্রাট আওরঙ্গজেবের ইহকালে প্রত্নুতি শেষ, পরকালের জন্য তৈরী হচ্ছেন তিনি। সারাজীবন কৃষ্ণ সাধন, ফকিরী জীবন-যাপন করে শুকনা রুটি আর খেজুর পাতার বিহানায় শুয়ে মদ, নারী, গীতবাদ্য বা কোন রকম বিলাসিতা থেকে বহু দূরে থেকে ১৭০৭ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুর মুখোমুখী হয়ে জীবনের শেষ নামায পড়েন এবং আত্মাহুঁর কাছে অনুযোগ করলেন, “হে আল্লাহ তোমার আইন মত কতটুকু বা চলেছি? যত ভাল কাজ করেছি তার জন্য তুমি প্রশংসার দাবীদার আর যত খারাপ কাজ আমি করেছি তার জন্য দোষী আমি নিজে। তুমি আমায় ক্ষমা কর।” তারপর বিশ্ব নিয়ন্তা আর বিশ্ব পয়গম্বরের নাম উচ্চারণ করে মুখ ও চোখ বন্ধ করলেন।

হাল ইতিহাসে মারাঠা জাতিকে বীরের জাতি বলা হয়। তাই মারাঠা বা বর্গীয় শিবাজীকে জাতীয় বীর বলা হয়। বাংলায় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে ও স্বদেশী আন্দোলনে ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে শিবাজী উৎসব পালন করা হয়। অনেক দূরদর্শী ঐতিহাসিকদের মতে এটা একটা ঐতিহাসিক ভ্রান্ত পদক্ষেপ। কারণ যদি জাতীয় হিন্দু বীর হিসেবে খাড়া করতে হয়, তাহলে প্রতাপ সিংহই উপযুক্ত শ্রেষ্ঠতর বীর। মারাঠা জাতি বা “বর্গীয় হাদ্গামা” সত্য ইতিহাসের পাতায় খুব বেশী অপরাধী। এজন্য যে, শোষণ জাতিকে ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তারে তরাই প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করেছিল। পেশোয়া দ্বিতীয় বাজিরাও লর্ড ওয়েলেসলীর “অধীনতামূলক মিত্রতা” নীতি গ্রহণ করার ফলেই ভারতে ইংরেজ প্রভুত্ব দ্রুত প্রতিষ্ঠিত হয় (১৮০২)।

প্রকৃত প্রাচীন ইতিহাসে মারাঠা বা বর্গী হাঙ্গামাকারীরা যেভাবেই চিত্রিত হোক না কেন আসলে যে তারা দুসু্য বা লুণ্ঠনকারী ছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। প্রমাণ স্বরূপ নীচে কতকগুলো উদ্ধৃতি উল্লেখ করা হল :

(ক) “ইংরেজ বণিকেরা বর্গীয় হাঙ্গামার সুযোগ পাইয়া নবাবের কোন অনুমতি গ্রহণ না করিয়া কলিকাতায় দুর্গ নূতন করিয়া গড়িতে আরম্ভ করিল।”

(খ) “এইরূপে রঘুজী (মারাঠা) পুনঃ পুনঃ বঙ্গদেশ লুণ্ঠন করিতে লাগিল, আলীবর্দী কিছুতেই তাহাদিগকে পরাস্তা করিতে না পারিয়া গুপ্তঘাতকের দ্বারা নিহত করাইল।”

(গ) “মারাঠা অশ্বারোহী সৈন্যরা এদেশে বর্গী নামে পরিচিত। আলিবর্দী খাঁর সিংহাসনে আরোহণের পূর্ব হইতেই তাহারা সময়ে অসময়ে মোঘল সাম্রাজ্য আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠপাট করিত। আলিবর্দী খাঁর আমলে এদেশে যে আক্রমণ ও লুণ্ঠন চলিতে থাকে তাহাই ‘বর্গীর হাঙ্গামা’ নামে পরিচিত।”

(ঘ) তখনকার শ্রেষ্ঠ ধনী জগত শেঠের বাড়ি লুণ্ঠন করিয়া প্রায় আড়াই কোটি লইয়া প্রস্থান করে।”

উপরোক্ত লেখাগুলি শ্রী অজয় কুমার সুলিখিত “ঐতিহাসিক প্রশ্নোত্তর” পুস্তকের দৃষ্টব্য।

H. G. Rawlinson M. A. I. A. প্রণীত "Sivaji the MMaratha" পুস্তকে আছে, "দাক্ষিণ ভারতের মুসলমান সুলতানরা মারাঠাদের বিশ্বাস করে তাঁদের দায়িত্বপূর্ণ পদগুলোও রাজ্য পরিচালনার ভার প্রদান করিছিলেন। কিন্তু এ অতি উদারতা ও বিশ্বাসের ফলে তাঁদেরও মুসলিম জাতির পক্ষে মারাত্মক হয়েছিল। শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠাদের বিদ্রোহ ও তদ্বারা আফজল খাঁর হত্যায় নিরীহ জনসাধারণের অসহ্য অত্যাচার উপদ্রব ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠন ইত্যাদি ব্যাপারে তার নিদর্শন।"

জনৈক ঐতিহাসিক লিখেছেন "মারাঠা দেশ নায়করা হিন্দু রাজ্য সংস্থাপনের অভিলাষ করিয়াছিলেন। সাধারণ লোকের বিশ্বাস মুসলমানরা হিন্দুদের প্রতি উৎপীড়ন করিতেন বলিয়া শিবাজী মুসলমানদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। কিন্তু কেবলমাত্র মুসলমান শাসনকর্তাদের বিরুদ্ধে মারাঠাদের অভ্যুত্থান চেষ্টার একমাত্র কারণ নয়। আসল কথা এই যে, পঞ্চদশ ষোড়শ শতাব্দীতে সমস্ত ভারতবর্ষে বিশেষতঃ দাক্ষিণাত্যে ধর্ম সমাজ সাহিত্য প্রভৃতির একটা সংস্কারের যুগ আসিয়াছিল। মুসলমানদের সঙ্গে কেবল বিরুদ্ধ সংঘর্ষের আঘাতেই যে এই সংস্কারের চেষ্টা জাগিয়াছিল তা সত্য নয়। বরং মুসলমান ধর্ম ও সাংখ্যিকের সংস্পর্শেই তথাকার হিন্দুচিন্তে একটি বিশেষ শক্তি সঞ্চার করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। রাজস্ব বিভাগের ও ধনকোষের কর্তৃত্ব হিন্দুরা লাভ করিয়াছিল। মারাঠারা সৈন্যদলভুক্ত হইয়া যেমন অর্থোপার্জন করিত তেমনই যুদ্ধ বিদ্যায় দিন দিন উন্নতি লাভ করিতেছিল। দাক্ষিণাত্যের মুসলমান শাসনকর্তারা অনেকেই হিন্দু মহিলা বিবাহ করিতেন। এইরূপ হিন্দু মুসলমান বৈবাহিক হিন্দু মহিলা বিবাহ করিতেন। এইরূপ হিন্দু মুসলমান বৈবাহিক সম্বন্ধ মুসলমান রাজ্যগুলিতে হিন্দুজাতিকে বাড়াইয়া তুলিয়াছিল। যে সকল হিন্দু মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল তাহাদিগের দ্বারাও হিন্দুদিগের ক্ষমতা বাড়িয়া উঠিতে ছিল। এ দেশের মুসলমানরা কদাচ গোঁড়া হইয়া উঠিতে পারেন নাই। সময়ে সময়ে মুসলমানেরা যৎসামান্য অত্যাচার করিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য নয়। সাধারণত এদেশের মুসলমানেরা হিন্দু প্রজাদের প্রতি সদ্যবহার করিতেন এবং সর্ব প্রকার রাজ কার্যের ক্ষমতা হিন্দুদের হস্তে অর্পণ করিতেন। ক্রমে বাহুবলে ও বুদ্ধি সুকৌশলে শাসন ও সৈন্য বিভাগে হিন্দুরাই প্রধান্য লাভ করিয়াছিল। মুসলমান শাসনে হিন্দুদিগের ক্ষমতা লেমমাত্র ব্যাঘাত না পাইয়া দিন দিন বাড়িয়া উঠিতে ছিল। ক্রমশ হিন্দু এমন প্রবল হইয়া উঠিয়া ছিল যে মুসলমানেরা নামেমাত্র শাসনকর্তা ছিলেন। হিন্দুরাই রাজ্যের সর্বত্র ক্ষমতা চালনা করিবার ফলে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে গোলকুণ্ড, বিজাপুর, আহমদনগর ও বিদর এই মুসলমান রাজ্যগুলির সকল ক্ষমতা মারাঠা নীতিবেত্তা ও যোদ্ধাদিগের অধিগত হইল। এইরূপে মারাঠা জাতি শক্তিশালী হইয়া যখন মুসলমান শাসনের বন্ধন ছিন্ন করিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীন হইয়া উঠিল তখন এক নতুন বিপদ তাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল।" (শরৎ কুমার রায়ের "শিবাজী ও মারাঠা" দ্রষ্টব্য)

মাননীয় শরৎ কুমারের লেখা পর্যালোচনায় গোলাম রব্বানি (বর্ধমানী) সাহেব লিখেছেন, "মারাঠাদের পক্ষে উক্ত নতুন বিপদ হইতেছে আওরঙ্গজেবের আবির্ভাব।" আওরঙ্গজেবের পূর্বে ও পরে এমন একটিও বার্ষিক রাজনীতিবিদ দেখা যায় নি, যিনি তাঁর সমকক্ষ। সারা সাম্রাজ্যের সর্বময় কর্তা হয়েছে রাজকোষ থেকে এক পয়সাও নিতেন না। টুপি সেলাই আর পবিত্র কুরআন কপি করে বা পেতেন তাই দিয়ে খেতেন শুকনা রুটি আর মধু। সারা ভারত এবং বহির্ভারতে ছিল তাঁর সাম্রাজ্যের বিস্তার। এত ব্যস্ততার মধ্যেও সময়মত নামায, যুদ্ধক্ষেত্রে নামায, গভীর রাত্রে আল্লাহর কাছে দণ্ডায়মান হয়ে প্রার্থনা রত, তদুপরি জ্ঞানার্জনের জন্য পড়া শুনা কখন যে কি করতেন, কেমন করে করতেন তা আজ চিন্তা করলে কিনারা পাওয়া যায় না।

আওরঙ্গজেবের ব্যবহারিক চরিত্র ছিল অত্যন্ত সুমধুর। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের স্বর্ণোজ্জ্বল মুহূর্তগুলো লিপিবদ্ধ করলে একটি সুখ পাঠ্য পুস্তক তৈরী হবে যদিও এ বন্ধমান পুস্তকে তারই দু-একটা মাত্র ঘটনা তুলে ধরা হল :

সম্রাট আলমগীর তাঁর পুত্রের জন্য একজন গৃহ শিক্ষক নিয়োগ করেছিলেন। একদিন মৌলভী সাহেব প্রচণ্ড ব্যুষ্টির দিনে কোন রকমে ভিজে ভিজে জমাট বন্ধ কাদা পেরিয়ে এসে হাজির হলেন তাঁর কর্মস্থলে। রাজপুত্র দেখেই বললেন, ইস! একদম গোটাই ভিজে গেছেন যে! আজ এত কষ্ট করে না এলেই পারতেন। মৌলভী সাহেব বললেন, তা হয় না বাবা, কর্তব্য কাজে অবহেলা করা অপরাধ। যাই হোক এখন পা দুটো ধোয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু রাজপুত্রকে দিয়ে তো পা ধোয়ার পানি আনা যায় না, তাই মৌলভী সাহেব ইতস্তত করতে লাগলেন। বাদশাহ পুত্র ব্যাপারটা লক্ষ্য করে ছুটে গিয়ে পানি এনে দিলেন। কিন্তু তাতেও আর এক অসুবিধা এক হাতে পানি ঢেলে আর এক হাতে কাদা পরিষ্কার করা বড় মুশকিল হচ্ছে। মৌলভী সাহেব কোন রকমে সংকোচ কাটিয়ে বলেন বাবা পানিটা একটু পায়ে ঢেলে দিতে পার? রাজপুত্র ততক্ষণে চালাতে লাগলেন। এমন সময় রাজ দরবারে যাবার পথে স্বয়ং বাদশাহ আলমগীর ব্যাপারটি লক্ষ্য করে গেলেন। মৌলভী সাহেবের বুকের ভিতরটা ধক্ ধক্ করে উঠল। আজ আর ঘাড়ে মাথা থাকবে না বোধ হয়। রাজপুত্র দিয়ে পায়ে পানি ঢালানোর ব্যাপারটা স্বয়ং বাদশাহ দেখে গেছেন। মৌলভী সাহেব নিজেকে একটু শক্ত করে ভাবল, শিক্ষকের স্থান সবার উপরে অতএব তার ভয় কিসের?

এমন সময়ে দরবারে মৌলভী সাহেবের ডাক পড়ল। মৌলভী সাহেব তো ভয়েই দিক্ বিদিক্ জ্ঞান শূন্য। কোন রকমে কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে দরবারে উপস্থিত হলেন। তখন বাদশাহ আলমগীর বলতে লাগলেন—"দরবারে আসার পথে দেখলাম আমার ছেলে আপনার পায়ে পানি ঢেলে দিচ্ছে আর আপনি নিজ হাতে কাদা পরিষ্কার করছেন। এটা কি বেয়াদবী নয়? কেন, সে কি নিজ হাতে আপনার পায়ের কাদাটুকু পরিষ্কার করে দিতে পারল না? এটা আমার পুত্রের উপযুক্ত কাজ হয়নি। শিক্ষকের স্থান বাদশাহেরও উপরে।"

সমস্ত শুনে মৌলভী সাহেব অশ্রু সিক্ত নয়নে কান্না ভেজা কণ্ঠে বলেন, বাদশাহ আপনি সত্যই মহৎ।

এছাড়া আধ্যাত্মিক উন্নতিতেও তাঁর এমন বিশেষ ভূমিকা ছিল যা একটি করে তুলে ধরলে পৃথক একটি পুস্তকেই সম্ভব। তবু প্রমাণ স্বরূপ পেশ করার প্রয়োজনীয়তার পরিপ্রেক্ষিতেই একটিমাত্র ঘটনা লিপিবদ্ধ করা হল।

মুসলমান হয়ে প্রত্যহ পাঁচ ওয়াক্ত নামায না পড়লে তাকে শাস্তি নিতে হত। আর হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সময়ে তো পৃথিবীতে এমন একটিও মুসলমান ছিলেন না যিনি প্রত্যহ নামায পড়তেন না। তবে শাস্ত্রানুযায়ী পাগল, শিশু প্রভৃতির জন্য তা প্রযোজ্য নয়।

একদিন সম্রাট আলমগীরের কাছে সংবাদ এল ‘একজন লোক নাকি নামায পড়েন না এবং সব সময় উলঙ্গ থাকেন। অথচ তিনি একজন নামকরা পণ্ডিত হিসেবে পরিচিত। তাঁর অনেক অলৌকিক প্রভাবে লোক তাঁর দিকে আকর্ষিত।’ এ সংবাদে সম্রাট একদিন স্বয়ং তাঁর কাছে গিয়ে প্রশ্ন করলেন, “কাপড় না পরা শক্ত অপরাধ তা কি আপনি জানেন না?” তিনি হেসে উত্তর দিলেন, “পাব কোথায়?” সম্রাট একখানা পোশাক পরিয়ে দিয়ে বলেন, “আজ শুক্রবার, জুমআর নামায পড়া ফরয (অবশ্য পালনীয়) তা কি আপনি স্বীকার করেন?” তিনি বলেন, “অবশ্যই, নামায পড়া খুব দরকার,, আমি আজ নামায পড়তে যাব।” তারপর মসজিদের প্রথম সারিতে নামায পড়তে পড়তে চিৎকার করে বলেন “হে ইমাম তোর খোদা আমার পায়ের তলায়।” তার পর ছুটে মসজিদ থেকে বেরিয়ে পলায়ন করেন। পরে তাঁকে ধরে এনে মোরতাদ (পথভ্রষ্ট) বলে প্রাণদণ্ড দেয়া হল। কিন্তু সম্রাট আলমগীরের মনে বার বার একটা প্রশ্নের উদয় থেকে লাগল তিনি কি ঠিক করলেন না ভুল করলেন? রাগে দু রাকাত প্রার্থনার উদয় থেকে লাগল তিনি কি ঠিক করলেন না ভুল করলেন? রাগে দু রাকাত নামায পড়ে শুয়ে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখলেন, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যেন বিচারাসনে বসে আছেন আর সে প্রাণদণ্ড প্রাপ্ত ব্যক্তিটি এক হাতে নিজের কাটা মাথাটা ধরে ফরিয়াদ করে বলছেন,, “হে নবী, আলমগীর আমার প্রাণদণ্ড দিয়েছে আপনি বিচার করুন।” উত্তরে হযরত যেন বলছেন, “তুমি আমার প্রতিষ্ঠিত প্রিয় শরীয়তের আইন অমান্য করেছিলে কেন? অতএব আমার আলমগীর যা করেছে ঠিকই করেছে।” আওরঙ্গজেবের ঘুম ভেঙ্গে গেল। তিনি তাঁর শিক্ষক মোল্লাজীকে সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বললেন। মোল্লাজীও বললেন,, “তোমার প্রাণদণ্ড দেয়া ঠিক হয়নি। কারণ তিনি পূর্ণ পাগল ছিলেন তা না হলে কখনই উলঙ্গ থাকতেন না। আর ‘তোর খোদা আমার পায়ের তলে’ কথাটায় ‘তোর’ শব্দটা যোগ না থাকলে নিশ্চয়ই অমার্জনীয় অপরাধ হত। এখন মনে হচ্ছে যিনি নামায পড়িয়েছেন সে ইমামের কিছু ত্রুটি আছে।” ইমাম সাহেবকে ডাকার পর জিজ্ঞেস করা হলে তিনি স্বীকার করলেন যে, “হ্যাঁ, আমি অনিচ্ছাকৃতভাবেই ভাবছিলাম আমার কন্যাগুলোর বিবাহের জন্য অনেক অর্থের প্রয়োজন।” যদি আমার কুরআন পাঠ সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক হয় তাহলে হয়ত সম্রাট খুশী হয়ে আমার অভাবের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করতে পারেন।” মোল্লাজীও বললেন, “শরীয়তের সমাধান এটাই যে, অনিচ্ছাকৃতভাবে নামায অবস্থায় যে কথাই উদয় হোক নামায তো নিশ্চয়ই হয়ে যাবে। কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে পূর্ব থেকে উদ্দেশ্য যদি সম্রাটকে মুগ্ধ করা আর অর্থোপার্জন হয় তাহলেই সর্বনাশ।”

যাই হোক, মোল্লাজীও সম্রাটকে বলেন, ঠিক যেখানে দণ্ডিত লোকটি দাঁড়িয়ে ছিল সে জায়গাটি খুঁড়তে আদেশ কর। সম্রাটের আদেশে তাই করা হল। কিন্তু আশ্চর্যের দৃশ্য দেখা গেল সেখানে স্বর্ণ রৌপ্যের মুদ্রাভর্তি একটা বড় পাত্র। মোল্লাজীও বললেন, এখানে ‘তোর খোদা’ বলতে এই মুদ্রাগুলো।

অনেক সময় মহান মানুষের অন্তরে এমন অনেক কথার উদয় হয় যা পরে সত্যে পরিণত হয়। এরই নাম কিরামত। অবশ্য তা আল্লাহর ইচ্ছাতেই হয়। ইন্দ্রজালের সাথে কিরামত বা মোজিয়া পার্থক্য এখানেই যে, ইন্দ্রজাল ইচ্ছা করলেই সম্ভব আর কিরামত বা মোজিয়া ইচ্ছা করলেই সম্ভব হয় না।

আরেকটি ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা সে দিনেও বহুল প্রচারিত ছিল। কিন্তু বর্তমানে সব যেন অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে আসছে। পাঞ্জাবে একটি গ্রামের নাম ছিল ‘আলমগীর’। একদিন সম্রাট আলমগীরের একজন মুসলমান সেনাপতির অধীনে একদল সৈন্য বাহিনী এ পল্লীর মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ ভীড়ের মধ্যে জনৈক ব্রাহ্মণের এক অপরাধী সুন্দরীর প্রস্ফুটিত গোলাপের ন্যায় মুখশ্রী দেখে লোভাতুর সেনাপতি তার পিতার নিকট মেয়েটিকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেন এবং সিদ্ধান্ত জারী করেন যে,, আজ থেকে এক মাস পরেই সে তার বাড়ীতে বরবেশে উপস্থিত হবে।

এতে কন্যার পিতা স্বয়ং আলমগীরের শরণাপন্ন হয়ে তাঁকে সমস্ত ঘটনাটা বলে আশ্রয় প্রার্থনা করলেন। সম্রাট তাকে আশ্বাস দিয়ে বলেন, ‘যাও, নিশ্চিন্তে বাড়ী ফিরে যাও, নির্দিষ্ট দিনে আমি তোমার বাড়ীতে উপস্থিত থাকব।’ ব্রাহ্মণ নানা চিন্তার ঝুঁকি নিয়ে বাড়ী ফিরলেন। সত্যিই কি সম্রাট স্বয়ং আসবেন? না তাঁর পক্ষে থেকে কোন প্রতিনিধি পাঠাবেন। আর যদি সত্যিই তিনি আসেন তাহলে সাথে নিশ্চয়ই লোক-লম্বার, হাতী, ঘোড়া পাঁচশ’র কমম হবে না। তাঁদের সে থাকতে দেবে কোথায় ইত্যাদি অনেক চিন্তা।

অবশেষে সমস্ত চিন্তার অবসান ঘটিয়ে বিবাহের আগের দিন সম্রাট আলমগীর একাই এসে উপস্থিত হলেন ব্রাহ্মণের বাড়ীতে। ব্রাহ্মণ তো অবাক। অতপর এ দরিদ্র ব্রাহ্মণের এক জীর্ণ কামরায় সারারাত ইবাদত ও মোনাজাতে অশ্রু বিসর্জন করে কাটালেন। ইনি কাঁদছেন কেন? এঁর কিসের অভাব? সকলে উকিঝুঁকি মেরে দেখতে লাগল কিন্তু প্রকাশের অনুমতি নেই। একি শুধু তোমার মেয়ে এ যে আমারও মেয়ে।

পরদিন মোঘল সেনাপতি বরবেশে ব্রাহ্মণের ঘরে উপস্থিত হলেন। কিন্তু ঘরে প্রবেশ করেই দেখলেন উলঙ্গ তরবারি হাতে সম্রাট আলমগীর স্বয়ং। উদ্ভ্রান্ত যৌবনের বুক ভরা আবেগ আর মুখ ভরা হাসি নিমিষেই মিলিয়ে গেল। যাঁর দাপটে শত্রু সৈন্য থর থর করে কাঁপে, যাঁর হৃদয়ে ভয়-ভীতি অথবা দুর্বলতা কখনও স্থান পায় না, আজ সে হৃদয় কাল বৈশাখী ঝড়ের মত দুরূহ দুরূহ শব্দে যেন কেঁপে উঠল। নিজেকে সামলে নিয়ে ক্ষমা চাইবার চেষ্টা করলেন কিন্তু দুঃখ, লজ্জা, শাস্তি আর অপমানের আশঙ্কায় জ্ঞানহারী হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন বলিষ্ঠ দেহের সেনাপতি। কন্যার পিতা সম্রাট আলমগীরের সুবিচার, দায়িত্ববোধ অসাম্প্রদায়িক ভূমিকা দেখে আনন্দে অশ্রু গদগদ কণ্ঠে বলেন, আপনি আমার বিশেষ করে আমার কন্যার ইজ্জত

রক্ষা করেছেন। আপনার এ ঋণ অপরিশোধ্য। সম্রাট ব্রাহ্মণকে বৃকে জড়িয়ে আলিঙ্গন করে বলেন, ভাই এ মহান দায়িত্ব আমার। আমি যে আমার দায়িত্ব যথাযথ পালন করতে পেরেছি এতেই আমি ধন্য।

সম্রাট আলমগীর আজ নেই সত্য, কিন্তু তাঁর মহিমাম্বিত অমর আলেখ্য মৃত্যুঞ্জয়ী হয়ে রয়েছে এ গ্রামের প্রতিটি অণু-পরমাণুতে। এ ঘটনার পরই এ পল্লীর নামকরণ হয় ‘আলমগীর’ গ্রাম। আর যে কামরায় সম্রাট আলমগীর ইবাদত করেছিলেন এখনও পর্যন্ত সেখানে কেউ জুতা পায়ে দিয়ে প্রবেশ করে না।

এমনিই এক মহৎ ও উদার চরিত্রের সাধককে ইতিহাসে হিন্দু বিদ্রোহী বলে চিত্রিত করতে ঐতিহাসিকদের কলম এতটুকু কঁপে উঠেনি।

আজও ঐতিহাসিক মন্দির “বালাজী বা বিষ্ণু মন্দির” যা চিত্রকুটের রামঘাটের উত্তর দিকে অবস্থিত, সে মন্দিরে গেলে দেখতে পাওয়া যাবে লেখা আছে “সম্রাট আওরঙ্গজেব নির্মিত বালাজী মন্দির।” মুসলমানকে মূর্তিপূজায় অংশগ্রহণ বা মূর্তি, মন্দির নির্মাণে নিষেধ আছে। কিন্তু যখন হিন্দু প্রজা বা সংখ্যালঘু প্রজাদের মন্দির যে কোন রূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেখানে তাদের ধর্ম রক্ষার দায়িত্ব মুসলমান বাদশাহের উপর পড়ে। অতএব এত উদার সম্রাট আওরঙ্গজেবকে কুরসে রঞ্জিত করা নিঃসন্দেহে বিকৃত মানসিকতার বিকাশ। যদি পচা ইতিহাসের পোকাটে পাতায় ইতিহাসের সব তত্ত্ব ও তথ্য আছে বলে কেউ দৃঢ়মনে বিশ্বাস করেন তাহলে কিছু বলার নেই। নচেৎ অনুরোধ করব হিন্দু তীর্থস্থান বারানসী ধামে গিয়ে দেখুন। সেখানে বহু পুরাতন মন্দিরের রক্ষক ও সত্বাধিকারীদের কাছে সংরক্ষিত সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলের বহু ফরমান বা দলিল দেখে অবাক থেকে হবে। মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত হিন্দু বিদ্রোহী আওরঙ্গজেব হিন্দু মন্দির সমূহের রক্ষাকল্পে জায়গীর স্বরূপ প্রচুর সম্পত্তি দিয়েছিলেন।

“এ প্রকার কাশীর প্রদেশে হিন্দু মন্দির রক্ষার্থে বাদশাহ কর্তৃক যে সমস্ত জমি ও বৃত্তি দান করা হইয়াছে সেই ফরমান দেখিয়া অবগত হওয়া যায় যে তাহার মধ্যে অধিকাংশ ফরমানে আওরঙ্গজেবের নাম অঙ্কিত রহিয়াছে। (দ্রষ্টব্য : Islam and Civilization)

বেনারস বা কাশীতে কয়েকজন নবদীক্ষিত মুসলমান অভিজ্ঞতার নামে হিন্দু মন্দির ও পূজারীদের কিছু ক্ষতি করেছিল। সংবাদ পেয়ে সম্রাট ক্ষতিপূরণ স্বরূপ প্রচুর অর্থ এবং তার স্থায়িত্বের জন্য একটি ফরমান জারী করেন। বিদ্রোহসাহী ও অনুসন্ধিৎসু পাঠক-পাঠিকাদের জন্য তার বঙ্গানুবাদটি এখানে উল্লেখ করিছি—“প্রজাদের মঙ্গলার্থে ব্যথিত হৃদয়ে আমরা ঘোষণা করছি যে, আমাদের ছোট বড় প্রত্যেক প্রজা পরস্পর শান্তি ও একতার সঙ্গে বাস করবে এবং ইসলামী বিধান অনুসারে আরও ঘোষণা করছি যে, হিন্দুদের উপাসনালয়গুলোর রক্ষণাবেক্ষণ বা তত্ত্বাবধান করা হবে। যেহেতু আমাদের কাছে আকস্মিক সংবাদ পৌছেছে যে, কতিপয় লোক আমাদের বারানসী ধামে অবস্থিত হিন্দু প্রজাগণের সাথে অসম্মানজনক নিষ্ঠুর ব্যবহার করতে এবং ব্রাহ্মণগণকে তাদের প্রাচীন ন্যায়সংগত উপাসনার অধিকারে বাধা দিতে মনস্ত্ব করেছে

এবং আরও আমাদের কাছে জানান হয়েছে যে, এ সমস্ত অত্যাচারের ফলে তাঁদের মনে দারুণ দুঃখ ক্ষোভ ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। অতএব আমরা এই ফরমান প্রকাশ করছি এবং এটা সাম্রাজ্যের সর্বত্র জানিয়ে দেয়া হোক যে এই ফরমান (অর্ডিন্যান্স) জারী হবার তারিখ থেকে কোন ব্রাহ্মণকে যেন তার উপাসনার কাজে বাধা প্রদান বা কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না করা হয়। আমাদের হিন্দু প্রজাগণ যেন শান্তির সাথে বসবাস করতে পারে এবং আমাদের সৌভাগ্য ও উন্নতির জন্য আশীর্বাদ করেন।” (ইসলামিক রিভিউ দ্রষ্টব্য)

আজ যে সাম্যবাদ সারা বিশ্বের মানুষের মস্তকে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, যে সাম্যবাদের অভিনব বন্যায় পৃথিবীর পুরাতন সব ঐতিহাসিক রাজা বাদশাহ ও তাঁদের শাসন নীতি, ধর্মনীতি, অর্থ নীতি প্রভৃতি ‘মধ্য যুগের অসভ্যতা’ বলে অনেকের ধারণা হয়েছে, কার্লমার্ক্সের যে নতুন চিন্তাধারা নতুন পথ আর পাথেয় দান করে পৃথিবীকে রক্ষা করতে উপস্থিত হয়েছে সে সম্বন্ধে আজ প্রমাণিত সত্য কথা এটাই যে, মুসলমান রাজা বাদশাহদের উদার ব্যবহার, সাম্যবাদ ও অর্থনৈতিক নৈপুণ্য বর্ণনা করে গেছেন ঐ বিখ্যাত ঐতিহাসিক এবং ফারসী পর্যটক ‘বার্নিয়ে’ আর পর্যটক ‘তার্ভানিয়ের’। তাঁদের লেখা থেকে জানা যায় শাহাজানের প্রখ্যাত পুত্র আওরঙ্গজেবের সাম্যবাদ, অর্থনীতি, শাসননীতির এত সুব্যবস্থা ছিল যা যে কোন নিরপেক্ষ মানুষের মনকে আনন্দ এবং বিস্ময়ে অভিভূত করে। কার্লমার্ক্স ইতিহাসের এ অধ্যায়ে পড়ে মুগ্ধের মত হয়ে গিয়েছিলেন। কার্লমার্ক্স এও বুঝেছিলেন, আওরঙ্গজেবের রাজত্বের যত বৈশিষ্ট্য সবই কিন্তু ইসলাম ধর্ম তথা কুরআন আর হাদীসের বৈশিষ্ট্য। কারণ আওরঙ্গজেব কুরআন বিদ্রোহী কোন কাজ করতে কোন দিনই ইচ্ছুক ছিলেন না। তিনি এ প্রসঙ্গে আরও বলেছিলেন, যে মুসলমান বাদশাহ যত অন্যায় করেছেন তিনি তত কুরআনে নীতি থেকে দূরে ছিলেন। তাই আজ কার্লমার্ক্স এর কমিউনিজম বৃক্ষেও ইসলামী ফল, ফুল, আর লতা পাতার সৌন্দর্য পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু সৌন্দর্যমণ্ডিত এ বৃক্ষটি সুস্থ শরীর সমাজে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠে নেই। তার কারণ বৃক্ষটির শিকড় ও মূল কেটে দেয়া হয়েছে অর্থাৎ নাস্তিকতা নীতিই তার মূল কারণ।

যদি নাস্তিকতা নীতির পরিবর্তন করে নতুন নেতা সাম্যবাদকেই পরিবেশন করতে এগিয়ে আসেন তাহলে আজ যে মুসলমান ওলামা, মুফতিগণ দূরে দাঁড়িয়ে ভাবছেন তাঁরা প্রত্যেকে ঝাঁপিয়ে পড়বেন সারা বিশ্বে এ নীতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

সম্রাট আওরঙ্গজেবের ন্যায় নীতিতে মার্ক্স যে মুগ্ধ হয়েছিলেন তা শ্রীঘোষকেও কিম্বদন্তি স্বীকার করতে হয়েছে। তিনি লিখেছেন, “বার্নিয়েরের বিশ্লেষণ পাঠ করিয়া কার্লমার্ক্সের মত মনীষীও মুগ্ধ হইয়াছিলেন।” (ভারতজনের ইতিহাস, ৪৮৭ পৃষ্ঠা)

এত সুদীর্ঘ আলোচনার পর সমীক্ষান্তে শ্রদ্ধাবনত মস্তকে আমরা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেকেই একথাই বলতে পারি যে, মহানুভাব রাজাধিরাজ হযরত হাফেয মাওলানা আলমগীর (রহঃ)-এর সুমহান চরিত্র মাধুর্য যেন সারা ভারত তথা পৃথিবীর মানুষের এ নৈতিক অধঃপতনের যুগসন্ধিক্ষণ প্রকৃত দিশারীরূপে অন্ধকারের মাঝে দীপ্যমান আলোকবর্তিকা স্বরূপ বরণীয়, গ্রহণীয় ও অনুকরণীয় হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মহীয়সী জেবুন্নিহার বিকৃত চরিত্রের আসল তথ্য

পূর্বেই বলেছি হিংসা স্বার্থের নেশায় মাতাল হয়ে সম্রাট আলমগীরকে ছোট করে প্রতিপন্ন করতে গিয়ে তাঁর কন্যা, বোন, প্রভৃতিকে এমন ভাবে চিত্রিত করা হয়েছে যে, একজন পতিতার বিরুদ্ধেও এ রকম উলঙ্গ সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব নয় কোন ভদ্র লেখকের পক্ষে।

বর্তমানে বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীতে ‘রাজসিংহ’ বই পাঠ্যপুস্তক রূপে গৃহীত হয়েছে। তাতে আওরঙ্গজেবের অতি আদরের কন্যা গুণবতী, চরিত্রবতী ও প্রতিভাবতী জেবুন্নিহারকে ভ্রষ্টা ও পতিতা অপেক্ষাও চরিত্রহীনা করে প্রমাণ করা হয়েছে। কিন্তু প্রতিবাদ করার উপায় নেই। সেটি নাকি ইতিহাস নয়, ঐতিহাসিক উপন্যাস! তাই তাতে কিছু কাল্পনিক রং চড়িয়ে পৃথিবী বিখ্যাত বিদূষী ও সতীদেব উপর দোষারোপ করলেও দোষ নেই। অথচ আর একজন বুদ্ধিজীবী বলেন, এর চেয়ে বড় পাপ, বড় অন্যায় এবং কালি কলমে সমাজের মস্তিষ্কে পোকা ধরিয়ে দেয়ার মত ব্যভিচার আর নেই।

পৃথিবীর বুকে বহু নরনারী এমন মেলে যারা জীবনে বিয়ে করেননি। অতএব কষ্ট করে উপন্যাস লিখতে গেলে চিরকুমার আর চিরকুমারীদের চরিত্রহীন আর চরিত্রহীনা করে না লিখলে উপন্যাস সরস আর উলঙ্গ হবে কি করে? তাই সমস্ত কুরআন শরীফ কণ্ঠস্থকারিণী ‘হাফেযা’ ও অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারিণী জেবুন্নিহারকেও উপন্যাস মার্কা ঐতিহাসিক বুলেটের আঘাত থেকে রেহাই দেয়া হয় নেই।

হাফেয মাওলানা হযরত আলমগীরের (রহঃ) চরিত্র বিকৃত করলে যেমন পরক্ষণেই কুরআন ও হাদীসকে অকেজি এবং নেশার সামগ্রী প্রতিপন্ন করে মুসলমান সমাজকে ধর্ম বিমুখ করা যায় ঠিক অনুরূপ এ মহীয়সী মহিলা হাফেযা জেবুন্নিহারকেও যদি ভ্রষ্টা চরিত্রহীনা প্রমাণ করা যায় তাহলে মুসলিম নারী জাতিকেও কুরআন ও হাদীসের বিপরীত দিকে চালানো সম্ভব হবে—এ চাতুর্যপূর্ণ মতলব নিয়েই ইতিহাসে বিষ প্রয়োগ করার পাকাপাকি ব্যবস্থা। তাই আকীল খাঁকে তাঁর প্রণয়ী বলে লিখেছেন কিন্তু অমুসলমান লেখক। আর মুসলিম বিদ্বৈষী লেখক ঋষী বঙ্কিম মহাশয়ের মতে জেবুন্নিহার মোবারক খাঁর অবৈধ প্রেমিকা। (‘রাজ সিংহ’ দৃষ্টব্য)। আবার সম্রাট আওরঙ্গজেবের বোন জাহানারাকেও এ সামান্য সৈনিক মোবারক খাঁর প্রেমে পাগলিনী, উন্মাদিনী বলে দেখিয়েছেন সাহিত্য সম্রাটের দল। ফোফা ভাইবির একই ব্যক্তির সাথে ব্যভিচারের নেশার উৎকট সাধনার কথা বর্ণনা করে নতুন ইনভেন্টারের খ্যাতি লাভ করেছেন অনেকে সস্তা কাগজের পাতায়। কিন্তু নিরপেক্ষ মানুষের মাথার মগজের সংবাদ তার বিপরীত।

কুমারী জেবুন্নিহার চিরকুমারীত্বের বিশুদ্ধতায় সুবিখ্যাত এক ঐতিহাসিকের উদ্ধৃতির অনুবাদ এখানে তুলে দিচ্ছি—“যেহেতু জেবুন্নিহার দিবানিশি কাব্যানুশীলন ও পুস্তক অধ্যয়নের গবেষণায় রত থাকতেন এবং বিবাহ হলে যেহেতু স্বামী সেবা অবশ্য কর্তব্য হয়ে যাবে ফলে অধ্যয়ন, গবেষণা ও কাব্য রচনার স্বাধীনতার ক্ষুণ্ণ হবে বলে চিরজীবন চিরকুমারী থেকে বিবাহে জঞ্জালটির মধ্যে নিজের স্বাধীন সন্তোকে সায় দিতে পারেন নি।” (উর্দু গ্রন্থ ‘জেওয়েরে জেবুন্নিহার দ্রষ্টব্য)

কোন কোন কুৎসতি প্রতিভাধারী লেখক জেবুন্নিহারকে ছত্রপতি শিবাজীর প্রণয় ণ্ডিয়ারিণী বলতে বা বইয়ে লিখে নাটকও যাত্রা রূপে তা সমাজে প্রচারের উদ্দেশ্যে ছড়িয়ে দিতেও লজ্জানুভব করেননি। ফলে সমাজে সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় রোগ ছড়িয়ে পড়েছে। (যাত্রা, নাটক, সিনেমায় এগুলো দেখে পাঠক দর্শন এঁদের চরিত্র এরূপ মনে করছে।)

আবার কোন কোন লেখক নাসারী খাঁর সঙ্গেও জেবুন্নিহার অবৈধ প্রেম ছিল বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সে সব কুপস্থী জঘন্য রুচীসম্পন্ন লেখক লেখার সময় মনে রাখা উচিত ছিল যে, তাদেরই মতে সম্রাট আওরঙ্গজেব খুবই নাকি গোঁড়া মুসলমান ছিলেন। অতএব গোঁড়া মুসলমানের মেয়েদের কোন পরপুরুষ দেখতে পায়না এটাই স্বাভাবিক নিয়ম। সুতরাং গোঁড়া সম্রাট আওরঙ্গজেবের হেরেমে সংরক্ষিতা রাজকন্যাদের অপর পুরুষের সাথে অবাধ মেলামেশার সুযোগ থাকতে পারে কি ভাবে? তাই মনে হয় ভেজাল দেয়ার উন্মাদনায় সবকিছু তাল গোল পাখিয়ে গেছে।

হাফেযা জেবুন্নিহার সম্বন্ধে সে যুগের বড় বড় জ্ঞানী, গুণী লেখক ও কবিগণ তাঁদের কাব্য কবিতায় যা লিখে গেছেন তাদের জানা আছে তাঁরা অবশ্যই জেবুন্নিহার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবেন চিরকাল। মির্জা সাঈদ আশরাফ তাঁর জন্য লিখেছেন, “আল্লাহর বান্দাগণ যেমন তাঁর ইবাদত করেন অথচ তাকে প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পান না, তেমনি জেবুন্নিহার ভূত্যাগণ তাঁর কাজ করত অথচ তাঁকে দেখতে পেত না। (মূল উদ্ধৃতির বঙ্গানুবাদ)

সে সময়কার সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক নিয়ামত আলি খাঁন লিখেছেন, “আল্লাহ নিজে অদৃশ্য থাকলেও তাঁর গুণরাজির দ্বারা তিনি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত ও প্রকামিত। জেবুন্নিহার পর্দার অন্তরালে অদৃশ্য থাকলেও দয়া ও দান সর্বত্র পরিব্যাপ্ত ও প্রকাশিত।”

এগুলো সবই মুসলমানদের উদ্ধৃতি তাই অনেকের কাছে গ্রহণীয় নাও থেকে পারে। তাই বিখ্যাত হিন্দু লেখক লসমী নারায়ণের লেখা উদ্ধৃতি দিচ্ছি—(বঙ্গানুবাদ) “জেবুন্নিহার তৈমুর বংশীয়া উজ্জ্বলতর আলোক বর্তিকা, এ যুগের নারীকুল মকুটমণি। তাঁর অধ্যাবসায়, আরাধনা, কাব্য সাধনা ও ধর্ম প্রবণতা তাঁকে সুনামের অধিকারিণী করেছে। তাঁর সুখ্যাতি অনেকের কাছে পবিত্র কা’বা ঘরের মত। হযরত মুহম্মদের (সঃ) পত্নী খাদিজার (রাঃ) মত তিনি ছিলেন পাপ ও কলঙ্কশূন্য কুমারী।”

আরও অমুসলমান লিখিত বিশেষ করে হিন্দু লেখক লিখিত জেবুন্নিহার সম্পর্কে জানতে হলে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত লসমী নারায়ণ সংকলিত ‘গুলোরানা হস্তলিপি’ দ্রষ্টব্য।

আজ ভারতে সাম্য, শানিতমৈত্রী-মিলন স্থায়ী করতে হলে প্রত্যেক সমস্যার সঠিক সমাধান করা আবশ্যিক। গোড়ায় গলদ রেখে বাহ্যিক সমাধান করলে তা সোনার মত যত চকচকই করুক আসল মূল্যহীন। এ সমস্ত অপকীর্তি বন্ধ করতে হলে প্রথমেই 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' লেখার পথ বন্ধ করতে হবে।

আমাদের দেশে ঐতিহাসিক উপন্যাসের যিনি আবিষ্কারক অথবা প্রবর্তক তিনিই হচ্ছেন আমাদের সর্ববরণ্য ঋষী আর সাহিত্য সম্রাট উপাধিপ্রাপ্ত মুসলিম বিদেষী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ইনিই ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে 'রাজসিংহ' লিখে উপন্যাস মার্কা ইতিহাস সৃষ্টি করলেন। আর ঐরই প্রদর্শিত পথে চলেন শ্রী ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর 'অঙ্গুরী বিনিময়' বইয়ে শিবাজীকে নায়ক আর রোসিনারাকে নায়িকা করে। ভূদেব বাবুর লেখার স্রোতে আওরঙ্গজেবের কন্যা রোসিনারাকে একেবারে পশু চরিত্র নামিয়ে দেয়া হয়েছে। অথচ আওরঙ্গজেবের রোসিনারা নামে কোন কন্যাই ছিল না। অনেকের ধারণা, ভূদেব বাবুর ইতিহাসে প্রকৃত জ্ঞানের অভাবেই এত বড় ভুল হয়েছে। অবশ্য ভূদেব বাবুর রচনায় বাঁচার একটা রাস্তা অবলম্বন করা হয়েছে। সেটা হচ্ছে এটাই যে, যদিও রোসিনারা নামে আওরঙ্গজেবের কোন কন্যা নেই তথাপিও এটা যে উপন্যাস।

আর আগই বলেছি উপন্যাসে কল্পনার মিথ্যা পালিশ চড়ালে যেন অপরাধের কিছু নয়। অতএব ঐতিহাসিক উপন্যাসিকদের মতে, প্রখ্যাত চরিত্রবতী জেবুন্নিসাকেও চরিত্রহীনা বললেই বা দোষ হবে কেন?

এমনি ভাবে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে মণিলার গঙ্গোপাধ্যায় একটি বই লিখেছেন তার নাম 'ভারতের বিদুষী'। 'বিদুষী' 'বিদ্যান' এর স্ত্রী লিঙ্গ। কিন্তু গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের গ্রন্থখানায় জেবুন্নিসা যে স্থান পেয়েছেন এটাই মুসলমানদের সৌভাগ্য বলতে হবে। তবে তিনিও শিবাজীর প্রেম প্রণয়ী বলে জেবুন্নিসাকে চিত্রিত করেছেন। তেমনিই ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে সুনীতি দেবীর "The Peautifull princess" নামে একটি পুস্তকে শিবাজীর প্রণয়িণী বলে জেবুন্নিসার সুউচ্চ চরিত্রে কলংক লেপন করেছেন।

তাছাড়া আজকাল প্রায় নানা পত্র পত্রিকায় এত বেশী উৎকট ঐতিহাসিক উপন্যাস সৃষ্টি হচ্ছে যে নিরপেক্ষ পাঠকের সামনে যখন এগুলো বার বার ফুটে ওঠে তখন আমার মত অনেকেরই মনে পড়ে "একটা মিথ্যাকে বার বার প্রচার করতে করতে তা সত্যে পরিণত হয়"। তাছাড়া আমাদের বাংলা ভাষাতেও একটা প্রবাদ বাক্য আছে- "যা রটে তার কিছুও ঘটে।" কিন্তু আজ বোধহয় নতুন প্রবাদ বাক্য তৈরী করতে হবে "যা না ঘটে তাও রটে।"

অথচ প্রকৃতপক্ষে যারা ঐতিহাসিক স্বীকৃতি লাভ করেছেন, যেমন কাফি খাঁ, মনুচি, ওট্যাভনার, স্যার যদুনাথ সরকার প্রভৃতি পণ্ডিতদের লিখিত ইতিহাসে এসব অভিযোগ বা অপরাধের 'অ' ও লেখা নেই বরং প্রশংসার প্রাচুর্য আছে। স্যার যদুনাথ সরকারের একটি পুস্তকের নাম 'শিবাজী'। আর একটির নাম 'ওরঙ্গজেব'। কিন্তু এগুলোর মধ্যে এসব গাঁজারে গল্পের কোন স্থান নেই। তবে আগামীকাল নতুন সংস্করণে বা নতুন নতুন মুদ্রণে কি হবে তা বলার স্পর্ধা আজ অনেকেরই নেই।

বঙ্গে বিখ্যাত ঐতিহাসিকদের মধ্যে যদুনাথ সরকার প্রথম শ্রেণীর সন্দেহ নেই। তিনি ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে "Modern Review" পত্রিকায় যে প্রবন্ধটি লিখেছেন তার নাম "Love affairs of jeban-nessa"। তাতে তিনি জোরালো ভাষায় গুরুগম্ভীর ভঙ্গিমাতে প্রকাশ করেছেন—"এ সমস্ত কাহিনী একেবারে মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন।"

আর একজন খ্যাতনামা চরিত্রকার শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর "মোগল বিদুষী" পুস্তক এ সমস্ত প্রেম কাহিনীকে মিথ্যা এবং কাল্পনিক বলে শুধু লিখা নয় বরং প্রমাণ করতেও সক্ষম হয়েছেন।

একদিন সম্রাট আওরঙ্গজেব তাঁর এ কন্যা জেবুন্নিসার জন্মের পূর্বে যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তা যথার্থ বাস্তবে পরিণত হয়েছিল। তিনি স্বপ্নে দেখেছেন তাঁর এক কন্যা তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ পাণ্ডুলিপি সংশোধন করে দিচ্ছে এবং নানা ধর্মীয় উন্নতির জন্য নতুন অনেক তথ্যাদি সংগ্রহ করে পিতার করকমলে পেশ করছে। স্বপ্ন সব সময় সত্য হয়না, কিন্তু বড় বড় বুজুর্গ বা আল্লাহর আদর্শ ওলীদের স্বপ্ন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সঠিক ও সার্থক হয়। আলমগীরের স্বপ্ন কতটা সফল হয়েছিল তা আজ বিচারের দিন।

আওরঙ্গজেব নিজেই পছন্দ করে নাম রেখেছিলেন জেবুন্নিসা—অর্থাৎ 'ললনাশ্রী'। তিনি যখন কুরআন মুখস্থ করতেন তখন পুরোনো পড়া ভুলে যাবার সম্ভাবনা ছিলনা কারণ তাঁর স্মৃতি শক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর। হাফেয়া হবার পর আরবী, ফারসী ও উর্দুতে পূর্ণ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। এছাড়া আরও অন্যান্য ভাষায় যথেষ্ট জেবুন্নিসার দখল ছিল।

জেবুন্নিসার প্রতিভার অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। একবার পারস্যের বাদশাহ স্বপ্নের মধ্যে একটি কবিতা মুখস্থ করেন—"দুররে আবলাক ক্যাসে কমদিদা মওজুদ"। বাদশাহ সমস্ত কাব্যবিদ ও কবিদের ঐ বাক্যের সাথে মিলিয়ে অর্থ, ছন্দ ও তাৎপর্যপূর্ণ এ রকম আর একটি বাক্য তৈরী কর দিতে আহ্বান করেন। অনেকেই করলেন বটে কিন্তু তা বাদশাহের পছন্দসই হয়নি। সেজন্য সকলের পরামর্শে এ বাক্যটি হিন্দুস্থানের কবি কাব্যকারদের জন্য দিল্লীর রাজদরবারে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু সকলেই ইতস্ততঃ করতে লাগলেন, কারণ পারস্যের মাতৃভাষা পারসী। অতএব সেখানকার লোকেরা যখন পারেননি তখন না জানি কত কঠিনই হবে। বাক্যটির অর্থ হল "বাগাফটকা মতির প্রত্যক্ষদর্শী বিরল"।

অবশেষে ভারত বিখ্যাত বিদুষী জেবুন্নিসার কাছে অন্তপুরে তা পাঠানো হল। তিনি একটু চোখ বুলিয়ে এ বাক্যটির নীচে একটি বাক্য লিখে দিলেন—

"নাগার আশকে বুতানে সুরমা আলুদ"।

অর্থাৎ—সুরমা পরা চোখের অশ্রু বিন্দু ঐ মতির প্রাচুর্য।

সাধারণ একটা বাক্যের সাথে জেবুন্নিহার রচিত এই অসাধারণ জ্ঞানবুদ্ধি বিজড়িত উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু সৃষ্টিতে ভারতের জ্ঞানী গুণীরা তো মুগ্ধ হয়ে ছিলেনই সে সাথে এ কবিতাটির যখন পারস্যে পৌঁছেছিল তখন তাকে পারস্যবাসী এত শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন যে, তাঁর জ্ঞানমুগ্ধ ও গুণমুগ্ধের দল অনেক পুস্তক পুস্তিকার লিখে ফেলেও ছিলেন।

পারস্যের পণ্ডিতবৃন্দ সুলতানকে অনুরোধ করেন একবার এ বিখ্যাত নারীকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য আমন্ত্রণ জানবার। কিন্তু সুলতান জানতেন বাদশার নারী মহলে এত পর্দা প্রথার প্রচলন যে, তাঁর এ আমন্ত্রণ হয়ত উপেক্ষিত হবে ফলে তিনি অপমানিত থেকে পারেন। তাই শেষে জেবুন্নিহারকে বিখ্যাত কবিকে দিয়ে কবিতার ভিতর দিয়ে মনের কথা জানালেন—“তুয়া ত্র্যায় মহাজেবী বে পরদা দিদান আরজু দারাম.....” অর্থাৎ “হে চন্দ্রাপেক্ষা সুন্দরী আমাদের ব্যবধান দূরীভূত হোক আর পর্দার বাইরে আপনার দর্শনের আশা নিয়ে যেতে চাই।

উত্তরে কথিত গৌড়া সম্রাটের গৌড়া কন্যা লিখে পাঠালেন—“বুয়ে গুল দার বারগে গুল পুশিদাহ আম দর সোখন বিনাদ মোরা”—অর্থাৎ, “পুষ্পের সুজ্ঞের মত পুষ্টেই আমি লুকিয়ে রয়েছি। আমায় যে কেউ দেখতে চায়, সে আমায় দেখুক আমারই লেখায়”। এ রকম পর্দার পক্ষপাতিনী নারী হয়েও জেবুন্নিহারকে আজ মর্যাদাপূর্ণ ও ঘৃণ্য অভিযোগের শিকার থেকে হয়েছে। বলাবাহুল্য এ নিষ্ঠুর ভূমিকার নেপথ্যে জেবুন্নিহার, রশিনারা আর জাহানারা প্রভৃতি রমণীগণ পর্দা বাজায় রেখে পাণ্ডিত্য

অর্জনের যে ইতিহাস রেখে গেছেন তা চাপা দেয়া এবং তাঁদের পবিত্র চরিত্রে কলঙ্ক নিক্ষেপ করার প্রয়োজন এজন্যই যে, যদি শিক্ষিতা নারী সমাজ পর্দার পক্ষালম্বন করেন তাহলে উদ্দেশ্য যাদের সফল হয় না তাঁরাই প্রমাণ করতে চান কুরআন আর হাদীসের শিক্ষাপ্রাপ্ত পর্দায় থাকা রাজকুমারীরা পর্দায় থাকলেও অন্তরে তাঁদের পর্দা ছিল না। তাই যাকে তাকে প্রেম বিতরণ করেছেন। সুতরাং যত দোষ যেন তাঁদের মতে কুরআন হাদীসের শিক্ষা। অতএব মুসলিম নারীকে এমন পর্যায়ে আনতে হবে যাতে তাঁরা কুরআন হাদীসের শিক্ষা থেকে দূরে সরে থাকেন এবং প্রথা থেকে মুক্তি নিয়ে অপর অসভ্য স্রোতের টানে উলঙ্গ অথবা অর্দ্ধলঙ্গ স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিণী এবং নকল উন্নতির শেষ সীমায় ব্যভিচারিণী হয়ে উঠেন। অবশ্য তাঁদের শ্রমের সার্থকতা আজ প্রমাণিত। সুফিয়া খাতুন আজ মিস্ সুপ্রিয়ায় পরিণত হয়ে পোশাক পরিচ্ছদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অনেক এগিয়ে পড়েছেন। এমন কি বিচারকের সামনে পায় উলঙ্গ হয়ে দেশ সুন্দরী বিশ্ব সুন্দরী, পুরস্কার নিতেও পিছিয়ে নেই। প্রকৃতপক্ষে এগুলো উন্নতি না অবনতি তা আজ গভীরভাবে ভেবে দেখার প্রয়োজন।

সপ্তম অধ্যায়

সম্রাট আওরঙ্গজেবের পরবর্তী মোঘল বাদশাহগণ

সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর তাঁর পরবর্তী বংশধরগণ সম্রাট আওরঙ্গজেবের মত এত যোগ্যতা সম্পন্ন ছিলেন না কিন্তু তাই বলে অযোগ্যও ছিলেন না। আওরঙ্গজেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহ আলম বাহাদুর শাহ উপাধি নিয়ে ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। সম্রাট শাহ আলম বা বাহাদুর শাহ বীর পণ্ডিত ও ধর্ম পরায়ণ ছিলেন। সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর সকল শত্রুই স্বাভাবিকভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে থাকে। কিন্তু শাহ আলমের বীরত্ব গাভীর্য ও কলাকৌশলের ভূমিকা অবলোকন করেই অনেকে শান্ত ও ক্ষান্ত হয়। কিন্তু শিখ জাতি শক্তিশালী হয়ে বান্দার নেতৃত্বে এগিয়ে এলেন। বান্দার আদেশে শিরহিন্দে লুটপাট শুরু হয়। বাহাদুর শাহ কোন সেনাপতি নিয়োগ না করে নিজে বীরবেশে সুশিক্ষিত সৈন্যসহ স্বয়ং-যুদ্ধক্ষেত্রে নামলেন। যুদ্ধে শিখ সৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হল এবং বান্দা কোন রকমে পালিয়ে প্রাণ বাঁচান। এতে চারদিকে শাহ আলমের সুনাম হড়িয়ে পড়ে। শাহ আলম মোঘল বাহিনীকে শক্তিশালী করে সম্রাজ্য পরিচালনা সক্ষম হননি। সে সময় ইব্রাহিম লোদীর সঙ্গে আফগান সামন্তদের বিবাদ কোন্দল খুব জোরাল রূপ ধারণ করে। ঠিক এ সময় এগার বছরের এক পিতৃহীন বালক যেন উন্নতি উদয়ের প্রতীক্ষায় ছিলেন। তিনিই বাবর। পাঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলত লোদী ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত ও পদচ্যুত করার জন্য বাবরকে আমন্ত্রণ জানালেন তিনি বার হাজার সুসজ্জিত সৈন্য সহ এগিয়ে এলেন। ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে পানিথে যুদ্ধ হয় বাবরের সঙ্গে ইব্রাহিম লোদীর। লক্ষাধিক বিপক্ষ সৈন্য থাকা সত্ত্বেও বাবর দারুণ ভাবে জয়লাভ করেন। ইব্রাহিমের ভরসা ছিল তাঁর সৈন্যাধিক্যের উপর। কিন্তু বাবর সারারাত্রি নামায শেষে সৈন্যদের সামনে ভাষণ দান করলেন এবং সার কথা জানালেন জয় পরাজয় সবই আল্লাহর কুদরতী হাতে আছে আমাদের প্রাণপণে লড়তে হবে।

বাবর জানত তাঁর সৈন্যদের মধ্যে অনেকে মদপান করতেন যা ধর্মে মহাপাপ। তাই যুদ্ধের পূর্বাঙ্কে, মদপানের বিরুদ্ধে তাঁদের জোর করে ক্ষেপিয়ে না তুলে বার হাজার সৈন্যসহ আল্লাহর দরবারে হাত তুলে মোনাজাত বা প্রার্থনা করতে হাত উঠিয়ে বলেন, “হে আল্লাহ তুমি আমায় ক্ষমা কর আমি প্রতিজ্ঞা করছি আর জীবনে মদপান করব না, পূর্ব অপরাধ ক্ষমা কর এবং তার পরিবর্তে যুদ্ধে ইজ্জত রক্ষা কর।” এত জোরে শিশুর মত কাঁদতে লাগলেন বাবর যে এতে সমস্ত সৈন্যদের ভাবান্তর হয় এবং তাঁদেরও বেশীর ভাগের চক্ষু অশ্রুপুত হয়েছিল এবং দলের মধ্যে যারা মদপানে অভ্যস্ত ছিলেন তাঁরা সকলেই সেদিন থেকে মদপান পরিত্যাগ করেন। এটা বীর বাবরের সুন্দর ধর্মীয় কৌশল বা কঠিন কূটনীতির নিদর্শন। তাই অনেক ঐতিহাসিক বাবরের জন্য লিখেছেন, তিনি মদপায়ী ছিলেন। কিন্তু তা একেবারেই ভুল। বাস্তবিক তিনি ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান ইবাদতকারী মুসলমান।

তিনি আসলে আধ্যাত্মিক শক্তিরও অধিকারী ছিলেন। প্রমাণ স্বরূপ বলা যায়, তাঁর পুত্র হুমায়ুন যখন কঠিন পীড়গ্রস্ত হয়ে শয্যাগত হয়েছিলেন, যখন সমস্ত চিকিৎসক জবাব দিলেন তখন বাবর বলেন, ‘আল্লাহ্ কুরআনে বলেছেন, “তোমরা নামাযের সাথে ধৈর্য চাও’। অতএব চিকিৎসক জবাব দিয়েছে সত্যি কিন্তু খোদা তো জবাব দেননি।” তাই ওযু করে সন্তানের শয্যার পাশে নামায পড়লেন, তারপর দুই হাত তুলে দোয়া করলেন, “হে আল্লাহ্ তুমি সর্ব শক্তিমান, তোমার শক্তি যুগে যুগে মানুষ দেখে এসেছে আমায় তোমার শক্তির আর একটি কণা দেখাও; আমার নিজের প্রাণ তোমার দরবারে সমর্পণ করছি বিনিময়ে হুমায়ুনকে তুমি সুস্থতা ও আয়ু দান কর।” সাথে সাথেই অলৌকিকভাবে হুমায়ুন উঠে বসে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলেন আর বাবর সাথে সাথেই পীড়িত হলেন ও সন্তানের শয্যাতেই শয়ন করলেন এবং এ শয্যাতেই তাঁর মৃত্যুর ডাক এসেছিল। মহামিলন হয়েছিল তাঁর মহান প্রপৌত্রের সাথে ১৬৩০ খ্রীঃ পানিপথের যুদ্ধেও বাবরের জয় শুধু দৈহিক নয় মানসিকতাও আধ্যাত্মিকতাকেও অস্বীকার করা যায় না।

বাবর তাঁর আত্মজীবনীতে নিজের অনেক দোষও বর্ণনা করতে দ্বিধাবোধ করেন নি। তিনি তুরকী ভাষায় সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক ছিলেন। বাবর সম্বন্ধে ইতিহাসে খুব একটা বেশী বিকৃতি ঘটানো হয় নি। তবে মদপানের ব্যাপারটি বেশ মারাত্মক। অনেকে সহজেই মনে করতে পারেন মদপান তত দোষের নয় যদি হত তাহলে এত বড় সুনাম বিজয় আর অলৌকিকতা পরিলক্ষিত হত না বাবরের জীবনে। কিন্তু সূক্ষ্ম সমীক্ষকদের মতে তা সঠিক নয়। বাবরের চরিত্র ও চেহারা মুসলমানের মতই নির্ভেজাল ছিল।

হুমায়ূনের আগমন

বাবরের পুত্র সম্রাট হুমায়ুন ২৩ বছর বয়সে পিতাকে হারান। হুমায়ুনও দরবেশ চরিত্রের লোক ছিলেন। তিনি ও তাঁর চেহারা ও পোশাক পরিচ্ছেদ পূর্ণভাবে পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন। তিনি হযরত মুহাম্মাদের (সাঃ) চিন্তাধারায় বিশ্বাসী ছিলেন। ১৫৩০ থেকে ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি বাদশাহ ছিলেন। হুমায়ূনের জন্য ইতিহাসে অন্ততঃ একটি ইনজেকশনও দেয়ার প্রয়োজন ছিল ইতিহাস বিকৃতকারীদের। যেহেতু তিনিও একজন পরহেজগার মুসলমান ছিলেন তাই তাঁকে আফিম খোর বলে মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু তিনি একজন বিশিষ্ট বীর ও নিরপেক্ষ শাসক ছিলেন। কঠিন রোগমুক্তির পরেই দুর্বল দেহে এবং পিতার মৃত্যুতে শোকাক্ত হুমায়ুন দেখলেন, গুজরাটে বাহাদুরশাহ নামে এক প্রতাপশালী রাজা নিজ শক্তি বৃদ্ধি ও রাজ্য সীমা বৃদ্ধিতে চলমান, অন্যদিকে বিহারে পাঠানবীর শের আফগান প্রবল শক্তিতে দণ্ডায়মান। বাহাদুরের বিরুদ্ধে হুমায়ুন যুদ্ধ করে তাঁকে পরাস্ত করেন। তারপর বিপুল বিক্রমে ১৫৩৯ খৃষ্টাব্দে চৌসার যুদ্ধে শের আফগানকে পরাস্ত করার চেষ্টা করলেন কিন্তু নিজেই পরাজিত হলেন। আসলে ঐ যুদ্ধ ধর্মের জন্য বা শৃঙ্খলার জন্য ছিলনা, যুদ্ধে ছিল শুধু বংশ মর্যাদা রক্ষার প্রশ্ন, তাই ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে আবার উভয়ে যুদ্ধ করলেন এবং শের আফগান দিল্লী ও আখ্ণা দখল

করলেন। একথা সঠিক যে শের আফগানের ধর্মগুণ, বীরত্ব, মহত্ব, চরিত্র, কূটনীতি ও রাজনীতি ক্ষমতা হুমায়ুন অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিলনা বরং উৎকৃষ্টই ছিল। যাই হোক তখন হুমায়ুনকে পারস্য পলায়ন করতে হয়েছিল। এ দুরবস্থার মধ্যে অমরকোট নামক স্থানে তাঁর আকবর নামে এক পুত্রের জন্ম হয়।

পারস্য সম্রাটের সাহায্য পেয়েই হুমায়ুন ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় ভারত আক্রমণ করে এবং দিল্লী ও আখ্ণা দখল করে পূর্ণ মর্যাদা ফিরিয়ে আনলেন। বিজয়ী হয়ে কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি তাঁর পাঠাগারের সিঁড়ি থেকে নামতে গিয়ে পড়ে আহত হন। আখ্ণাহুর নাম বারবার উচ্চারণ করতে করতে জানালেন সকলকে শেষ বিদায়। সেটা ছিল ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দ।

একবার হুমায়ুন যুদ্ধক্ষেত্রে থেকে খরস্রোতা নদীতে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। প্রাণ বাঁচানোর দায় হয়েছিল, সে সময় এক ভিক্তিওয়ালা তাঁর ছাগল চামড়ার ভিক্তিটি তাঁকে সাতার কেটে পৌঁছে দিয়ে হুমায়ূনের প্রাণ রক্ষা করে উপকার করেছিলেন। হুমায়ুন বলেছিলেন, আমি যদি দিল্লীর সিংহাসন পাই তুমি দেখা করবে আমি তাই উপহার দেব যা তুমি চাইবে। যখন হুমায়ুন দিল্লীর সিংহাসন পেলেন সে সময় ছেঁড়া ময়লা জামা পরিহিত কাঁধে সে ছাগল চামড়ার ভিক্তি নিয়ে ভিক্তিওয়ালা হুমায়ূনের ফটকপ্রহরীকে প্রস্তাব করলেন ‘আমাকে বাদশাহর কাছে যেতে দাও’। প্রহরী ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে দাঁড় করিয়ে গুপ্তচর অথবা পাগল মনে করে আটকে রেখে বাদশাহকে জানাতেই কর্মরত হুমায়ুন জানালেন ‘খুব সম্মানজনকভাবে একেবারে আমার কাছে নিয়ে এস।’ অদ্ভুত বেশে ভিক্তিওয়ালা ঘরে রাজ প্রাসাদে হুমায়ূনের কক্ষে প্রবেশ করতেই হুমায়ুন ছুটে গিয়ে তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে হুমায়ুন বলেন, ‘আমি আপনার উপকৃত। বলুন আপনি কি চান? আমি ইনশাআল্লাহ বিনা দ্বিধায় আপনাকে তাই দেব।’ ভিক্তি ওয়ালা বলেন, ‘আমি চাই তোমাকে সরিয়ে সিংহাসনে বসতে।’ সমস্ত সভাসদ অবাক। হুমায়ুন মাথার পাগড়ি খুলে ভিক্তিওয়ালার মাথায় পরিয়ে তাঁকে সিংহাসনে বসিয়ে সভাসদকে জানিয়ে দিলেন আজ থেকে ইনিই দিল্লীর বাদশাহ, আমি এর নগণ্য খাদেম।’ গোটা দিল্লীতে তোলপাড়। হুমায়ুন বহু ভাবে জিজ্ঞাসিত হলেন কেন তিনি এরকম করেছেন। হুমায়ুন উত্তর দিলেন পবিত্র কুরআনে আছে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা অবৈধ। সুতরাং আমি তো ভুলে মরেই যেতাম। তাই তিনি যা চাইবেন তাই দেব বলে অস্বীকার করেছিলাম। একদিন একরাত্রি যাপনের পর মহামান্য ভিক্তিওয়ালা হুমায়ুনকে আলিঙ্গন করে তাঁর মাথায় মুকুট পরিয়ে তাঁকে সিংহাসনে বসিয়ে হাত তুলে দোয়া করে করমর্দন করে বলে গেলেন আমি বড় পুরস্কার পেয়েছি তা হচ্ছে আপনার মানবতা ও চরিত্রের সুদৃঢ়তা।

আর একবার এক বিধবা রাণী কর্ণাবতী তাঁর শিশু পুত্রকে নিয়ে রাজ্য সামলাতে পারছিলেন না। ঠিক সে সময় তাঁকে আক্রমণ করার প্রতুতি চলে। কয়েক গাছি সূতা পুতাকাঁচা চুড়ীর মত যাকে ‘রাখী’ বলা হয়, পাঠিয়েছিলেন হুমায়ুনকে আর ধলিখে পাঠিয়েছিলেন, ‘আপনাকে ভাই হিসাবে গ্রহণ করতে এ রাখী পাঠালাম আপনি হাতে পরবেন এবং আমাকে বোন হিসেবে এবং আমার শিশু পুত্রকে ভাগ্নে হিসেবে সসৈন্যে

এসে রক্ষা করবেন।' হিন্দু রমণীর সে সূতা হুমায়ুন অশ্রু সজল নয়নে হাতে পড়ে স্বয়ং একদল সৈন্য নিয়ে চললেন হিন্দু বোন, ভাগ্নে আর তাঁদের রাজ্য রক্ষা করতে। একটি যুদ্ধ যাত্রায় কত লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ তা অল্প মূল্যের সূতার চেয়েও কম দাম মনে করে দীর্ঘদিন পর পৌছালেন সে বোনের রাজ্যে কিন্তু তাঁর পৌছবার পূর্বেই রাণী ভয়ে ভীতা হয়ে বিষপান করে দেহত্যাগ করেছেন। হুমায়ুন এ সংবাদে এত কঁদেছিলেন যে হঠাৎ কেউ দেখলে অবাক না হয়ে পারত না যে, একজন প্রাপ্ত বয়স্ক বীর বাদশাহ তাঁর পাতান বোনের জন্য এমন শিশুর মত কাঁদতে পারেন। ঠিক এ সুযোগেই শের শাহ শক্তি সঞ্চয় করে হুমায়ুনকে পরাস্ত করে দিল্লী ও আখ্রা দখল করেছিলেন। (দ্র: প্রসাদ কুসুম, শিবরতন মিত্র)

অতএব এহেন এক দয়াদ্র বাদশাহের চরিত্রে আফিংখোরের অভিযোগ আরোপ করে ইতিহাসের পাতাকে যেভাবে কলুষিত করা হয়েছে তা আজ আশ্চর্যের সন্দেহ নেই।

শের শাহ

১৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৫৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময় শেরশাহ রাজত্ব করেন। তিনি মাত্র পাঁচ বছর রাজত্ব করেন। এ অল্প সময়ের মধ্যেই শুধু যুদ্ধে নয় সর্ববিষয়ে তিনি যে রাজনৈতিক ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন তা চমকপ্রদ। গোটা রাষ্ট্র কতকগুলো প্রদেশে ভাগ করেছিলেন। প্রত্যেক প্রদেশকে কয়েকটি সরকার, প্রত্যেক সরকারকে আবার কয়েকটা পরগণায়। প্রত্যেক পরগণা কতগুলো গ্রাম নিয়ে গঠিত হত। প্রদেশের শাসককে বলা হত 'ইকতেদার'। ইকতেদারের অধীনে ছিল 'সিকদা-ই-সিকদারান'। রাজস্ব ও বিচার বিভাগের নেতা ছিল 'মুনসিফ-ই-মুনসিফান'। এমনি ভাবে মুনসিফ, ফোতাদার, কারকুন, আমিন, দেওয়ান প্রভৃতি প্রচুর পদ বিন্যাস করেছিলেন আর সবার উপরে ছিলেন শের শাহ স্বয়ং। তাঁর চারজন বিশিষ্ট মন্ত্রী ছিলেন চারটি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত। চার জনই ছিলেন নিজের বিভাগে সুপণ্ডিত এবং সৃজনী শক্তিদ্বারা। ১) 'দেওয়ানি ওজারত, বা রাজস্ব মন্ত্রী (২) 'দেওয়ান-ই-রিসালাত' বা পর রাষ্ট্রমন্ত্রী (৩) 'দেওয়ান-ই-আরিজ বা সেনা বিভাগের মন্ত্রী (৪) 'দেওয়ান-ই-ইনসা বা দলিল ও ভূ-মন্ত্রী। সমগ্র রাষ্ট্রের জমি জরিপ, প্রজাদের 'পাট্টা' এবং 'কবুলিয়াত' দান, শস্য থেকে কর প্রদানের সুবিধা দান এবং ভারতে চিঠি পত্র আদান প্রদান রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় প্রথম চালু হয় এ শের শাহের আমলেই। ভারতীয় মুদ্রা 'তঙ্কা'কে রূপেয়া নাম তাঁরই দেয়া।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা শেরশাহ যেভাবে নীচুতলা থেকে উপর তলা পর্যন্ত শাসন ব্যবস্থা চালু করেছিলেন তা আজও শুধু ভারতে নয় সারা বিশ্বে কোথাও বা সামগ্রিকভাবে অথবা আংশিক ভাবে প্রচলিত রয়েছে। শেরশাহের শাসন ব্যবস্থা এত সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ ছিল যে কাউকে ঘরে খিল লাগাবার বা তালা লাগাবার প্রয়োজন হত না। রাস্তায় লুটপাট বা হিনতাই বন্ধ করেছিলেন। ছোট বড় অনেক রাস্তা নির্মাণ করেছিলেন। কলকাতা থেকে পেশোরা পর্যন্ত নির্মিত বিখ্যাত রাস্তাটির ধারে ধারে বরাবর হিন্দু ও মুসলমান প্রজাদের জন্য পৃথক পৃথক সরাইখানা স্থাপন করেছিলেন। সে রাস্তার ধারেই বসে আমি আজ ইতিহাসের ইতিহাস লিখছি। এ ঐতিহাসিক

রাস্তাটির নাম শেরশাহ রোড বা হয়ে ইতিহাসের পাতায় ইংরেজী নাম 'গ্রাণ্ড ট্রাক রোড' আমরা সংক্ষেপে লিখি জি. টি. রোড।

তিনি একবার বলেছিলেন, "যদি আমার 'হায়াত' আরও আল্লাহ বাকী রাখেন তাহলে আমি এমন একটি রাস্তা তৈরী করতে চাই যেটা ভারত থেকে খাইবার গিরিপথ দিয়ে একেবারে আরব দেশ মক্কাশরীফ পর্যন্ত লম্বা হবে, যেটির উপর দিয়ে আমার ভারতীয় যেকোন বোন বোরকা পরে একা হাঁটতে হাঁটতে হজ্জ্ যেতে পারেন।" কিন্তু তাঁর সে সাধ পূরণ হয়নি, হঠাৎ একদিন বারুদের স্তুপে আগুন লেগে তিনি তাতেই মৃত্যুবরণ করেন। এ মহৎ ও চরিত্রবান বাদশাহের জন্য শ্রীবিনয় ঘোষ ভারতজনের ইতিহাসে ৩৯৪ পৃঃ যা লিখেছেন তাতে তাঁকে মুসলমানধর্ম অমান্যকারী বলে প্রমাণিত হয়েছে— "সম্রাট ই ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সমস্ত শক্তির আধার ও উৎস। এ রাজ তত্ত্ব শেরশাহও মানিতেন।" উপরোক্ত কথা আদৌ সত্য নয় কোন মুসলমান এরূপ ধারণা রাখতে পারেন না।

হুমায়ুন ও শেরশাহের পর আকবরের আগমন। তাঁর সম্বন্ধে ইতিপূর্বেই এ পুস্তকের এক বিস্তৃত স্থান জুড়ে আলোচনা করা হয়েছে। তবে একটা কথা অবশ্যই তাঁদেরই মনে পড়বে যাঁরা আকবরের ইতিহাস ইতিপূর্বে পড়েছেন, সেটি হচ্ছে এটাই যে আকবরের চরিত্রহীনতা, নারীলোলুপতা, মুর্থতা প্রভৃতির প্রাবল্যে মোঘল সাম্রাজ্য কয়েক মাসের মধ্যে ধ্বংস হয়ে যেত যদিই সম্রাট শেরশাহ রাজ্য চালানোর পথ প্রস্তুত করে না যেতেন। সুতরাং আধুনিক চিন্তাশীলদের কাছে এটা স্পষ্ট যে আকবরের রাজত্ব ও তার স্বায়ীত্ব পর্দার অন্তরালে শেরশাহের কাছে বিশেষভাবে ঋণী।

জাহাঙ্গীর

আকবরের মৃত্যুর পর ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে জাহাঙ্গীর সিংহাসন লাভ করেন। তিনি চরিত্রে, চেহারা, পোশাক-পরিচ্ছদে পুরাপুরি ইসলাম বিরোধী ছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে কিছু আলোচনা এ ইতিহাসের ইতিহাসে করা হয়েছে। কিন্তু শুধু তাঁর চরিত্রের কাল দিকটাই তুলে ধরা হয়েছে, এছাড়াও তাঁর একটা ভাল দিকও রয়েছে, সেটি হচ্ছে— হযরত আলফেসানী আহমদ সাহেবকে তিনি কারাগারে বন্দী করেছিলেন। কারণ আকবরের বিরুদ্ধে অভিযান তিরিই সৃষ্টি করেছিল এবং প্রকারান্তরে আকবরকে পরাজিত করেছিলেন এ আলফেসানী সাহেবই আকবরের নূতন ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে। তাই দেখা যায় পৃথিবীর বেশীর ভাগ নবী, রাসূলগণ দরিদ্র হয়েও সহস্র সহস্র শিষ্যের নেতা, আর যাঁর হাতে সারা ভারতের চাবিকাঠি, যিনি দণ্ডমুণ্ডের কর্তা সারা জীবনে তাঁর মাত্র ১৮ জন শিষ্য। তাও তাঁর মৃত্যুর পূর্বেই বিকল ধর্মের অচল অবস্থা। এর পিছনে হাত ছিল শেরহিন্দের মুজাদ্দিদ হযরত সাওলানা আহমদ আলফেসানীর ধর্মীয় প্রচার অভিযান।

জাহাঙ্গীর আশফজাহ পরামর্শ দিলেন বাদশাহী কর্মচারী উজীর নাজীর যেভাবে মুজাদ্দিদ আহমদ সাহেবের শিষ্য থেকে শুরু করেছেন তাতে একদিন রাজনৈতিক বিপ্লব আসতে পারে তাই তাঁর দিকে লক্ষ্য রাখা বিশেষভাবে দরকার। মদপানী জাহাঙ্গীর বড় বড় সেনাপতি রাজ কর্মীদের তাঁর পরামর্শে দূরে দূরে পাঠিয়ে দিলেন।

তারপর মুজাদ্দিদ আহমদ সাহেবকে রাজ দরবারে আসতে সংবাদ পাঠালেন। তিনি জানতেন জাহাঙ্গীরের দরবারে প্রত্যেককে সিজদা করতে হত, আর করতে হত সম্মুখে নত হয়ে দুহাত কপালে ঠেকিয়ে কুর্নিশে। জেনে-শুনেই আহমদ সাহেব জাহাঙ্গীরের দরবারে ঘৃণাভরে সদর্পে মাথা উঁচু করে গিয়ে দাঁড়ালেন। জাহাঙ্গীর জানতে চাইলেন তিনি দরবারের আইন অনুসারে সিজদা বা কুর্নিশ করলেন না কেন? আর অন্ততঃ আসসালামু আলাইকুমও তো করতে পারতেন? কপর্দবহীন হযরত আহমদ সাহেব বলেন, “আমি জাহাঙ্গীরের দরবারের ভৃত্য নই বরং আমি আল্লাহর দরবারের ভৃত্য, তাই তাঁর আইনই আমার কাছে আইন আর বাকি সব কিছু আমার কাছে বে-আইন। তবে তোমাকে সালাম দেননি এজন্য যে, তুমি অহঙ্কারী, হযরত উত্তর দেবেনা তখন আমার সালাম দেয়ার অর্থ হবে প্রিয় নবীর একটা সুনাতকে পদলিত করান।”

জাহাঙ্গীর রেগে তাঁকে বন্দী করে গোয়ালিয়ার দুর্গে কারাগারে পাঠান। এ সংবাদ চারদিকে ছড়িয়ে পড়তেই জাহাঙ্গীরের উপর লোক অসন্তুষ্ট হয়ে উঠল। মহব্বত খাঁন কাবুলে জাহাঙ্গীরের কর্মী হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন। তিনিও মুজাদ্দিদ সাহেবের শিষ্য ছিলেন। তাই ক্রোধে আশ্রিত হয়ে তিনি বিদ্রোহ করলেন। শুধু তাই নয়, নিজের নামে মুদ্রা প্রচলন করলেন এবং জাহাঙ্গীরের সাথে ভাল ব্যবহার করতে জানালেন এবং তাঁকে কারাগার থেকে মুক্তি দিতে বললেন। মহব্বত তাই করলেন।

জাহাঙ্গীর এবার মুজাদ্দিদ সাহেবকে সসম্মানে দরবারে আমন্ত্রণ করলে মুজাদ্দিদ সাহেব জানালেন তাঁর কতকগুলো শর্ত পালন করলে তাহলে জাহাঙ্গীরের সাথে তিনি সাক্ষাত করতে পারেন নচেত দেখা হবার কোন উপায় নেই—(ক) দরবার থেকে ইসলাম বিরোধী সিজদা ও কুর্নিশ প্রথার উচ্ছেদ করতে হবে। (খ) ধ্বংস করে দেয়া মসজিদগুলো পুনঃ নির্মাণ করতে হবে। (গ) যুদ্ধকরের পুনঃ প্রবর্তন করতে হবে। (ঘ) জাহাঙ্গীরকে নিজে ইসলাম অনুযায়ী চলতে হবে এবং রাজ্য ইসলামের আইন মতে চলবে। (ঙ) বিচার আগের মত কাজী বা মুফতি মৌলভীরা করবেন। জাহাঙ্গীর সমস্ত শর্ত মেনে নিলেন, নিজে মুজাদ্দিদ সাহেবের শিষ্য হলেন এবং মদপান পরিত্যাগ করলেন। পাঁচবার নামায, কুরআন পাঠ প্রভৃতি শুরু করলেন। মুজাদ্দিদ সাহেবকে প্রধান পরামর্শ দাতা করে মদপায়ী চরিত্রহীন ধর্মত্যাগী প্রায় জাহাঙ্গীর যেন ইসলামের স্নিগ্ধ আলোকে নব-শিশুর মত নির্মল জীবন আরম্ভ করলেন। মাত্র পাঁচ বছর তাঁর এ নতুন জীবন স্থায়ীত্ব লাভ করেছিল। তিনি নূরজাহানকে আর পূর্বের মত বাইরের ভূমিকা পালন করতে নিষেধ করে দিলেন। একটি কূপের মত গভীর গর্ত তৈরী করালেন সেটা সোনা রূপার টাকার দিয়ে ভর্তি করলেন সেটা থেকে জাহাঙ্গীর দীন, দুঃ, অনাথ, বিধবা হিন্দু মুসলমান প্রজাদের দান করতেন।

একদিন যে জাহাঙ্গীর ছিলেন নূরজাহানের হাতের পুতুল প্রজাদের সাথে সাক্ষাত অনুভবের অবকাশ ছিল না। আজ তিনি মুজাদ্দিদ সাহেবের পরামর্শে দরবারের বাইরে ফটকে একটি শিকল রাখলেন যেটি একেবারে জাহাঙ্গীরের শয়নকক্ষ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, আর সাথে একটা ঘন্টাও বাঁধা ছিল। যে কোন অত্যাচারীত, উপবাসী, অবহেলিত, মুসলমান অমুসলমান প্রজা রাজকর্মচারীদের দ্বারা যার কাজ সমাধা হয়নি তিনি শিকল টানলেই বাদশা জাহাঙ্গীর তাঁদের সাথে সাক্ষে কক্ষে ডাকতেন এবং তাঁর সমস্তোষজনক সমাধান করে তবে ক্ষান্ত থাকতেন।

একদিন রূপ লাভণ্যের জীবন্ত প্রতীক নূরজাহান আয়নার সামনে তাঁর রূপচর্চা করছিলেন এমন সময় এক বিকৃত মস্তিষ্ক হিন্দু প্রজা কেমন ভাবে একেবারে নূরজাহানের কক্ষে উপস্থিত হয়ে পড়ে। নূরজাহান সাথে সাথে তাঁকে গুলি করেন। হিন্দু প্রজা মারা যান। মৃতের আত্মীয় শিকল টানলেন এবং জাহাঙ্গীরের কাছে বিচার প্রার্থী হলেন নূরজাহানের বিরুদ্ধে। জাহাঙ্গীর তাঁর প্রিয়তমা বিশ্ব সুন্দরী নূরজাহানের বিচার করে রায় দিলেন নূরজাহানের প্রাণদণ্ড। সকলেই অবাক হলেন। সেদিনের জাহাঙ্গীর আর আজকের জাহাঙ্গীরের মধ্যে অনেক দূরত্ব, অনেক ব্যবধান। আগে ছিলেন ধর্ম মুক্ত রাজা এখন হচ্ছেন ধর্ম যুক্ত বাদশাহ। সারা ভারতে যিনি সব চেয়ে অবাক হয়েছিলেন তিনি তাঁর সহধর্মিণী নূরজাহান। নূরজাহান কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন, “হে স্বামী পুরানো দিনের কোন কথা কি আপনার মনে নেই! আমার সমস্ত প্রেম, ভালবাসা, মায়া সেবা সমস্ত কিছু একটু মনের তুলনাতে কি ওজন করলে হত না?” জাহাঙ্গীর চোখ ভরা জল নিয়ে বলেন, “প্রিয়া নূরজাহান, আমি আমার মনের তুলনাতে তোমার সারা জীবনের সবকিছু এক পাল্লায় চাপিয়েছি আর অন্য পাল্লায় চাপিয়েছি হযরত (সাঃ) এর আইনকে। বারে বারেই ভারী হয়েছে ইসলামের আইনের নির্দেশ। ইসলামের আইনে তুমি তাকে হত্যা করতে পারতে প্রাণদণ্ডের বা ব্যাভিচারের অপরাধে কিন্তু সে দোষ তার ছিল না। আসলে সে ছিল বিকৃত মস্তিষ্ক, অতএব আবার বলছি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তোমার প্রাণদণ্ড।” বিচারপ্রার্থী স্বপ্ন দর্শনের মত নাটকীয় ইসলামী বিচার ব্যবস্থা দেখে কাঁদতে কাঁদতে বলেন, “হে বাদশাহ আমরা আর প্রাণদণ্ড দেখতে চাই না, নূরজাহানকে আমরা ক্ষমা করলাম। আমরা আজ দুঃখাম ইসলাম সত্যিই শান্তি ও সত্যের নিরপেক্ষ ধর্ম।”

অনেক কান্নাপূত অনুরোধে নূরজাহান তাঁদের কাছে ক্ষমার সাথে প্রচুর ক্ষতিপূরণ দিয়ে প্রাণ ফিরে পেলেন। জাহাঙ্গীরের এত সুন্দর, আদর্শ চরিত্রের প্রভাব তাঁর সম্মানদের উপর পড়া অস্বাভাবিক ছিল না।

শাহজাহান

১৬২৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৬৫৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকাল। বঙ্গদেশ খণ্ডের আফগান সর্দার খাঁনজাহান লোদী বিদ্রোহী হন কিন্তু সম্রাট তাঁকে দমন করেন। তারপর ১৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে আহমদনগর দখল করেন। বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সুলতানদের তিনি শান্তিপূর্ণভাবে সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করার জন্য শর্ত জানান। কিন্তু তাঁরা যুদ্ধই পছন্দ করলে তখন সম্রাট একটি সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করেন। অবস্থা অশুভ বুঝে বিজাপুরের সুলতান বাৎসরিক ২০ লক্ষ টাকা কর দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সন্ধি করলেন। এমনভাবে ১৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দে বিজাপুরের আদিল শাহী ও গোলকুণ্ডার কুতুবশাহী সুলতানদের সাথে সন্ধি করে শাহজাহান নিজের আধিপত্য বিস্তার করেন। এ সময় বঙ্গদেশে পর্তুগীজরা ঘাঁটি তৈরী করে বাণিজ্য ও অত্যাচারে বেশ উন্নতি করেছিল তখন বাংলার সুবাদার ছিলেন কাসিম আলী খাঁ। সম্রাট শাহজাহান তাঁকে আদেশ দিলেন হুগলী অবরোধ করে পর্তুগীজদের যেন উপযুক্ত শিক্ষা দেয়া হয়। সম্রাটের আদেশে যুদ্ধ ঘোষিত হল, পর্তুগীজরা পরাজিত ও বহু নিহত হয় এবং অজস্র পর্তুগীজ বন্দী হয়ে আশ্রয় প্রেরিত হয়।

শাহজাহানের চেহারা, পোশাক-পরিচ্ছদ একজন পূর্ণ মুসলমানের মতই ছিল এবং জাহাঙ্গীরের ধর্মীয় ভাবান্তর ও ইসলামে আত্মসমর্পণের ছাপ শাহজাহানের উপরও পড়েছিল। তিনি যদি মাতাল ধর্মহীন, দাড়ি মুণ্ডিত আকবরের মত বা জাহাঙ্গীরের প্রথম অবস্থার সাথে নিজেকে মেলাতে পারতেন তাহলে তার বিরুদ্ধেও অভিযোগ থাকত না বরং তিনি বহু সুনামের অধিকারী থেকে পারতেন। মিঃ ঘোষ খ্রিষ্টান লেখক মিঃ স্মিথ, মিঃ ডিসেন্ট প্রভৃতি ঐতিহাসিকদের উদ্ধৃতি দিয়ে তার ইতিহাসে যা লিখেছেন তাও তাৎপর্য পূর্ণ—“স্মিথ বলিয়াছেন এবং ঠিকই বলিয়াছেন বাদশাহ শাহজাহানের ঐশ্বর্য বিলাস, স্থাপত্য প্রীতি, প্রাসাদ, দুর্গ, বিশেষ করিয়া তাজমহল নির্মাণ অনেককে অবাক করিয়া দিয়াছে কিন্তু এই বিলাসিতার অন্তরালে অনেক নিষ্ঠুর অত্যাচার ও নৃশংস হত্যা কদর্যতা লুকাইয়া রহিয়াছে।” (৪৩৩১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু দাড়িওয়ালা সম্রাটকে সুস্পষ্ট ভাষায় চরিত্রহীন না বলা সরল পাঠক সহজে বুঝবেনা, সে জন্য আবার লেখা হয়েছে “মমতাজের মৃত্যু হয় ১৬৩১ খ্রিষ্টাব্দে এবং তারপর জীবনের বাকী ৩৫ বছর শাহজাহান তাজমহলে সমাধিস্থ প্রিয় পত্নী মমতাজের ধ্যান করিয়া কাটান নাই। স্মিথ বলিয়াছেন—“During the remaining thirty five years of his he disgraced himself grass licentiousness বাকী ৩৫ বছর নির্বিকার উচ্ছৃঙ্খলতায় শাহজাহান নিজের জীবনকে কলুষিত করতে কুণ্ঠিত হন নাই।”

আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, মমতাজের মৃত্যুজনিত শোকে শাহজাহানের মস্তিষ্ক বিকৃতি দেখা দিয়েছিল এবং তিনি মমতাজের মৃত্যুর পর শুধু শোকে নয় নানা শারীরিক ও মানসিক পীড়ায়ও পীড়িত ছিলেন, তাই দূরবর্তী শ্রেষ্ঠতম শাহজাদা আলমগীরের মূল্য নির্ধারণ করতে না পেরে নিকটবর্তী অপদার্থ দারশেকোহকেই আশাতিরিক্ত স্নেহ ও সুযোগে সিক্ত করে সুপথের পরিবর্তে তাঁর ঐতিহাসিক মঞ্চ থেকে পলায়নেরই পথ নির্শন করেছিলেন।

শাহজাহানের তাজমহল, দিল্লীর লালকেল্লা, দেওয়ানিআম, দেওয়ানিখাস, মতি মসজিদ, দিল্লীর জুমআ মসজিদ, ময়ূর সিংহাসন প্রভৃতি শাহজাহানের অক্ষয় কীর্তি যার সাথে তাঁর স্থাপত্যশিল্প ও ধর্মানুরাগী মনেরও পরিচয় বিজড়িত।

একবার শাহজাহান রাত্রিতে স্বপ্নে একটি মসজিদ দর্শন করলেন। ঘুম ভাঙ্গার পর তাঁর ইঞ্জিনিয়ারদের ডেকে আদেশ দিলেন আমার বর্ণনানুযায়ী আপনার এ মসজিদের ছবি এঁকে আমায় দেখান। সকলেই বহুরূপে বহুভাবে কল্পিত মসজিদের একটা করে ছবি আঁকলেন বটে কিন্তু একটিও ছবি বাদশাহর মনের মত হল না। সে সময় মস্তবড় এক সাধক বা দরবেশ খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। অবশেষে তাঁরই শরণাপন্ন থেকে হয় বাদশাহকে এ ছবির জন্য। দরবেশ বাদশাহকে জানালেন, আমার অপেক্ষাও বড় দরবেশ যিনি আপনার রান্না করেন। বাদশাহ অবাক হয়ে দাড়িওয়ালা ছোট জামা পরা রাধুনীকে ডেকে ছবির কথা বলতেই তিনি বলেন, আমার চেয়েও বড় বুজুর্গ যিনি আপনার পায়খানা পরিষ্কার করেন। বাদশাহ অবাক হয়ে মেথরকে ডেকে বলেন আপনার মত মহান মানুষ নিজেকে গোপন রাখার এ কৃষ্ণ সাধনার উপর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি, আর ক্ষমা চাইছি আপনাকে এর আগে চিনতে না পারার জন্য। মেথর ফকির তাঁর স্বপ্ন বৃত্তান্ত শুনে বলেন “তা ‘মোফাভেশ’রা (Engineer) আঁকতে পারবে কেন? এটা যে বেহেশতের মসজিদ। (দ্রঃ রাজমুকুট পৃষ্ঠা ১৩) মেথর ফকির একজন

শিল্পীকে ডাকিয়ে আনলেন এবং নিজে একটি মসজিদের ছবি এঁকে তাঁকে দেখালেন। বাদশাহ খুব অবাক হলেন যে এ ছবি তাঁর স্বপ্নে দেখা ছবির সাথে হুবহু সংগতিপূর্ণ। ফকীর শেষ কথা বললেন, “দ্রাভঃ স্মরণ থাকে, যে ব্যক্তির রুখনও নামায ক্বাযা হয় নাই কেবল তিনিই এ মসজিদের প্রথম প্রস্তরখানি প্রথিত করবেন।” (দ্রঃ রাজমুকুট পৃঃ ১৩, ১৯২৩ খ্রিঃ মুদ্রণ) আরও কথিত আছে, এ ঘটনার পরের দিন থেকে সে ফকিরকে আর লোকালয়ে দেখা যায়নি।

দিল্লীর জুমআ মসজিদ নির্মাণের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনায় সম্রাট বহু আলেম সুফী আমীর ওমরাদের বললেন, “আমি এমন লোক দ্বারা মজিদের প্রথম ইট বসাতে চাই যার বার বছর কোনদিন তাহাজ্জুদের নামায ক্বাযা হয়নি।” প্রতিদিন গভীর রাত্রে নিয়মিতভাবে এ নামায পড়া বেশ কঠিন কাজ। তাই নানা কারণে কেহ এগিয়ে আসলেন না। বাধ্য হয়ে বাদশাহ নিজেই প্রথম ইট বসালেন এবং কেঁদে বললেন, “হে আল্লাহ আমি জানতাম না যে তুমি আমাকে এমনভাবে প্রকাশ করে লজ্জিত করবে, হে আল্লাহ তোমার শোকর যে আমার বার বছর তাহাজ্জুদ বাদ যায় নি।” লোকে প্রশ্ন করলেন, “বাদশাহ দিল্লীর শাহী মসজিদ এত বিরাট উঁচু জায়গায় নির্মাণ করছেন কেন?” উত্তরে সম্রাট বলেন, “আমার মৃত্যুর পর আমার ছোট বড় প্রজারা যখন উচ্চ স্থানে স্থাপিত মসজিদে আল্লাহকে সিজদা করবেন আমি তখন আমার প্রজাবৃন্দের পায়ের নীচে, অনেক নীচে করবে তাঁদের দোয়ারে ভিক্ষুক হয়ে প্রতীক্ষায় থাকব।”

দিল্লীর বুকে আজও সে মসজিদ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। মসজিদে অপবিত্র অবস্থায় প্রস্তাবান্তে শৌচাদি ব্যতিরেকে কোন মুসলমান পুরুষ ও নারীর প্রবেশ করার অনুমতি ধর্মে নিষিদ্ধ, কিন্তু আজ জাতি ধর্ম নির্বিশেষে পুরুষ ও স্ত্রী প্রতিদিন যেভাবে মসজিদে প্রবেশ, বিচরণ ও পর্যবেক্ষণ করেন তা যে কোন প্রকৃত মুসলমানের জন্যে তাঁর হৃৎপিণ্ডে আঘাত দেয়ার মত অপরাধ।

আজ আমাদের সূক্ষ্ম বিচার দণ্ড ও নিরপেক্ষ দৃষ্টি ভঙ্গিতে গবেষণা করে দেখতে হবে যে, সারা ভারতের অধীশ্বর যে সম্রাট শাহজাহান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সুন্দরীকে কাছে পেয়েও, পাশে পেয়েও আল্লাহর স্মরণের জন্য মমতাজের সমস্ত আকর্ষণ উপেক্ষা করে তাহাজ্জুদের নামাযে নিমগ্ন থেকে পারেন তিনি প্রকৃতপক্ষে উচ্ছৃঙ্খল না, উচ্ছৃঙ্খল তাঁরাই যারা তাঁর নির্মল নিষ্কলুষ চরিত্রের উপর কলঙ্কের কালিমা লেপন করতে দ্বিধা করেন নি? বার বছরের নিরবিচ্ছিন্ন রাত্রি জাগরণের ইতিহাসটি হজম করতে পারলেই ব্যাকীমাত হবে মনে করে যারা অবিশ্রান্ত বিষাক্ত কালি বর্ষণ করে গেছেন তাঁদের কোন ভূষণে ভূষিত করবেন তা স্বচ্ছ চিন্তাচেতনা সম্পন্ন পাঠক পাঠিকাদের বিবেচন্যধীন।

শাহজাহানের শাসনকালে দু-একটি বিদ্রোহ ছাড়া শান্তি ও শৃংখলা বিদ্যুত হয়নি। B. P. Saksena mPuj, "In Shahjahan's reign the Mughal Empire attained to the zenith of prosperity and affluence." শাহজাহানের রাজত্বকালে মোঘল সাম্রাজ্য ঐশ্বর্য এবং প্রাচুর্যের উচ্চপর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল। ফরাসী ঐতিহাসিক ও পর্যটক ভার্নিয়ের বলেন, “শাহজাহান রাজা হিসেবে প্রজাদের শুধু শাসন করা নয় পরিবার এবং সন্তানদের ন্যায় তিনি প্রজা শাসন করতেন।”

এরপর মোঘল সাম্রাজ্যের ইতিহাসে আওরঙ্গজেব ও তাঁর পরবর্তী বংশধরগণের ইতিহাস ইতিপূর্বেই আলোচিত হয়েছে বলে এখানেই এ অধ্যায়ের যবনিকা টানছি।

অষ্টম অধ্যায়

সম্রাট বাবর

আমরা আকবর বা আওরঙ্গজেবের প্রভৃতি ঐতিহাসিক ব্যক্তির আলোচনায় দুটি জিনিষ এখানে তুলে ধরেছি একটি হচ্ছে ইতিহাস বিকৃতির ছবি আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে বিকৃত করার বৈজ্ঞানিক কারণ। সে জন্য মোঘল বংশের ধারাবাহিকতা সাময়িক ভাবে বাদ দেয়া হয়েছে। আমরা পুনরায় মোঘল শাসনের ধারাবাহিক আলোচনায় ফিরে আসছি।

মোঘলগণ বহুবার ভারত আক্রমণ করে ফিরে গিয়েছিল নিজেদের বাসভূমিতে। তাই তাদের কাজকর্মে প্রমাণিত হয়েছে তারা বিদেশী বা আক্রমণকারী। কিন্তু এ মোঘল বংশীয় অর্থাৎ এশিয়ার বিশ্ব বিখ্যাত দিগবিজয়ী বীর তৈমুরলঙ্গের রক্তের সাথে মাতার দিক দিয়ে চেঙ্গিসখান রক্তসন্ধিক্ষণে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন বাবর।

মুহাম্মদ বিন তুঘলক সম্বন্ধে ইতিহাসে অনেক মিথ্যাকে সত্য ও সত্যকে মিথ্যার আবরণে আখ্যায়িত করা হয়েছে সে সম্বন্ধে আলোচনার অবকাশ রইল। মুহাম্মদ বিন তুঘলকের মৃত্যুর পর ফিরোজ শাহ তুঘলক বংশের মর্যাদা বা পূর্ব সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ১৭১২ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। মাত্র ৫ বছর রাজত্ব করেন শাহ আলম। স্বল্পায়ু না হলে শাহ আলম আওরঙ্গজেবের মত অমর হয়ে থাকতেন। তিনি সিংহাসনে বসে রাজা তাদের সাথে মৈত্রী বন্ধনের ব্যবস্থা করেছিলেন। সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে বন্দী শত্ৰুজীর পুত্র শাহকে মুক্তি দিলেন। এমনি ভাবে পাণ্ডিত্য, বিচক্ষণতা, সুদূরপ্রসারী চিন্তাধারা সর্বোপরি ধর্ম প্রবণতা তাঁকে মহীয়ান করে তুলেছিল।

সম্রাট শাহ আলমের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র জাহানশাহ শাহ সম্রাট হন। তিনিও বিচক্ষণ ছিলেন। দুষ্ট দমনে তিনি ছিলেন খুবই নির্ভিক। ষড়যন্ত্রকারীদের চক্রান্তে ১ বছর রাজত্ব করার পর তিনি গুপ্ত ঘাতকের হাতে নিহত হন। এখানে অপমৃত্যুর জন্য তিনি দায়ী নন। ভারতে গান্ধীজী, পাকিস্তানের লিয়াকত আলি খান, আমেরিকার মিঃ কেনেডিকে হত্যা করা হয়েছিল। যঁরা হস্তা তারাই কলঙ্কিত আর যঁরা নিহত তাঁরা ইতিহাসের আসল পাতায় চির জীবন্ত হয়ে রয়েছেন। সম্রাট জাহানশাহের পরে বাহাদুর শাহের পৌত্র ফারুক শিয়ার সিংহাসনে বসেন ১৭১৩ খ্রিঃ। পূর্ব পুরুষদের আকস্মিক মৃত্যু লক্ষ্য করে স্থির করলেন মৃত্যুর পূর্বে এমন সুযোগ্য প্রতিনিধি তৈরী করতে হবে যাতে তাঁরা যে কোন মুহূর্তে সাম্রাজ্যের হাল ধরতে পারে। তাই সম্ভ্রান্ত বংশের সুযোগ্য দুই ভাই (ইতিহাসে সৈয়দ ভাদ্রদয় বলে পরিচিত) সৈয়দ হুসাইন আর সৈয়দ আবদুল্লাকে সাথে নিলেন এবং রাজকার্যে এমন সুযোগ্য করে তুললেন যাতে সম্রাটের অসুস্থতা, অনুপস্থিতির কারণে সম্রাটের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন থেকে পারে। অপর

পক্ষে অনেক ঐতিহাসিকগণ মনে করেন সম্রাট ফররুকশিয়ার সৈয়দ ভাদ্রদয়ের হাতের পুতুল ছিলেন। আসলে তাঁরা সম্রাটের উচ্চ চিন্তা বুঝতে পারেন নেই। এ সময় মাওয়ার রাজা অজিত সিং বিদ্রোহ ঘোষণা করলে সম্রাট তা কঠোর হস্তে দমন করেন। অজিত সিং পরাজিত হয়ে অত্যন্ত আগ্রহে সম্রাট ফররুকশিয়ারের আনুগত্য স্বীকার করেন এবং নিজ কন্যাকে সম্রাটের থেকে বিবাহ দেন। পূর্বে বর্ণিত শিখ নেতা বান্দা আবার শক্তি সঞ্চয় করে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ফররুকশিয়ার বিপুল বিক্রমে বান্দাকে পরাজিত এবং নিহত করেন। ১৭১৯ খৃষ্টাব্দে আততায়ীর হাতে সম্রাট নিহত হন।

এমনিভাবে বাহদুর শাহের চতুর্থ পুত্র জাহান শাহ মুহাম্মদ শাহ উপাধি নিয়ে সম্রাট হলেন (১৭১৯-৪৮)। পতনোন্মুখ মোঘল সাম্রাজ্যের ইনিই ছিলেন শেষ প্রতাপশালী সম্রাট। তাঁর সময়ে দরবারে ওমরাহগণ ইরানী ও তুর্কী দুই দলে বিভক্ত হয়ে যায়। ফলে সাম্রাজ্য আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা প্রকাশ পায়। তাঁর উজির নিজাম উল মুলক দাক্ষিণাত্যের সুবাদার থেকে স্বাধীন শাসক হয়ে উঠলেন, হায়দরাবাদ রাজ্যের তিনিই প্রতিষ্ঠাতা। এ সময় সাফাবীবংশ উচ্ছেদ করে তুর্কী নাদির শাহ পারস্যের মসনদে বসে ভারত আক্রমণ করেন। তাঁর প্রচণ্ড আঘাতে মোঘল সাম্রাজ্যের মেরুদণ্ড ভেঙে যায়। সুবাদারগণ চারদিকে স্বাধীন অযোধ্যায় সাদাত খাঁ, বাংলা দেশে আলিবর্দী, রোহিল খণ্ডে আফগানরা। মারাঠাগণ এ সময় খুবই প্রবল হয়ে মালব, বুলেন্দ খণ্ড ওজরাট, বেবার ও উড়িষ্যা পর্যন্ত দখল করেন। বাংলাদেশে মারাঠাদের লুটপাটকে লোকে বর্গীর হাঙ্গামা বলত।

নাদীর শাহের পর আহম্মদ শাহ আব্দালির ভারত অভিযানে মোঘল সাম্রাজ্য একবারে অন্তসার শূন্য হয়ে পড়ল। মুহাম্মদ শাহের পরে আহম্মদ শাহ (১৭০৮-৫৪), দ্বিতীয় আলমগীর (১৭৫৪-৬৯), দ্বিতীয় শাহ আলম (১৭৫৯-১৮০৬), দ্বিতীয় আকবর (১৮০৬-৩৭) ও দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ ১৮৩৭-৫৮ সম্রাট হয়েছিলেন। ১৭৫৭ খৃঃ পলাশীর যুদ্ধে ব্রিটিশ রাজশক্তির উদ্ভূত হয় দ্বিতীয় আলমগীরের রাজত্বকালে। তার একশত বছর পরে (১৮৫৭-৫৮) দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের আমলে জাতীয় বিদ্রোহ হয়। এ বিদ্রোহের নায়ক হিসেবে তিনি ইংরেজদের হাতে বন্দী হয়ে রেডুনে নির্বাসিত হন এবং তাঁর পুত্র পৌত্রদের তাঁর সামনে দিল্লীতে মিঃ হডসন গুলি করে হত্যা করে। সম্রাট মুহাম্মদ শাহ থেকে দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ পর্যন্ত সম্রাটদের অনেক সমালোচক ও ঐতিহাসিকগণ অযোগ্য বিলাসী প্রভৃতি বলে আখ্যায়িত করেন। ইংরেজ এবং দেশের দালালগণ ভারতের বিরুদ্ধে যে ভাবে বিরোধিতা করেছিল সেখানে সাহস ও যোগ্যতা প্রদর্শন ইতিহাসে আত্মহত্যার নামান্তর বলে গণ্য হত। হৃদয়ে খোদাই করে রাখার মত ঘটনা এটাই যে, শেষ সম্রাট বাহাদুর শাহ সিপাহি বিদ্রোহ আন্দোলনে (১৮৫৭) সারা ভারতে বিদ্রোহই হিন্দু মুসলমানদের নিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য সারা ভারতের সম্রাট বলে ঘোষণা করেন। সারা ভারতে সকলের মাঝে সকলের বিচারে সম্রাট হিসেবে নির্বাচিত হবার মত যোগ্যতা তাঁর ছিল একথা সর্বজনবিদিত।

নবম অধ্যায়

ভারতীয় রাষ্ট্রমধ্যে গজনির ঘুর ও শাসকদের অভিযান

সবুজগীন

নবম শতাব্দীর শেষ ভাগে প্রবল পরাক্রান্ত তুর্কীরা আলগুগীনের নেতৃত্বে স্বাধীন রাজত্ব স্থাপন করেন। সবুজগীন এ আলগুগীনেরই ক্রীতদাস। আলগুগীনের মৃত্যুর পর ৯৭৭ খ্রিঃ ২০ এপ্রিল সবুজগীন গজনির সিংহাসনে বসেন। আফগানের পার্বত্য এলাকায় রাজশক্তি সুদৃঢ় করে তিনি শাহী রাজা জয়পালের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। সবুজগীনের কয়েকজন কর্মীকে বন্দী করার অপরাধে জয়পালের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি যুদ্ধ যাত্রা করলে জয়পাল আজমীর, কলিঙ্গর, কণৌজ প্রভৃতির রাজাদের সম্মিলিত শক্তি নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেও জয়লাভ করতে পারলেন না। তিনি ৯৯৭ খ্রিঃ পরলোকগমন করেন।

সুলতান মাহমুদ

সবুজগীনের মৃত্যুর পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র সুলতান মাহমুদ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি ৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১০৩০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজ্য পরিচালনা করেন।

সুলতান মাহমুদ খুবই উৎসাহী ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। তিনি শ্রেষ্ঠ সৈন্যাধক্ষের অন্যতম এবং একজন শ্রেষ্ঠ বিতেজা ছিলেন। তাঁর সতের বার ভারত আক্রমণ করার পশ্চাতে ভারতীয় রাজাগণ কর্তৃক সন্ধি চুক্তি ভঙ্গ ও তাঁর আনুগত্য অস্বীকার এবং ভারতীয় মিত্রবর্গকে উৎপীড়ন প্রভৃতি অনিবার্য কারণ। ১০০০ খ্রিষ্টাব্দে মাহমুদের প্রাথমিক অভিযানের ফলস্বরূপ সীমান্তস্থিত কয়েকটি দুর্গ অধিকৃত হয়। পর পৌত্রসহ বন্দীত্ব বরণ করে অবশেষে পরাজয়ের গ্লানি থেকে আত্মরক্ষার নামান্তরে আগুনে প্রাণ বিসর্জন দেন। ১০০৫ খ্রিষ্টাব্দে মুলতান অধিকৃত হয়। অতপর সুলতানের শাসনকর্তা দাউদকে বিদ্রোহাত্মক কার্যে সহায়তার অভিযোগে মাহমুদ জয়পালের পুত্র আনন্দ পালের বিরুদ্ধে ষষ্ঠ অভিযান প্রেরণ করেন। আনন্দপালের সন্ধি নীতির ফলে সম্মিলিত হিন্দু বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়েও পরিশেষে মাহমুদের জয় হয়। ১০০৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি নারায়ণপুরের রাজাকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। ১০১২ খ্রিষ্টাব্দে খানেশ্বরের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়ে তা অধিকার করেন। ১০১৮ খ্রিষ্টাব্দে এক বৃহৎ সেনাবাহিনীর পুরোভাগে থেকে তিনি গজনি রওনা হলেন। এ সময় বারনের রাজা দশ হাজার সৈন্যসহ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তাঁর অধীনতা স্বীকার করেন। এক-কথায় তাঁর সুদীর্ঘ ৩৩ বছর কালব্যাপী ক্রমাগত যুদ্ধে তিনি একবারও পরাজয় বরণ করেন নি।

সুলতান মাহমুদের ইতিহাসে সোমনাথ মন্দির অভিযান এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১০২৫ খ্রিষ্টাব্দের শেষার্ধ্বে গজনি ত্যাগ করে সুলতান মাহমুদ ১০২৬ খ্রিষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারী সোমনাথের দ্বারে উপস্থিত হলে হিন্দুরা প্রবল বাধা প্রদান করেও পরাজিত হয়। এ সোমনাথকে কেন্দ্র করেই আধুনিক চিরাচরিত ইতিহাসে সুলতান মাহমুদের ন্যায় স্বচ্ছ চরিত্র বীরের উপর “ভারতীয় মন্দির সমূহ ধ্বংস করে ইসলাম ধর্ম প্রচার, মূর্তিভঙ্গ, অর্থ লোলুপ, হস্তা ও লুণ্ঠনকারী ইত্যাদি অসংখ্য অপবাদ আরোপ করা হয়েছে। অথচ প্রকৃত ইতিহাসে এ সমস্ত ধারণার একটিও সত্য নয়। তাঁর ভারত আক্রমণ সম্পূর্ণ রাজনৈতিক ব্যাপার। তদানীন্তন সময়ে ভারতের ধন-সম্পদ এমন কি অনেকের মতে জল দুসূরাও তাদের লুণ্ঠিত অর্থ সোমনাথ মন্দিরে গচ্ছিত রাখত। এসব নানান কারণে সোমনাথ যখন মন্দির রূপী রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল তখন আর মাহমুদের আক্রমণে কোন বাধা ছিল না।

ডাঃ ঈশ্বরী প্রসাদও এ কথার সমর্থনে বলেন, "The temples of India which Mahmud raided were store houses of enormous and untold wealth and also some of these were political centres." মাহমুদ ভারতের যে মন্দিরগুলো আক্রমণ করেছিলেন তাতে বিপুল ও বর্ণনাভীত ধনরত্ন পূর্ণ ছিল এবং তাদের মধ্যে কয়েকটি ছিল রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের কেন্দ্রস্থল। প্রত্যক্ষদর্শী বিখ্যাত ঐতিহাসিক ক্রিয়া কলাপের কেন্দ্রস্থল। প্রত্যক্ষদর্শী বিখ্যাত ঐতিহাসিক আল-বিরুনী বলেন, “বিদেশী বণিকদের কাছে উৎপাদিত উৎকৃষ্ট সামগ্রীর বিক্রয়লব্ধ অর্থে যে সমস্ত হিন্দুরা ধনী হয়েছিল, তাদের দানের প্রাচুর্য দিয়েই এ সমস্ত ধনরত্ন সঞ্চিত হয়েছিল।”

অতএব ধর্মীয় বিদ্বেষের কারণে তিনি মন্দির ধ্বংস করেছিলেন একথা আদৌ সত্য নয়। বিখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক স্যার ডব্লিউ হেইগ বলেন, "His religious policy was based on toleration and though zealous for Islam, he maintained large body of Hindu troops and there was no reason to believe that conversion was a condition of their services." তাঁর ধর্মীয় নীতি সহিষ্ণুতার উপর গড়ে উঠেছিল এবং যদিও ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর উৎসাহ যথেষ্ট ছিল তথাপি তিনি এক বিরাট হিন্দু সৈন্যদল পোষণ করতেন। একথা বিশ্বাস করার কোন হেতু নেই যে ধর্মোত্তরিতকরণই এ কাজের মূল উদ্দেশ্য। Prop. Habib "The non religious character of his expedition will be obvious to the critic who has grasped the salient fetures of the age. It is impossible to read a religious motive in them" - সমালোচকদের কাছে তাঁর অভিযানের ধর্ম নিরপেক্ষতা প্রতীয়মান হবে যদি তারা যুগ ধর্মের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারেন। এর মধ্যে ধর্মীয় উত্তেজনার বাস্তবিকই অভাব ছিল।

সুলতান মাহমুদের ধর্মনীতি সম্বন্ধে মিঃ এলফিনষ্টোন বলেন, “এ রকম ঘটনা কোথাও দেখা যায়নি যে, যুদ্ধ ব্যতীত কোথাও কোন হিন্দুকে তিনি প্রাণদণ্ড দান করেছেন।” তাঁর সামরিক বাহিনীর ইতিহাসে তিলক রায়, হাজারী রায় এবং সেনার নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও তিনি গজনীতে হিন্দু সংস্কৃতি এবং সংস্কৃত সাথেকোর উৎকর্ষ বিধানের জন্য একটি কলেজ ও একটি বাজার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ধর্মাত্মক হলে এ সমস্ত কাজ কি করে তাঁর দ্বারা সম্ভব হত? উল্লেখ করা যেতে পারে ভারতে হিন্দু রাজন্যবর্গ ও মধ্য এশিয়ার মুসলমান রাজাদের সাথে তাঁর ব্যবহারের কোন তারতম্য ছিল না।

তদুপরি ভারত অভিযানের পরিপ্রেক্ষিতে মন্দির ধ্বংস ও লুণ্ঠনের জন্য যে সমস্ত অভিযোগকারীরা তাঁকে লুণ্ঠন প্রিয় ও হিন্দু বিদ্বেষী বলে প্রচার করতেন বা আজও করেন তাঁদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, এ সমস্তই যুদ্ধের স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে হয়েছিল এবং তাঁর পূর্ববর্তী ও তদানীন্তন পৃথিবীতে এটা আদৌ অসঙ্গত ছিলনা। তদানীন্তন প্রচলিত নীতি অনুসারে বিজিত জাতির লুণ্ঠিত ধন-সম্পত্তিতে বিজয়ী সৈন্য দলের ন্যায্য অধিকার স্বীকার করা হত। মাহমুদ এ প্রচলিত নিয়ম পালন করেছেন মাত্র। এটা তাঁর নতুন কিছু আবিষ্কার নয়।

মাহমুদের চরিত্র

আধুনিক সহজলভ্য ইতিহাসে সুলতান মাহমুদের চরিত্রে যে সমস্ত কলঙ্ক আরোপ করা হয়েছে তা অনেকটাই অভিজ্ঞতাপ্রসূত ও স্বপোলকল্পিত মন্তব্য ছাড়া আর কিছুই নয়। সামগ্রিকভাবে তিনি ছিলেন দেহ মনে নানাবিধ গুণের সমাবেশে অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। তাঁর ব্যবহারিক চরিত্র ছিল অত্যন্ত মধুর ও উদার।

একবার এক দরিদ্র হিন্দু প্রজা সম্রাটের কাছে অভিযোগ নিয়ে এলেন, সম্রাটের ভাগ্নে নাকি তাঁর অসহায় স্ত্রীর উপর প্রতি নিয়ত পৈশাচিক অত্যাচার চালায়। সম্রাট তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে নির্দেশ দিলেন এবার যখনই তাঁর ভাগ্নে তার বাড়ীতে যাবে সাথে সাথে তিনি যেন সম্রাটকে তা অবগত করান। তার হাতে একটা কার্ড দিয়ে বলেন এটা দেখালেই যে কোন মুহূর্তেই রাজভৃত্যরা তাকে সরাসরি সম্রাটের কাছে পৌঁছে দেবে। তাই, সেদিন রাতে সম্রাটের ভাগ্নে তাদের বাড়ীতে উপস্থিত হল। হিন্দু প্রজা এ সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল। সে এবার পরখ করবে মুসলমান বাদশাদের ইসলামিক বিচার পদ্ধতি। তৎক্ষণাৎ বাদশাহের কাছে খবর পৌঁছাল বাদশাহ তরবারি হাতে সে দরিদ্র প্রজার বাড়ীতে উপস্থিত হলেন। বাদশাহ এক টিমটিমে আলোয় দেখলেন এক উন্নতমস্তক যুবক ঘরের ভিতর হিংস্র মূর্তিতে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি ইশারায় আলোটি নিভিয়ে দিতে বলে উলঙ্গ তরবারী দিয়ে পিছন দিক থেকে এক চোটে তাকে দ্বিখণ্ডিত করলেন, তারপর গৃহকর্তাকে আলো জ্বালতে নির্দেশ দিয়ে এক গ্লাস পানি চাইলেন। গ্লাসটি বসে তিন নিঃশ্বাসে শেষ করলেন, “ওগো আল্লাহ্, আমি যে তোমার পছন্দনীয় ইসলামের নিয়মানুযায়ী আমার এ হিন্দু প্রচার বিচারের ভার নিজ হস্তে সুসম্পন্ন করতে পারলাম তার জন্য তোমার অশেষ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।” তাঁর হিন্দু প্রজা

তাকে আলো নিভানো ও পানি পান করার কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন আবল্য মেহসিজ্ঞ ভাগ্নের শিরোচ্ছেদের পথে মায়া মমতার কোন বাধা সৃষ্টি না হয় তার জন্যই আলো নিভানোর নির্দেশ। আর আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনার অভিযোগের সুবিচার করতে পারছি ততক্ষণ পানি স্পর্শ করব না। তাই এর মাথা কেটেই পানি পান করতে চেয়েছিলাম কারণ আমি তখন পিপাসায় কাতর ছিলাম। আরও অবাধ হবার কথা এ হতভাগ্য যুবক আমার কোন ভাগ্নে নয়, সামান্য একজন রাজকর্মচারী মাত্র। ইসলামের এহেন বিচার পদ্ধতি দেখে সম্রাটের হিন্দু প্রজা সেদিন আশ্চর্যান্বিত হয়ে হতবাক হয়ে গিয়েছেন।

তিনি নিয়মিত কোরআন পাঠ ও মসজিদে জামাতের সাথে নামায পড়তেন। শাহনামা রচয়িতা কবি সম্রাট ফিরদৌসী, মহা পণ্ডিত আলবিরুণী ঐতিহাসিক উত্বী, দার্শনিক আল-ফারাবী প্রভৃতি মনীষীদের দ্বারা তাঁর রাজসভা অলঙ্কৃত থাকত।

মুহাম্মদ ঘুরী-সুলতান মাহমুদের মৃত্যুর পর একাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে গজনী বংশের অভ্যন্তরীণ সুযোগ নিয়ে ১১৭৩ খ্রিষ্টাব্দে গিয়াসুদ্দিন ঘুরী ও তার ভাই মৈজউদ্দিন ঘুরী ঘুর বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। দ্বাদশ শতাব্দীর চতুর্থ ভাগে মুহাম্মদ ঘুরী তাঁর ভারত অভিযান শুরু করে প্রথমে মুলতান, পেশোয়ার, লাহোর, পাঞ্জাব প্রভৃতি অধিকার করার পর তারাইনের প্রথম যুদ্ধে পৃথিরাজের কাছে পরাজিত হলেও দ্বিতীয় যুদ্ধে ১২৯২ খ্রিষ্টাব্দে পৃথিরাজকে পরাজিত ও নিহত করে উত্তর ভারতে মুসলমানদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেন।

দশম অধ্যায় দাস বংশের প্রতিষ্ঠা

“কুতুবউদ্দিন আইবেক”—কুতুবউদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরীর মৃত্যুর পর ‘দাস বংশ’ নামে এক নতুন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করে ১২০৬ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসন আরোহণ করেন এবং মাত্র চার বছর রাজত্ব পরিচালনার সুযোগ লাভ করে ১২১০ খ্রিষ্টাব্দে ‘চোগান’ খেলায় ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে হঠাৎ মৃত্যুবরণ করেন। অতি অল্প সময়ে এ শাসন ব্যবস্থাতেও তিনি অত্যন্ত সুখ্যাতি লাভ করেন।

সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেক ন্যায় বিচারক ছিলেন। তিনিও হিন্দু মুসলমান সকলকে সমান চোখে দেখতেন। সুলতান কুতুবউদ্দিনের আলেমদের সাথে গাঢ় সম্পর্ক ছিল। তাঁর দরবারে কাজী হামীদুদ্দিন ইসতেকার, আলী বিন আমরুল মাহমুদী, ফকরে মুদাব্বার সদরুদ্দিন, হাসান নিজামী, মাওলানা বাহাউদ্দিন উশী প্রভৃতি সুপণ্ডিত ও জ্ঞানী ব্যক্তির অবস্থান করতেন। তিনি শরীয়ত সম্মত খাজনা আদায় করতে নির্দেশ দেন।

কালঙ্কর, বেনারস, কালপী, দিল্লী, আজমীর, আজাইন এবং বাদাউনির যুদ্ধে তিনি মন্দির ধ্বংস করেছিলেন বলে যে বর্ণনা সচরাচরভাবে পাওয়া যায় তা সত্য হলে তুর্কীয় আক্রমণ উত্তর ভারতে একটি মন্দিরও অবশিষ্ট থাকত না এবং হাজার হাজার মসজিদ হত। কিন্তু বাস্তব অবস্থা অন্য রকম উত্তর ভারতে তখন ১২টি মসজিদও ছিল না, পঞ্চাশেরে সে সময়ে হাজার মন্দির বিদ্যমান ছিল। দু-একটা মন্দির যা ধ্বংস হয়েছে তা কোন ধর্মীয় উদ্দেশ্য অনুযায়ী হয়নি যুদ্ধের হাঙ্গামার ফলেই তা হয়েছে।

(সালাতীনে দেহলীকে মজহাবী রুজহানাত, পৃঃ ৫৮, ৯০-৯৭ দ্রঃ)

ইলতুতমিস

কুতুবউদ্দিনের মৃত্যুর পর তাঁর পর তাঁর পুত্র আরাম শাহকে সুলতান মনোনীত করা হয়। কিন্তু তাঁর অযোগ্যতার ফলে ওমরাহগণের অনুরোধে ইলতুতমিস ১২১১ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসন আরোহণ করেন। তিনি লাহোর, মুলতান, বাদাউন, অযোধ্যা প্রভৃতি অঞ্চলে নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে তাঁর দুই বৃহৎ প্রতিদ্বন্দ্বী তাজউদ্দিন ও নাসিরউদ্দীনকে পরাস্ত করেন। ১২৩০-৩১ খ্রিঃ ইখতিয়ার উদ্দীনকে পরাজিত করে বাংলার সিংহাসন দখল করেন। ১২৩২ খ্রিঃ গোয়ালিয়র তাঁর অধিকারভুক্ত হয়। ১২২৯ খ্রিঃ বাগদাদের খলিফার কাছ থেকে তিনি “সুলতান-উল-হিন্দ” উপাধি লাভ করেন।

ইলতুতমিস নিজের সদ্গুণের দ্বারা ইতিহাসে এক অমর কীর্তি স্থাপন করেন। সমসাময়িক ঐতিহাসিক মিনহাজ-উস-সিরাজ বলেন, “এ রকম ধার্মিক, দয়ালু, আত্মাহু ভক্ত ও বিদ্বানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল সুলতান দিল্লীর সিংহাসনে আর কখনও আরোহণ করেননি।” Never was a sovereign so virtuous, kind hearted and reverent to wards the learned and divines at uppn the throne of Delhi. (Minhaj-us-Siraj)

দিল্লীর কুতুবমিনার ও আজমীরের অপূর্ব সুন্দর মসজিদ তাঁরই স্থপতি বিদ্যার প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগের কথাই ঘোষণা করে। তিনিই সর্ব প্রথম আরবী মুদ্রার প্রবর্তক। ডঃ ঈশ্বরী প্রসাদ ও আরও অনেক ঐতিহাসিকের মতে তিনিই ভারতে দাস বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা।

সুলতান ইলতুতমিস সপ্তাহে তিন দিন, রমযান মাসে প্রত্যেক দিন, জিলহজ্ব এবং মহররম মাসের দশ তারিখে ওলামা সম্প্রদায়দের নিয়ে ওয়াজের সভা করতেন। তিনি পঞ্চীয় নামাযে অভ্যস্ত ছিলেন এবং জানাযার অংশ গ্রহণ করতেন। যুদ্ধক্ষেত্রেও তাঁর জানা নামাযের ব্যবস্থা ছিল এবং ইমাম ও বক্তা প্রত্যেক যুদ্ধে তাঁর সঙ্গী থাকতেন। সুলতান সামশুদ্দিন ইলতুতমিস আনুগত্য এবং ইবাদতে লেগে থাকতেন। জুমআর দিনে মসজিদে যেতেন এবং ফরয ও নফল নামায পড়ার জন্য সেখানে অবস্থান করতেন। সমস্ত রাত্রি জেগে নতশিরে আল্লাহর দরবারে বসে থাকতেন। ইয়রত নিজামুদ্দিন আওলিয়ার (রহঃ) বর্ণনা তিনি রাত জাগতেন কাউকে জাগাতেন না।

(তবকতে আকবরী ১ম খণ্ড ৬৩ পৃঃ ও ‘ফাওয়ায়েদুল ফাওয়াদ’, ২১৩৩ পৃঃ দ্রঃ)

‘সালাতীনে দেহলীকে মজহাবী রুজহানাত’ পুস্তকের ১০৮ পুস্তকের ১০৮ পৃষ্ঠা থেকে জানা যায়, রাতে যখনই কেউ তাঁকে দেখত তখনই দেখতে পেত তিনি দণ্ডায়মান অবস্থায় ইবাদতে নিমগ্ন আছেন। নিজেই পানি আনতেন, অয় করতেন। চাকরদের কখনও জাগাতেন না বরং বলতেন যারা আরাম করছে তাদের কি করে কষ্ট দিই?

গোলাম সরওয়ারে উক্তি—যদিও বাদশাহীর (রাজত্ব) সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল লাক্ষ্যো, অন্তরে তিনি ছিলেন ফকীর এবং ফকীরই তাঁর বন্ধু ছিল।

(খাজিনাতুল আসফিয়া, ১ম খণ্ড, ২৭৬ পৃঃ)

ঐতিহাসিক বারগী বলবনের উক্তি নকল করে বলেছেন, এ রকম বুজর্গ এবং পবিত্র মানুষ তিনি কখনও দেখেননি বা শোনে নি। (‘তারিখি ফিরোজ শাহী’, ৭০ পৃঃ)

ইলতুতমিস নয় দশ বছর বয়সে বোখারার বাজারে বিক্রিত হন। একদিন তাঁর মনিব তাঁকে বাজার থেকে আঙ্গুর কিনে আনতে বলেন। তিনি পথে মুদ্রাটি হারিয়ে ফেলেন। ছোট বালক কাঁদতে থাকলে একজন ফকীর তাঁকে সমস্ত জিজ্ঞেস করে নিজের পকেট থেকে মুদ্রা দিয়ে আঙ্গুর কিনে দেন এবং বলেন, “দেখ, তুমি যখন বাড়লোক হবে তখন ফকীর দরবেশদের সম্মান করবে এবং তাঁদের অধিকারকে স্বীকার করা নিজের অবশ্য কর্তব্য মনে করবে।” এ সামান্য ঘটনা তিনি চির জীবন মনে রেখেছিলেন।

আর একদিন কতকগুলো সঙ্গীসহ উপবিষ্ট খাজা মইনুদ্দিন চিশতীর পাশ দিয়ে রাখাল বালক ইলতুতমিস ধনুক হাতে যাচ্ছিলেন। খাজা সাহেব দেখা মাত্র বলেন, “এ বালকই একদিন দিল্লীর সম্রাট হবে।” চিশতী সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণী সত্যই একদিন বাস্তবে যথার্থ রূপ পরিগ্রহ করেছিল।

সুলতানা রাজিয়া

মুসলমান নারী হিসেবে রাজিয়াই সর্ব প্রথম ১২৩৬ থেকে ৪০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিতা ছিলেন। তাঁর সময়ে চারদিকে বিপদ ও বিদ্রোহ দেখা দিলেও সাহস ও উন্নত কূটবুদ্ধির দ্বারা তিনি শীঘ্র সমস্ত দমন করতে সক্ষম হন। সামসাময়িক ঐতিহাসিক মিনহাজ-উস-সিরাজ বলেন, “লক্ষণাবতী থেকে দেবল এবং দানরীলা পর্যন্ত সমস্ত দেশের তিনি মালিক ছিলেন এবং আমীরগণ তাঁর আনুগত্য ও প্রভুত্ব স্বীকার করে নেয়।” তিনি আরও বলেন “রাজিয়া একজন শ্রেষ্ঠ সুলতানা, জ্ঞানী, ন্যায়বতী, মহানুভবা, বিদ্যোৎসাহিনী, সুবিচারিকা, প্রজাদের রক্ষাত্রী এবং সৈন্য বাহিনীর সুপরিচালিকা রূপে চিত্রিতা হয়েছেন।

সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদ

নাসিরুদ্দিন মাহমুদ বিশ বছর (১২৪৬-৬৬) কাল রাজত্ব করেছিলেন। তিনি একজন অমায়িক, সুবিচারক, উদার, মহানুভূতিশীল, সরল এবং ধার্মিক বাদশাহ ছিলেন। তিনি অবসর সময়ে কুরআন নকল করে বাজারে বিক্রি করতেন। সুলতানের লেখা কুরআন বলে লোকে সীমিতিরিক্ত দাম দিতে পারে মনে করে তিনি নিজের নাম গোপন করতেন। তিনি বিনা অযুতে মুহাম্মদ (সাঃ) এর নাম নিতেন না। একদিন মুহাম্মদ নামে তাঁর এক সেবককে তিনি তা-জুদ্দিন বলে ডাকলেন। নামের বিকৃতি শুনে সুলতান অসন্তুষ্ট হয়েছেন মনে করে সেবকটি কয়েক দিন দরবারে হাজির না হলে বাদশাহ তাকে সমস্ত বুঝিয়ে বলেন যে, এ সময় তাঁর অযু ছিল না।

নাসিরুদ্দিন অত্যন্ত নম্র ও বিনয়ী ছিলেন। একবার তাঁর কুরআন শরীফ পড়া অবস্থাতে এক ব্যক্তি এসে বলেন, ‘এ জায়গাতে ভুল আছে, ওটা কেটেদিন’ নাসিরুদ্দিন ওটাকে কেটে নিয়ে লোকটি চলে গেলে পুনরায় তা লিখে দিলেন। সেবক এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, “এ লোকটির ভুল বলমাটাকে অস্বীকার করলে তিনি মানোক্ষুণ্ণ থেকে। জেনে রাখ মানুষের মনের তুলনায় কাগজের উপর থেকে দাগ মিটিয়ে দেয়া সহজ।” তিনি রাজকোষ থেকে অর্থ নিতেন না। তাঁর স্ত্রী বাঁদী রাখার প্রস্তাব দিলে তিনি তাঁকে এ বলে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন যে, “রাজকোষ খোদার বান্দাদের আমার নয়।”

সুলতান গিয়াস উদ্দিন বলবন

বলবন প্রথম জীবনে মোঙ্গলদের হাতে বন্দী হয়ে বাগদাদের কাজা জালালউদ্দিন বসরীর কাছে বিক্রি হন। ১২৩২ খ্রিষ্টাব্দে অন্যান্য ক্রীতদাসদের সাথে তাঁকে দিল্লী আনা হলে এ দুলাটিকে শামসুদ্দিন ইলতুতমিস ক্রয় বিভিন্ন পদে নিয়োগ করেন। অবশেষে ১২৬৬ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান নাসিরুদ্দিনের মৃত্যুর পর গিয়াসুদ্দিন বলবন উপাধি ধারণ করে ছয় বছর বয়সে সিংহাসন আরোহণ করেন। তিনি নানা স্বাক্ষরসমূহ কাজ করেছিলেন। জায়গীর প্রথার বিলোপ সাধন, মোঙ্গল দুর্ভষ্যদের দমন, বৈদেশিক নীতি

নির্ধারণ, তুঘল খাঁর বিদ্রোহ দমন, ইত্যাদি অনেক কাজ তিনি করেছেন। রাজাকে লিখিত আদ্বাহর প্রতিনিধি মনে করে চারটি প্রধান কর্তব্য পালনের উপর তাঁর পারলৌকিক মুক্তি নির্ভর করে বলে জানতেন। যথা-(১) ধর্ম রক্ষা করা এবং শরীয়তের শাসনকে কার্যকরী করা; (২) দুর্নীতি এবং পাপ কার্য নিবারণ করা; (৩) ধার্মিক এবং সম্ভ্রান্ত লোকদের রাজকার্যে নিযুক্ত করা; (৪) সুবিচার এবং সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা করা।

সুলতান বলবনের রাজত্ব শুধু ভারতেই নয়, ইসলামী জগতের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। তাতারীরা মুসলিম রাজ্য আক্রমণ করলে তিনি কেবল নিজের রাজ্যই রক্ষা করেননি হাজার হাজার হতভাগ্যকে আশ্রয় দিয়েছিলেন।

বলবনের চরিত্র-তিনি প্রথম জীবনে কিছুটা মদপায়ী ও আরাম প্রিয় হলেও সিংহাসনে আরোহণের পর তাঁর জীবনে সামগ্রিকভাবে এক বিরাট পরিবর্তন সূচিত হয়। সমস্ত অবৈধ জিনিস থেকে তিনি সর্বদা দূরে থাকতেন। মদপান থেকে কঠোর তওবা করেন, এমন কি মদপায়ী ব্যক্তিদের নামোচ্চারণ করতেও তিনি ঘৃণাবোধ করতেন। তিনি নিজে দৈনন্দিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাতের সাথে আদায় করতেন এবং সম্মানদেরও তাগিদ করতেন। ফযরের নামাযের পরিবর্তে শুয়ে থাকলে অথবা জামাতের সাথে নামায আদায় না করলে তিনি তাদের সাথে এক মাস পর্যন্ত ঝাঝালাপ করতেন না। কোন মসজিদে ওয়াজের খবর পেলে তৎক্ষণাৎ গিয়ে সাধারণ মানুষের মত বসে যেতেন। তিনি সর্বদা অযু অবস্থায় থাকার চেষ্টা করতেন এবং সাধারণত ইবাদত করতেন। তিনি জানাযায় অংশ গ্রহণ করতেন। জুমআর নামাযের পর তিনি কবর বিয়ারত করতেন। (তারিখি ফিরোজশাহী ৪৬-৪৭ পৃঃ ৫৪)

জন্মের থেকে ফিরে আসার সময় হিন্দু মুসলিম সকলে মিলে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাত। তিনি প্রজাদের সার্বিক সুখ স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করেছিলেন। শেখ হামীদুদ্দিন সাওয়ালী (রহঃ) এবং শেখ নিজামুদ্দিন আওলিয়া (রহঃ) নামের সাথে রহমাতুল্লাহি আলাইতে বলতেন। এর দ্বারা তাঁর যথেষ্ট বুজুর্গীর পরিচয়া পাওয়া যায়।

(তারিখি ফিরোজশাহী ৫৪)

কায়কোবাদ

মুহাম্মদের মৃত্যুর পর বলবন তাঁর দ্বিতীয় পুত্র বুগরাখাঁনকে রাজ্যের গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করতে বললে তিনি তা অস্বীকার করায় অভিজাত সম্প্রদায় বলবনের মৃত্যুর পর বুগরাখাঁনের পুত্র কায়কোবাদকে ১২৮৭ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে বসান। তিনি সর্বমোট দু বছর রাজত্ব করেছিলেন।

সুলতান মোয়েজুদ্দিন কায়কোবাদ নামায রোযা করতেন না। তিনি শরাবখোর ও আরাম প্রিয় ছিলেন। একদিন এক ব্যক্তি তাঁর পিতৃহত্যা কায়কোবাদকে সতর্কভাবে জ্ঞাপিয়ে দারুণ আহত করে যমুনায় ফেলে দেয়। এমনি নৃশংস ও অমর্যাদার সাথেই তাঁর মৃত্যু হয়। (সালাতীনে দেহলীকে মজহবী রুজহাতান ৫ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)

পাঠক-পাঠিকাৰ্গকে এখানে স্বধর্মের আদর্শ বিচ্যুতির শোচনীয় পরিণাম দর্শন করতে অনুরোধ করি।

একাদশ অধ্যায়

খলজী বংশের উত্থান-পতন

খলজী বংশের আদি পরিচয় সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতরোধ রয়েছে। সাম্প্রতিক গবেষণার ফলে খলজী বংশকে তুর্কীজাতি সম্বৃত বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু সুদীর্ঘকাল আফগানিস্তানে বসবাসের ফলে তাঁরা আফগান জাতির সকল প্রকার বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করেছিলেন বলে জিয়াউদ্দিন বারানী ও অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ ভুলবশতঃ তাঁদের আফগানিস্তানের অধিবাসী বলে বর্ণনা করেছেন।

সুলতান জালালুদ্দিন খলজী-কায়কোবাদের মৃত্যুর পর ওমরাহ এবং খলজীদের মধ্যে সিংহাসন কেন্দ্রিক ঝগড়াতে খলজীদের জয় হয়। অবশেষে জালালুদ্দিন খলজী ১২৯০ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ জুন ৭০ বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেই দৌলতখানায় প্রবেশ করে দু রাকাত শুকরানা নামায পড়লেন।

(সালাতীনে দেহলীকে মজহবী রুজহানাত, ১৯৬, পৃঃ ৮৯)

১২৯২ খ্রিষ্টাব্দে হালাকুর নাতি আবদুল্লাহ ভারত আক্রমণ করলে জালালুদ্দিন তাঁর মোকাবিলা করেন। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই জালালুদ্দিনকে পিতা বলে সম্বোধন করতে থাকলে উভয়ের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপিত হয়। এরপর চেঙ্গিস খাঁর এক নাতি 'আলাও' সদল বলে মুসলমান হয়ে ভারতের ইতিহাসে 'নব মুসলমান' (New Massaalman) নামে খ্যাতি লাভ করেন। জালালুদ্দিন শরিয়তের খুব পাবন্দ ছিলেন। তিনি নামায রোযার প্রতি অত্যধিক যত্নবান ছিলেন, এমন কি রোজাবস্থাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। রমযান মাসে ভাইপো এবং জামাই আলাউদ্দিনের সাথে কাটরা যান। ইফতারের সময় ঘনিয়ে এসেছে, তিনি সবেমাত্র কুরআন পড়ে উঠেছেন এমন সময় হঠাৎ নুসরত খানের ইঙ্গিতে মহম্মদ সেলিম তাঁকে আক্রমণ করেন। অতপর তাঁকে শহীদ করা হয়। মৃত্যুর সময় তিনি কালেমা শাহাদত পড়েছিলেন।

সুলতান আলাউদ্দিন খলজী

জালালুদ্দিনের মৃত্যুর পর ১২৯৬ খ্রিষ্টাব্দে নানা বিপদকে সঙ্গী করে আলাউদ্দিন খলজী দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। একদিকে জালালী প্রধানগণ বৃদ্ধ সুলতানের মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণে সচেষ্ট অপর দিকে রাজমাতা মালিকা জাহানের চক্রান্তে রুকনুদ্দিন ও ইব্রাহিমের সিংহাসন লাভ, তদুপরি উপর্যুপরি মোঙ্গলদের আক্রমণ।

বহুত ভারতবাসী সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রথম পথ প্রদর্শনই আলাউদ্দিনের সর্বপ্রধান কীর্তি। আলাউদ্দিনের সাম্রাজ্য বিস্তার নীতিকে উত্তর ভারত ও দাক্ষিণাত্য এ দুভাগে ভাগ করা যায়। ১২৯৭ খ্রিষ্টাব্দে গুজরাট ১৩০১ খ্রিষ্টাব্দে রণথম্বোর, ১৩০৩ খ্রিষ্টাব্দে থেকোর ও ১৩০৫ খ্রিষ্টাব্দে মালব আলাউদ্দিনের সাম্রাজ্য ভুক্ত হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য থেকোর প্রসঙ্গে আলাউদ্দিন পদ্মিনীর যে উপাখ্যান বহুল প্রচলিত আছে তার মূলে কোন ঐতিহাসিক সত্যতা নেই। সেনাপতি মালিক কাফুরের সহায়তায় দাক্ষিণাত্য বিজয়াভিযানে আলাউদ্দিন একে একে দেবগিরি, বরঙ্গল, মাদুরা প্রভৃতি নিজ অধিকারভুক্ত করে রামেশ্বর সেতুবন্ধ পর্যন্ত মুসলিম প্রভুত্বের প্রতিষ্ঠা করে ১৩১৬ খ্রিষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।

আলাউদ্দিনের শাসন ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য কীর্তি হল মোটামুটি এরূপ : তিনি সামরিক বিভাগের সংস্কার সাধন করে সৈন্যদের বেতন নির্ধারণ করেন, জিনিস পত্রের দর বেঁধে দেন, মদপান কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেন, দেশের বিভিন্ন স্থানের খবরা-খবর আনয়নের জন্য গুপ্তচর নিয়োগ করেন, আমীর ওমরাহদের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ সুলতানের অনুমতি ব্যতীত নিষিদ্ধ করেন ইত্যাদি।

মোঘল কুলগৌরব রবি আলমগীরের কথা বাদ দিলে তাঁর পূর্বে কোন মুসলমান সম্রাট এত বড় বিশাল রাজ্যের শাসক ছিলেন না। তাঁর ব্যক্তিগত চারিত্রিক কলঙ্কের কথা ব্যতিরেকে শাসনগত যোগ্যতা ও কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। ধর্ম সম্বন্ধে বেপরোয়া মনোভাব, স্বার্থপরতা, পাপ-প্রবণতা, কুটনীতির নামে প্রতারণার সুক্ষ কৌশল তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্রে মসিলিপ্ত করেছিল। বলাবাহুল্য, আলাউদ্দিনের এরূপ ধর্মদ্রোহীতাই পরবর্তী যুগে তাঁর উত্তরাধিকারীগণের অনুপযুক্ততা ও মালিক কাফুরের ক্ষমতা লাভের ফলে খলজী বংশের পতনের অন্যতম কারণ।

তবে ডাঃ ঈশ্বরী প্রসাদ লিখেছেন, “আলাউদ্দিন হিন্দুদের উপর অত্যাচার উৎপীড়ন করেছিলেন বলে যে তথ্যটি প্রচারিত তা সত্য নয়।”

(Medieval India, Ishari Prasad, P-208)

মুরল্যাও এবং প্রফেসর হাবীব লিখেছেন, “বারানী যেখানে ‘হিন্দু’ শব্দ ব্যবহার করেছেন তাঁর উদ্দেশ্য হল যুত, মুকাদাম, চৌধুরী ইত্যাদি। এরা ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী। সুতরাং রাজনীতির প্রয়োজনে তাদেরকে শক্তিহীন করার প্রয়োজন ছিল।” (Agrarian system during the Muslim Rule in India by moreland, P-225 & An introduction to the study of Madieval India, by Prof: Habib, P--5, Aligarh University magazine) যুত, মুকাদাম, চৌধুরীকে এবং হিন্দুদেরকে তিনি ধর্মের কারণে নিধন করেন নি। ডাঃ ত্রিপাঠী লিখেছেন, “তিনি মুসলমানদেরকেও ছাড়েন নি; অতএব হিন্দুদেরকেও কিভাবে ছাড়া সম্ভব?” (Some Aspects of Muslim Administration, by Dr. Tripathi, P-258)

বারণী

জনাব জিয়াউদ্দিন বারণী খলজী যুগের আমলে ঐতিহাসিক। তাঁর “তারিখি ফিরোজশাহী” এক অমর ঐতিহাসিক সৃষ্টি। গ্রন্থটি থেকে সমসাময়িক বাদশাহদের জীবনবৃত্তান্ত ও বহু ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। একালের ঐতিহাসিকরা তাঁর এ গ্রন্থ থেকে বহু তথ্য সংগ্রহ করে তাঁর সত্যনিষ্ঠা ও বিচারবোধের প্রশংসা করেছেন।

আমীর খসরু

উর্দু সাধিকের জনক মহাকবি খসরু ছিলেন তাপস শ্রেষ্ঠ খাজা নিজামুদ্দিন আউলিয়ার সর্ব প্রিয় শিষ্য। তাঁর আসল নাম আবুল হাসান। তিনি ১২৫৩ খ্রিঃ জন্মে ১৩২৫ খ্রিঃ দিল্লীতে মারা যান। অতি অল্প বয়স থেকেই তিনি কবিতা লিখতেন। একবার বলবন পত্র বুগরাখানের সৌজন্যে অনুষ্ঠিত কবিদের সভায় তাঁর স্বরচিত কাব্য শুনিতে এক থালা মোহর পেয়েছিলেন।

পীর শ্রেষ্ঠ নিজামউদ্দিন (রহঃ)

আমীরকে অত্যধিক ভালবাসতেন। তাই মণীষী তাঁর শেষ জীবনের প্রার্থনা শিষ্যদের কাছে ব্যক্ত করেছিলেন—“আমীরকে দেখছি না কেন? আমার ডাক এসেছে যেতে হবে। যদি আল্লাহ তায়ালা বলেন, পৃথিবী থেকে কি এনেছি আমার জন্য?” তখন বলব, “পৃথিবী ঘুরে তোমার জন্য এনেছি এক সুমহান কবি যার হৃদয় ফুলের মত সুন্দর, নাম তার আমীর খসরু।” নিজামুদ্দিন (রহঃ) এর মৃত্যু সংবাদ শুনে শিশুর মন কাঁদতে কাঁদতে কবি ছুটে এলেন বাংলাদেশ থেকে দিল্লীতে। তারপর দিবানিশি কবরের পাশে কাঁদতে কাঁদতে প্রাণ বিসর্জন করলেন ‘ভারতের তোতা পাখী’ নামে খ্যাত দিল্লী তথা সারা ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলমান কবি ঐতিহাসিক আমীর খসরু।

দ্বাদশ অধ্যায়

তুঘলক বংশের আবির্ভাব

গিয়াসুদ্দিন তুঘলক

দোর্দণ্ড পতাপশালী সম্রাট আলাউদ্দিন খলজীর মৃত্যুর পর তাঁর বংশধরদের মধ্যে সিংহাসন কেন্দ্রিক কোন্দল, চক্রান্ত ও হত্যাকাণ্ডে দেশে অশান্তি দেখা দিলে আমীর ওমরাদের আবেদনে উত্তর পশ্চিম সীমান্তের দীপরপুরের শাসক গাজী মালিক ‘গিয়াসুদ্দিন তুঘলক’ নাম ধারণ করে ১৩২০ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়ে ‘তুঘলক বংশ’ নামে এক নতুন রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। ১২২৩ খ্রিষ্টাব্দে তেলঙ্গানার কাকতীয়রাজ প্রতাপ রুদ্রের বিরুদ্ধে অভিযান তাঁর প্রধান কীর্তি। ১৩২৫ খ্রিষ্টাব্দে এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়।

তিনি সুশাসক এবং আল্লাহ ভক্ত ছিলেন। জিয়াউদ্দিন বারণী লিখেছেন, “পাঁচ ওয়াক্তের নামায তিনি জামাতের সাথে আদায় করতেন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত এশার নামায না পড়তেন ততক্ষণ হেরেমে প্রবেশ করতেন না। (তারিখি ফিরোজ শাহী, ৪৪৩ পৃঃ)। জুমআ এবং দুই ঈদের নামায তাঁর কখনও ছুটে যেত না। রমযান মাসে রীতিমত জারাবীহ পড়তেন এবং রোযা রাখতেন। অধিকাংশ সময় অযু অবস্থায় থাকতেন এবং সারারাত ইবাদতে নিমগ্ন থাকতেন (তবকাত আকবরী ১ম খণ্ড দ্রষ্টব্য)। শরীয়ত অনুযায়ী শাসন করার ফলে কাজী, মুফতি প্রভৃতিদের সম্মান যথেষ্ট বেড়ে গিয়েছিল (তারিখি ফিরোজশাহী, ৪৪১ পৃঃ)। তিনি নিজেও মদ খেতেন না আর জনসাধারণকেও মদ খাওয়া থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করতেন।

মুহাম্মদ বিন তুঘলক

গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র জুনা খাঁ ‘মুহাম্মদ বিন তুঘলক’ নাম দিয়ে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তাঁর রাজত্বকাল ছিল ১৩২৫ থেকে ১৩৩৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত।

সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক ছিলেন ভারতের ইতিহাসে এক অতি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন বাদশাহ। ধর্মের দিক দিয়ে তিনি যেমন স্বচ্ছ জ্ঞানের অনুসারী ছিলেন তেমনি রাজনীতিতে বৈপ্লবিক চিন্তাধারায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর সম্পূর্ণ কুরআন মুখস্থ ছিল এবং পূর্ব উল্লিখিত ‘হিদায়া’র মত ফিকহ শাস্ত্রের কঠিন গ্রন্থও কণ্ঠস্থ ছিল (মাসালিকুল আবসার, পৃঃ ৭ দ্রঃ)। তিনি উপদেশ দিতে গিয়ে কুরআনের বাণী উদ্ধৃত করতেন। বারণী লিখেছেন, যখন শব্দ তাঁর কানে যেত তিনি লাফিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন। ফযরের নামায পড়ার পর অধিক সময় পর্যন্ত অন্যান্য অজিফা পড়তেন

(ভারিখি ফিরোজশাহী ৫০৬ পৃঃ দ্রঃ)। ঐতিহাসিক ফিরিস্তা সুলতানের নফল এবং মুস্তাহাবে আম্রহের বর্ণনা দিয়েছেন (ভারিখি ফিরোজশাহী এবং মাসাশার রহিমী ১ম খণ্ড ৩৪৫ পৃঃ দ্রঃ)। তিনি শুধুমাত্র রমযান মাসে নয় অসুস্থ অবস্থাতে এবং গ্রীষ্মের দারুণ ক্রান্তিতেও মহররম মাসের দশ তারিখে রোযা রাখতেন। ছোট খাটো ব্যাপারেও ধর্মের অনুশাসন মেনে চলতেন। শরীয়তসম্মত ভাবে জবেহ করা হয়নি বলে মনে হলে সে পশুর মাংস খেতেন না (আজায়েবুল আসফার,, ১৭৬ পৃঃ দ্রঃ)। শায়খ আবদুল হক মোহাম্মদে দেহলবীর বর্ণনা থেকে জানা যায় সিংহাসনে বসার পর তিনি কোন উপাধি ধারণ করেন নি। মুহাম্মদ নামই তাঁর কাছে মানব সন্তানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নাম হিসেবে বিবেচিত। তবে তিনি নিজেকে 'মুহীযে সুনানা খতামান্নাবিইন, অর্থাৎ শেষ নবীর সুন্নাতকে জীবিতকারক বলে অভিহিত করতেন। ঐতিহাসিক বা... লিখেছেন, ব্যভিচার ইত্যাদি অবৈধ কাজের দিকে তিনি নজর দিতেন না, অপ্রয়োজনীয়, অশ্লীল এবং কুৎসিত দ্রব্য থেকে যতদূর সম্ভব নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতেন। হেরেমে প্রবেশের সময় না মোহরেম (যাদেরকে বিবাহ করা অবৈধ) মেয়েরা তাঁকে দেখে পর্দা করত এবং তিনিও তাদের প্রতি দৃষ্টি দেয়া অত্যন্ত দোষের জ্ঞান করতেন (ভারিখি ফিরোজশাহী ৫০৬ পৃঃ দ্রঃ)।

তিনি তাঁর মাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন, তাঁর কোন আদেশেরই তিনি বিরোধিতা করতেন না। তিনি মদের ঘোর শত্রু ছিলেন। মদপানের অপরাধে একজন আমীরের তিনি সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছিলেন। শাহাবুদ্দিন আল আমরী শিবলী বলেন, সে সময় দিল্লীতে প্রকাশ্যে মদ পাওয়া যেত না। তিনি মসজিদে জামাতের সাথে নামায পড়ার জন্য খুব জোর দিতেন। ইবনে বতুতা লিখেছেন, বাদশাহ মুসলমানদের নামাযের ব্যাপারে খুব জোর তাকিদ দিতেন। জামাতের সাথে নামায না পড়ার অপরাধে তিনি তাঁর একজন নিকট আত্মীয়কেও কঠোর শাস্তি প্রদান করেন। ভারতে ইনিই প্রথম বাদশাহ তিনি শাসন ব্যবস্থায় নামাযকে অঙ্গীভূত করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত নাচ-গান করা মেয়েরাও নামাযে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক তবলীগের সমর্থক ছিলেন এবং সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিতও ছিলেন। সে যুগে তিনি সতীদাহ প্রথা তুলে দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু হিন্দু ধর্মে বিরোধিতা বা হস্তক্ষেপ হবে বলে বিরত থাকেন।

মুহাম্মদ বিন তুঘলকের মস্তিষ্ক বিকৃতি না ঐতিহাসিকদের হৃদয় বিকৃতি

মুহাম্মদ বিন তুঘলক ছিলেন সর্ব গুণের সমন্বয়ে এক অদৃশ্যপূর্ব ব্যক্তিত্ব, অতুলনীয় আল্লাহভক্ত এবং নিরলস সংগ্রামী বাদশাহ। অতএব এহেন এক মধুর চরিত্র সম্রাটের ঘাড়ে 'পাগল', 'বিকৃত মস্তিষ্ক' আর 'রক্ত লোলুপ' এর স্ট্যাম্প না লাগালে ঐতিহাসিক হওয়া যাবে না অথবা প্রভুভক্ত ভারত প্রেমিক হওয়া সম্ভব হবে না। তাই তাঁকেও দুর্নামের শিকার থেকে হয়েছে। কারণ একথা প্রকাশ্যে দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট যে, ভারতীয় মুসলামন বংশধররা যেদিন থেকে তাঁরা ইসলামের ছায়াবলম্বনে গঠিত হবে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর আদর্শে আদর্শবান হবে, উন্নত-আদর্শ রাজা বাদশাদের চরিত্র

মাধুর্যের রঙে রঙিত হবে সেদিনই ভারতে প্রভু ইংরেজদের লোটা কমল কাঁধে নিয়ে এ ভারত ভূমি ছেড়ে সুদূর পশ্চিমী দেশে পাড়ি দিতে হবে। আর ইংরেজ প্রভু ও তাঁদের পোষ্য পুত্রের দল প্রায় সমস্ত আদর্শ মুসলিম রাজা বাদশাদের চরিত্রেই কলঙ্কের বিষাক্ত ইনজেকশন প্রয়োগ করেছেন, এমনকি অনেক স্থানে পবিত্র ইসলামের উপরও নির্মম আঘাত হেনেছেন। প্রধানতঃ চারটি কারণে মুহাম্মদ বিন তুঘলককে ইতিহাসে পাগল, নিষ্ঠুর এবং খামখেয়ালী অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়ে থাকে। কারণগুলো এরূপ—(১) রাজ্য জয়ের পরিকল্পনা, (২) রাজধানী দেবগিরিতে স্থানান্তরকরণ, (৩) দোরাব এলাকায় করভার স্থাপন ও (৪) তাম্র মুদ্রার প্রচলন। এবার কারণগুলোর যথার্থতা ও যৌক্তিকতা নিয়ে কিছু আলোচনা করা যাক।

১। ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারণী লিখেছেন, খোরাসান অভিযানের উদ্দেশ্যে মুহাম্মদ বিন তুঘলক ৩৭০.০০০ সৈন্য সংগ্রহ করে অবশেষে এ পরিকল্পনা পরিত্যাগ করেন। এতে তাঁর বাস্তব জ্ঞানের অভাব ও অদূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। উল্লেখ করা যেতে পারে বারণী সাহেবের লেখা পক্ষপাত দোষে দুষ্ট। কারণ তিনি তাঁর রচনায় খোরাসান জয়ের পরিকল্পনা কেন ত্যাগ করা হয়েছিল তা বলেন নি। তবে সে তথ্য আমাদের হাতে মৌজুদ। পারস্য ও মিশরের মধ্যে মনোমালিন্যের পরিশ্রেক্ষিতেই এ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল কিন্তু পরবর্তী সময়ে পারস্যের আবু সৈয়দ ও মিশরের আন-নাসিরের মধ্যে হৃদযাতা গড়ে ওঠে। এখন বাধ্য হয়েই মুহাম্মদ বিন তুঘলক তাঁর পরিকল্পনা পরিত্যাগ করেন। অতএব এক্ষেত্রে তাঁর জ্ঞানের অভাব বা অদূরদর্শিতার পরিচয় তো পাওয়া যায়ই না বরং তাঁর শান্তিকামী মনের পরিচয় ফুটে ওঠে এবং দেশে ক্ষতির পরিবর্তে যে বিরাট লাভ হয়েছিল তা হচ্ছে এটাই যে, যুদ্ধে অনাভিজ্ঞ প্রজাবৃন্দের বিরাট একটা অংশ যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী হয়েছিল যা আধুনিক যুদ্ধ বিজ্ঞানীদের মতে এক উল্লেখযোগ্য অবদান।

এছাড়া বারণী তাঁর রচনায় মুহাম্মদ বিন তুঘলকের চীন অভিযানের মিথ্যা কল্পনাপোলকল্পিত ঘটনাকে স্থান দিয়ে ইতিহাসকে দূষিত করেছেন। বাস্তবিকপক্ষে মুহাম্মদ বিন তুঘলক চীন অভিযান তো করেনই নি, চীন অভিযানের কল্পনাও তাঁর মস্তিষ্কে স্থান লাভ করেনি কোনও দিন। অবশ্য চীন ও ভারতের সীমানাবর্তী কারাচল বা কুর্মাচলে তিনি বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন কিন্তু তার পশ্চাতেও যথেষ্ট বাস্তব যুক্তি রয়েছে। উদ্ধৃত পার্বত্য সর্দারকে আয়ত্তাধীনে আনার জন্যই তাঁর এ অভিযান, শুধু তাই নয় এ অভিযানের ফলস্বরূপ কারাচলের রাজা সুলতানের বশ্যতা স্বীকার করতেও বাধ্য হন।

(২) দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুহাম্মদ বিন তুঘলকের ন্যায় এক অভিজ্ঞ, দূরদর্শী ও অসাধারণ প্রতিভা সম্পন্ন ব্যক্তিত্বে যেভাবে কলঙ্কের মসিলেপন করা হয়েছে তাতে ঐতিহাসিকরা নিরপেক্ষতা ও দূরদর্শীতার পরিচয় দিতে পারেন নি। রাজধানী পরিবর্তনের ব্যাপারে ঐতিহাসিক ইবনে বতুতা যেভাবে কল্পনার তুলি দিয়ে চমকপ্রদ উপন্যাস সৃষ্টি করেছেন তাতে সত্যতার লেশমাত্র নেই। তিনি বলেছেন 'দিল্লীর লোদিগকে শাস্তি দেয়ার উদ্দেশ্যেই তিনি দাক্ষিণাত্যে

তার রাজধানী স্থাপন করেছিলেন।' কিন্তু এ উক্তি ভিত্তিহীন এবং প্রকৃতপক্ষে সত্যের অপলাপ। ঐতিহাসিক বারগীও অনুরূপ ঔপন্যাসিক কৃতিত্বের পরিচয় দিতে ভুলেননি। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে এটাই যে—

পিতার শাসনকালে বরঙ্গল অভিযানে নিযুক্ত থাকার সময় মহম্মদ বিন তুঘলক দাক্ষিণাত্যের বিপজ্জনক সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। তাই সিংহাসন লাভের পরেই এ সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে তিনি দেবগিরিতে দৌলতাবাদ নামক একটি রাজধানী স্থাপন করতে প্রয়াসী হলেন। কেননা দেবগিরি ছিল সাম্রাজ্যের অপেক্ষাকৃত মধ্যবর্তী এবং দাক্ষিণাত্যের শাসন প্রণালী পর্যবেক্ষণ করার অধিকতর নিকটবর্তী স্থান। সুদূর দিল্লীতে অবস্থান করে বৃহৎ সাম্রাজ্যের অধিপতি সুলতানের পক্ষে সমগ্র দেশ পরিচালনা করা এক প্রকার অসম্ভব ছিল। তাছাড়া দিল্লী ভারত সীমান্তের নিকটবর্তী হওয়ায় মোঙ্গল আক্রমণের লক্ষ বস্তুতে পরিণত হয়েছিল। এসব নানা কারণে সুলতানের নতুন রাজধানী স্থাপনের নিছক পাগলামী বলে উড়িয়ে দেয়া চলেনা বরং এর পশ্চাতে তাঁর যোগ্য শাসন ক্ষমতা ও দূরদর্শী মনের কৃতিত্ব লুকিয়ে রয়েছে।

মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজধানী স্থানান্তরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বর্তমান গতানুগতিক ইতিহাসে পাওয়া যায়—তিনি নাকি জোর করে সমস্ত দিল্লীবাসীদের শিশু-সন্তানসহ ৭০০ মাইল পথ অতিক্রম করে দৌলতাবাদে যেতে বাধ্য করেছিলেন এবং অপারগ অনেক শিশু, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা নানা কষ্টে পথে মৃত্যুবরণ করে। ইবনে বতুতার বর্ণনায়, “দিল্লী নগরী তখন মরুভূমিতে পরিণত হয়েছিল।” তিনি আরও বলেন, “এক পশু ব্যক্তিকে পথে নিক্ষেপ করা হয় এবং একজন অন্ধকে দিল্লী থেকে দৌলতাবাদে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়।”

কিন্তু এ সমস্ত উক্তি প্রকৃত সত্যের বিপরীত। ১৩২৭ এবং ১৩২৮ খ্রিষ্টাব্দে দুটি সংস্কৃত অনুশীলন লিপি থেকে জানা যায়, সুলতান সাধারণ প্রজাবর্গ অথবা হিন্দুদের রাজধানী ত্যাগ করতে আদেশ দেন নি। প্রকৃত ঘটনার বেশ কয়েক বছর পরে ইবনে বতুতা ভারতবর্ষে এসে হাঁটুরে গল্পের ভিত্তিতে তিনি তাঁর মত প্রকাশ করে গেছেন। দিল্লী যে কখনও জন পরিত্যক্ত ছিল না অথবা কোনও দিন তার রাজধানীর মর্যাদা হারায় নি, এ অমোঘ ঐতিহাসিক সত্য সমীক্ষাই তাঁর উক্তির অসারতা ও অযৌক্তিকতা প্রমাণ করে। তাছাড়া ইবনে বতুতার উক্তি সঠিক হলে ১৩৩২৯ খ্রিষ্টাব্দে মুলতানে যে বিদ্রোহ ঘোষিত হয়েছিল তার বিরুদ্ধে এক বিরাট ও শক্তিশালী সৈন্য গঠন করা এ জন শূন্য দিল্লী থেকেই সুলতানের পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব ছিল না।

সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা হচ্ছে এটাই যে, রাজধানী পরিবর্তনের যে কথাটা জোরেসোরে প্রচার করা হয়েছে সেটা আসলেই সঠিক নয়। তিনি রাজধানী পরিবর্তন করেন নি তবে শাসন কার্যের সুবিধার জন্য দৌলতাবাদকে সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানীতে পরিণত করতে চেয়েছিলেন মাত্র। আর দিল্লীবাসীকে দেবগিরি প্রেরণের পশ্চাতে আসল তথ্য হচ্ছে এটাই যে, দাক্ষিণাত্যের মুসলমানেরা সে সময় ধর্ম বিমুখ

হয়ে অত্যাচারী গোষ্ঠিতে পরিণত হয়েছিল, তাই তাদেরকে ইসলামের আলো দেখানোর জন্য দিল্লী থেকে শুধুমাত্র একদল মুসলমানকেই দেবগিরি পাঠানো হয়েছিল। তাছাড়া আরও অন্যান্য অঞ্চলে তিনি ইসলাম প্রচারক দল পাঠিয়ে ছিলেন। বিখ্যাত আলেম শামসুদ্দিন ইয়াহুইয়াকে ডেকে বলেছিলেন, “আপনি এখানে বসে কি করছেন? কাশ্মীরে যান এবং আল্লাহর সৃষ্টিকে স্রষ্টার দিকে ডাক দিন।” তাই মনে হয় প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অভাবে বতুতা সাহেব কিংবদন্তীর ভিত্তিতেই এ সমস্ত উপাদানগুলোকে বিকৃত ইতিহাসে স্থান দিতে গিয়ে তালগোল পাকিয়ে বসেছেন।

তবে একথাও সঠিক যে ঐতিহাসিকরা কোন নবী, পয়গাম্বর বা অবতার নন। তাঁরও রক্ত মাংসের মানুষ। অতএব ভুল-ত্রুটি তাঁদের কিছু কিছু থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক বা অসম্ভব নয়। ঐতিহাসিক বারগী বা ইবনে বতুতার ক্ষেত্রেও এ সত্য প্রযোজ্য।

তাছাড়া ইবনে বতুতা ১৩৩৩ খ্রিষ্টাব্দে ভারতবর্ষে এসে প্রায় আট বছর কাল ধরে মুহম্মদ বিন তুঘলক কর্তৃক দিল্লীর প্রধান কাজীর বিচারক পদে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু এমন এক অমার্জনীয় অপরাধ তাঁর দ্বারা হয়ে যায় এবং তার বিচার সুলতানকেই করতে হয় এবং তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয়। কারারুদ্ধির পর যদিও তিনি সুলতানের প্রতি ক্ষমা চেয়েছিলেন তথাপি শাস্তির কথা ভুলতে পারেন নি। তাই তাঁর পুস্তকে সুলতানের প্রতি কিছুটা ঘৃণা ও অবজ্ঞাকে তিনি শত চেষ্টা করেও বোধ হয় চাপা দিতে পারেন নি। দ্বিতীয়তঃ অপরাধের পর্যটকদের ন্যায় তিনিও ঘটনার সাথে গল্পের মিশ্রণ ঘটিয়েছেন এবং অলীক জনশ্রুতিকেই অধিক প্রাধান্য দান করেছেন। অবশ্য এর জন্য তাঁকে আমরা সম্পূর্ণ রূপে দায়ী করতে পারি না। কারণ অধিকাংশ ঘটনা তিনি প্রত্যক্ষ দেখার সুযোগ পান নি। তাই প্রায় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তাঁকে জনশ্রুতির উপর নির্ভর করতে হয়েছে। তবে জনতার দলের চরিত্র নিরীক্ষণ না করার অপরাধকে অস্বীকার করা যায় না।

তবুও আমরা দ্বিধামুক্ত চিন্তে একথা বলতে পারি যে, তাঁর রচনায় সে যুগের অনেক মূল্যবান সংবাদ বা তথ্য ইতিহাস সত্তারকে পরিপূর্ণতা দান করেছে।

মুহাম্মদ বিন তুঘলকের শাসনামলে এ দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হয়েছিল তা অনাবৃষ্টির কারণে স্বাভাবিক ভাবেই দোয়াববাসীদের ভাগ্যে দুর্ভাগ্য নেমে এসেছিল। মুহাম্মদ বিন তুঘলক এর জন্য দায়ী নন।

নিরপরাধ মুহম্মদ বিন তুঘলকের চরিত্রে নিষ্ঠুরতার আর এক অপবাদের অলেখ্য আঁকন করা হয়েছে। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, দোয়াবে সুলতান দশ থেকে বিশগুণ কর বৃদ্ধি করে রায়ত শ্রেণীকে ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য করেন এবং কৃষক শ্রেণীর উপর নিষ্ঠুর অত্যাচারের স্টীমরোলার চালিয়ে গেছেন। বলা যেতে পারে প্রবাদ বাক্যের মত এ মতকেই সাদরে গ্রহণ করে ইউরোপীয় ঐতিহাসিকরা তাতে আরও কল্পনার রং চড়িয়ে প্রকৃত ইতিহাসকে হজম করে ফেলেছেন। কিন্তু জানিয়ে রাখা ভাল যে, জিয়াউদ্দিন বারগী কদাচ সুলতানের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না; তাছাড়া তাঁর

ইতিহাসের ঘটনাবিন্যাসও ধারাবাহিকভাবে নয়। যখন যে শোনা ঘটনা তাঁর কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করেছে তখন সেটাকেই তিনি অগ্রে স্থান দিয়েছেন। ফলে তাঁর বর্ণনায় মুহম্মদ বিন তুঘলকের সমস্ত কায়কলাপই কার্যকর নীতি বিবর্জিত এক পাগলামী ক্রিয়াকাণ্ড বলে মনে হয়েছে।

খলজী বংশের পতনের পর আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলার কারণে দোয়াব অঞ্চল থেকে কর আদায়ের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। তাই মুহম্মদ বিন তুঘলক আলাউদ্দিন খলজী অপেক্ষাও কম হারে পূর্ব আরোপিত করের পুনঃপ্রবর্তন করেন। আজও ভারতে দু-তিন বছরের অপরাগ অনাদায়ীকৃত করকে এক সাথে আদায় করা হয়। এটা যদি শিক্ষিত যুগে শিক্ষিত মানুষের কাছে দোষনীয় না হয় তাহলে মুহম্মদ বিন তুঘলকই বা দোষী কিসের জন্য? কৃষি প্রধান রাষ্ট্রে পর পর দু বছর বৃষ্টিপাত না হলে গণজীবন বিপর্যস্ত হয়। কিন্তু মুহম্মদ বিন তুঘলকের সময়ে দোয়াব অঞ্চলে এক বছর দু বছর তিন বছর নয় পর পর সাত বছর অনাবৃষ্টি হয় এবং এর ফলে সেখানকার জনসাধারণকে এক দারুণ দুর্ভিক্ষের প্রকোপে পড়তে হয়েছিল। মুহম্মদ বিন তুঘলকের মত এক উদারচেতা ও অসীম সাহসী বাদশাহের পক্ষেই এরকম ভীষণ সমস্যার মোকাবিলা করা সম্ভব হয়েছিল। কারণ তিনি এ বিপদে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন না করে দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রজাদের সাহায্যের নিমিত্ত খাদ্য দান, ঋণ দান, কৃপা খনন, চাষের বীজ ইত্যাদির ব্যবস্থা করে জনকল্যাণকামী মনোভাবের পরিচয় দান দিয়েছিলেন। কথিত আছে, হাতেমতাই এবং অন্যরা এক বছরে যা দান করতেন তিনি একেবারেই তা করতেন। তাই ডাঃ ঈশ্বরী প্রসাদ দুঃখ করে বলেছেন, “প্রায় এক যুগ স্থায়ী মারাত্মক দুর্ভিক্ষ তাঁর রাজত্বের গৌরব অনেকখানি বিনষ্ট এবং প্রজাদিগকে বিদ্রোহী করে তুলেছিল। তাঁকে নীরো এবং ক্যালিগারের মত নিষ্ঠুর এবং রক্তপিপাসু দানব বলে অভিহিত করলে তাঁর মহান প্রতিভার প্রতি অবিচার করা হয় এবং দুর্ভিক্ষের প্রতিরোধের জন্য তাঁর প্রকৃত প্রচেষ্টা ও বিভিন্ন উন্নতিমূলক সংস্কারের পরিকল্পনা হেতু মহান কৃতিত্বের দাবীকে অবজ্ঞা করা হয়।”

(৪) মুহাম্মদ বিন তুঘলক তাঁর রাজত্বের প্রথম ভাগে স্বর্ণ রৌপ্যের পরিবর্তে তাম্র মুদ্রার প্রচলন করেন।

মোটকথা মুহাম্মদ বিন তুঘলকের সামগ্রিক জীবনী আলোচনা করে আমরা নিঃসংকোচে বলতে পারি তিনি এক দিকে যেমন আদর্শ বাদশাহ, উন্নত চরিত্র সাধক, প্রতিভাশালী শাসক, যুগোত্তীর্ণ পণ্ডিত, অসাধারণ বক্তা ও অতুলনীয় দাতা ছিলেন তেমনি অপর দিকে তর্কশাস্ত্র, জ্যোতিষবিদ্যা, দর্শন, গণিত এবং স্বাস্থ্য বিজ্ঞানেও তাঁর বিস্ময়কর পাণ্ডিত্য ছিল। বারগী বলেছেন, পাণ্ডিত্য ও প্রতিভায় মুহাম্মদ ছিলেন ‘সৃষ্টির বিস্ময়’। বদায়ুনী তাঁকে ‘বৈপরীত্যের সংমিশ্রণ’ বলেছেন। ডাঃ ঈশ্বরী প্রসাদ বলেছেন, “Muhammad Tughlak was unquestionably the ablest man among the crowned heads of the Middle ages.” - মধ্যযুগের রাজা বাদশাহদের মধ্যে মুহম্মদ তুঘলক প্রশ্নাতীতভাবে সর্বাধিক ক্ষমতাশালী শাসক ছিলেন।

তাঁর সময়ের হিন্দুদের লেখা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, তৎকালীন হিন্দু প্রজারা সুলতানের উপর খুব ভাল ধারণা পোষণ করতেন। চৌদ্দ শতকের শেষের দিকে বিহারের বিখ্যাত কবি বিদ্যাপতি ঠাকুরের লেখা বিখ্যাত বই ‘পুরুষা পরিশকা’তে মুহম্মদ বিন তুঘলকের অত্যন্ত প্রশংসা করা হয়েছে। (Vidyapati Thakur's 'Purusa Pariska' P-20-24, 4-44, Allahabad)

১৩২৭ ইং শ্রী ধারাগী ব্রাহ্মণের বই এ তাঁর রাজত্বের হীরা বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাঁকে সাকার সাথে তুলনা করা হয়েছে। (Catalogue of the Delhi Museum of Archaeology-J. P. Vogel, Calcutta 1908, P-29)

রতন নামে জনৈক হিন্দুকে মুহম্মদ বিন তুঘলক সিন্ধু প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত করেন। (আজায়েবল আসফারেজ, ২য় খণ্ড পৃঃ ৯)

এমনিভাবে মহা পণ্ডিত হাফেয কুরআন মুহম্মদ বিন তুঘলক তাঁর হিন্দু মুসলিম প্রজাবৃন্দের মধ্যে এক মিলন এক্য গড়ে তুলে মূল ইতিহাসে চির অমর ও অক্ষয় হয়ে আছেন কিন্তু সাধারণ ইতিহাসে তিনি আজ বিপরীত।

ফিরোজ শাহ তুঘলক

মুহাম্মদ বিন তুঘলকের আকস্মিক মৃত্যুতে সৈন্য বাহিনীর মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে তাঁর ভাইগো ফিরোজ শাহ তুঘলক ১৩৫১ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি ১৩৮৮ খ্রিষ্টাব্দে পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন।

তাঁর রাজত্বকালে মুফতি ও কাজীগণ বিচার করতেন। মুফতি আইন ব্যাখ্যা করতেন আর কাজীগণ রায় দিতেন। তিনি অনেক জনহিতকর কাজ করেছেন। যেমন অসংখ্য প্রাসাদ, মসজিদ, সরাইখানা, স্নানাগার, উদ্যান, খাল খনন, দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন, দীন হীন জনসাধারণকে সাহায্য দান, রাজপথ, মতভেদে প্রায় ১০০০ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা অসংখ্য অক্ষয় কীর্তি তাঁর দ্বারাই স্থাপিত হয়েছিল।

ঐতিহাসিক মোহাম্মদ এহিয়া খান বলেন, “The has been no king at Delhi so just and merciful, so kind religious or such a builders as Firuj shah.” - (Tarikhi Mubarak Shahi)

ফিরোজ শাহের ন্যায় ন্যায়-পরায়ণ, দয়ালু, ধর্মপ্রাণ ও নির্মাতা কোন সম্রাট দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন নি। ঐতিহাসিক হ্যাভেলও তাঁর প্রশংসা করে গেছেন।

বস্তুত মুহম্মদ ফিরোজ শাহ তুঘলক ছিলেন এক আদর্শ চরিত্র শাসক। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেই সমস্ত ওমরাহদের ডেকে বলেন, “আপনারা যখন আমার কাঁধে এ বিরাট দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছেন তখন একটু অপেক্ষা করুন, অযু করে নেই। অযু সমাপ্ত করে দু রাকাত নামায পড়লেন। তারপর সিজদায় গিয়ে কেঁদে বলেন, ওগো আল্লাহ! রাজ্যের ব্যবস্থা এবং রাজত্বের গতি নির্ধারণ মানুষের চিন্তা শক্তির বাইরে। রাজ্য ব্যবস্থা সুসম্পন্ন তোমারই নির্দেশে। হে আল্লাহ! তুমি আমার শান্তিদাতা এবং আশ্রয়স্থল। এরপর তিনি হাতীর পিঠে চড়ে ফুফুর কাছে গিয়ে দেখা করলে ফুফু তাঁকে বক্ষে ধারণ করে মুহম্মদ তুঘলকের স্মৃতি জড়িত টুপি স্বহস্তে তাঁর মাথায় পড়িয়ে দিলেন। যার দাম এক লক্ষ টাকা।

কিন্তু তবুও ফিরোজ শাহ তুঘলক সাধারণ ইতিহাসে মহামান্য ঐতিহাসিকদের বিষাক্ত কলমের খোঁচা থেকে নিজেকে বাঁথেকে পারেন নি। জিজিয়া কর আদায়ের জন্য তাঁর উপর বিদ্রোহমণ্ডনা ও ধর্মান্ধতার দোষ আরোপ করা হয়। কিন্তু আগেই জিজিয়াকর প্রসঙ্গ আলোচনায় বলা হয়েছে জিজিয়া কোন অত্যাচারী বা সাম্প্রদায়িক কর নয়। মাথা গণতি যে কোন অমুসলমানের কাছে থেকেই জিজিয়া নেয়া হত না। তাই জিজিয়া করের দোহাই দিয়ে স্বচ্ছচরিত্রের ফিরোজ শাহের মাথায় অপবাদের বোঝা চাপানোর পশ্চাতে কোন্ মনোভাবের পরিচয় লুকিয়ে রয়েছে সূক্ষ্মদর্শী পাঠক-পাঠিকারাই তা নির্ণয় করবেন।

বীর তৈমুর

ফিরোজ শাহ তুঘলকের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র পৌত্রদের মধ্যে কলহ শুরু হলে দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি বিঘ্নিত হয় এবং বিশৃঙ্খলার আগুন প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে। এমত অবস্থায় ১৩৯৮ খ্রিষ্টাব্দে তৈমুর ভারত আক্রমণ করেন। তিনি ট্রান্স অক্সিয়ানার কেশ অঞ্চলের শেবজার গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা তুরঘাই ছিলেন তুর্কদের দলপতি আর মাতা নাগিনা ছিলেন চেংগিজ খানের বংশীয়া। তৈমুর আঠার বছর বয়স পর্যন্ত অশ্বারোহণ, যুদ্ধ-বিদ্যা, লেখাপড়া প্রভৃতি বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করে ৩৫ বছর বয়সে অদ্বিতীয় প্রতিপত্তিতে বীরপুরুষ বলে মানুষের হৃদয়ের ভক্তি ও প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি জ্ঞাপনে পরিণত হলেন। এ সময়ে তাঁর মনে বিশ্ব বিজয়ের অভিলাষ জাগে। বাস্তবিক তাঁর সামগ্রিক জীবনী আলোচনা করলে জানা যায়, রুশ সাম্রাজ্যের অধিকাংশ, চীনের প্রাচীর ও নীল নদ পর্যন্ত তার বিজয়কেতন উড্ডীন ছিল; তাছাড়া তুর্কিস্তান, আফগানিস্তান, পারস্য, ইরাক, সিরিয়া প্রভৃতি দেশ তাঁর সাম্রাজ্য ভুক্ত ছিল। পৃথিবীর সকল ঐতিহাসিকই একমত যে, বিজেতা হিসেবে তৈমুর অদ্বিতীয়। আলেকজান্ডার, সীরাজ, হানিবল, শার্লিমেন, চেসিজ, নেপোলিয়ন কেহ তাঁর সমকক্ষ নহেন। এক কথায় তৈমুর নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষা, সাংগঠিক ক্ষমতা, রাজনৈতিক দক্ষতা, অপরিসীম সাহস ও অধ্যবসায়ের গুণে ভূমধ্য সাগর থেকে গঙ্গা এবং ভল্গা ও ইপটিস্ নদী থেকে পারস্যোপসাগর পর্যন্ত নিজের সাম্রাজ্যের পরিধিকে বিস্তৃত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ভারতের ইতিহাসে তৈমুরের দিল্লী অভিযান এক রক্তক্ষয়ী অধ্যায়।

অনেকে বলেন, তৈমুর হিন্দু বিদ্রোহী। কিন্তু তা সঠিক নয়। হিন্দু বিদ্রোহের বশে তিনি ভারত আক্রমণ করেন নি; তিনি তাঁর উৎকট দিগ্বিজয়ের বাসনাকে চরিতার্থ করতেই শুধু ভারত নয় বিশ্বখ্যাসে মেতে উঠেছিলেন।

অবশেষে ১৪০৬ খ্রিষ্টাব্দে চীন জয়ের পরিকল্পনাতে রাজধানী সমরখন্দ থেকে কয়েক শত মাইল দূরে প্রবল শীতে বিখ্যাসোদ্যত মহাবীর তৈমুর ৭০ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

তুঘলক বংশের পতন

ফিরোজ শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পৌত্র দ্বিতীয় গিয়াসুদ্দিন তুঘলক সিংহাসনে বসেন। কিন্তু তাঁর আমোদ-প্রমোদ ও দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাঁরই পিতৃব্য পুত্র আবু বকর তাঁকে হত্যা করে ১৩৮৮ খ্রিষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু নাসিরুদ্দিন মুহাম্মদ নামে নগরকোটের এক শাসনকর্তা তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করেন। নাসিরুদ্দিনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র হুমায়ুন সিংহাসনে আরোহণ করেন। অল্পকালের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়। অতপর কনিষ্ঠ ভ্রাতা নাসিরুদ্দিন মাহমুদ তুঘলক সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনিই ছিলেন তুঘলক বংশের শেষ সুলতান। তিনি ২০ বছর রাজত্ব করে ১৪১৩৩ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথেই তুঘলক বংশের পতন শুরু হয়।

এখানে অবশ্যই একথা লক্ষণীয় যে, বাদশাদের ইতিহাসে যেখানে যে বাদশাহ তাঁর নিজ ধর্মের (ইসলামের) আদর্শ থেকে দূরে সরে পড়েছেন সেখানেই তাঁর পতন অনিবার্য হয়ে দেখা দিয়েছে। সুলতান মোয়েজুদ্দিন কায়কোবাদ, দ্বিতীয় গিয়াসুদ্দিন প্রভৃতি বাদশাহদের জীবনে এ সত্যেরই বিকাশ অতি প্রকট রূপে দেখা যায়। তাহলে কি একথা ঠিক নয় যে, ধর্মবিমুখ বাদশাহরাই ইতিহাসে স্বেচ্ছাচারিতা আর দুর্নীতির আলোখা অঙ্কন করে গেছেন আর যারা ধর্মপ্রাণ তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন সৎ, চরিত্রবান, প্রজাপালক এবং উন্নত আদর্শ?

ত্রয়োদশ অধ্যায় প্রাদেশিক মুসলিম রাজ বংশ

বঙ্গদেশ

সুলতানের পতনের ফলে কেন্দ্রীয় শাসন ক্ষমতার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ভারতের বিভিন্ন অংশে কতকগুলো স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। বঙ্গদেশই সর্বপ্রথম স্বাধীনতা ঘোষণা করে।

১২০১ খ্রিষ্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী নদীয়া অধিকার করে বঙ্গদেশের প্রথম শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। কিন্তু বলবনের সময়ে তুখিল খাঁর নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষিত হলে সুলতান নিজপুত্র বুগরা খাঁনকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। অবশেষে ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ পূর্ব বঙ্গে এবং আলাউদ্দিন আলী শাহ পশ্চিমবঙ্গে স্বাধীনতা ঘোষণা করলে অবিভক্ত বাংলাদেশ দুই স্বাধীন সুলতানের শাসনাধীনে দ্বিখণ্ডিত হয়ে পড়ে। পরে অবশ্য শাসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ (১৩৫৩) দুই দেশের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করে অখণ্ড বাংলার স্বাধীন সুলতানের রূপে নিজেকে ঘোষণা করেন। তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র সেকেন্দার শাহ সুলতান হয়েছিলেন। তিনি আদিনাতে (পাণ্ডয়ার নিকটবর্তী) এক সুবহুৎ মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর পরবর্তী সময়ে রাজা গণেশ নামে এক ব্রাহ্মণ জমিদার ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসন দখল করেন। অনেক পণ্ডিত ও ঐতিহাসিকদের মতে তিনি দুই ক্রীড়নক সুলতানের নামে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন।

এ গণেশকে কেন্দ্র করেই ইতিহাসে এক উপভোগ্য অধ্যায় সংযোজিত হয়েছে। মুসলমানদের গৌড়বঙ্গ বিজয়ের দু'শ বছরেরও অধিক পরের ঘটনা। তখন গণেশ ইলিয়াস শাহী বংশের প্রধান মন্ত্রীত্বের পদে নিয়োজিত ছিলেন। সুলতান সাইফুদ্দিন হামজার দুর্বলতার অজুহাতে গণেশ তাঁকে কৃষ্ণসভাবে হত্যা করে স্বয়ং একদিন সিংহাসন দখল করে বসেন। বলাবাহুল্য, এ গণেশই সুলতানকে রাজ্য শাসনের মোহে নানা অপকীর্তিতে ডুবে থাকতে প্ররোচিত করতেন। তিনি প্রচুর পরিমাণে উৎকোচ দান করে অর্থলোভী মুসলমান জমিদার ও আমীর ওমরাহদের মুখ বন্ধ করেন এবং পরে মুসলমান প্রজাবৃন্দের উপর অকল্পনীয় অত্যাচার শুরু করেন। তখন অন্যান্যপায় প্রজাবৃন্দ শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা বদরুল ইসলাম সাহেবের কাছে এর প্রতিকার দাবী করেন। মাওলানা সাহেব মুখপাত্র হিসেবে গণেশের দরবারে উপস্থিত হলেন ও অত্যাচারের বিরত থাকতে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু উদ্ধত রাজা তাঁর কোন কতায় কর্ণপাত না তাকে কুর্গিশ করতে বলেন। মাওলানা তাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, রাজাকে কুর্গিশ নয়, বরং রাজাই কোন শায়খুল ইসলাম রাজদরবারে এলে সিংহাসন থেকে নেমে মুকুট হাতে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবে—এটাই 'রাজানুমোদিত নীতি'।

কোনক্রমেই যখন পেরে ওঠা গেল না তখন রাজা গণেশ এক কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করেন। একটা নিম্নদ্বার বিশিষ্ট জনশূন্য কক্ষে আলোচনার জন্য মাওলানা সাহেবকে আমন্ত্রণ জানান হল। মাওলানা সাহেব এসে দেখলেন গণেশ ভিতরে বসে। আর এ নীচু দ্বার দিয়ে মাথা হেঁট করে প্রবেশের অর্থই হল তাকে প্রণাম করা। অতএব গণেশের এ সুপরীকল্পিত চাতুর্য উপলব্ধি করে মাওলানা পিছন হেঁটে ঘরে প্রবেশ করেন। অপমান আর ক্রোধের বশে রাজা গণেশ সে দিনই হযরত মাওলানা বদরুল আলম সাহেব ও আরও কয়েকজন বিজ্ঞ আলেমকে নদী গর্ভে ডুবিয়ে হত্যা করান।

অতপর নিরুপায় মুসলমান সমাজ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে সে সময়ে ওলীকুল শ্রেষ্ঠ মোহাম্মদ নূর কুতুবুল আরম সাহেবের দারস্থ হন। মনীষী কুতুবুল আলম তখন ইব্রাহিম শারকীকে বাংলাদেশ আক্রমণ করতে নির্দেশ দেন। হযরতের আদেশ পেয়ে বিরাট সৈন্য বাহিনী নিয়ে শারকী ফিরোজপুরে শিবির স্থাপন করলেও সংবাদে ভীত হয়ে রাজা গণেশ মনীষীর পদপ্রান্তে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। মনীষী তাঁকে ইসলাম গ্রহণ করতে বলেন। স্ত্রীর সাথে পরামর্শক্রমে তিনি নিজে মুসলমান না হয়ে পুত্র যদুকে তাঁর হস্তে সমর্পণ করে সস্ত্রীক কাশী যাত্রা করেন। এ যদুই পরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে জালালুদ্দিন মুহাম্মদ শাহ নাম নিয়ে সিংহাসনে বসেন।

ডঃ কিরণ চন্দ্র চৌধুরী এম, এ, এল-এল-বি, ডি, ফিল, লিখেছেন, যদু ইসলাম গ্রহণ করিয়া জালালুদ্দিন মহম্মদ শাহ নাম গ্রহণ করেন। ইসলাম ধর্মে ধর্মন্তরিত হবার পর যদু অত্যন্ত অত্যাচারী হইয়া উঠেন। বিশেষভাবে হিন্দুদের উপর অবিচার ও অত্যাচার তিনি অপ্রতিহত ভাবে চালাইয়াছিলেন।” ডঃ চৌধুরীর এই উদ্ধৃতিতে প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম ধর্ম মানেই অত্যাচারী এবং অমুসলিম বিদ্বেষী ধর্ম। কিন্তু মাছি মারা কেরানী সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন না হয়ে যাঁরা ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে অজিঞ্জ তাঁরা প্রত্যেককেই (মুসলিম অমুসলিম যাই হোন) এক বাক্যে স্বীকার করেন যে, ইসলামের কোথাও অমুসলমানদের উপর অত্যাচার করার নির্দেশ নেই। যুগে যুগে দেশে অসংখ্য অমুসলমান মনীষীরা ইসলামের মধুর ও অনুপম আদর্শে মুগ্ধ হয়ে মুসলমান হয়ে নিজেদের ধন্য মনে করেছেন। এক্ষেত্রে লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে এটাই যে, যদুর ধর্মনীতি কোন মুসলমানী রক্ত প্রবাহিত নয়। বরং তিনি কেবলমাত্র হিন্দু ছিলেন না পাকা ব্রাহ্মণ ঘরের ছেলে ছিলেন। অতএব তিনি যদি অপ্রতিহত ভাবে অত্যাচারই করে থাকেন যদি হিন্দু বংশ ধ্বংস করার জন্য রক্ত মেতেই উঠে তাকে তবে তার জন্য দায়ী তাঁর বর্ণ শ্রেষ্ঠ রক্ত, দায়ী তাঁর পূর্ব সমাজ, তাঁর পূর্ব সভ্যতা, তাঁর পূর্ব ধর্ম, দায়ী তিনি নিজে; ইসলাম নয়।

ডক্টর সুকুমার সেন তাঁর সম্বন্ধে বলেন, “গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তিনিও হিন্দু কবি ও পণ্ডিত দিকের পৃষ্ঠপোষকতায় পরানুখ হন নাই। যদুর অনুগৃহীত পণ্ডিতদিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত ছিলেন বৃহস্পতি মহিষ্ঠা।

(বাংলা সাপ্তাহিকের কথা—ডক্টর শ্রী সুকুমার সেন। কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয় সংস্করণ ১৯৩৯)

যাহোক, যদু ওরফে জালালুদ্দিন মুহম্মদ শাহের পর তাঁর পুত্র মামসুদ্দিন আহমদ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। কিন্তু গুপ্ত ঘাতকের হাতে তাঁর মৃত্যু হলে রাজা গণেশের বংশের পতন ঘটে এবং পুনরায় ইলিয়াস শাহী বংশের অভ্যুদয় হয়। ইলিয়াসের পৌত্র নাসিরুদ্দিন অতপর তাঁর পুত্র রুকনুদ্দিন বরাবক শাহ এবং তারপর হাবসী রাজারা ১৪৯৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করে শেষে আলাউদ্দিন হুসেন সিংহাসনে বসলেন। উড়িষ্যার সীমান্ত থেকে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্য পরিধি বিস্তৃত ছিল। ডঃ এ, বি, এম হাবিউল্লাহ বলেন, “একমাত্র আসাম ব্যতীত সকল অভিযানই সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল।

তাঁর সময়ে শ্রী চৈতন্যদেবের মতবাদ প্রচার করেন, বাংলা সাংখ্যিকের প্রভূত উন্নতি হয়। জ্যৈষ্ঠ পুত্র নসরত খাঁ তাঁর মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি সাহিত্য ও শিল্পানুরাগী ছিলেন। গৌড়ে দুটি মসজিদ নির্মাণ করান; একটির নাম ‘বড়সোনা’ ও অপরটি ‘কদম রসূল’। একজন প্রাসাদরক্ষী দ্বারা ১৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি নিহত হলে গিয়াসুদ্দিন মাহমুদ শাহ বাংলাদেশে হুসাইন মাহী বংশের শেষ স্বাধীন সুলতান রূপে সিংহাসন লাভ করেন। অতপর শের ১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দে গৌড় অধিকার করলে তিনি বঙ্গদেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। শের শাহের মৃত্যুর পর সোলাইমান কররানী বঙ্গদেশ অধিকার করে আফগান বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দে আপগান বংশের পতন হলে বাংলাদেশ মোঘল অধিকার ভুক্ত হয়।

জৌনপুর

তুঘলক বংশের শেষ সুলতানের রাজত্বকালে সরওয়ার ওরফে খাজা জাহানের নেতৃত্বে জৌনপুরও স্বাধীনতা অর্জন করে। ১৩৩৯৯ খ্রিষ্টাব্দে সরওয়ারের মৃত্যুর পর তাঁর পোষ্য পুত্র সিংহাসন লাভ করলেন। কিন্তু তিনিও ১৪০০ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। অবশেষে সুলতানের ছোট ভাই শিল্ল ও সাংখ্যিকের পৃষ্ঠপোষক ইব্রাহীম শাহ সিংহাসনে সমাসীন হন। তাঁর শাসনকালে জৌনপুর মুসলিম সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল। আতানা মসজিদ তাঁর স্থাপত্য শিল্পের প্রকৃষ্ট নিদর্শন স্বরূপ আজও বিদ্যমান। ১৪৪০ খ্রিষ্টাব্দে ইব্রাহীম শাহের মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র মাহমুদ শাহ সিংহাসনে বসেন। বিখ্যাত ‘লাল দরজা’ তাঁরই নির্মিত। অবশেষে বাহলোন লোদী কর্তৃক জৈনপুরের শেষ স্বাধীন নবাব হুসাইন শাহ বিতাড়িত হলে এর স্বাধীনতার অবসান ঘটে।

মালব

আলাউদ্দিন খলজী অধিকৃত মালবও সর্বশেষে দিলওয়ারের নেতৃত্বাধীনে স্বাধীন হয়ে পড়ে। দিলওয়ারের পর পুত্র হুসাং খাঁ সিংহাসন অধিকার করে রাজধানী মণ্ডুতে স্থানান্তরিত করেন। কিন্তু মন্ত্রী মাহমুদ খাঁন তাঁকে হত্যা করে ১৪৩৬ খ্রিষ্টাব্দে বলপূর্বক সিংহাসন দখল করেন। তাঁর সময়ে হিন্দু মুসলমান সকলে শান্তিপূর্ণভাবে পাশাপাশি বাস করত। মালবের মুসলমান শাসকদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। তারপর শান্তিপ্রদ নীতির মধ্য দিয়ে গিয়াসুদ্দিন সিংহাসনে বসলেন। দ্বিতীয় মাহমুদ

ছিলেন এ বংশের শেষ সুলতান। তাঁর সময়েই গুজরাটের বাহাদুর শাহ মণ্ডু অধিকার করে মালব রাজ্যের স্বাধীনতা খর্ব করেন। অবশ্য পরবর্তীকালে যথাক্রমে মোঘল সম্রাট হুমায়ুন কর্তৃক, ১৫৩৫ খ্রিষ্টাব্দে শেরশাহ কর্তৃক ১৫৪২ খ্রিষ্টাব্দে এবং আকবর কর্তৃক ১৫৬১ খ্রিষ্টাব্দে মালব অধিকৃত হয়।

গুজরাট

গুজরাট শেষে স্বাধীনতা লাভ করে। সুলতান আলাউদ্দিন খলজী দ্বারা তা প্রথম বিজীত হয় ১২৯৭ খ্রিষ্টাব্দে। তখন থেকেই এটা মুসলমান শাসনাধীনে শাসিত হয়ে আসছিল। ১৪০১ খ্রিষ্টাব্দে জাফর খাঁ মুজাফ্ফর শাহ উপাধি বরণ করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তাঁর পর তাঁর পৌত্র আহমদ শাহ সিংহাসনে বসেন। অনেকের মতে ইনিই গুজরাটের প্রতিষ্ঠাতা। এর পৌত্র মাহমুদ বিগরহ পরবর্তী শ্রেষ্ঠ সুলতান রূপে অভিষিক্ত হন। ১৫১১ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র দ্বিতীয় মুজাফ্ফর সিংহাসনে বসে মেবারের রানা সংগ্রাম সিংহকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন। অতপর পৌত্র বাহাদুর শাহ গুজরাটের সুলতান হন। এ প্রবল প্রতাপাধিত সম্রাট পুর্তুগীজদের বিশ্বাসঘাতকতায় ১৫৩৭ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যু সংবরণ করলে গুজরাট বিশৃঙ্খলার এক কেন্দ্রস্থানে পরিণত হয়।

কাশ্মীর

মুসলিম প্রধান কাশ্মীর ১৩৪৯ খ্রিষ্টাব্দে অবধি হিন্দু শাসকদের দ্বারা পরিচালিত হলেও শাহ মির্জা, শামসুদ্দিন নাম নিয়ে ১৩৪৯ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসন আরোহণ করে মুসলিম শাসনের গোড়া পত্তন করেন। কাশ্মীরে শাসককুলের মধ্যে জয়নুল আবেদীন ছিলেন উল্লেখযোগ্য। তিনি দ্রব্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ করেন এবং প্রজাদের করভার লাঘব করেন। তাঁর সময় ‘মহাভারত’ ও ‘রাজতরঙ্গিনী’ পারস্য ভাষায় অনূদিত হয় এবং অনেকগুলো আরবী ও পারস্য ভাষার গ্রন্থ হিন্দীতে ভাষান্তরিত করা হয়। তাঁর মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারীগণের অক্ষমতার সুযোগ নিয়ে হুমায়ুনের এক আত্মীয় হায়দার মির্জা ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে (১৫৪০) কাশ্মীর অধিকার করেন। ১৫৮৬ খ্রিষ্টাব্দে মোঘল সম্রাট আকবর এটা অধিকার করেন।

বাহমণী রাজ্য

সুলতানী শাসনের দুর্বলতার সুযোগে যে সমস্ত প্রাদেশিক রাজ্যসমূহ স্বাধীনতা অর্জন করেছিল বাহমণী রাজ্য তাদের মধ্যে অন্যতম। হাসান আবুল মুজাফ্ফর আলাউদ্দিন বাহমণ শাহ উপাধি ধারণ করে বাহমণী বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। অনেকে মনে করেন হাসান গঙ্গ বাহমণী নামে এক ব্রাহ্মণ জ্যোতিষীর ভৃত্য ছিলেন এবং এ পৃষ্ঠ-পোষকের নামানুসারেই তাঁর বংশের নামকরণ হয়েছে। কিন্তু এ মতের পিছনে কোন ঐতিহাসিক সমর্থন নেই। কারণ পরবর্তী ঐতিহাসিক গল্পকে স্বীকার করেন না এবং কোন ঐতিহাসিক উপাদান থেকেও এর যথার্থ প্রমাণ পাওয়া যায় না।

যাহোক, আলাউদ্দিন শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র প্রথম মহম্মদ শাহ সিংহাসন লাভ করে সুন্দর সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থা পড়ে তোলেন। পরবর্তী বাদশাহ দ্বিতীয় মাহম্মদ

শাহও শান্তি প্রিয় লোক ছিলেন। ফিরোজ শাহও (অষ্টম শাসক) ছিলেন একজন সুশাসক। তারপর তাঁর ভাই সিংহাসনে বসেই বিজয় নগর আক্রমণ করে সেখানকার রাজাকে অনাদায়ী কর দিতে বাধ্য করান। তাঁর পুত্র দ্বিতীয় আলাউদ্দিন সিংহাসনে বসেন। তিনি ছিলেন “কঠোর শাসক, শ্রেষ্ঠ নির্মাতা ও বিদ্যোৎসাহী”। ১৪৫৭ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর পুত্র হুমায়ুন সিংহাসন আরোহণ আরোহণ করেন। মুহাম্মদ গাওয়ান নামক জনৈক সহৃদ ব্যক্তিটি তাঁর শিশু পুত্র নিজাম শাহের রাজ কার্য পরিচালনা করতেন। শেষে এ শিশু সম্রাটের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা তৃতীয় মুহাম্মদের রাজত্বকালে তিনি প্রধান মন্ত্রী পদে ভূষিত হন। কিন্তু “শত্রু দাক্ষিণাত্য দলের” ষড়যন্ত্রে তিনি সুলতান কর্তৃক মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। Meadows Taylor বলেন “With him departed all the cohesion and Power of the Bahmani Kingdom.” তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথে বাহমনী রাজ্যের সংহতি ও ক্ষমতা বিনষ্ট হয়ে গেল। তিনি ছিলেন তদানীন্তন সময়ে একজন বিখ্যাত রাজনীতিবিদ, একজন সমর কুশলী সেনাপতি, একজন সুদক্ষ শাসক ও বিজেতা। তিনি সাম্রাজ্যের প্রত্যেক বিভাগের কিছু কিছু সংস্কার সাধন করে উন্নতি বিধানের ব্যবস্থা করেন। এক বিরাট কলেজ নির্মাণ তাঁর অক্ষয় কীর্তি। মুহাম্মদ শাহের মৃত্যুর পর তাঁর শিশু সুলতান মামুদের রাজত্ব কালে প্রাদেশিক রাজাদের স্বাধীনতা ঘোষণা, দাক্ষিণাত্য ও বিদেশীর মধ্যে দলাদলি, সুযোগ্য মন্ত্রী মাহমুদ গাওয়ানের মৃত্যু ইত্যাদি কারণে বাহমনী রাজ্য ধ্বংসের মুখে পতিত হয় ও পতন ঘটে। অতপর বাহমনী রাজ্য বেরার, বিজাপুর, আহম্মদ নগর, গোলকুণ্ডা ও বিদর এ পাঁচ ভাগে খণ্ড খণ্ড হয়ে পাঁচটি স্বাধীন সুলতানের অধীনে বিভক্ত হয়ে পড়ে। যথাক্রমে ১৪৮৯ খ্রিষ্টাব্দে ইউসুফ আদিল কর্তৃক আদিল শাহী বংশের ১৪৯০ খ্রিষ্টাব্দে আহম্মদ নিজাম শাহ কর্তৃক নিজাম শাহী বংশের ১৫২১ খ্রিষ্টাব্দে কুলি কুতুব শাহ কর্তৃক কুতুবশাহী বংশের এবং ১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দে আমীর ফরিদ শাহ কর্তৃক ফরিদ শাহী বংশের অভ্যুদয় হয়।

এমনিভাবে তফতি নদীর তীরে অবস্থিত খান্দেশ রাজ্যও মালিক রাজার নেতৃত্বে স্বাধীনতা অর্জন করে। অবশ্য ১৬০১ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট আকবর আসিরগড় দুর্গ অধিকার করে পরে খান্দেশ নিজের সাম্রাজ্যসীমার অন্তর্ভুক্ত করে নেন।

চতুর্দশ অধ্যায়

বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উ-দৌল্লাহ দুর্লভ ঐতিহাসিক তথ্য

দিল্লীর শেষ সম্রাট যেমন রাহদর শাহ তেমনি ভারতের প্রাণ কেন্দ্র বঙ্গদেশের শেষ নবাব ছিলেন সিরাজুদৌল্লাহ। ১৭৫৭ তে ইংরেজ ও তাঁদের দালালদের চক্রান্তে তাঁকে ধ্বংস করা হয়। সে সাথে তাঁর জীবনে মহানুভবতা, বিচক্ষণতা, বীরত্ব ও মহত্বকে ইচ্ছাকৃত ভাবে ইতিহাসের বিকৃত করা হয়েছে। আর ভারতের মাটি রক্ষা করতে নিজের দেহের সমস্ত রক্তবিন্দু দিয়ে যিনি ভারতের মাটিকে রক্ত রঞ্জিত করলেন তাঁর ঐতিহাসিক স্বতন্ত্র রক্ষার জন্য সামান্যতম চেষ্টার পরিবর্তে অসামান্য অপচেষ্টা করা হয়েছে। কিভাবে কেন তা করা হয়েছে, তাই আলোচনার প্রয়োজন।

আগেই বলেছি বঙ্গদেশকে ভারতের মস্তিষ্ক বলা যেতে পারে। বাংলার সম্পদ সম্পত্তিও অর্থ ইংরেজদের হাত শক্ত করেছিল তাই ইংরেজদের পক্ষে ফরাসীদের পরাজিত করা সহজ সাধ্য হয়েছিল। সম্রাটদের রাজ্যবঙ্গদেশ একটা প্রদেশ বলে গণ্য ছিল। মুর্শিদ কুলী খাঁন ছিলেন বাংলা প্রথম নবাব। পরে ১৭২৭ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর জামাতা সুজাউদ্দিন বাংলা বিহারের নবাব হন। তারপর ১৭৩৯ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর পুত্র সরফরাজ খাঁ সিংহাসনে বসেন। তিনি খুব উপযুক্ত ও শক্তিশালী ছিলেন। তাঁর অধীনস্থ গভর্ণর আলিবর্দি খাঁ মারাঠা ও বর্গীদের লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে কঠোর ভাবে প্রতিরোধ করার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন। তাতে সরফরাজ খাঁ খুব একটা গুরুত্ব দেন নি। ফলে বীর আলিবর্দীর বীরত্ব প্রকাশে বাধা সৃষ্টি হয় দেখে তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং সরফরাজকে পরাজিত করে নিজে নবাব হন।

আলিবর্দি খাঁ উপযুক্ত শাসক ও বীর ছিলেন। মারাঠা, বর্গী প্রভৃতি জাতির লুণ্ঠন ও অত্যাচারকে তিনি কঠোর হস্তে দমন করেন। ইংরেজরা আলিবর্দীর হাতভাবে চরম নীতির পরিবর্তে নরম নীতি অবলম্বন করে এবং তাঁর দরবারে জানানো হয় যে, ‘আমরা মহামতি আকবরের সময় থেকে আজ পর্যন্ত আপনাদের অর্থাৎ মুসলমানদের অনুগ্রহে ব্যবসা করছি এবং ঘাঁটি ও নির্মাণ করে থাকি। অতএব আশা করি আপনি আমাদের এ দুটি সুযোগই পুনর্বহাল রাখবেন।

আলিবর্দি জানালেন ব্যবসা করার অনুমতি দেয়া হচ্ছে কিন্তু দুর্গ নির্মাণের কোন সুযোগই নেই। যদি পুর্নগীজদের আক্রমণের ভয় আছে বলে অযুহাত দর্শান তাহলে জেনে রাখবেন যে কোন বহিঃশত্রুর জন্য নবাব আলিবর্দিই যথেষ্ট।

আলিবর্দি খাঁয়ের কোন পুত্র সন্তান ছিল না। তাই তাঁর প্রাণপ্রিয় নাতি সিরাজুদৌল্লাহ সিংহাসনে বসেছিলেন। সিরাজ এর পিতার নাম ছিল জয়নুদ্দিন আহমেদ। তিনি ছিলেন বিহারের গভর্ণর। আর তাঁর মায়ের নাম ছিল আমিনা। এই সিরাজদৌল্লাহ রাজত্বকাল ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। মিথ্যা দুনার্মের তাঁর ভূমিকা আধুনিক ইতিহাসে অতীব চিত্তাকর্ষক।

সিরাজের বিরুদ্ধে যত অভিযোগ আছে তাঁর কিছুই যে সত্য নয় তা হয়ত এখানে বলার উদ্দেশ্য নয় কিন্তু এমন অনেক অভিযোগও ইতিহাসে আছে যার কোন ভিত্তিই নেই।

যাই হোক সিরাজের সিংহাসনের বসার পরেই নবাবের মনে ইংরেজরা দুঃসাহসের সাথে কলকাতার লিয়ম দুর্গ নির্মাণ করতে আরম্ভ করা ভারতের মস্তিষ্ক বাংলা তাই কলকাতার কল্পনাকে রূপ দেয়ার চেষ্টা করতে সংবাদ পাঠালেন যে, দুর্গ তৈরি বন্ধ করা নবাবের আদেশ। ইংরেজরা নবাবের আদেশে আত্মাহ দুর্গ তৈরীর কাজ অব্যাহত রাখে। যুদ্ধের জন্য তাঁরা আগে হতেই তৈরি সঙ্গে বিদেশী ইংরেজকে আক্রমণ করে এবং ভীষণভাবে পরাজিত করেন এ যুদ্ধের সঙ্গেই সংযুক্ত বা অক্ষকূপের কাহিনী।

কলকাতা অধিকারের সংবাদ মাত্রাজে পৌঁছালে। সাথে সাথে ব্রিটিশ সেনাপতি ক্লাইভ বিরাট সৈন্য সামন্ত নিয়ে কলকাতা পুনর্দখল করেন। সিরাজ বুঝতে পারলেন আর লড়াই করে পারা যাবে না। কারণ ইংরেজদের চক্রান্তে তাঁর বিশ্বাস ভাঙন হিন্দু ও মুসলমান বন্ধু বান্ধব ও ইংরেজকে জয়ী করার জন্য সর্বস্ব পণ করে লেগেছেন, ফলে বাধ্য হয়েই তাঁকে ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে অত্যন্ত দুঃখ ও বেদনার সাথে সন্ধি করতে হয়। এ সন্ধির নাম হয় 'আলী নগরীর সন্ধি'। সন্ধির সর্তানুযায়ী কলকাতা ইংরেজরা ফিরে পায় এবং শুধু মাত্র ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের মেরামত বা নির্মাণের অধিকার প্রাপ্ত হয়। কিন্তু কিছু কালের মধ্যে ইংরেজরাই বিশ্বাসঘাতকের ভূমিকায় হঠাৎ বঙ্গের চন্দন নগর দখল করেন এবং সিরাজদৌল্লাকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্য সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা হল।

এ ব্যাপারে ইংরেজরা একটা বড় অস্ত্র হাতে পেয়েছিল। বঙ্গের বিখ্যাত জগৎশেষ্ঠ এবং কলকাতার বড় বড় ব্যবসায়ী উমিচাঁদ এবং রাজবল্লভ প্রভৃতি দেশের শত্রু ও শোষণবৃন্দ সিরাজের বিরুদ্ধে ইংরেজদের সাথে যোগ দেন। জগৎশেষ্ঠের বাড়ীতে গোপন সভা হয়। সে গোপন আলোচনায় স্ত্রী লোকের ছদ্মবেশে ইংরেজদের দূত মিঃ ওয়াট্‌স সাহেবকে পালকীতে করে আনানো হয়। এ সভায় মিঃ ওয়াট্‌স প্রচুর পরিমাণে লোভ লালসায় মুগ্ধ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করা হবে এবং তার ফলে বঙ্গ তথা সারা ভারতের মুসলমানদের উত্তেজিত হয়ে ওঠার রাস্তা বন্ধ করতে তাঁরই আত্মীয় মীরজাফরকে সিংহাসনে বসানো হবে। মিঃ ওয়াট্‌স আর জানালেন, সিরাজের সাথে লড়াইতে যে প্রস্তুতির প্রয়োজন এবং তার জন্য যে প্রচুর অর্থের আবশ্যক তা বর্তমানে আমাদের নেই। জগৎশেষ্ঠ সে কর্তব্য পালন করতে সদৃষ্টে আশ্বাস দিয়েছিলেন, “টাকা যা দিয়েছি আরও যত দরকার আমি আপনাদের দিয়ে যাব, এতে কোন চিন্তা নেই।”

এবার রাজ রাজবল্লভ সিরাজের বড় খালা ঘসেটি বেগমকে বোঝালেন—আমরা চেষ্টেছিলাম আপনি সিংহাসনে বসবেন। কিন্তু এখনও উপায় আছে যদি আপনি আমাদের অর্থাৎ ইংরেজদের শুধু একটু সমর্থন করেন মাত্র।

মীরজাফরকে একটু বোঝাতে বেগ পেতে হল। তিনি প্রথমে বলেছিলেন, “আমি নবাব আলিবর্দীর শ্যালক; অতএব সিরাজদৌল্লা আমার আত্মীয়, কি করে তা সম্ভব?” তখন উমিচাঁদ বুঝিয়েছিলেন ‘আমরাত আর সিরাজকে মেরে ফেলছি না অথবা আমরা নিজেরাও নবাব হচ্ছি না, শুধু তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করে আপনাকে বসাতে চাইছি। কারণ আপনাকে শুধুমাত্র আমি নেই এবং ইংরেজরা এবং মুসলমানদের অনেকেই আর অমুসলমানদের প্রায় প্রত্যেকেই গভীর শুদ্ধার চোখে দেখে।’

সুতরাং মীরজাফর উমিচাঁদের বিষ পান করলেন। উমিচাঁদের জয় হলেও তিনিও পুরস্কৃত হবেন আর মীরজাফর হবেন বাংলার নবাব; এদিকে জগৎশেষ্ঠের শোষণের পর নিষ্কটক হবে আর ইংরেজদের লাভ হবে ভারত আসবে তাদের হাতের মুঠোয়। পক্ষান্তরে সিরাজদৌল্লার লাভ হলে তা হবে বাংলা পথা সমগ্র ভারতের লাভ।

যাই হোক, ষড়যন্ত্রের জাল বোনা যখন শেষ, ভারতের স্বাধীনতা সূর্য্যকে পরাধীনতার গ্লানিতে কবর দেয়ার সমস্ত পরিকল্পনা যখন প্রস্তুত সে সময় ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে ১৩ জুন ক্লাইভ মাত্র তিন হাজার দুইশত সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ যাত্রা করেন। ১৯ শে জুন নবাবের অধীনস্থ কাটোয়া ক্লাইভের দখলে আসে। ২২ জুন গঙ্গা পার হয়ে ক্লাইভ মধ্য রাত্রিতে নদীয়া জেলার সীমান্তে পলাশীর প্রান্তরে পৌঁছান। নবাবের প্রচুর সুদক্ষ সেনা আগ থেকেই তৈরি ছিল। ক্লাইভের তবুও ভয় নেই, কারণ তিনি জানেন এ যুদ্ধ যুদ্ধ নয় পুতুল খেলার সামিল। আগে থেকেই পরিকল্পনা পাকাপাকি। উমিচাঁদ, রায়দুর্লভ, জগৎশেষ্ঠ প্রভৃতির সাজানো সেনাপতি আজ ভিতরে ভিতরে ক্লাইভের পক্ষে।

ক্লাইভের সৈন্য যেখানে মাত্র তিন হাজার দুইশত সেখানে সিরাজের সৈন্য পঞ্চাশ হাজার। কিন্তু মির্জাফর, রায় দুর্লভ ও অন্যান্য সেনাপতি পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইলেন আর ইংরেজদের আক্রমণ ও গুলির আঘাতে নবাবের সৈন্য আত্মহত্যার মত মরতে শুরু করল। এ অবস্থায় সেনাপতির বিনা অনুমতিতেই সিরাজের জন্য তথা দেশ ও দেশের জন্য মীর মর্দান ডায়াবহ বীর বিক্রমে যুদ্ধে ব্যপ্ত হইলেন আর পরক্ষণেই গুলিতে বীরের মত শহীদ হইলেন। নবাব সিরাজ এ সংবাদে দিশেহারা হয়ে পড়লেন। এ সময় যুদ্ধের গতি নবাবের অনুকূলে যাচ্ছিল। কারণ মীর মর্দানের বীরত্বে মোহনলাল ও সিনফ্রে তখন ইংরেজদের কায়দা করে ফেলে ছিলেন। এমন শুভ মুহূর্তে নবাবের প্রধান সেনাপতি মীরজাফর যুদ্ধ বন্ধ করতে আদেশ দেন। এদিকে ক্লাইভ এ মুহূর্তটির অপেক্ষাতেই ছিলেন। নীরব মুসলমান ও হিন্দু সৈন্যদের উপর গোলা বর্ষন চলতে লাগল। অবশেষে নিরুপায় নবাবের সৈন্যরা যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। নবাবও রাজমহলের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে গিয়ে ধরা পড়লেন এবং তাঁকে বন্দী করা হল। শেষে তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

বাংলার বিশ্বাসঘাতক সভ্যদেরা এটা বোঝে নি যে, এ পরাজয় শুধু সিরাজের নয়, শুধু বাংলার নয় – সমগ্র ভারতের! আর এ বিজয় ইংরেজ ও ইংল্যান্ডের।

কিন্তু সিরাজ পরাজিত ও নিহত কেন? এর উত্তরে বলা যেতে পারে পলাশীর যুদ্ধ কোন যুদ্ধই ছিল না। কারণ এটা ছিল যুদ্ধযুদ্ধ খেলা মাত্র। আসলে যাদের তিনি বিশ্বাস করতেন উমিচাঁদ, সেনাপতি রায় দুর্লভ, প্রধান সেনাপতি মীরজাফর আর বঙ্গের শ্রেষ্ঠ ধনী জগৎশেষ্ঠ, প্রভৃতি এরাই ছিলেন সিরাজের প্রতিদন্দী। শত্রু প্রকাশ্য হলে তার দ্বারা যত ক্ষতি হয়, বন্ধু শত্রু হলে ফল হয় আরও মারাত্মক। পলাশীর যুদ্ধে এ সত্যই দারুণ ভাবে প্রমাণিত। তাই দেশ থেকেই নিরপেক্ষ বিখ্যাত লেখক শ্রী নিখিনাথ রায় লিখেছেন, “অষ্টাদশ শতাব্দীর যে ডায়াবহ বিপ্লবে প্রাবিত হইয়া হতভাগ সিরাজ সামান্য তুণের ন্যায় ভাসিয়া গিয়াছিল এবং মীরজাফর ও মীরকাশিম উদ্ধৃক্ষিপ্ত অধঃক্ষিপ্ত কেহ বা অনন্ত নিদ্রায় কেহ বা ফরিকী অবলম্বনে নিষ্কৃতি লাভ করেন। জগৎশেষ্ঠ ক্রোধ ঝটিকা সেই তুফানের সৃজনের মূল।

দুঃখের বিষয় সেই ভীষণ তুফানে অবশেষে তাহাদিগকেও অনন্ত গর্ভে আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। যে ব্রিটিশ রাজা রাজেশ্বরীর শান্তি ধরায় আসমুদ্র হইয়াছিল। যে ব্রিটিশ রাজা রাজেশ্বরীর শান্তি ধরায় আসমুদ্র হিমালয় শিখ্র হইতেছে জগৎশেষ্ঠ গণের সাহায্যই তাহার প্রতিষ্ঠাতা। একজন ইংরেজ লিখিয়াছেন যে, হিন্দু মহাজনের অর্থ আর ইংরেজ সেনাপতি তরবারী বাংলায় মুসলমান রাজত্বের বিপর্যয়। যে ব্রিটিশ রাজলক্ষ্মীর কিরীট প্রভায় সমস্ত ভারতবর্ষ আলোকিত হইতেছে মাহ প্রাণ জগৎশেষ্ঠগণের বৃষ্টিতে ও প্রাণপাতে তাহার অভ্যেচক ক্রিয়া সম্পাদিত হয়।” (ঐতিহাসিক চিত্র, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যায় দ্রষ্টব্য)

শ্রীঘোষ ও তাঁর ইতিহাসের ৫১৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, “আজকের যে কোন বালকও দুখিতে পারে যে পলাশীর যুদ্ধ শুধু যুদ্ধ যুদ্ধ খেলার মত অভিনয় ছাড়া কিছু নয়।”

ইংরেজরা যখন ক্লাইভের বিচার করেছিল তখন ক্লাইভ শাস্তিপ্রাপ্ত চোরের মত কোর্টে দাঁড়িয়ে যে উত্তর দিয়েছিলেন তা গুরুত্বপূর্ণ।

“চল্লিশ লাখ পাউণ্ড ষ্টার্লিং কর এবং সে পরমাণ ব্যবসায় লাভ থেকে পারে এমন একটা সাম্রাজ্য আপনাদের জন্যই আমি জয় করেছিলাম। তার পরিশ্রমিক হিসেবে আপনারা আমার সাথে যে ব্যবহার করেছেন, আমি যেন একজন ভেড়া চোর।”

তাহলে ভারতের মানুষের এতবড় সর্বনাশ সাধন করার উদ্দেশ্য কি? এর উত্তরে অনেকে কথা বলেন। তবে একদল বিচক্ষণ পণ্ডিতের মত সাম্প্রদায়িকতাই প্রধান কারণ।

মুর্শিদাবাদের কথা বলতেই মনে পরে যার মুসলমান মুর্শিদ কুলীর নাম। কিন্তু তিনি মুসলমান ছিলেন বলেই তাঁর অপরাধ ছিল না, বরং তাঁর বড় অপরাধ ছিল তিনি ব্রাহ্মণের সন্তান হয়েও ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। (এ সিয়াটিক সোসাইটির সংরক্ষিত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সম্পাদিত 'ঐতিহাসিক চিত্র' দ্রষ্টব্য)

সিরাজের ইতিহাসে জগতশেঠদের ভূমিকা

পৃথিবীর ইতিহাস সমালোচনা করে জানা যায় ইংরেজরা মুসলমান শক্তির সাথে লড়াই এ সব সময়ই অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরাজিত হয়েছে। তার ফলস্বরূপ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে সারা বিশ্বে মুসলমান রাষ্ট্রের সৃষ্টি। ক্রসেডের যুদ্ধ গুলোতেও মুসলমানদের বীরত্ব অস্বীকার করা সম্ভব নয়।

ভারতে ব্যবসাদার ইংরেজ রাজা হয়ে বসতে পারত না যদি তাদের কথাতে ভারতের বিশ্বাসঘাতকদের সহযোগিতা না থাকত। যে বা যাদের বিশ্বাসঘাতকতায় ইংরেজরা ভারতের মাটিতে তুলানোর পরিবর্তে রাজদণ্ড ধারণ করতে সক্ষম হয়েছিল তাঁদের মধ্যে জগতশেঠদের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ভারতের যোধপুরের একটি দরিদ্র পরিবার অভাবের জ্বালায় হীরানন্দ মাতৃভূমি ত্যাগ করে, বঙ্গদেশের এক গ্রামে একটি পূর্ণ কুটীরে মৃত্যু শায়িতা বৃদ্ধার সেবা করার সুযোগ পান। সে বৃদ্ধার মৃত্যুর পর তার গচ্ছিত কিছু টাকা হীরানন্দের মূলধনে পরিণত হয়। এমনিভাবে এ বংশের মানিকচাঁদের সাথে মুর্শিদকুলী খাঁর ভালবাসা হয়। মানিক চাঁদ কাজ গুছিয়ে বেশ উঁচু ধাপে উঠতে থাকেন। ১৭১৫ খ্রিষ্টাব্দে বাদশাহ ফররুখশাহের কাছে সুপারিশ করে মুর্শিদকুলী খাঁ তাঁকে শেঠ উপাধি দান করেন। হিন্দু মুসলমান ভালবাসা বাসিরই এক ঐতিহাসিক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এ শেঠ উপাধি দান। (রিয়াজুস সানাতিন, Stewarts Hisstory of Bengal)

শেঠ বংশের ফতেই চাঁদই প্রথমে জগতশেঠ উপাধি প্রাপ্ত হন। আবার রিয়াজুস সানাতিনে ২৭৪ পাতায় পাওয়া যায় মুহাম্মদ শাহ ও জগতশেঠ উপাধি দিয়েছিলেন, তার সাথে মতির মালা এবং কয়েকটি হাতী। সম্রাট মুহাম্মদ শাহকে শেঠজীরা তোষণ ও সেবায় এত মুগ্ধ করেন যে, মুর্শিদকুলী খাঁর উপর একবার বিরক্ত হয়ে ফতেই চাঁদকেই নবাব করতে চেয়েছিলেন। মুর্শিদকুলী খাঁর মৃত্যুর সময়ে তাঁর টাকা শেঠদের বাড়ীতে যা জমা রাখা ছিল তার পরিমাণ সে বাজারের সাতকোটি টাকা যা শেঠজীরা কোনদিন ফেরত দেন নি।

(মুর্শিদাবাদ কাহিনী, ৫৬ পৃ. নিখিল চন্দ্ররায় দ্রঃ)

এ অর্থই যত অনর্থের মূল। সারা ভারতে বহু স্থানে শেঠদের গদী ছিল। ইংরেজরা প্রথম শেঠদের হাত করেন এবং শেঠরা যত টাকা প্রয়োজন দিতে প্রতিশ্রুতি হন। তারপর জগতশেঠের বাড়ীতে গোপন বৈঠক বসে। সে সভাতে সাহেবদের সাথে সারা ভারতকে তথা সিরাজকে ধ্বংস করতে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা হচ্ছেন জগতশেঠ, রাজা মহেন্দ্ররায় (দুর্লভ রায়) রাজা রামনারায়ণ, রাজা রাজ বল্লব, কৃষ্ণদাস ও মীরজাফর প্রভৃতি।

একজন প্রস্তাব করেন যখনকে নবাব না করে হিন্দু নবাব করার। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র মুসলমান মীরজাফরের দিকে দৃষ্টি দিয়ে লজ্জিত ও থতমত খেয়ে বলেন মীরজাফরকেই নবাব করে আমরা সিরাজকে সরাতে চাই। উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানগণ ক্ষেপে উঠবে না, মুসলমান নবাবের পরিবর্তে মুসলমান নবাব মাত্র। অনেক বাদানুবাদের পর জগতশেঠ বলেন রাজাকৃষ্ণ চন্দ্রের বখাই যুক্তি সঙ্গত। 'আমরা কেউ নবাব হলে অন্য বিপদ আছে।' সাথে সাথে এ মত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে গেল।

তাই বলা যায়, ভারতে ইংরেজ রাজ্যই শুধু তাদের গোলাগুলি আর মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতাতেই প্রতিষ্ঠিত নয় বরং শেঠ জীদের বিশ্বাসঘাতকতাই এর পশ্চাতে প্রধানতম সহায়ক।

উল্লেখ করা যেতে পারে শেঠজীদের দেশদ্রোহীতা বা বিশ্বাস ঘাতকতা মীর জাফরের তুলনায় কোন অংশেই কম ছিল না এবং শেঠজীদের বিপুল অর্থ সাহায্যই ইংরেজদের এমন দুঃসাহসিক অভিযানের গোড়াপত্তন। ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ ও এ বিরাট সত্যকে একেবারে হজম করতে পারেন নি, তাই বলেছেন - "The rupees of the Hindu banker, equally with the sword of the English colonel contributed to the overthrow of the Mahammedan power in Bengal." বাংলায় মুসলমান শক্তিকে ধ্বংস করতে (ভারতে পরাধীন করতে) ব্রিটিশ সেনাপতির তরবারির সাথে হিন্দু ধনপতিদের অর্থ সম্ভারও সমান ভাবে সহযোগিতা করেছিল।

শেঠজীরা শুধুমাত্র ইংরেজদের হাতেই অর্থ দেন নি, সিরাজের সৈন্যদের পর্যন্ত পরমানে অর্থ সরবরাহ করে ইতিহাসকে কলঙ্কিত করেছেন। আরও দুঃখের কথা, সিরাজকে হত্যা করার প্রস্তাব ইংরেজ সর্দারকে এ জগতশেঠই দিয়ে দিয়েছিলেন।

'মুর্শিদাবাদ কাহিনী'র লেখক নিখিত বাবু বড় দরদ দিয়ে লিখেন হতভাগ্য রাজ্যহারা হইয়া অবশেষে প্রাণ ভিক্ষার জন্য প্রত্যেকের পদতলে বিলুপ্তিত হইয়াছিল তাহারা প্রাণ দানের পরিবর্তে যদি প্রাণ নাশের কেহ সম্মতিও দিয়ে থাকে তাহা হইলে তাহার ঘৃণিত ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক যে সর্বদা নিন্দনীয় এ কথা মুক্ত বলা যাইতে পারে।"

জগতশেঠের মৃত্যু হয়েছিল উচ্চ পর্বত থেকে নিচে নিক্ষিপ্ত হয়ে। পৃথিবীর প্রখ্যাত ধনী বংশ দরিদ্রতর থেকে সৃষ্টি হয়ে দরিদ্রতম গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে তাদের ভগ্নস্থূপের পাশে বিচরণ করছে।

সিরাজুদ্দৌলার বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ

বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজুদ্দৌল্লা সম্পর্কিত ইতিহাসকে সাতিহ্য, নাটক, উপন্যাস, গ্রামোফোনরেকর্ড ও সিনেমা প্রভৃতিতে প্রচার দ্বারা যে ভাবে কলঙ্কিত করা হয়েছে তা অত্যন্ত পরিতাপের।

নবাব নাকি চরিত্রহীন ও মদপায়ী ছিলেন। তিনি নাকি নিষ্ঠুর ছিলেন-এ অপবাদ প্রমাণিত হয় তাঁর অন্ধকূপ হত্যার দ্বারা। দুষ্ট জন ইংরেজকে ছোট্ট একটি অন্ধকার কক্ষে খাদ্য, পানীয় ও বাতাসের অভাব ঘটিয়ে হত্যা করা হয়েছিল বলে নিরীহ সিরাজের নামে কলঙ্ক দেয়া হয়েছে। তাছাড়া আরও বহু অভিযোগ আছে সিরাজের নামে।

আমাদের দেশে ইংরেজদের দালালির দলে যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন তাঁরা আজও সিরাজকে ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদের সম্মানে ভূষিত করতে পারেন নি। এছাড়া বিশ্বাসঘাতকতা যতটুকু হয়ে ছিল সিরাজকে ঘিরে তার সবটুকুই যেন চাপানো হয়েছে দুখ্যাত মুসলমান মীরজাফরের ঘাড়ে। কিন্তু প্রকৃত ইতিহাসে তা বলেনা।

একথার সত্যতা সম্পর্কে পূর্বাচ্ছেই কিছুটা আভাস দেয়া হয়েছে 'সিরাজের ইতিহাসে জগতশেঠদের ভূমিকা' পর্যালোচনায় এবং আরও পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠবে পরবর্তী আলোচনায়।

সিরাজুদ্দৌল্লা অল্প বয়সে একবার মদপানের কলঙ্কে কলঙ্কিত হয়েছিলেন। কিন্তু আলিবর্দীর প্রাণ প্রিয় সিরাজকে ডেকে মদ আর কোনও দিন স্পর্শ না করার জন্য কুরআন

ছুঁয়ে শপথ করতে বলেন। তাতে সিরাজ বলেছিলেন, “নানা, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। সিরাজ জীবনে কোন দিন মদ স্পর্শ করবে না। যদি করি তাহলে আমি আপনার নাতি নামের কলঙ্ক। বলাবাহুল্য, সিরাজ তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন সারা জীবন।

এতদ্ব্যতীত নারী লোলুপতার যে মিথ্যা অপবাদটি তাঁর উপর আরোপ করা হয়েছে তাও ভিত্তিহীন এবং এটা ইংরেজ ও তাদের দালালদের সৃষ্ট কৌশল মাত্র।

গ্রামোফোন রেকর্ডে সিরাজের কণ্ঠে বলা হয়—“প্রথম যৌবনের উদ্দানায় নারী অনেক চেয়েছি, পেয়েছিও” ইত্যাদি। যখন বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা তথা ভারতের ভাগ্য নিয়ে যুদ্ধ চলছে মীর মর্দান নিহত-সৈন্যদের বিশ্বাসঘাতকতায় সিরাজের চোখে অশ্রু, তখন রেকর্ডে আমরা শুনি তিনি আলেক্সাকে নিয়ে প্রেম লীলায় মত্ত! এতবড় ভুল বাঙালী হয়ে বাঙালীর বিরুদ্ধে মানুষ কি করতে পারে? তা কি সম্ভব? তবু ও কাল যা সম্ভব ছিল না, আজ হয়ত তা সম্ভব এবং আগামীতেও কল্পনা করা আকাশ কুসুম নয় যে, আজকের সুধী সমাজ গড়ে তুলবে পূর্ব পুরুষদের মিথ্যা ইতিহাসের বিরুদ্ধে কঠিন প্রতিরোধ।

শ্রী সুধীর কুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, “সিরাজ অতিরিক্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি প্রায় নদীতে বন্যার সময় নৌকা হইতে আরোহীদিগকে উল্টাইয়া দিয়া ডুবাইয়া দিয়া এক সাথে এক দুই শত যুবক, যুবতী, স্ত্রী, বৃদ্ধ, শিশু সাতার না জানিয়ে পানিতে নিমজ্জিত হওয়ার নিষ্ঠুর দৃশ্যটি উপভোগ করিয়া আনন্দ লাভ করিতেন।”

এ প্রমাণহীন মিথ্যা কাহিনী পড়ে হয়ত অনেকে বলতে পারেন সুধীর বাবু তেমন দামী নামী লোকের মধ্যে গণ্য নন সুতরাং গুরুত্ব না দেয়াই ভাল। কিন্তু বিখ্যাত কবি, উচ্চ ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালী বাবু বা নবীনচন্দ্র সেন যদি অনুরূপ বা ততোধিক মারাত্মক কিছু বলে না লিখে থাকেন তবে সুধীর বাবুরই বা লেখা দোষের হবে কেন? নবীনচন্দ্র সেন শুধু নৌকায় নরবের নরহত্যার কথা লিখেই ক্ষান্ত হন নি বরং আরও নতুন সৃষ্টি করেছেন। বিশেষ করে ‘গভিনীর বক্ষ বিদারক’ এর ঘটনা অর্থাৎ সিরাজ নাকি জীবন্ত গর্ভবতী নারীর পেট কেটে সন্তান দেখতেন। এমনি আরও কত আজগুবি আর অবাস্তব কিংবদন্তীর অবতারণা করে সিরাজের ইতিহাসকে কলঙ্কিত করার জঘন্যতম প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। সিরাজের অন্ধকূপ হত্যার ইতিহাসটিও এরই প্রতিচ্ছবি। যার সত্যতা সম্পর্কে অমর সাক্ষী নাকি কলকাতার ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত কুখ্যাত মনুমেন্ট।

অন্ধকূপ হত্যার পশ্চাতে নিষ্ঠুর ঐতিহাসিকতা

সিরাজের অন্ধকূপ হত্যার কাহিনী ইতিহাসে এ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। শাসকদের চরিত্র মসী লেপনের এক অদ্ভুত ঐতিহাসিক প্রাকটিক্স।

তাই এ অন্ধকূপ হত্যা (Black Hole) সম্বন্ধে একটু আলোচনা দরকার। সুধীর বাবু তাঁর রচনায় বাংলা তথা ভারতের কল্যাণের জন্য বেশ বুদ্ধিমানের ও মস্তিষ্কের উর্বর পরিচয় দিতে চেষ্টা করে গেছেন। ‘অন্ধকূপ হত্যার’ চেষ্টা সুধীর বাবু নন, তিনি হচ্ছে ইংরেজ অনুচর মিঃ হলওয়েল (Hal well)। এ হল ওয়েলকে শ্রী সুধীর বাবু সত্যবাদী ও প্রকৃত ঐতিহাসিকের মর্যাদা দিয়েছেন। সুধীর বাবু মোটামুটি চারটি পয়েন্টের উপর চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন। প্রথমত—যেহেতু হলওয়েল এ ঘটনার নায়ক সেহেতু অন্ধকূপ সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য ও বক্তব্য অবশ্যই গ্রহণযোগ্য।

দ্বিতীয়ত—মিঃ হলওয়েলের প্রকাশিত তথ্য প্রমাণ করে তাঁরা অন্ততঃ মিথ্যাবাদী নন। অতএব তাঁদের কথা সত্য।

তৃতীয়ত—যদি এ কথা মিথ্যা হত তবে Dark এবং Councillor গণ এটাকে মিথ্যা প্রমাণ করার চেষ্টা করেননি কেন?

চতুর্থত—হলওয়েলের স্বজাতির মধ্যে যারা তাঁর শত্রু তাঁরাই বা প্রতিবাদ করেননি কেন? অতএব উপরোক্ত সত্যতার ভিত্তিতে কলিকাতায় Halwell Monument (হল ওয়েল মনুমেন্ট) রচিত।

এক্ষণে উপরের প্রমাণাদিতে একথাই প্রমাণিত হয় যে, যা রটে তা কিছুও বটে অর্থাৎ সিরাজের অন্ধকূপ হত্যার কাহিনীকে নিছক গল্প বলে বলে উড়িয়ে দেয়া যাবে না। কিন্তু তবুও বাঁধা বুলিতে মুঞ্চ হবার চেয়ে একটু যুক্তি তর্কের আশ্রয়ে পূর্ণ তথ্যটি আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা নিঃসন্দেহে বুদ্ধিমানের পরিচয়।

এবার মিঃ হল ওয়েলের চরিত্রটা যাঁচাই করা কর্তব্য। ঐ হল ওয়েল সাহেবই মীরজাফরকে সিংহাসনচ্যুত করার ষড়যন্ত্র করে মীর কাশিমকে সিংহাসনে বসিয়েছিলেন এবং তিন লক্ষ নয় হাজার তিনশত টাকা পুরস্কার পেয়েছিলেন। এর জীবন্ত প্রমাণ ১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দের Report of the Committee of the House of commons দৃষ্টব্য। এ হল ওয়েলই বিলেতে পত্র লিখেছিলেন যে, “নবাব মীর জাফর আলী খাঁর জঘন্য চরিত্রের কথা কি আর জানাব! তিনি ১৭৮৬ খ্রিষ্টাব্দে জুন মাসে নওয়াজেস মহিষী ঘষেটা বেগম, সিরাজের মা আমিনা বেগম ইত্যাদি সম্ভ্রান্ত মহিলাদের ঢাকার রাজ কারাগারে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করেছেন।”

এ পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে হলওয়েল যে মন্তব্য এক বোকা ও মিথ্যাবাদী তা প্রমাণিত। কারণ হলওয়েল যখন ঢাকায় রাজমহিলাদের মৃত্যু কাহিনী রচনা করেন তার পরও তাঁরা স্বশরীরে জীবিতা ছিলেন। (Long's Silicion from the crecord of India. Vol- 1 দ্রঃ)

letter to court, 1776 Suplement পাঠ করে জানা যায় হলওয়েলের এ বানানো কাহিনী পরে অনেকে মিথ্যা বলতে বাধ্য হয়েছে।

হলওয়েলের হিসাব :-

মিঃ হলওয়েলের লেখাতেও প্রমাণ হয় সিরাজের কলকাতা আক্রমণের পূর্বে কলকাতা দুর্গে ষাটজন মাত্র ইউরোপীয়ান ছিলেন। এ ষাট জনের মধ্যে গভর্নর ড্রেক, সেনাপতি, মিনচিন, চার্লস্‌ডগলাস, ওয়েভার ব্যাকরণ, ক্যাপ্টেনহেনরী, লেঃ মেপল দফট, রেভারেণ্ড ক্যাপ্টেন, ফ্রাঙ্কল্যান্ড মানিংহাম ও গ্রান্ট প্রভৃতি দশজন বীরপুরুষ পালিয়ে গিয়েছিলেন।

তাহলে হলওয়েলের মতে ষাট থেকে দশ গেলে বাকী থাকে পঞ্চাশ অর্থাৎ সিরাজের হাতে মাত্র পঞ্চাশ জনের প্রাণ হানি হয়। কিন্তু এ হলওয়েল আবার কি করে শতাধিক লোকের মৃত্যু সংবাদ পরিবেশন করেছেন তা বড়ই আশ্চর্যের বিষয়। এ তথ্যগুলোর প্রমাণ মেলে “Halwell's Letter to the Honble the court of direclors, dated Fala, 30 the Nov, 1756 Part 36” দৃষ্টব্য।

পূর্বে বলা হয়েছে মিঃ ড্রেকের দুর্গ পরিত্যাগের পর ১৭০ জন দুর্গের জীবিত ছিল। কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শী মিঃ গ্রে বলেছেন, ১৯ শে জুন রাতে একজন ইংরেজ সৈন্য ৫৭ জন ডাচ সৈন্যসহ শত্রু পক্ষে যোগদান করে। প্রমাণ স্বরূপ Gray's Letter, Hill Vol-1, P - 108 দৃষ্টব্য।

আবার মিঃ ওয়াটস বলেছেন, মিঃ ড্রেকের দুর্গ ত্যাগের পর এবং দুর্গের পতনের পূর্ব পর্যন্ত প্রাচীরের উপরেই নিহত হয় ৫০ জন এবং দুর্গের পতনের পূর্ব পর্যন্ত প্রাচীরের উপরেই নিহত হয় ৫০ জন সৈন্য। Hill : Vol 1, P- 88 তে উক্ত তথ্যের প্রমাণ মেলে।

এদিকে হলওয়েল বলেছেন গোলন্দাজ বাহিনীর ৩১ জন সৈন্য ২০ শে জুনের দুপুরের পূর্বে নিহত হয়। প্রমাণ : Hill : Vol - 1. P - 114 দ্রঃ।

মিঃ মিলস বলেন দুর্গের পতনের সময় ১৮ জন সৈন্য পলায়ন করেন।

প্রমাণ : Vol - 1 P - 44

মিসেস ম্যাসির পত্রে বুঝা যায়, তাঁর ভ্রাতা ও মিঃ পলক এ সময় পলায়ন করেন।

প্রমাণ : Hill : Vol - 1, P - 182 দ্রষ্টব্য। কিন্তু মিঃ পলকের নাম মিঃ মিলসের তালিকার মধ্যে পাওয়া যায় না।

তাহলে দেখা যাচ্ছে ১৭০ জন লোকের মধ্যে ১৫৭ জন দুর্গ পতনের পূর্বে নিহত হয় বা পলায়ন করে। সুতরাং মাত্র ১৩ জন দুর্গের মধ্যে থাকে বা ছিল।

অন্যান্য অনেক কাগজ পত্রে বা রেকর্ডে দেখা যায় দুর্গ সংলগ্ন পরিখা বা খালে সাঁতার দিয়ে পালাবার সময় অনেকে ডুবে মারা যায়। প্রমাণ : Hill Vol - 1, P - 50, 208, 293, Vol-3, P - 169 দ্রষ্টব্য।

ক্যাপটেন কলিন্স এই ভাবেই মারা গিয়েছিলেন। প্রমাণ Hill Vol-3, P - 72, 105 দ্রষ্টব্য। এইব ইতিহাসিক হিসাব বা গবেষণার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে মাত্র ৮ থেকে ১০ জন ইংরেজ দুর্গে বর্তমান ছিল।

তাইএ হলওয়েলের কুকীর্তির স্বরূপ দেখে নিরপেক্ষ দৃষ্টি সম্পন্ন বাংলার বীর সন্তান শ্রী অক্ষয় কুমার মৈত্রের বলেন, “মুসলমানদের বাংলার বীর কথা ছাড়িয়া দাও। তাঁহার না হয় স্বজাতির অলঙ্কার বিলুপ্ত করিবার জন্য স্বরচিত ইতিহাস হইতে এই শোচনীয় কাহিনী সযত্নে দূরে রাখিতে পারেন। কিন্তু যাঁহারা নিদারুণ যন্ত্রণায় মর্মপীড়িত হইয়া অন্ধকূপ কারাগারে জীবন বিসর্জন করিলেন তাঁহাদের স্বদেশীয় স্বজাতির সমসাময়িক ইংরাজদিগের কাগজ পত্র অন্ধকূপ হত্যার নাম পর্যন্তও দেখিতে পাওয়া যায় না কেন?”

শ্রীমতি হেমলতা দেবী লিখিত ‘ভারত বর্ষের ইতিহাস’ পুস্তকের সমালোচনায় শ্রী রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর তাঁর লেখা “ইতিহাস” পুস্তকের দ্বিতীয় সমুদ্রে ১৫৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, “সিরাজুদ্দৌল্লার রাজ্য শাসন কালে অন্ধকূপ হত্যার বিবরণ লেখিকা অসংশয়ে প্রকাশ করিয়াছেন। যদি তিনি শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার মৈত্রের ‘সিরাজুদ্দৌল্লা’ পাঠ করিতেন তবে এই ঘটনাকে ইতিহাস স্থান দিতে নিশ্চয়ই কুণ্ঠিত হইতেন।”

পলাতক ইংরেজ বীরপুরুষগণের পলায়নের বিবরণে বা সিরাজের প্রতি পিগটের পত্রে অথবা সিরাজকে লিখিত ওয়াটগণের ও ক্লাইভের বীরত্বপূর্ণ পত্রে অন্ধকূপের চরম পত্রে ও অন্ধকূপের উল্লেখ নেই।

এমন কি আলিনগরের সন্ধির কাগজেও তার উল্লেখ নেই।

ক্লাইভ কোর্ট অফ ডিরেক্টরকে যে পত্র লিখেছেন তাতে সিরাজকে কেন সিংহাসনচ্যুত করা হয়েছে তার বিবরণ আছে কিন্তু অন্ধকূপ হত্যার কোন কথাই সেখানে নেই। অথচ সুধীর কুমার আর নবীন কুমারের নবীন কলম নবীশতায় তাকে জোর সোরে প্রতিপন্ন করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা করা হয়েছে। তাই তাদের এহেন ধৃষ্টতা বহু দৃঢ়চেতা সং মানুষ তথা অক্ষয় কুমার মৈত্র, বিহারীলাল সরকার, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, নিখিত নাথ রায়, কবি রবীন্দ্রনাথ এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের বীরনেতা নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু প্রভৃতি অনেকের মনকে বেদনা দিয়েছিল।

শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমারের আন্দোলন এবং কলমের অগ্নিবর্ষণকে নেতাজী দারুণভাবে সমর্থন জানিয়েছিলেন। ফলে ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে ২৪ শে মার্চ কলকাতার হিন্দীক্যাল সোসাইটির মাধ্যমে এসিয়াটিক সোসাইটির ঘরে এক বিরাট সভায় উপস্থিত বঙ্গবীর অক্ষয়কুমার মৈত্রের, জে, এইচ লিটল, এফ, জে মানাহন প্রমুখের সম্মুখে ঐ অন্ধকূপ হত্যার ইতিহাস উপন্যাস, উপকথার মত নিষ্কিণ্ড হয়, অর্থাৎ ঘটনাটি মিথ্যা বলে স্বীকৃতি পায়। তার কিছুদিন পরে জে, এইচ, লিটল Calcutta Historical Society এর ম্যাগাজিন বা পত্রিকায় তা প্রকাশ করে দেন এবং অন্ধকূপের জন্য বলা হয় Gigantic hoax অর্থাৎ প্রকাণ্ড ধাপ পাবাজী। উপরোক্ত তথ্যাদি Bengali past and present, Vol - XI, Serial No_1, P, P: - 75 - 10 'থেকে সংগৃহীত।

সিরাজ বিদ্রোহী ইংরেজদের কল্পিত অন্ধকূপে প্রায় দু'শ জন লোকের বন্দীর কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সে ঘরটির আয়তন হচ্ছে মাত্র ১৮×১৪। সুতরাং স্থান সংকুলার নয় না দেখে কামিয়ে ১৪৬ জন ধরা হয়েছে; কিন্তু শয়তানের দল যখন দেখল এ পরিমাণ স্থানে ১৪৬ জনেরও স্থান সংকুলান থেকে পারে না তখন সাথে সাথে সর পাল্টে ১৪৬ থেকে মাত্র ৬০ সংখ্যায় এনে দাঁড় করানো হল। এরই নাম ইতিহাস।

ব্যবসাদার কবি ও সাহিত্যিকদের নীতি হচ্ছে, ‘মামার জয়’ বলার মত, অর্থাৎ যখন যোগদিকে বাতাস বইতে সেদিকেই লিখে যাওয়া, স্রোতের টানে ভেসে যাওয়া। বীর তাঁরাই যারা প্রয়োজনীয় বিষয় সকল বাধা বিপত্তি উপেক্ষা করেও সমাজে সামনে তুলে ধরতে সাহসী হন। তাই অক্ষয় কুমার, সুভাষ বোস প্রভৃতি বীর সন্তানদের প্রতি ধন্যবাদ যে, যখন দেশ স্বাধীন হয়নি সে সময় ইংরেজদের বিরুদ্ধে কথা বলা বা আন্দোলন করা খুবই বীরত্বের পরিচয় সন্দেহ নেই।

১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দে জুন মাসে সুভাস বোস এ অন্ধকূপ হত্যার মনুমেণ্টটি ভেঙ্গে ফেয়ার দাবী করেন। ফলে বিরাট আন্দোলন হয়। শত্রু ইংরেজ এবং মুসলমান বিদ্রোহী অনেক অমুসলমানই সেদিন অবাক অথবা অসন্তুষ্ট হন কিন্তু সত্যের জয় অবশ্যজ্ঞাবী, তবে ধৈর্যের প্রয়োজন। ইংরেজ। ইংরেজ রাজত্বের রাজধানী কলকাতার এ মনুমেণ্ট ইংরেজকে ভেঙ্গে ফেলতে বাধ্য থেকে হয়।

এদিকে গিরিশ ঘোষ ‘সিরাজউদ্দৌল্লা’ নামে একটি সঠিক সুন্দর এর সাহসের সঙ্গে লিখলেন। তার উপর অক্ষয় বাবুর ‘সিরাজউদ্দৌল্লা’ নামে একটি সঠিক সুন্দর বই সাহসের সাথে লিখলেন। তার উপর অক্ষয় বাবুর ‘সিরাজউদ্দৌল্লা ও মীরকাসিম’ অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করে। পরে সত্যচরণ শাস্ত্রী একখানি বই লিখলেন তার নাম ‘জালিয়াত ক্লাইভ।’ তারপর সখারাম গণেশ দেউস্কর ‘দেশের কথা’ নাম দিয়ে এ সম্বন্ধেই আর একখানা বই লিখলেন। এখানিও বেশ উপাদেয় বই। এর দু-একটি বাক্য এখানে তুলে ধরি—“ইংরাজ ইতিহাস লেখকেরা হিন্দু ছাত্রদের হৃদয়ে মুসলমান বিদ্বেষ প্রজ্জ্বলিত রাখিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। পরিতাপের বিষয় কোন কোন অদূরদর্শী হিন্দু লেখক বাক্য নাটকাদিতে অনর্থক মুসলমান ভ্রাতাদিগের নিন্দাবাদ করিয়া ইংরাজের উদ্দেশ্য সিদ্ধি বিষয়ে সহায়তা করিতেছেন।”

উক্ত মন্তব্যটি সুগভীরভাবে পাঠক-পাঠিকাবৃন্দকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, সমাজের বর্তমান অবস্থা একেবারে সখারাম মহাশয়ের লেখার সাথে সাংঘাতিক ভাবে সঙ্গতি রক্ষা করে। যাই হোক, বিরাট ইতিহাস সমুদ্রের মাত্র এক পাত্র নোনা পানিকে সিরাজ কেন্দ্রিক কলমে পরিশ্রুত করা হয়েছে কিন্তু বাকী তথ্য আর কতদিন দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যতের সুভাষ আর অক্ষয়ের অপেক্ষা প্রতীক্ষা করবে জানি না।

—আবার এদিকে গিরীশচন্দ্র ঘোষ মহাশর একটি নাটক লিখছেন যা সহজে বিধাত্ত ও চলতি নাটকের একেবারে উল্টা। সাধারণ মানুষের মস্তিষ্ক একটু নড়ে উঠল — তাহলে ইতিহাস যা শুনি না তা ঠিক না। কবি নবীনচন্দ্র সেন এ বইটি পড়ে একটি পত্র লিখলেন গিরীশচন্দ্রের নামে তাও এখানে তুলে ধরা হল—

ভাই গিরিশ

বিশ বৎসর বয়সে আমি পলাশীর যুদ্ধ লিখিয়াছিলাম, আর তুমি ষাট বৎসর বয়সে ‘সিরাজদ্দৌলা’ লিখিয়াছি। আমি বিদেশী ইতিহাসে যেভাবে পাইয়াছি সেইভাবে চিত্রিত করিয়াছি কিন্তু তুমি সিরাজের নিখুঁত চিত্রটি অঙ্কিত করিয়াছ। অতএব তুমি আমার অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী, আমার অপেক্ষা অধিক ভাগ্যবান।”

অত্যন্ত দুঃখের কথা সিরাজের ইতিহাসে শুধু যেন মনে হয় মুসলমান মীর জাফরের কথা, যেন প্রমাণ হয় মুসলমান জাতি মানেই বিশ্বাসঘাতক জাতি। তাই আজ মুর্শিদাবাদ জেলাও মুসলমান জাতি পর্যন্ত বাংলার বাতাসে যেন কলঙ্কিত। কিন্তু প্রকৃত ইতিহাস এই কথাই বলে, ইংরেজদের বিরুদ্ধে যে স্বাধীনতার আকাশ ছোঁয়া অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত হয়েছিল তা মুসলমানদের হাতেই। “সিপাহী বিদ্রোহ” তার জলন্ত প্রমাণ, আর এই “সিপাহী বিদ্রোহের” গোড়াপত্তনের দাবীতে যে জল গৌরবের অধিকারী ইতিহাস মণ্ডিত উল্লেখযোগ্য স্থান মুর্শিদাবাদের সদর শহর “বহরমপুর”। যারা দিলেন খুন, যারা দিলেন জীবন তাঁদের ভাগ্যে পুরস্কার পরিবর্তে তিরস্কার। হায়! এই নাকি ইতিহাস!

সিরাজ জানতেন মীর জাফরের হাবভাব। তাহলে এখানে একটা প্রশ্ন হবে এটাই যে, সিরাজ যদি জানতেন মীর জাফরের দ্বারা ভাগ্যকাশেদুযোগ উয় হবে তবে কেন তাঁকে পূর্বাচ্ছেই সরিয়ে দেন নি? স্বাধীন ভারতের প্রতি সিরাজের এটা কি নিষ্ঠুরতা নয়? উত্তরে বলব-না। কারণ মীর জাফর সিরাজের সম্মুখে পবিত্র কুরআন ছুঁয়ে শপথ করে বলে ছিলেন যে তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে সিংহাসন রক্ষা করতে চেষ্টা করবেন। তাই পবিত্র কুরআনের সম্মানার্থে বিশ্বাসঘাতকতার পূর্বেই তাঁকে শাস্তি দিতে পারেন নি। একা নিষ্ঠুরতা না উদারতা অনুমান সাপেক্ষ।

বীর সিরাজ ওয়াট সাহেবকে সপরিবারে বন্দী করে কাশিম বাজার থেকে মুর্শিদাবাদ নিয়ে এসেছিলেন। সিরাজ জননী আমিনার কোমলতায় সিরাজের করুণাবতী স্ত্রী লুৎফুনুসা তাঁদের মুক্তি দিয়েছিলেন। যখন সিরাজ ঘটনাটা শুনলেন তখন গর্ভধারিণী মা বা সহধর্মিণী স্ত্রী কাউকেই তিরস্কার অথবা কৈফিয়ত চাইবার কোন ভূমিকাই তিনি নিতে পারেন নি। এটাও সিরাজের সহনশীলতা, সহিষ্ণুতা ও উদারতা না নিষ্ঠুরতা তারও বিবেচনার ভাব পাঠক পাঠিকাদের উপর থাকল।

রাজা রাজবল্লভ অলিবর্দীর আমলে প্রজাদের সর্বনাশ সাধন করে যে বিরাট অঙ্কের ধন সঞ্চয় করেছিলেন এবং তাঁর পুত্র কৃষ্ণ রায় মারফত সে প্রচুর অর্থ যখন ইংরেজদের ঘাঁটিতে পাচার হয়ে ছিল তখন সিরাজ রাজবল্লভ ও তাঁর পুত্র কৃষ্ণরায়ের উপর স্বাভাবিকভাবেই অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। ঠিক তার পরেই তিনি কলকাতার দুর্গ নির্মাণের অপরাধে কলকাতা আক্রমণ করেছিলেন এবং বিশ্বাস ঘাতক হলওয়েল সাহেব, কৃষ্ণদাস ও উর্মিচাঁদকে ইংরেজদের কাছ থেকে বন্দী করে নবাবের সম্মুখে আনা হল। বলঅবাহল্যা, এ কৃষ্ণদাসের

পাচার করা প্রচুর অর্থই কলকাতা দুর্গ নির্মাণে ইংরেজদের হাত শক্তি করে ছিল। তাই কৃষ্ণদেবের কাণ্ডকে কেন্দ্র করেই সিরাজের কলকাতা অভিযান। সিরাজ যখন তাঁদের হাতের মুঠোয় পেলেন তখন তাঁরা জানতের প্রাণদণ্ডই হয়ই আমাদের যোগ্য শাস্তি। কিন্তু তিন জনেই ক্ষমা প্রার্থনা করলেন আর সিরাজ প্রত্যেককে ক্ষমা করে ব মুক্তি দিয়ে ক্ষমাধর্মের অতুলনীয় মাছাখাকে অক্ষুণ্ণ রাখলেন। এরই নাম বোধ হয় নিষ্ঠুরতা?

সিরাজের ঐতিহাসিক নিমজ্জন

সিরাজ আওরঙ্গজেবের ন্যায় ইসলামের পূর্ণ প্রতীকও যেমন ছিলেন না তেমনি একেবারে ন্যায় স্বধর্মের নিপাত সাধনে অগ্রগামী নায়ক ও ছিলেন না বরং তাঁকে ধর্মভীরু বলার পথে কোন প্রতিবন্ধক নেই। কেননা যখন তিনি বন্দী ছিলেন তখন তাঁর কক্ষে মহম্মদীবেগ উলঙ্গ তরবারী হাতে প্রবেশ করলেই সিরাজ অনুমান করেছিলেন তাঁর মৃত্যু সংবাদ আগত। তখন সিরাজ কাতর কণ্ঠে বললেন—‘মুহম্মদী বেগ! তুমি আমার কতল করতে এসেছ?’ মুহম্মদী বেগ তখন নিশ্চুপ। অন্যবের মুখের দিকে তাকাতেও যেন সে অপরাগ। আবার কাতর কণ্ঠে নবাব বলেন—‘আমাকে কি তোমার সামান্য একটা অসহায় গরীবের মত বেঁচে থাকতেও দেবে না?’ এবার মুহম্মদী বেগ গলাটা সামান্য পরিষ্কার করে বলল—‘না’ তারা তা দেবে না’, ‘আমিও বাঁথেকে চাইনা, হুসেন কুলীর মৃত্যুর প্রতিশোধ হোক’। বাংলা বিহার, উড়িষ্যা তথা সারা ভারতের দেদীপ্যমান আলোকে বর্ণিকা নবাব সিরাজদ্দৌলার কোটাকোটি দেশবাসীর চোখের আড়ালে অশ্রু মুছে আবার কাতর কণ্ঠে বলেন—‘আমাকে একটি বার সুযোগ দাও, আল্লাহর সন্নিধানে যাবার পূর্বে শেষ দুই রাকাত নামায পড়ে নিই।’ মুহম্মদী বেগের চক্ষুদ্বয় তখন বর্ষণোন্মুখ। অশ্রু বর্ষণ মেঘে কিছু দেখতে পায় না সে, উত্তরও দিতে পারে না। নবাব বুঝলেন মৌনং সম্মতি লক্ষণম্। তাই জীবনের অন্তিম প্রার্থনা ময় নামাযে আত্মনিয়োগ করলেন। নামায তখনও শেষ হয় নাই, দূরে বাঁশির সংকেত শ্রবণে মুহম্মদী বেগ প্রার্থনারত অবস্থাতেই তরবারী চালনা করলো নবাবের পিঠের উপর। ঐ আঘাতেই লুটিয়ে পড়লেন নবাব। অতপর আরও কয়েকটি আঘাত করল মুহম্মদী বেগ। সিরাজ শুধু একবার বলেছিলেন, ‘আল্লাহ্ তুমি আমায় ক্ষমা কর’। তারপর রক্তাক্ত সিরাজ শুধু আল্লাহ্ আল্লাহ্ শব্দ করতে করতেই চির বিদাই নিলেন।

এ ঘটনায় অল্পজ্ঞানী পাঠক, মুসলমান ভূত কত বিশ্বাস ঘাতক ও নিষ্ঠুর থেকে পারে তারই শিক্ষা পাবে কিন্তু সূক্ষ্ম ও সুস্থ জ্ঞানীর নিকট ধরা পরবে আসল রহস্য।

ইংরেজরা যখন সিরাজকে পিঞ্জিরাবদ্ধ পাখীর মত বন্দী করেছিল তখন সিরাজের সমস্ত চাকর চাকরানী আর সিরাজের ছিল না বরং ইচ্ছার বিরুদ্ধে ও ক্লাইভ আর ওয়াট সের হাতের পুতুল হয়ে গিয়েছিল। এমতাবস্থায় ইতিহাসে মুসলিম চরিত্রকে কলঙ্কিত করবার পরিকল্পিত বুদ্ধিতেই সিরাজের সাহায্যপুষ্ট মুহম্মদী বেগ তাতে রাজী না হওয়ায় তারও প্রাণদণ্ড হবে বলে তাকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল। তখন অন্যান্যপায় নিরক্ষর বোকা মুহম্মদী বেগ অশ্রু সঞ্চরণ করেও মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই হত্যা করতে বাধ্য হয়েছিল। যদি মুহম্মদ বেগ শিক্ষিত ও জ্ঞানী হত তাহলে হয়ত ইংরেজদের আদেশ প্রত্যাখ্যান করে নিজের প্রাণদণ্ডকেই অমৃত জ্ঞানে বরণ করে মীর মর্দান অর মোহনলালের মত ধন্য থেকে পারত। সিরাজ যখন একটু অসহায়ের মত বেঁচে থাকার আবেদন করেছিল তখন মুহম্মদবেগ একথা বলে নি যে, না আমরা তা দেব না। বরং তাঁর ভাষাতে হৃদয়ের অব্যবহিত প্রেমধারাই প্রবাহিত হয়েছিল, ‘না, তারা তা দেবে না।’ এই তারা কারা?

যাই হোক, সিরাজকে হত্যা করে তাঁর মৃত দেহকে একটি বস্তায় ভরে হাতীর পিঠে চড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সিরাজের স্ত্রী মা এবং অনেক আত্মীয় তখন বন্দি। তাঁদের জিজ্ঞেস করা হয়েছিল তাঁরা আলিবর্দীর বিখ্যাত বাগানের আম খেতে চান কি না। অশ্রু সজল নয়নে তাঁরা ইঙ্গিতে সম্মতিই দিয়েছিলেন। তারপর করুণার জীবন্ত ছবি ইংরেজ কর্মচারীর আদেশ অনুযায়ী অর্দ্ধ ভর্তি আমের বস্তা পৌঁছে দেয়া হয়েছিল। নবাব পরিবারের সমস্ত মহিলাদের পক্ষ থেকে একজন বস্তার মুখ খুলতেই দেখতে পেলেন ভিতরে আমও নেই বা অন্য কোন খাদ্য বস্তুও নেই আছে সিরাজের বীভৎস কাঁচা কাটা মাথা। সিরাজ যেন তাঁর গর্ভধারিণী মাকে শেষ দেখা করতে এসেছে। সিরাজের হতভাগী মা প্রিয় পুত্রের মুখের দিকে এক পলক তাকাতেই অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। সখি ফিরে এলে মীর জাফরের অনুচর গোলাম হোসেনের আদেশে তাঁকে পুনরায় কারারুদ্ধ করা হয়।

এদিকে জয়নুল আবেদীন নামক এক দরিদ্র নাগরিকের অনুরোধে সিরাজের খণ্ডিত দেহকে ভাগীরথী নদীর পারে খোসবাগ নামক বাগানে নানাজান আলিবর্দীর কবরের পূর্ব পার্শ্বে সমাধিস্থ করা হল। আবার মৃত নানা ও নাতীর এক ঐতিহাসিক মিলন হয়েছিল মৃত্যুর পরেও। এ প্রসঙ্গে বর্ধমান জেলার এক কবির কবিতার-কিয়দংশ গভীর শ্রদ্ধার সাথে তুলে ধরি—

“আলিবর্দীর কবরের ছায়া সূর্যাস্তের সনে,
ধীরে ধীরে পড়ে সিরাজের গোরে। দেখি ভাবি মনেঃ
আজো বুঝি দাদু ভোলে নাই তারি স্নেহের দুলালটিরে,
আজো বুঝি তারে দুটি বাহু দিয়ে রেখেছে সোহাগে ঘিরে।”
সিরাজের ইতিহাস পৃথক একটা পুস্তকে তুলে ধরই সম্ভব।
তার জন্য বহু ঐতিহাসিক তথ্য আমাদের হাতে মজুত আছে।
কিন্তু এখানে সংক্ষিপ্ত মাত্র জানান হল।

পঞ্চদশ অধ্যায়

সিরাজোত্তর সংক্ষিপ্ত বাংলা

ইংরেজরা ক্লাইভকে নিয়ে খুব গর্ব করত, কি বিরাট বাহাদুরী আর বীরত্বই না তিনি দেখিয়েছিলেন পলাশীর যুদ্ধ ক্ষেত্রে। কিন্তু পলাশীর এটা যে কোন যুদ্ধই নয় বরং সেনাপতি আর গণ্য মান্য কিছু দেশবাসীর আত্ম সমর্পণ ছিল সেকথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। বিলেতি সাহেবদের বিলেতি বীরত্বের ইতিহাস বিলেতে চির স্মরণীয় করে রাখবার জন্য পলাশী আম বাগানের শেষ গুচ্ছ আম গাছটির গোড়ায় মাটি খুঁড়ে গাছটির মূল উপড়ে নেয়া হয়েছে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে। তারপর সগর্বে তা বহন করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বিলেতের মাটিতে। দেশবাসীর দেখার তৃষ্ণা মিটে যাওয়ার পর ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে শ্বেত মার্বেল পাথরে জয়স্বস্ত্য স্থাপন করা হয়েছে। ক্লাইভ মিথ্যা সম্মানের যে বুদ্ধদ নির্মিত গগন চুম্বী অট্টালিকা তৈরী করেছিলেন কিছুদিন পরে সামান্য সূর্যালোকে তা শেষ হয়ে গেল। প্রকাশ হয়ে গেল কোল ভিতরের তথ্য। নানা গুপ্ত দোষ হয়ে গেল প্রকাশিত। তাই হয়ত তাঁর শেষ পরিণতি হল রক্তাক্ত মৃত্যু। অর্থাৎ কাপুরের মত নিজের কণ্ঠে কলুষিত হস্তে ধারাল ক্ষুর ধরে স্বাসনালী কর্তন করে আত্মহত্যার কলঙ্ক নিয়ে ইতিহাসের পাতায় আত্মগোপন করার চেষ্টা করলেন।

এদিকে মীরজাফর ইংরেজদের সুপ্ররিকল্পিত সিদ্ধান্তে বাংলার সিংহাসনে বসেন। তিনি ইংরেজদের হাতে উপটোকনের নামান্তরে মোটা অঙ্কের অর্থ প্রদানের ফলে তাঁর ধনাগারে প্রায় শূন্য হয়ে পড়েন। অবশেষে অর্থ দিতে অপারগ হলে তাঁকেও হলওয়েলার কৌশলে সিংহাসনচ্যুত করে তাঁরই জামাতা মীরকাশিমকে সিংহাসনে বসান হয়। মীরকাশিম বেশ দুখতে পেরেছিলেন ইংরেজরা গোটা ভারত দখল করতে চায়। তিনি এও বুঝেছিলেন ইংরেজরা তাঁদের শক্তির দ্বারা এখনি তাঁকে পরাজিত করে রাজা হয়ে বসতে সক্ষম। কিন্তু তারা এখনই তা চায় না, কেন না বাংলার জনতা বিশেষতঃ মুসলমানেরা বিদ্রোহী হয়ে উঠতে পারে আর সে বহিঃ সারা ভারতের বৃকে ছড়িয়ে যেতে পারে। তখন তা সামলানো হবে মুশকিল। অতএব এ নবাবী শুধুমাত্র প্রহসন। তাই মীরকাশিম ‘করি অথবা মরি’ নীতি অবলম্বন করে ইংরেজদের অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে বদ্ধপরিকর হলেন।

ইংরেজরা চাষীদের উৎপাদিত শস্য দরিদ্র দেশবাসীর দোকানের মাল যথেষ্ট ভাবে নিয়ে দাম দিত না। খুব অনুগ্রহ হলে কিছু দিত মাত্র। এছাড়া ইংরেজরা বহুদিন ধরে একটা বাণিজ্যিকর দিয়ে আসছিল তাও হঠাৎ বন্ধ করে দেয়। এ সমস্ত কারবার দেখে মীর কাশিম তাঁর হিন্দু-মুসলমান প্রজাদের জানিয়ে দিলেন যে, তাদেরও আজ থেকে কোন কর দিতে হবে না। কারণ আমার দেশবাসী কর দেবে আর শোষক ইংরেজ কর ফাঁকি দিয়ে ভারতে শিকড় গড়বে তা হয় না।

এ ঘোষণার ক্রোধাক্ষ হয়ে ইংরেজরা মীর কাশিমকে সিংহাসনচ্যুত করতে মনস্থ করলে তিনি বীর বিক্রমে সৈন্যে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বাঁপিয়ে পড়েন। যুদ্ধ আরম্ভ হল। ইংরেজরা কাটোয়া, গিরিয়া, উদয় নালা, মূঙ্গের প্রভৃতি স্থানে মীর কাশিমকে পরাস্ত করে। মীর কাশিম অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌল্লা এবং দিল্লীর সুলতান রাহাদুর শাহের সাহায্য প্রার্থনা করলে তারা সাথে সাথে যথাসাধ্য সৈন্য সামন্ত নিয়ে মীর কাশিমের দুই পাশে এসে দাঁড়ালেন একসার নামক যুদ্ধ ক্ষেত্রে। তথাপি মীর কাশিমের ভাগ্যে পরাজয় নেমে আসে। অনেক ঐতিহাসিকের মতে পলাশী যুদ্ধ অপেক্ষা ভারতের ইতিহাসে এই যুদ্ধ অধিক গুরুত্বপূর্ণ। স্যার জি. টেম্পেলন বলেছেন, “Buxar deserves far more than plossey to be considered as the origin of the British power in India.”

১৭৭৪ খ্রিষ্টাব্দে বকসার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মীর কাশিম তখন তাঁর রাজধানী মুঙ্গেরে পলায়ন করেন। ১৭৭৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি বাংলার বঙ্কু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনের অলক্ষে দিল্লীর বৃকে পরলোক গমন করেন।

ইংরেজরা আবার মীর জাফরকে পুতুলের মত নবাবী আসনে অধিষ্ঠিত করে। ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লীর শাহ আলম বুঝতে পারলেন বাংলায় মুসলমান শক্তি নিভিয়ে গেছে। সেখানে অতপর যুদ্ধ করতে যাওয়া আত্মহত্যার নামান্তর। ইংরেজ এখন বহুগুণে বলীয়ান। ঠিক এ সময় ক্লাইব শাহ আলমের কাছ থেকে ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করেন।

ইংরেজদের বহুদিনের সাধ পূরণ হল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এখন সামরিক বিভাগ এবং রাজস্ব বিভাগ হাতে পেল। ক্লাইব শোষণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন বটে কিন্তু তা সাধারণের দৃষ্টি এড়িয়ে যাতে হয় তার জন্য রাজস্ব আদায়ের ভার দিলেন হতভাগ্য দুই বাঙালীর উপর। একজনের নাম মুহাম্মদ রোজা খান অপর জনের নাম শ্রী সিঁতা বরায়। বিদেশী বণিক ইংরেজ শোষণের যাদাশী দিয়ে চেপে ধরল জনসাধারণের অর্থনৈতিক কণ্ঠ। দেশের চারদিকে অসন্তোষ দেখা দিল। ১৭৭০ খ্রিষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষ শুরু হয়ে গেল। বাংলা হিসাবে ১১৭৬ সালের এ দুর্ভিক্ষে বাংলার এক তৃতীয়াংশ লোক অনহারে প্রাণ ত্যাগ করে। ১১৭৬ সালের এ দুর্ভিক্ষই ইতিহাসে ছিয়াত্তরের নামান্তরে নামে সুপরিচিত। এ সময় ওয়ারেন হেস্টিংস কোম্পানীর হাত থেকে নিজ হাতে দায়িত্ব নিয়ে নবাবকে বৃত্তিভোগী কর্মচারীতে পরিণত করেন।

ভারতের মারাঠা শক্তি মোঘলদের বহুব্যবহৃত করত। পূর্বেই তাদের লুণ্ঠন, হত্যা কাণ্ড প্রভৃতি অপর দিকে তাদের প্রতিষ্ঠিত হবার ইতিহাসের ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। এখন কিন্তু মারাঠা রাজপুত্রা এবং দেশের অমুসলমান জনসাধারণ নীরব দর্শক।

মারাঠাদের দ্বারা ভারতের সাংঘাতিক সর্বনাশের আর এক ধাপ ঐতিহাসিক তথ্য এটাই যে, ১৭৭২ সালে পেশোয়া মাধবরায়ের মৃত্যুর পর মারাঠারা এত নোংরা ঘরোয়া বিবাদ শুরু করছিল যা এক চরম পর্যায়ে পৌঁছায়। এ সময় পূর্ব থেকেই রণনাথ রাও আর মাধব রাও এর মধ্যে শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছিল। মাধবের মৃত্যুর পর তাঁর ভাই নারায়ণ রাও ‘পেশোয়া’ পদ অধিকার করলেন। বলাবাহুল্য, এ অসভ্য জাতি পেশোয়া পদটির জন্য এত লালায়িত যে, যে কোন নাকতামূলক কাজ করতে তারা পিছ পা তন না। যাহোক, নারায়ণরাও তাঁর পিতৃব্য রঘুনাথ রাওয়ের চক্রান্তে কয়েক মারে মধ্যেই নিহত হন। কিন্তু চক্রান্তকারী রঘুনাথ রাওয়ের ভাগ্যেও পেশোয়া হওয়া হয়ে উঠল না। বরং নারায়ণ রাওয়ের শিশু পুত্র দ্বিতীয় মাধব রাও নারায়ণ পেশোয়া পদে বরণ করা হয়। তখন রঘুনাথ রাও ক্রোধের আতিশয্যে গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন। প্রতিশোধ তাকে নিতেই হবে। পেশোয়া তাকে থেকেই হবে।

সেটি ছিল ১৭৭৫ খ্রিষ্টাব্দ। রঘুনাথ একেবারে বোম্বাইয়ের গভর্ণমেন্টের সাথে চুক্তিতে টিপ সই করেন। এ চুক্তির নাম “সূরাটের সন্ধি”। ইংরেজরা ভারতকে আরও শোষণের হাতিয়ার স্বরূপ মারাঠা জাতির প্রত্যক্ষ সাহায্যের রাস্তা পেয়ে গেল।

এভাবে রঘুনাথ ইংরেজদের সহযোগীতায় পুনরায় মারাঠাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করলেন ১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দে। কিন্তু যুদ্ধের প্রথম ভাগে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়ে ইংরেজরা অপমানজনক “ওয়াব গাঁওয়ার” সন্ধি করতে বাধ্য হয়। তারপর হেস্টিংস সব চুক্তি ছিন্ন করে মারাঠাদের আক্রমণ করেন। ইংরেজদের পক্ষে ছিল ভোসলে ও গায়কোয়াড়। ১৭৮০ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজ মারাঠাদের পরাজিত করে বেসিন সাক্ষরন অধিকার করে। এমনি ভাবে মারাঠা নেতা নানা ফরনবীশের সমর্থনে ১৭৮২ খ্রিষ্টাব্দে ১৭ মে ইংরেজ মারাঠা আর একটি সন্ধি হয়। অবশেষে মারাঠা শক্তির অবনতি ঘটে।

১৭২৭ খ্রিষ্টাব্দে হায়দার আলি নামক এক বীর সম্ভ্রান্ত কোরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। যৌবনের প্রারম্ভে তিনি মহীশূরের হিন্দু রাজার অধীনে সৈনিক হিসেবে কাজ আরম্ভ করেন। হায়দারের বহু গুণ ছিল, তন্মধ্যে দু’টি গুণ উল্লেখযোগ্য। একটি বীরত্ব আর একটি দত্ততা। এ সময়ে রাজার মন্ত্রী ও সেনাপতিদের মধ্যে মতানৈক্যের ফলস্বরূপ অর্থ দণ্ডের দুর্য্যবস্থাকে রাজা আয়ত্বে আনতে না পেরে অবশেষে হায়দারের হাতে সব কিছু সমর্পণ করেন। হায়দার এ ডুবন্ত রাজ্যের হার সাহসের সাথে গ্রহণ করে মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে নাজিম, পোষণ, দান, দয়া, মায়া ও বুদ্ধি পূর্ণ কৌশলে সমস্ত কিছু আয়ত্বে আনেন। তিনি পার্শ্ববর্তী ছোটছোট রাজগুলো দখল করে মহীশূরের সীমানা বৃদ্ধি করে দেশে প্রকৃত শান্তি ফিরিয়ে আনেন। তাঁর অন্তরের আসল ইচ্ছা ছিল ইউরোপীয় আদর্শ ও বাব ধারায় নিজে ও সৈন্যদের সুগঠিত করে ইংরেজদের দেশচ্যুত করা।

এখানে একটা কথা খুব বেশি মনে রাখা দরকার, মুসলমান শাসনে পতন সেখানে সম্ভব হয়েছে যেখানে মুসলমান হয়ে ধর্মকে করা হয়েছে উপেক্ষা অবজ্ঞা। আকবর জাহাঙ্গীরের ন্যায় সিরাজ থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কারণ সিরাজ মুসলমান ধর্মের অত্যন্ত জরুরী দাবী অবশ্য প্রতিপাল্য পঞ্চয় ইবাদতকে উপেক্ষা বা অস্বীকার না করলেও অবহেলা করেছেন। আকবর ও জাহাঙ্গীরের সময়ের মত আবার সিরাজের সময়েই দেশে মদপান শুরু হয়। অতএব পতন তাঁর অবধারিত হয়ে পড়ে। ভাগ্যে শুধু প্রতিকূল অবস্থার উপস্থিতিই সিরাজের জীবনে লক্ষণীয় আত্মীয়-স্বজন বিভ্রান্তি। যুদ্ধে হঠাৎ মীর মর্দানের মৃত্যু পলায়নের সময় নদীতে নৌকা চলার মত পানির অভাব, ক্ষুধার জ্বালায় আশ্রয় খুঁজতে গিয়ে দুর্ভাগ্যক্রমে শত্রুগৃহে কবলিত হওয়া সবই বিশ্ব নিয়ন্তার ইঙ্গিতের ফল স্বরূপ।

যাহোক, হায়দারে বীরত্ব বুদ্ধি জ্ঞান প্রতিভার অভাব ছিল না, নামায ইত্যাদি ধর্মনৈতিক আদেশ নিষেধও তিনি খুব গুরুত্ব দিতেন কিন্তু পুত্র পরিবার বা রাজদরবারের নামায সম্বন্ধে খুব গুরুত্ব দেয়া হত না এবং হায়দারে মূলনীতি ছিল ইংরেজ বিতাড়ন। তিনি বেশ উপলব্ধি করতে পারছিলেন যে ইংরেজদের দ্বৈত শাসনের ফলে যেমন তারা ছদ্মবেশে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার শাসনকর্তা হয়েছে তদনুরূপ সারা ভারতকেও পদানত করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

এদিকে মারাঠাদের বিশ্বাসঘাতকতা তথা ইংরেজদের সাথে হাত মেলানো অপরদিকে অর্থলোলুপ অপদার্থ নিজামের বিশ্বাস ঘাতকতার আশঙ্কায় তিনি উভয় ক্ষেত্রে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁদের বুঝান যে, বিদেশী ইংরেজদের পরাজিত করে দেশ ত্যাগী করতে আমাদের সকলকে একজোট বা সংঘবদ্ধ হওয়া আবশ্যিক। কারণ, তারা শুধু শাসন করতে চায় না সাথে সাথে শোষণ করতেও চায়। কিন্তু আমরা যে যেখানে থেকেই আসি না কেন ভারতকে নিজের মাতৃভূমি রূপে বরণ করে নিয়েছি। অতএব, হিন্দু, মুসলমান, শিখ, মারাঠা সবই আমরা ভারতবাসী ভাই ভাই।

হায়দারের উদার ও যুক্তিপূর্ণ প্রস্তাবে উভয়েই তাঁর হাতে হাত মেলান। এবার হায়দার ১৭৬৭ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজদের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। এটাই ইতিহাসে প্রথম মহীশূর যুদ্ধ (First Mysore War) নামে বিখ্যাত। কিন্তু দুঃখের বিষয় মাঝ পথে নৌকা ডুবির মত নিজাম হায়দারের পক্ষ ত্যাগ করেন। আর মারাঠারা শুধু পক্ষ ত্যাগ নয় বিপক্ষে ইংরেজদের প্রলোভনে প্রলোভিত হয়ে ভীতির কারণ হয়ে উঠে। কিন্তু হায়দার বীর বিক্রমে একাই সংগ্রামকে অস্বীকার যুদ্ধের অগ্রগতিকে মাদ্রাজের দ্বারে পৌঁছে দেন। ইংরেজগণ হায়দারের অসম্ভব সাহসিকতা আর বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ ব্যবস্থায় ভীত হয়ে সন্ধির প্রস্তাব দেন। হায়দার খুব বেশি দেখাপড়া না জানলেও জন্মগত ভাবে চতুর ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ছিলেন। তাই অনুমান

করলেন মারাঠারা অপর দিক থেকে আক্রমণ করলে ঘরের শত্রু বিভীষণে পরিণত হবে। অতএব আপাতত সন্ধির প্রস্তাব গ্রহণ করলেও অন্য কোনশক্তি হায়দারকে আক্রমণ করলে ইংরেজরা তাকে সাহায্য করবে।

এদিকে হায়দারে অনুমানই বাস্তবে পরিণত হয়। মারাঠারাই ১৭৭০ খ্রিষ্টাব্দে মহীশূর আক্রমণ করল। কিন্তু সন্ধির শর্তানুযায়ী ইংরেজরা কোন সাহায্য দানে এগিয়ে আসল না। আবার হায়দার পূর্বের ন্যায় জ্ঞানগর্ভ যুক্তিতে মারাঠাদের বোঝালেন। ফলে পুনরায় তারা হায়দারের সাথে সহযোগীতা করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াবার সদিচ্ছা জ্ঞাপন করে। নিজামও ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে একমত বলে জানান। হায়দার আবার সাহসে ভর করে সৈন্যে মাদ্রাজ পৌঁছান। কিন্তু এবার আর সন্ধির কথাও নয় বীর বিক্রমে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগলেন হায়দার। তাঁর সুযোগ ও বীর সন্তান টিপু ইংরেজদের এমন ভাবে পরাজিত করলেন যে তাঁরা আর পলায়নেরও সুযোগ না পেয়ে অবশেষে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। হায়দার তাঁর বীর সন্তানের বীরত্ব দেখার সুযোগ বেশি দিন পাননি। এক কঠিন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে ১৭৮২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন।

টিপুর জন্ম হয় ১৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে। বীর পিতার মৃত্যু হলেও তিনি (হায়দার) 'মহীশূরের বাঘ' নামে খ্যাত ছিলেন। সুযোগ্য পিতার সুযোগ্য পুত্র রূপে টিপুও পিতা অপেক্ষা বীরত্বে কোন অংশেই কম ছিলেন না। পিতার ন্যায় এরও নীতি ছিল ইংরেজদের দেশচ্যুত করা। তিনি মেথিউ সাহেবকে বদনূরে সৈন্যে বন্দী করেন এবং মাদ্রাজের অধিকার করেন। ১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজরা টিপু সাহেবের অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতার সাথে সন্ধি করে বন্দী বিনিময় অঞ্চল নির্ধারিত করে। কিন্তু ইংরেজগণ এবারও সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করে মারাঠা ও নিজামের সহযোগীতায় বিভিন্ন দিক থেকে মহীশূর আক্রমণ কর। টিপু এক বছর পর্যন্ত তাদের ঠেকিয়ে রাখেন। কিন্তু ১৭৯২ খ্রিষ্টাব্দে অবশেষে পরাজয় বরণ করে এক সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করতে হয়। অর্ধেক রাজ্য, প্রচুর অর্থ এবং দু'টি পুত্রকে জামিন রেখে অত্যন্ত মনোবেদনার সাথে তাঁকে মেনে নিতে হয়েছিল এ সন্ধি, যা পরাজয়ের নামান্তর। তবুও আবার একবার ভীষণ দূরদর্শিতায় ও তৎপরতায় সৈন্য গঠন করলেন এবং পিতার হায়দারের মত মারাঠাদের ও নিজামের সাথে সন্ধির আবেদন জানালেন। এবার মারাঠারা পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করলেন সুলতানের এ সাধু প্রস্তাব। নিজামও ইংরেজদের এ বাধ্যতামূলক সন্ধি মেনে নিয়েছিলেন।

মিঃ ওয়েলেসলীর তথা ইংরেজদের রাজ্য বিস্তারের পথে বিরাট প্রতিবন্ধক ও প্রবলতম প্রতিদ্বন্দ্বীকে নিশ্চিহ্ন করতে মিত্র শক্তি ও সম্মিলিত প্রচেষ্টায় চতুর্থ মহীশূর যুদ্ধ সংঘটিত হয় ১৭৯৯ খ্রিঃ। টিপু দেশী বিদেশী এ সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে অত্যন্ত বীরত্ব ও যোগ্যতার সাথে লড়েও জয় যুক্ত থেকে পারলেন না। টিপু শ্রী রঙ্গপত্তম শত্রুপক্ষ অধিকার করে। টিপু সৈন্যগণ যেভাবে ক্রয় পর্যায়ে তিনটি শক্তির সাথে লড়াই করছিলেন এবং সর্বশেষে শহীদের মর্যাদায় মৃত্যু বরণ করেছিলেন তাও দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের এক অলিখিত ঐতিহাসিক পদক্ষেপ।

পরিশেষে সমস্ত সৈন্যের যখন পতন হয় তখন সুলতান টিপুকে ইংরেজরা চিৎকার করে আত্মসমর্পণ করতে বলে। আহত বীরের এক হাত অস্ত্রাঘাতে অচল, কিন্তু অপর হাতেই যুদ্ধ করতে করতে ভাগ্যহারা টিপু ভারতের মাটিতে ভারত মাতার সুযোগ্য সন্তানের মত নিজের প্রাণ দান করলেন তবুও জীবন্ত বন্দী থেকে ঘৃণাবোধ করছিলেন।

টিপুর চরিত্র বল, মনোবল, দৈহিক বল এবং রাজনীতি জ্ঞান পুরো মাত্রায় থাকলেও স্বধর্মের আইন-কানুন অপেক্ষা তিনি বাহ্যিক পার্শ্ববর্তী আয়োজনকেই যথেষ্ট মনে করতেন। তাই

বেশ ভূষায় ও চাল চলনে ইউরোপীয় বা অপর প্রভাবে প্রভাবিত ছিলেন। তিনি ইতিহাসের এ অমোঘ শিক্ষা ভুলে গিয়েছিলেন যে, সমস্ত উন্নতি বা অবনতি শুধু নিরোজ কর্মদক্ষতা ও বাহ্যিক আয়োজনের উপরই নির্ভর কর না তার সাথে যোগ থাকে নৈপুণ্যে ভাগ্য নিয়ন্তার অদৃশ্য অঙ্গুলী হেলান।

তবে ইংরেজরা টিপু মৃত্যাবধি ভারত প্রান্তের অভিযানকে ইচ্ছানুক্রমিক তরান্বিত করতে পারে নি। কারণ টিপু অসাধারণ আন্তর্জাতিক রাজনীতি জ্ঞানের দারুণ ভীতিই ছিল এ পথে বাধা। উল্লেখ করা যেতে পারে, টিপুই সর্বপ্রথম ভারতকে রক্ষা করারজন্য তদানীন্তন ইংরেজদের শত্রু ফরাসী শক্তি এবং পারস্যের জামান শাহের সাথে যোগাযোগ করছিলেন। ফ্রান্স টিপু পক্ষে যোগও দিয়েছিলেন।

ঠিক সে সময় ইউরোপের সাথে ১৭৮৩ খ্রিষ্টাব্দে ফ্রান্সের এক শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ফলে অসহায় টিপুকে একাই যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হয় এবং শেষে স্বদেশবাসীর বিশ্বাসঘাতকতায় স্ববংশে শহীদ থেকে হয়। নিঃসন্দেহে তিনিও ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে বীর শহীদের মর্যাদার বিভূষিত।

এরপর সিন্ধু প্রদেশে আমীরদের সাথে মিঃ মিস্টো ১৮০৯ খ্রিষ্টাব্দে একটু চুক্তি করে তার নাম দিয়েছিলেন 'চিরস্থায়ী বন্ধুত্ব'। ইংরেজরা বেশ বুঝতে পেরেছিল মুসলমানেরা তাদেরকে কোন মতেই বরদাস্ত করবে না। অতএব সকলের সাথে মিত্রতা করে নানা অজুহাতে এক এক করে কায়দা করাই প্রকৃষ্ট পদ্ধতি। কিন্তু ১৮৩৯ খ্রিষ্টাব্দে মিঃ অকল্যাও চির বন্ধু মীরদের (মুসলমান) উপর এমন অপমানকর চাপ সৃষ্টি করেন যে, ইংরেজ সৈন্য এবং নানা মালপত্রা যাতায়াতের ব্যবস্থা তাদের অধিস্থানের উপর দিয়েই হবে অর্থাৎ আফগানিস্তান অভিযানে মীরদের পরোক্ষ সহযোগ সৃষ্টির ব্যবস্থা। তখন সম্ভ্রান্ত মীরগণ তাঁদের এলাকায় নিজেদের মুদ্রা প্রচলিত রেখেছিলেন। কিন্তু চতুর গভর্ণর জেনারেল মিঃ এলেন বোর এবং জেনারেল নেপিয়্যার মীরদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অভিযোগ আনেন এবং তাঁদের প্রচলিত মুদ্রায় রাণী ভিক্টোরিয়ার নাম ছাপাতে আদেশ দেন। তখন মীরদের রক্ত বিদ্যুত ক্রিয়ার ন্যায় ঘৃণা আর বিদ্বেষের স্রোত বইতে থাকে।

তবুও তারা আর কিই বা করবেন। দেশবাসীর কোন সাহায্যের আশা নেই। বিশেষ করে অমুসলমানদের ইংরেজদের প্রভুত্ব বিস্তারের উপর তেমন কোন আপত্তি দেখা যায় নি। তখনও চিন্তার অবসান হয়নি। হঠাৎ ইংরেজ সৈন্যগণ মীরদের অধিকৃত ইমাম গড় দখল করে বসল। মীরগণ প্রাণপণে যুদ্ধ করলেন তবুও ১৮৪৩ সালে দেবু, হায়দ্রাবাদ, মিরানি তথা সিন্ধ ইংরেজদের হাতে এসে যায়। মুসলমানদের পরাজয় ঘটে।

এ সময় হিন্দু ও মুসলমানদের রাজনৈতিক ব্যবস্থা পর্যালোচনা করলে যা দেখা যায় তা অত্যন্ত বেদনাদায়ক।

একজন নামকরা ইংরেজ ঐতিহাসিক মিঃ আউটরাম অমুসলমানদের লক্ষ্য করে লিখেছেন, "তারা ইংরেজদের পক্ষে গুণ্ডচরের ন্যায় কাজ করেছিল।" আর একজন ঐতিহাসিক লিখেছেন, "হিন্দুগণ সুখে থাকলেও মুসলমান শাসনের অবসান কামনা করছিল।"

ষষ্ঠদশ অধ্যায়

ভারতের প্রথম স্বাধীনতা বিপ্লবী হযরত শাহ ওয়ালীউল্লা দেহলবী (রহঃ) ও

পরবর্তী মুসলিম মুজাহিদগণ

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যে সব মহা মনীষীগণ অনন্য সাধারণ প্রতীভা ও অবিস্মরণীয় ভূমিকায় চির ভাস্কর হয়ে আছেন, হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহঃ) তাঁদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ও অন্যতম। তিনি শুধু মাত্র ধর্মীয় গবেষণার ক্ষেত্রেই নয় বরং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রগামী দূত হিসেবেও ইতিহাসের পাতায় চির অমর হয়ে রয়েছেন। প্রায় একশত বছর পরাধীনতার নাগপাশে বন্দীত্ব স্বীকার করার পর এ মহা বিপ্লবীর কঠেই প্রথম ধনিত হয়েছিল স্বাধীনতার আওয়াজ। তিনিই ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্ম-দাতা প্রথম মুতাহীন প্রাণ।

এ মহামনীষী হযরত আলমগীরের (রহঃ) দেহাবসানের কয়েক বছর পূর্বে ১৭০৩ খ্রিষ্টাব্দে এক পুণ্যময়ী রজনীতে দিল্লী নগরীর বিখ্যাত সাধক ও আল্লাহ ভক্ত আবদুর রহিমের (রহঃ) সুযোগ্য সন্তান রূপে জন্ম গ্রহণ করেন। আলমগীর (রহঃ) তাঁর জন্মের পূর্বে প্রায়ই একজন তাপস শ্রেষ্ঠ, দূরন্ত প্রতাপ মনীষীর আগমনের প্রত্যাশায় দোয়া করতেন। তাঁর এ দোয়া বিশ্বদ্রষ্টার দরবারে গৃহীত হয়েছিল। তাই আসমুদ্র হিমাচল ভারতবাসীর দাসত্ব শৃঙ্খল উন্মোচন করতে, মানুষের সামাজিক, ধর্মনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন স্তরে এক অভাবনীয় পরিবর্তন সাধন করতে তথা দ্বিধা বিভক্ত মতবাদে জর্জরিত ও সংকীর্ণতা অট্টোপাশে আবদ্ধ মৃতপ্রায় মানুষকে নতুন আলোর সন্ধান দিতেই জন্ম নিয়েছিলেন শাহ ওয়ালীউল্লাহ (রহঃ)। মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে তিনি আরবী সমস্ত পাঠ যথা দর্শন, ভূগোল, তর্ক ও ইলমে কালাম, তাসাউফ ও সলুফ, চিকিৎসা বিজ্ঞান ও গণিত, সাহিত্য ও অলঙ্কার শাস্ত্র, হাদীস ও তফসীর প্রভৃতি নানা জাতীয় দুর্বোধ্য মাস্তুরের অসাধারণ বুৎপত্তি লাভ করেন। হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ সাহেবই ভারতের মাটিতে প্রথম মনীষী যিনি কুরআন অবতীর্ণ হবার সারে এগার শত বছর পর তদানীন্তন রাজকীয় ভাষা ফার্সীতে পবিত্র কুরআনের অনুবাদ করে অক্ষয় কীর্তি রেখে যান।

সারা ভারতে পবিত্র কুরআন পাঠিত হত বটে কিন্তু আরবী পারদর্শী পণ্ডিতবৃন্দ ছাড়া সকলেই মহাগ্রন্থের মধ্যে আল্লাহর আদেশ নিষেধ বা অর্থাৎ থেকে বঞ্চিত ছিল। কুরআনের অন্য ভাষায় অনুবাদ না করাও প্রতিবেশি, পরিবেশের অনুনুত প্রভাবের ফল। শাহ ওয়ালীউল্লাহ সর্ব ভাষায় মহাগ্রন্থের অনুবাদের রাস্তা নির্মাণ করলেন তাঁর ফারসী অনুবাদের মাধ্যমে। ভারতের শিক্ষিত মুসলমান প্রত্যেকেই ফারসী জানতেন। তাছাড়া তখন আইন আদালতে ফারসী সরকারী ভাষা ছিল, তাই শিক্ষিত মুসলমান সামাজিক প্রহের মহানুবাদ বিদ্যুৎ ক্রিয়ার মত সঞ্জীবিত হয়ে উঠল।

হযরত ওয়ালীউল্লাহ সাহেব নিজে একজন পীর বা আল্লাহ ভক্ত ফকির ছিলেন। তিনি তাঁর প্রত্যেক ছেলেকে ইসলামী শিক্ষা ও দীক্ষা দিয়ে শিষ্য ভুক্ত করেছিলেন। তাঁরা যথাক্রমে শাহ মাওলানা আবদুল আজিজ, শাহ মাওলানা আবদুল কাদের, শাহ মাওলানা রফি উদ্দিন ও

শাহ মাওলানা আবদুল গণি। আরও তাঁর বাছাই করা ছাত্রদের মধ্যে শাহ মাওলানা ইসমাইল যিনি তাঁর ভাইপো ছিলেন। আর একজন পরশ পাথর তুল্য বীর ও পণ্ডিত সৈয়দ আহমদ বেলবী। তিনি তাঁর পুত্র শাহ আবদুল আজিজ সাহেবের ছাত্র ছিলেন। শাহ মাওলানা আবদুল হাই যিনি শাহ আবদুল আজিজের আত্মীয় বা প্রিয় জামাতা ছিলেন। এছাড়া তাঁর আরও বাছাই করা ছাত্র যারা দিল্লী থেকে মাওলানা মওলুবী বা মোল্লাহ মুফতি হয়ে এসেছিলেন তাঁদেরকে নিয়ে সৈয়দ আহমদ ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিপ্লবের মারাত্মক সংঘ তৈরি করলেন। যে প্রতিষ্ঠান বা মাদরাসা থেকে এসব বিপ্লবী বাছাই করে নেয়া হয়েছিল সে মাদরাসা দিল্লীর শাহ ওয়ালীউল্লাহ সাহেবের প্রতিষ্ঠা করা। পূর্বেই দেখানো হয়েছে মোল্লা মাওলানা মুফতি বা প্রকৃত ফকিরদের প্রধান কাজ স্বজাতি বিজাতি যেই হোক তার সাথে লড়াই করা যারা ইসলাম ধর্মে ক্ষতি করে। এক্ষেত্রেও তাই হল। ইংরেজদের বিরুদ্ধে ৩০ লক্ষ মুজাহিদ যোদ্ধা চারদিকে প্রচার কাজে লিপ্ত হলেন, জনমত গঠন করলেন। উদ্দেশ্য ছিল দুটি, প্রথমতঃ মুসলমান জাতিকে পবিত্র কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী সঠিক পথে পরিচালিত করে ইংরেজকে তাড়িয়ে দেয়া। ইরেজরা বড় চতুর, তারা তখনও যদিও ভারতের সর্বময় কর্তা কিন্তু সরাসরি যেন লড়তে নারাজ। তাই ভারতের সরল শিখ জাতিকে মিথ্যা প্রলোভনে বিশ্বাসঘাতক সাজিয়ে মুসলমানদের সাথে লড়াইয়ে নামিয়ে দেয়া যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। ফলস্বরূপ হাজারে হাজারে মুসলমানদের শহীদ থেকে হল। স্বাধীনতা সংগ্রামী হযরত মাওলানা আসাদ মাদানীর কথায়—“এ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে দুই লক্ষের অধিক মুসলিম শহীদ হয়, সাড়ে সাতান্ন হাজার (৫৭,৫০০) আলিম মৌলবী শাহাদত বরণ করেন।” এ সাড়ে সাড়ে সাতান্ন হাজার মৌলবীকে শিক্ষায় পণ্ডিত এবং দীক্ষায় যোদ্ধা করে যারা স্বাধীনতা বিপ্লবে প্রাণ দিতে উৎসাহ ও উদ্দীপনা যুগিয়েছেন আজ তাঁদের নাম নিষ্ঠুর ইতিহাসে ‘ওহাবী’। আসলে আরব দেশে নজদের অধিবাসী আবদুল ওহাব আরবীয়দের অনৈসলামিক কাজ কর্ম ও চিন্তা ধারা রোধ করার জন্য এবং মহা গ্রন্থ কুরআন ও হাদীসের নির্দেশিত পথে চলার জন্য একটা আন্দোলন গড়ে তোলেন। প্রাচীন পন্থীদের সাথে ১৮০৩ খ্রিষ্টাব্দে খুব হান্সামা বা লড়াই হয়। আরবের প্রাণকেন্দ্র মক্কা ও মদীনা শরীফ দখল করেন। এ সময় মক্কা মদীনায় কবর পাকা করার নিয়ম ব্যাপক ভাবে প্রচলিত ছিল এবং কবর পাকা করে বাঁধানো আড়িজাত্যের পরিচয় বহন করতে। মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাবের নির্দেশে বেশির ভাগ কবর ভেঙ্গে মাটির কবরে পরিণত করা হয়। হযরত মুহাম্মদের (সাঃ) এবং তৎসংলগ্ন কবরগুলো সংরক্ষিত থাকে তাঁর যুক্তি ছিল মক্কা ও মদীনায় নির্দিষ্ট কবর স্থানগুলো মুসলিম জাতির এবং মক্কা ও মদীনাবাসীর কাছে খুব পবিত্র কিন্তু প্রত্যেকেই যদি কবর পাকাকরা শুরু করেন তাহলে কয়েক বছরের মধ্যে সীমিত স্থান পূর্ণ হয়ে যাবে ফলে মক্কা মদীনাবাসী এবং মৃত হাজার দল এ পবিত্র স্থানে সমাধিস্থ হওয়া থেকে বঞ্চিত হবেন।

যাহোক, আমাদের ভারতীয় হাজীরা ফিরে এসে ক্ষোভ-দুঃখ ও অভিজ্ঞতা বর্ণনায় প্রকাশ করেন যে রাসুলে বংশধরদের এবং সাহাবা ও তাবেরীয়দের বংশ ধরদের কবর সব শেষ করে দিয়েছে আরবের নতুন রাজা। এ সংবাদে সাধারণত ভারতীয় মুসলমানদের বেশির ভাগ লোকই দুঃখিত হন। শাহ ওয়ালীউল্লাহ প্রতিষ্ঠিত বিপ্লবী দল প্রথমেই মুসলমানদের কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী চলতে উৎসাহিত করেন আর অতিভক্তি, বাড়াবাড়ি, শিরুক ও বিদআত থেকে লোককে নিষেধ করেন। শাহ সাহেবের শিষ্য আহমদ বেলবী হজ্ব থেকে প্রত্যাবর্তন করলে ইংরেজরা খুব চতুরতার সাথে প্রচার করল ‘স্বাধীনতা আন্দোলনের নামে যারা আপনাদের ধর্মের বাণী শোনাচ্ছে আসলে তারা ইসলামের শত্রু এবং নবী ও সাহাবাদের অপমানকারী দল, এদের নাম ওহাবী, এরাই আপনাদের প্রিয় রাসুলের বংশধরদের কবরগুলো

ধ্বংস করে দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছে আর হিন্দুস্থানের রায়বেরেলীর মৌলানা সৈয়দ আহমদ হজ্ব করতে গিয়ে মক্কা থেকে সে দলের এজেন্ট নিযুক্ত হয়েছে এবং এরা সব ওহাবী তাই এরাও আপনাদের শ্রদ্ধেয় পীর বুজর্গ ও পূর্ব পুরুষদের কবর ভাঙতে চায়। এ কথা ইংরেজদের টাকা খাওয়া কিছু দালাল প্রচার করতে লাগল। সাধারণ মানুষ বিশ্বাসও করলেন অনেকে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় আজও শিক্ষিত মুসলমান, হিন্দু এমন কি যারা লেখক বা ঐতিহাসিক তাঁরা সকলেই ‘ওহাবী আন্দোলন’ কথাটা লিখতে বা বলতে দ্বিধা করেন না। অথচ নাজদের মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব জন্মগ্রহণ করেন ১৭০৩ খ্রিষ্টাব্দে আর তাঁর মৃত্যু হয়েছিল ১৭৯১ খ্রিষ্টাব্দে। অর্থাৎ ১৮২৩ খ্রিষ্টাব্দে সৈয়দ আহমদ ও শাহ হজ্ব করতে যান তার অনেক আগেই ১৭৯১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মারা যান। আর তৎপরে দলের প্রভাবও এ সময় অর্থাৎ ১৮২৩ খ্রিষ্টাব্দে কম হয়ে যায়। অথচ শত শত নয় সহস্র দলিল পেশ করা যাবে যে ১৮২৩ এর আগেই সারা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপ্লব শুরু হয়ে যায়। তবে হজ্ব থেকে ফিরে এসে আরও নতুন উদ্যমে জিহাদ আরম্ভ নয় বরং পুনরাবৃত্তি করেন।

প্রকৃত প্রতিভাধর অনেক ঐতিহাসিক লেখক এমন গবেষণা মূলক বই লিখেছেন এবং লেখার উপর ডক্টরেট পেয়েছেন তাঁরা মুসলমানদের এ আন্দোলনকে নানা নামে ভাগ করেছেন যেমন ওহাবী, মুহম্মদী, ফারাজী, পাটনা স্কুল দল এবং আহলে-হাদীস প্রভৃতি এগুলো ঠিক আন্দোলনের নয় নাম। সারা বিশ্বে যে কোন ব্যক্তি যেদিন ইসলাম অনুযায়ী নিজে চলেন এবং অপরকে চালার ইচ্ছা গ্রহণ করাবেন আর প্রত্যেক কাজ কর্মকে রূপ সারা বিশ্বে প্রায় একই রকম হবে, কিঞ্চিৎ যদি পার্থক্য পাওয়াই যায় তা উল্লেখযোগ্য নয়। সুতরাং নিজেদের ওহাব প্রতিষ্ঠিত কোন ওহাবী বলে দলই নেই আর তাঁদের সাথে ভারতের মুসলিম বিপ্লবের কাজে কর্মে মিল থাকতে পারে কিন্তু কোন যোগাযোগ ছিল না।

১৮২০ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা আসার পথে আহমদ ব্রেলবী পাটনায় পৌঁছে বহু মুসলমানকে মুরীদ বা শিষ্য করেন এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে কমিটি গঠন করে দেন এবং পাটনা কেন্দ্রের ভার বিপ্লবী মাওলানা বিলায়েত আলীকে ডেপুটি বা খলিফা নিযুক্ত করে একটি নতুন শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করেন। আর ভারতের মস্তক বঙ্গ দেশের কলিকাতায় এসে পৌঁছান। কলকাতা কেন্দ্রকে মজবুত করে বিপ্লবের বহিঃশিক্ষা জ্বালাতে পারলেই সারা ভারতে ইংরেজ মারখাবে এ ছিল তাঁর ধারণা। কলকাতার বড় মসজিদে নাম তখন ছিল কিতাবুদ্দিনের মসজিদ, ওখানেই এসে উঠলেন এবং বড় বড় লোকের সাথে আলাপ আলোচনা করলেন। (দ্রঃ ‘শহীদ তিতুমীর’, আবদুল গফুর সিদ্দিকীর লেখা ২য় প্রকাশ পৃঃ ৪২)

এখানে পীর বা ফকির আহমাদ সাহেব একটানা তিন মাস থাকেন এবং বহু লোককে মুরীদ করেন তাঁর এ শিষ্য গুলোই পরে আল্লাহগত প্রাণ ধর্মযোদ্ধায় পরিণত হয়েছিলেন। সারা ভারতের শ্রেষ্ঠ শহর কলকাতা। ভারতের বিভিন্ন স্থানের লোক আসত আর এ মসজিদে এলেই ইংরেজের বিরুদ্ধে জিহাদের তালিম পেত, নিত বা শুনত। অতএব বেশ ভালভাবে প্রমাণিত হচ্ছে, ১৮২০-তে পাটনায়, ১৮২১-শে কলকাতায় এবং ১৮২২ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের মূল মূল স্থানে বিপ্লবের বুনিয়াদ দিয়ে ১৮২৩ সালে আরবে গিয়েছিলেন হজ্ব করতে। হজ্ব থেকে ফিরে এসে আবার ইংরেজদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার আন্দোলনের মধ্যে তিনি শিখদের বিরুদ্ধে (আসলে ইংরেজদের বিরুদ্ধে) জিহাদের ফতোয়া দেন।

বঙ্গে প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের ভূমিকা

পূর্ব বঙ্গে মাদারীপুর গ্রামে মাওলানা শরিয়তুল্লাহ জন্ম হয়। তাঁর বাবা মা যে খুব ইসলাম ভক্ত ছিলেন তাঁর নামেই তার সাক্ষী। আঞ্চলিক পড়া শেষ করে কলকাতায় এসে মাওলানা

নাশারত আলীর কাছে যুবক শরিয়তুল্লাহ উচ্চ শিক্ষা নিতে থাকেন। এ মাওলানা সাহেবই ছিলেন হযরত আহমদ সাহেবের ভক্ত এবং একজন গুপ্ত যোদ্ধা। সুতরাং জিহাদের ধারণা দিতে ও নিতে কারও কোন বাধা ছিল না। তারপর গুরু শিষ্য উভয়ে মক্কা গেলেন এবং গুরু শিষ্যের আরও উচ্চ শিক্ষা ও থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে হানাতী মাজহাবের বিখ্যাত পণ্ডিত তাহের সোম্বালের নিকট সুফীতত্ত্বের শিক্ষা গ্রহণ করেন। তারপর মিশরের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া-শোনা করে বঙ্গ দেশে ঠিক ১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দে এসে উপস্থিত হন। ঠিক এরকম রত্নই খোঁজ করছিলেন হযরত আহমদ ব্রেলবী বঙ্গ দেশের জন্য। ১৮২১ খ্রিষ্টাব্দেই কলিকাতায় যোগাযোগ হয় এবং তাঁকে তাঁর পদ সম্বন্ধে সচেতন করা হয়। মাওলানা শরিয়তুল্লাহ সাহেব ইংরেজ সৃষ্ট জমিদার শ্রেণীর বিরুদ্ধে লড়াই করাও ইংরেজের সাথে লড়াই মনে করে শোষিত, অত্যাচারীত কৃষক তাঁতী, কলু প্রভৃতি অনুন্নত ও দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে আন্দোলন পরিচালনা করেন। একটা কথা খুব মনে রাখা দরকার সেটা হচ্ছে এটা যে, মুসলমান জমিদারও কিছু ছিল যারা আন্দোলনের প্রতিকূলে ছিল। তাদেরও রেহাই দেয়া হয় নাই। এ সময় হিন্দু জমিদারগণ মুসলমান কৃষকদের নিকট কালী পূজা, দুর্গাপূজা ইত্যাদিতে কর আদায় করতেন, যা ইসলাম বিরোধী। অন্যদিকে মুসলমান প্রজাদের জন্য ঈদুল আযহা পূর্বে গরু ব্যবহার বন্ধ করা হয়েছিল। মাওলানা শরিয়তুল্লাহ পূজায় চাঁদা দিতে মুসলমানদের নিষেধ করেন এবং অনুষ্ঠানে গরু ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান করেন।

মোটকথা তিনি ধর্ম সংস্কারকরূপে সংগ্রাম চালিয়ে সংগ্রামের বুনিয়াদ মজবুত করে ফেললেন। সে সাথে তাঁর ছেলে আলাউদ্দিন আহমদ (ডাক নাম দুদু মিয়া) মক্কা পাঠালেন। সেখানে বিদ্যা শিক্ষা লাভের পর বাড়ি এলেন এবং পিতার কাছে উচ্চ শিক্ষা নিয়ে তিনি উপযুক্ত প্রতিনিধিতে পরিণত হলেন। ১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দে শরিয়তুল্লাহ দেহ ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুর ৩/৪ বছর আগেই দুদু মিয়া স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন। পিতার মৃত্যুর পরেই তিনি সংগ্রামের ধারা একটু বদল করেন। হিন্দু মুসলমান দরিদ্র প্রজা শ্রেণীর মানুষের কানে প্রথমে তিনিই সাম্যবাদ প্রচার করেন আর বলেন জমিদার ও ইউরোপীয় নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রস্তুত থাকতে হবে। যদি হিন্দুর উপরও অত্যাচার হয় তাহলেও ইসলাম অনুযায়ী আমাদের তাদের পাশে সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে যাওয়া ধর্মের বিধান। যদি না যাওয়া হয় তাহলে তা অধর্মের কাজ হবে। তিনি শাসনতন্ত্র কায়ম করলেন। সমস্ত বাহিনী তরোয়াল, সরকী, তীর, ধনুক প্রভৃতি অস্ত্রে সজ্জিত হয়। সর্বপ্রথম তিনি ‘বিপ্লবী খিলাফত বাবস্থার প্রতিষ্ঠা করেন পুরোপুরি ভাবে। এ শাসন পদে সর্বোচ্চ পদে যিনি থাকতেন তাঁকে বলা হত ওস্তাদজি।’ তাঁদের পরামর্শ দাতারা দু’জন ছিলেন ‘খলিফা’, এমনি ভাবে সুপারিনটেনডেন্ট খলিফা, ওয়ার্ড খলিফা, গাঁও খলিফা প্রভৃতি নানা নামে পদের ব্যবস্থা ছিল। তিন চারশত বিপ্লবী পরিবার নিয়ে একটি গ্রাম ইউনিয়ন ছিল। সুপাঃ খলিফার একজন শিয়ান ও একজন পেয়াদা থাকত তাদের দ্বারায় নিম্ন থেকে উপর মহলে যোগাযোগ ও নির্দেশ পাঠাবার ব্যবস্থা ছিল। (দ্রঃ M..A. Khan op. cit, PP 104—112)

তাঁরা আদালত পঞ্চায়েত গঠন করেন এবং সমস্ত অঞ্চলের বিচার বিপ্লবীরাই করতে লাগলেন। মুসলমানদের যাকাত, ওশর ইত্যাদি দাতব্য অর্থ এবং সংগঠনের চাঁদা ফসল থেকে তোলা, ঠিক মত তা আদায় করা, সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করা, মাদরাসা মক্তব তৈরি করা, মসজিদ তৈরি করা প্রভৃতি কাজ চলতে লাগল। এমন অবস্থা আসল বিপ্লবীদের সুবিচার যেটা ইংরেজ বিরোধীতার নামান্তর। অর্থাৎ পৃথিবীতে জমি জায়গা যা আছে সব ঈশ্বরের; সেখানে জমিদার বা সরকারের কর নেয়া জুলুম বা অত্যাচার। মানুষ সব সমান, আমাদের কারও উপর তাদের কর্তৃত্ব করার অধিকার নেই।

তাই অমুসলমানরা অনেকে তাঁদের কাছেই কেস করতেন। বিচারও সূক্ষ্ম ভাবেই হত। কিন্তু বিচারের রায় না মানলে তা মানিয়ে নেবার ক্ষমতা দুদু মিয়ার সৈন্য বিভাগের ছিল। শেষে দুদু মিয়া তাঁর সমস্ত এলাকায় ঘোষণা করলেন, সমস্ত বিচার আমাদের স্বদেশী আদালতে হবে যদি কেউ ইংরেজদের আদালতে বিচারপ্রার্থী হয় তাহলে তাকে শাস্তি নিতে হবে। ইংরেজ ব্যবসায়ী বা নীলকরের সাহেবরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছির কারণ দরিদ্র শ্রমিক শ্রেণী মুসলমান বিপ্লবীদের হাতে। আর জমিদার শ্রেণীও খুব অসন্তুষ্ট হল। মুসলমানদের সহযোগীতায় তাঁদের মতে 'গরীব ছোটলোকদের' এত মাথায় তোলার অবিচার মাত্র। তাই এবার ইংরেজের স্তম্ভ জমিদার শ্রেণী হিন্দু এবং মুসলমান উভয় শ্রেণীর উপর মুসলিম বিপ্লবীদের আক্রমণ শুরু হয় এবং তা বহুদিন পর্যন্ত চলতে থাকে।

(দ্রঃ P. J. D.C. C. No. 25, 29 May 1843, P. 462)

এবার ইংরেজের ইস্তিতে ফরিদপুরের সিকদার ও ঘোষ পরিবার নামে দু'জন বড় জমিদার মুসলমান প্রজাদের জন্য ঘোষণা করলেন মুসলমানরা গরু কোরবানী করতে পারবে না। কালী ও দুর্গাপূজায় কর দিতে বাধ্য থেকে হবে এবং দাড়ির উপর কর বসান হয় আর নিষেধ করা হয় মুসলমান বিপ্লবী দলের সাথে কোন সংযোগ রাখতে পারবে না। প্রথমে কিছু মুসলমান প্রজা তা অবহেলা করার ফলে জমিদারদের দ্বারা কঠোর শাস্তি পেতে বাধ্য হয়।

(দ্রঃ A.R. Mallic, op, cit, M. A. Khan, op cit PP 27-28)

দুদু মিয়া ১৮৪১ খ্রিষ্টাব্দে কানাই পুরের সিকদার ও ফরিদপুরের জয়নারায়ণ জমিদারদের বিরুদ্ধে সৈন্য সহ আক্রমণ করলেন এবং তাঁদের উভয়কে পরাজিত করলেন। খুব মনে রাখা দরকার এ যুদ্ধ হিন্দু মুসলমানে নয় বরং কৃষক-জমিদারের যুদ্ধ অথবা ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে মুসলমান বিপ্লবী শোষিতদের যুদ্ধ। কানাই পুরের জমিদার দুদুর দাবী মেনে নেন এবং নিজের ভুলের জন্য ক্ষমা চান। কিন্তু ১৮৪২ খ্রিষ্টাব্দে ফরিদপুরের জমিদার জয়নারায়ণ প্রবল ভাবে বিপ্লবীদের বাধা দেন ফলে যুদ্ধ তুমুলভাবে রূপ নেয়। শেষে বিপ্লবীরা জমিদারের ভাই মদন বাবুকে ধরে নিয়ে চলে যায়। অনেকে বলেন তাঁকে তুলে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হয় এবং পদ্মা নদীতে নিক্ষেপ করা হয়। (দ্রঃ M. A. Khan, op, cit, PP, 27-29) ৮০০ জন মুসলমান বিপ্লবী এ কাজে নিযুক্ত ছিলেন। জমিদাররা ইংরেজের আদালতে মামলা করেন। বিচারে ২২ জনের ৭ বছর করে জেল হয়।

দুদু মিয়ার কোন শাস্তি হয়নি। তিনি মুক্তি পান। অবশ্য তা অনেকের মতে তাঁর শাস্তি হলে থেকে বিপরীত হত কেননা পুলিশী রিপোর্ট অনুযায়ী এ সময় দুদু মিয়ার হাতে আশি হাজার লোক প্রাণ দেয়ার জন্য প্রস্তুত।

(দ্রঃ P. J.D. oc, NO. 99, 7 April, 1847, P. 146)

১৮৪১ ও ১৮৪২-এর ঘটনার পর মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দু জমিদারগণ লড়াই করতে সাহসী হননি তবে ইংরেজদের সাথে যোগাযোগ করে সমস্ত সংবাদ সরবরাহ এবং পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে জমিদারের সাথে কৃষকের লড়াই টিকে হিন্দু মুসলমানের লড়াই বলে প্রমাণ করার খুব চেষ্টা করা হয়েছিল। যাদবপুর বিশ্ব বিদ্যালয়ের অধ্যাপক অমলেন্দুদের মতে জমিদারগণ অনেকাংশে সাফল্য মণ্ডিত হয়েছিলেন। লড়াইটিকে হিন্দু মুসলমানের লড়াই বলেই সাধারণ মানুষকে বোঝানো সম্ভব হয়েছিল।

এ সময় ডানলপ সাহেব কাসিমপুরে নীল কুঠির প্রভাবশালী সাহেব। এ ইংরেজের বিশস্ত পরিচালক ছিলেন কালি প্রসাদ কাজি লাল নামে এক গোমস্তা। ডানলপ সাহেব এবং ব্রাহ্মণ গোমস্তা আট শত সশস্ত্র লোক নিয়ে বাহাদুর পুরে দুদু মিঞার বাড়ী আক্রমণ করেন এবং

বাড়ির চারজন প্রহরীকে হত্যা করেন। এবং বহু ব্যক্তিকে আহত করে সে বাজারে দেড় লক্ষ টাকার অর্থ সম্পদ নিয়ে বিজয়ী হয়ে বাড়ি ফেরেন। (দ্রঃ M. A. Khan op, cit, 33) এবং অধ্যাপক অমলেন্দুর লেখায়) ১৮৪৬ সালে ৫ ডিসেম্বর দুদু মিয়া প্রতিশোধ নিতে ডানলপ সাহেবের কুঠি আক্রমণ করেন এবং গোমস্তাকে বাখরগঞ্জ এলাকায় অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হয় আর ২৬ হাজার টাকার ক্ষতি করে দেয়া হয়, চারজন নিহত আর দেড় লক্ষ টাকার ক্ষতির তুলনায় নিশ্চয়ই এ ক্ষতি অল্প। (দ্রঃ P. J. D. O, C. No. 99, 7 April, 1847, PP. 147-148, Jwise, op cit P. 25) সে সময় ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ডানলপের বন্ধু ছিলেন এবং দু'জনেই ছিলেন ইংরেজ, ডানলপ কোর্টে কেস করলেন। দুদু মিয়া এবং ৬৩ জন মুসলমান বিপ্লবীকে বন্দী করা হয়। বিচারে সকলের শাস্তির রায় হয়। তখন ভারতের রাজধানী কলকাতার সর্বোচ্চ আদালতে আপীল করা হয়। কৌশলী ইংরেজ সকলকেই মুক্তি দেয়। ১৮৪৭ সালে মুক্তি পেয়ে দুদু মিয়া সারা ভারতে প্রত্যেক কেন্দ্রে সংবাদ পাঠান যে চারদিক থেকে এক সাথে ইংরেজ ধ্বংস অভিযান চালাতে পারলে ইংরেজকে তাড়িয়ে দেশ স্বাধীন করা সম্ভব হবে। ষড়যন্ত্র চলতে লাগলো, শেষে খুবই গোপনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল। সারা ভারতের আন্দোলন ও বিপ্লবকে ইংরেজ তার সৈন্য বাহিনী দিয়েই দমন করছে সুতরাং সৈন্যদের কোন প্রকারে ক্ষেপিয়ে তুলতে পারলেই উদ্দেশ্য সফল থেকে পারে। ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভয়াবহ রূপ রুদ্র মূর্তি ধরবার পূর্বেই সরকার টের পেলে যে চতুর নেতা আলা উদ্দিন ওরফে দুদু মিয়াকে জেলে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। তাই তাঁকে বন্দী করে জেলে খুব অত্যাচার ও দুর্ব্যবহারের ইফন করা হল। শরীর দুর্বল হয়ে অসুস্থ অবস্থায় তিনি থাকলেও মন আর মস্তিষ্ক দুর্বল হয়নি একটুও। তাঁকে ছাড়া হয়েছিল ১৮৬০ সালে। তাঁকে যে শুধু ভয় করেই সরকার তাদের নিরাপত্তার জন্য বন্দী করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। (দ্রঃ J. Wise, op cit, P. 25; M. A. Khan, op cit, PP 42-43) দু'বছর তিনি জেলের বাইরে থাকলেও জের অত্যাচারের জের টাতে হয়েছিল শেষ পর্যন্ত। ১৮৬২ সালে স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম বিপ্লবী আলা উদ্দিন ওরফে দুদু মিয়া ২৪ সেপ্টেম্বর ঢাকাতে চির নিদ্রিত হলেন। আজিকার নিষ্ঠুর ইতিহাসে যেন ভুলে গেছে সে কথা।

দুদু মিয়ার মৃত্যুর পরেই গিয়াসুদ্দিন হায়দার হাল ধরলেন বিপ্লবী দলের। কিন্তু তিনি কঠিন অসুস্থতার জন্য তাঁর ছোট ভাই আবদুল গফুর (ডাকনাম নোয়া মিয়া)-কে নেতা নির্ধারিত করেন।

আলাউদ্দিন ও দুদু মিয়ার আর একজন সম সাময়িক বিপ্লবী বন্ধু ছিলেন, তিনি হচ্ছেন ২৪ পরগনা জেলার চাঁদপুর গ্রামের মীর নিসার আলী। ডাক নাম ছিল তেতো মিয়া। ছোট বেলায় খুব জ্বর হত তাই তাঁকে নানী কালমেঘা পাছগাছরা তিক্ত ঔষধ খাওয়াতে চাইলে শিতাবীর নানীর হাতে থেকে অম্লান বদনে তা খেয়ে নিতেন। তাই তেতো, তীতা থেকেই তীতু নামের উৎপত্তি। বিপ্লবী মাওলানা আলা উদ্দিন সাহেব (দুদু) হজ্জে যাবার আগে তাঁর সাথে দেখা করতে গিয়ে অনেক গোপন আলোচনা করেন। মৌলবী নিসার আলী বা তীতু মিয়া তাঁকে একটি তসবীহ মালা উপহার দেন। পরে এ মালা তিনি তাঁর শয্যা কক্ষে সযতনে রেখে দিয়েছিলেন। নিসার আলী ১৭৮২ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তার সাথে স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রদূত সৈয়দ আহমদ ব্রেলবীর দেখা হয় মক্কাশরীফে হজ্জের সময়। আগে থেকেই তিনি তাঁর চিন্তাধারা বিপ্লবী পদ্ধতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। এখন তিনি তাঁর কাছে লামাত বা মুরাদ হলেন আর নিজের আজীবন সবকিছু তাঁর কাছে সঁপে দিলেন। আহমদ সাহেব ও শিষ্যকে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে ভারতের শ্রেষ্ঠতম রাজনৈতিক কেন্দ্র কলকাতায় তথা

বাংলার বিপ্লবের ভার দিলেন। মীর নিসার আলী পীর বা গুরুর পরামর্শে প্রথমে তবলীগী অভিযান শুরু করেন যাতে প্রত্যেক মুসলমান প্রথমে প্রকৃত মুসলমান থেকে পারে। তাহলে ইংরেজকে তাড়াবার জন্য তারাই নিজেরা ক্ষেপে উঠবে, ক্ষেপাবার দরকার হবে না। ১৮২৭ খ্রিষ্টাব্দের দিকে যখন শিখের বিরুদ্ধে সৈয়দ আহমদ জিহাদের ফতোয়া দিয়ে প্রবল যুদ্ধে লিপ্ত তখন মীর নিসার আলী ভারতের কেন্দ্র বঙ্গে শুধু ধর্ম প্রচারই করে যাচ্ছেন। তার প্রধান কারণ ইংরেজ যেন বঙ্গের ঘাঁটি চূর্ণ করার চিন্তা না করে, যেহেতু এখানে এখনও অনেক কাজ বাকী আছে। কিন্তু অত্যন্ত গোপনে চাঁদা তুলে এবং আত্মবলী দিতে প্রস্তুত এমন মুসলমান যুবকদের সুদূর পাঞ্জাবের সিতানা অঞ্চলে পাঠাতেন আর প্রায় দলই এ সমস্ত সফরে যেতেন। আরও গুরুত্বপূর্ণ কথা এটাই যে, যে লোকগুলোকে পাঠানো হত তাদের গেরিলা যুদ্ধের সর্বপ্রকার ট্রেনিং নিসার আলী নিজেই দিতেন। যেহেতু তিনি একজন বিখ্যাত কুস্তিগীর বা ব্যায়ামবীর ছিলেন-গফুর সিদ্দিকী লিখিত 'শহীদ তীতুমীর' ৩০-৪১ এবং A. R. Mallick op cit, PP, 76-777 দ্রঃ) তাঁর জ্বালাময়ী বাগি়াতা শক্তি ছিল, তাই তাঁর বক্তৃতা শুনবার জন্য সভায় হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে জমা হত।

তীতুমীর ইসলাম ধর্মকে যেমন ভাল বাসতেন আবার তেমনি হিন্দুদের দুঃখ দুর্দশার কথাও চিন্তা করতেন এবং তাদের বিপদে নিজে যথাসাধ্য তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে। এতদসত্ত্বেও ইংরেজের পোষাপুত্র জমিদারগণ তাঁর উপর রাগ করতেন এবং তাঁর ধ্বংস কামনা করতেন। এ প্রসঙ্গে একজন নিরপেক্ষ লেখকের উদ্ধৃতি স্বরূপ একাংশ তুলে ধরা হলো-“তীতু আপন ধর্মমত প্রচার করতেন। সে ধর্মমত প্রচারে পীড়ন তাড়ন ছিল না। লোকে তার বাগবিন্যাসে মুগ্ধ হয়ে তার প্রচারে স্তম্ভিত হয়ে তার মতকে সত্য ভাবিয়া, তাকে পবিত্রতা মনে করে, তার মতাবলম্বী হয়েছিল এবং তার মন্ত্র গ্রহণ করেছিল। তীতু প্রথমে মোনিতের বিনিময়ে প্রচার সিদ্ধি করতে চায় নাই জমিদার কৃষ্ণদেব জরিমানার ব্যবস্থায় তার শান্ত প্রচারে হস্তক্ষেপ করলেন।”

(দ্রঃ বিহারীলাল সরকারের 'তীতুমীর বা নারকেল বেড়িয়ার লড়াই, কলিকাতা-১৩০৪, পৃঃ ৪৭)

ইংরেজের বলে বলীয়মান বিখ্যাত জমিদার রামনারায়ণ বাবু (তারাওনিয়া), কৃষ্ণদেব রায় (পুঁড়া), গোড় প্রসাদ চৌধুরী (নগরপুরা) প্রভৃতি প্রখ্যাত জমিদার মিলিত ভাবে নিসার সাহেবের আন্দোলনকে খতম করার জন্য প্রকাশ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু করেন। প্রত্যেক জমিদার তাঁর এলাকায় ৫টি বিষয়ে নোটিশ জারী করলেন। যথা “(১) যারা তীতুমীরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে অহাবী হবে, দাড়ি রাখবে, গোঁফ ছাটবে, তাদের প্রত্যেককে ফি দাড়ির উপর আড়াই টাকা এবং ফি গোঁফের উপর পাঁচ টাকা খাজনা দিতে হবে। (২) মসজিদ প্রস্তুত করলে প্রত্যেক কাঁচা মসজিদের জন্য পাঁচশত টাকা ও প্রত্যেক পাকা মসজিদের জন্য এক সহস্র টাকা জমিদার সরকারে নজর দিতে হবে। (৩) পিতা পিতামহ বা আত্মীয় স্বজন সন্তানের যে নাম রাখবে সে নাম পরিবর্তন করে অহাবী মতে আরবী নাম রাখলে প্রত্যেক নামের জন্য খারিজানা ফি পঞ্চাশ টাকা জমিদার সরকারে জমা দিতে হবে। (৪) গোহত্যা করলে হত্যাকারীর দক্ষিণ হস্ত কাটিয়া দেয়া হবে, যেন সে ব্যক্তি আর গো হত্যা করতে না পারে। (৫) যে ব্যক্তি অহাবী তীতুমীর কেনিজ বাড়িতে স্থান দিবে তাকে তার ভিটা থেকে উচ্ছেদ করা হবে।” (দ্রঃ A. R. Mallick, op, cit, 79-79 এবং সিদ্দিকী প্রণীত 'শহীদ তীতুমীর, পৃষ্ঠা ৫০-৫১)। সুস্বদর্শি অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের উপরোক্ত সর্ব পাঁচটি কত মারাত্মক এবং তাৎপর্যপূর্ণ আর সে যুগে এ জরিমানার টাকার পরিমাণ মুসলমানদের জন্য কত সীমাহীন অত্যাচার তাই শুধু বিবেচ্য নয় বরং ভারত বর্তমান পর্যন্ত ত্রিখন্ডে খণ্ডিত হবার মূলে হচ্ছে সাম্প্রদায়ী কতার গোড়াপত্তনকারী ইংরেজ সৃষ্ট জমিদার শ্রেণী।

সৈয়দ নিসার আলীর যা প্রস্তুতি ছিল তিনি একটা হামলা করতে পারতেন কিন্তু উদ্দেশ্য ঠার হিন্দু মুসলমানে লড়াই নয় বরং লড়াই হবে মুসলমান ও হিন্দুর সাথে ইংরেজের, তাই তিনি পুঁড়ার জমিদারকে শান্তির জন্য একটি মূল্যবান পত্র দিয়েছিলেন। সে পত্রটির ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। “দ্রষ্টব্যঃ জনাব কৃষ্ণদেব রায় সমীপে-পুঁড়ার জমিদার বাড়ি।

মহাশয় আমি আপনার প্রজা না হলেও আপনার স্বদেশবাসী আমি লোক পরাস্পরায় যজ্ঞানতে পারলাম আপনি আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন, আমাকে অহাবী বলে আপনি মুসলমানদের নিকট হয়ে করবার চেষ্টা করেছেন। আপনি কেন একরূপ করেছেন তা বুঝতে পারা মুশকিল। আমি আপনার কোন ক্ষতি করি নাই। যদি কেহ আমার বিরুদ্ধে আপনার নিকট কোন মিথ্যা কথায় আপনাকে উত্তেজিত করে থাকে তাহলে আপনার উচিত ছিল সত্যের সন্ধান করে হুকুম জারী করা। আমি ধীন ইসলাম জারী করিতেছি। মুসলমানদিগকে ইসলাম ধর্ম শিক্ষা দিচ্ছি। এতে আপনার অসন্তুষ্টের কি কারণ থাকতে পারে? যার ধর্ম সেই বুঝে। আপনি ইসলাম ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করবেন না, অহাবী ধর্ম বলে দুনিয়ায় কোন ধর্ম নাই। আল্লার মনঃপুত ধর্মই ইসলাম, ইসলাম শব্দের অর্থ শান্তি। একমাত্র ইসলাম ধর্ম ব্যতীত আর কোন ধর্মই জগতে শান্তি আনয়ন করতে পারে না। ইসলামী ধরনের নাম রাখা, দাড়ি রাখা, গোঁফ ছোট করা, ঈদুল আযহার কুরবানী করা ও আকীকা করবানী করা মুসলমানদিগের আল্লার ও আল্লাহর রাসুলের আদেশ। মসজিদ প্রস্তুত করে আল্লাহর প্রার্থনা করাও আল্লাহর হুকুম।-আপনি ইসলাম ধর্মের আদেশ, বিধি-নিষেধের উপর হস্তক্ষেপ করবেন না। আশা করি আপনি আপনার হুকুম প্রত্যাহার করবেন। ফকত-হাকির ও নাচিজ সৈয়দ নিসার আলী ওরফে তীতুমীর। (দ্রষ্টব্যঃ শহীদ তীতুমীর, পৃঃ ৫০-৫১)

সৈয়দ নিসার আলী তাঁর দাড়িওয়ালা সৎ সাহসী এবং নম্র শিষ্য মুহাম্মদ আমিনুল্লাহর হাতে পত্র দিয়ে পুঁড়ার জমিদার বাড়ি পাঠান। কৃষ্ণদেব পত্র পড়েই তাঁকে জমিদারী জেলে আবদ্ধ করতে আদেশ দেন এবং সকলের সামনে বন্দী সিংহ মারার মত বন্দী আমিনুল্লাহকে বাধা অবস্থায় সীমাহীন প্রহার করান হয় এবং হত্যা করা হয়। এ সংবাদ সৈয়দ নিসারের নিকট পৌঁছলে তিনি অশ্রু সংবরণ করতে পারেননি। তাই ব্যথিত হৃদয়ে বলেছিলেন, আমার আযাদী আন্দোলনের প্রথম শহীদ আমিনুল্লাহ।

এদিকে ইংরেজদের চক্রান্তে কলকাতায় বড় বড় জমিদারদের গোপন মিটিং হয় 'লাটু বাবু'র বাস ভবনে। তাতে অংশগ্রহণ করেন গোবরা, গোবিন্দপুরের জমিদার দেবনাথ রায়, নদুর আতীর দুর্গাচরণ রায়, পুঁড়ার কৃষ্ণদেব রায়, গোবর ডান্ডার কালি প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, নূর নগরের জমিদারের ম্যানেজার, টাকীর জমিদারের সদর নায়েব, রানাঘাটের জমিদারের ম্যানেজার, বাড়ির মালিক লাটু বাবু এবং বসিরহাট থানার ইংরেজ ভক্ত পুলিশ অফিসার রামরাম চক্রবর্তী। (দ্রঃ শহীদ তীতুমীর, পৃঃ ৫২-৫৩) সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে ইংরেজ পাদ্রী, ইংরেজ নীলকর ও সমস্ত জমিদার যথাসাধ্য সর্ব প্রকার সহযোগিতা নিয়ে জমিদার কৃষ্ণদেবকে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করা হবে। অধ্যাপক অমলেন্দুদের মতে তাঁরা প্রচারের মাধ্যমে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ত্রাসের করেন।

জমিদাররা উপর তলার ঘাঁটি মজবুত কর পুনরায় পূর্ব ঘোষিত নোটিশ অনুযায়ী মুসলমানদের নিকট কর আদায়ের অত্যাচার মূলক অভিযান শুরু করলেন এবং মুসলমানরা জরিমানা অনেকে দিল অনেকে গ্রাম থেকে পলায়ন করল। কিন্তু বিপ্লবী নেতা তখনো মিলন মৈত্রীর পথই খুঁজতে লাগলেন। তিনি মোটেই চাইছেন না লড়াই হিন্দু মুসলমানে হোক বরং চানছিলেন ইংরেজে মুসলমানে হউক হিন্দু জনসাধারণ অন্ততঃ নিরপেক্ষ থাকুক। কৃষ্ণদেবের

জরিমানা আদায়ের অভিযান যাখন সরফরাজপুরে আরম্ভ হল তখন সৈয়দ নিসারের সমর্থকরা বাধা দিল কিন্তু তা টিকল না। হিন্দু জমিদারে লাঠিওয়ালরা মসজিদে এবং গ্রামে পাইকারীভাবে আগুন লাগিয়ে দেওয়া আরম্ভ করে। অনেকে আগুনে ও অস্ত্রে আহত হয়। আমলেদুদের মতে একটি 'সৈন্যবাহিনী সহ সরফরাজপুর গ্রাম আক্রমণ' করা হয়। নিসার সাহেব বা তীতুমীর এখনো ধৈর্য ধরতে সক্ষম হলেন এবং কোর্টে মোকদ্দমা করলেন। বারাসাত কোর্ট এতবড় নরহত্যা মসজিদ গোড়ানো আর গ্রামকে স্থশানে পরিণত করার কেস ডিসমিস করে, তখন কলকাতায় আপীল করা হয়। তাতেও কোন সুবিচার পাওয়া গেল না তখন নিসার সাহেব ক্ষুব্ধ হলেন বুঝলেন সুবিচার চাইলে অবিচারই প্রাপ্য।

(দ্রষ্টব্য : A.R. Mallick, Co, L.t.d P-81)

বীরের ধৈর্যধারণের শেষ সীমা থেকেই কাপুরুষতার সীমা। তাই 'মরি বা করি' ভেবে নারিকেল বেড়িয়ায় একটি কেল্লা সাধ্যানুসারে তৈরি করা হল। মৈজদ্দিনের বাড়িতে সৈয়দ নিসারের আরাম করবার ও গোপন পরামর্শ করবার ব্যবস্থা হল। তারপর তাঁর সৈন্যাদ্যক্ষ মাসুম আলী ও সেখ মিশকিন সমস্ত সৈন্যদের একত্রি করে সৈয়দ সাহেব সকলকে প্রশ্ন করলেন এখন পাঁচজন লোকের প্রয়োজন যাঁরা আজ আজাদী আন্দোলনে প্রাণ দিতে প্রস্তুত। নারায়ণ তাকবীর ধর্মির মধ্যে সহস্র সহস্র সৈন্য ও সমর্থক অনিয়মিত ভাবে হাত নেড়ে জানাল প্রাণ দেয়ার প্রতিশ্রুতি। এবার আদেশ হল কৃষ্ণদেব বাবুর পুঁড়া আক্রমণ করতে। সাথে সাথে মুসলিম সৈন্য আমিনুল্লাহ হত্যা মসজিদ ও গ্রাম জ্বালানো আর অন্যায় জরিমানা আদায়ের প্রতিশোধ নিতে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করল। জমিদারদের সেনাবাহিনী নীলকর সাহেবদের কর্মচারী এবং পাটীদের সহকারি সকলে মিলে প্রতিরোধ করেও কিন্তু পরাস্ত করা সম্ভব হয় নাই। মুসলমান সৈন্যরা গরুর মাংস খাওয়ার ব্যবস্থা জমিদার বাড়িতেই করে। এবং তার শোনিতাদি মন্দিরের দেওয়ালে নিক্ষেপ করে। অবশ্য এগুলি ভদ্রসমাজে নিন্দনীয় তার চেয়েও নিন্দনীয় যারা প্রথম আক্রমণকারী বা আক্রমণের কারণ হয়। কিন্তু প্রত্যেকই অবাক হয় মাসুম সাহেবের সামরিক কায়দায় সৈন্য পরিচালনা করা দেখে যা ইংরেজকেও স্তম্ভিত করে। (মিঃ হাণ্টারের লেখা দ্রষ্টব্য)। নদীয়া জেলায়ও একটি দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছিল নিসারের দলের দ্বারা। জমিদারের পক্ষে বসিরহাটের পুলিশ অফিসারের অনেক তদবীর করার জন্য পূর্ব আক্রোশে তাঁকে আক্রমণ করা হয় এবং হত্যাও করা হয়। এছাড়া আরও বড় অভিযোগ ইংরেজদের মাধ্যমে ছিলেন তিনিই। অনেক মুসলমান সৈয়দ নিসারের আইন অমান্য করেন ফলে তাদেরও আক্রমণ করা হয় এবং কঠিনভাবে শাস্তি দেয়া হয়। হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতির মানুষ আক্রমণের শিকার হলেও চারদিকে চক্রান্ত মার্কি কথা রটে গেল। হিন্দু মুসলমানের যুদ্ধ অথচ মোটেই তা নয়। মোট কথা, নারিকেল বেড়িয়া অঞ্চলের মানুষ বেশ ভীত হয়ে পড়ে ভবিষ্যতের ভাবনায়।

(ই. টফথট ও উল্ডার-এর লেখা দ্রষ্টব্য)

এবার সৈয়দ নিসার ঘোষণা করলেন, 'আজ থেকে ইংরেজদের সাথে সর্বপ্রকার বিরোধিতা প্রকাশ্যে করতে হবে। এদিকে জমিদার বৃন্দ, থানা, ইংরেজ অফিসার, ইংরেজ নীলকরদের সুপারিশ এবং উপর মহলের পরামর্শের পরে ইংরেজ সরকার একদল অস্বারোহী সৈন্য পাঠালেন মাসুমের সৈন্যদের শায়েস্তা করতে কিন্তু সৈয়দ নিসার মাসুম ও মিশকিনের পরিচালনা পদ্ধতি ইংরেজদের চেয়েও উন্নত ধরনের ছিল ফলে ইংরেজ সৈন্য পরাজিত হয় এবং অনেকে মৃত্যুবরণ করে।

সেটা ছিল ১৩৮১ সাল। এদিকে ভারতের কেন্দ্রীয় নেতা যুদ্ধ করছেন ইংরেজের সঙ্গে শিখদের সম্মুখে। আর ১৮৩১ সালেই সৈয়দ নিসার সাহেবরা ইংরেজদের সাথে যুদ্ধ করছেন

হিন্দুদের সম্মুখে। সাধারণ দৃষ্টিতে মনে হবে হিন্দু ও মুসলমানে এবং শিখ ও মুসলমানে যুদ্ধ, কিন্তু মোটেই তা নয়। এটাই ইংরেজের চালাকি। ১৩৮১ খ্রিষ্টাব্দে মে মাসে প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের সর্বাধিনায়ক অতর্কিত শিখ আক্রমণে শহীদ হলেন। ইতিহাস আজ নীরব কেন, জানিনা। কয়েক মাস পরে সৈয়দ আহমদ ব্রেলবীর স্বর্গারোহণের সংবাদ সৈয়দ নিসারও পেয়েছিলেন কিন্তু ব্যাপক ভাবে তা প্রচার করলেন না। তবে প্রিয় নেতার মত মৃত্যুর জন্য তিনিও উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলেন।

এদিকে নারিকেল বেড়িয়ায় ইংরেজ সৈন্যের পরাজয়ের সংবাদ কলকাতায় পৌঁছাবার পরেই একজন সুদক্ষ সেনাপতির অধীনে বাছাই করা সৈন্য আর উচ্চ শ্রেণীর কামান পাঠানো হল নারিকেল বেড়িয়ার কেল্লার পতনের উদ্দেশ্যে। এবারেও সৈয়দ নিসার ওরফে তীতুমিয়া, মাসুম আলী ও মিশকিন খাঁ সৈন্যদের বললেন 'আমাদের আগ্নেয় কামান নেই হয়ত মৃত্যু থেকে পারে যাদের ইচ্ছা যুদ্ধে বিরত থাকতে পারে।' কিন্তু এমন একটিও দুর্বল হৃদয় সেদিন পাওয়া গেলনা যে প্রাণ দিতে ভয় পায়। যুদ্ধ আরম্ভ থেকেই সিংহ নিনাদে হুকার ছেড়ে ইংরেজ সৈন্যদের আক্রমণ করল মুসলিম সৈন্য। ইংরেজ সৈন্য ছত্রভঙ্গ হবার উপক্রম কিন্তু কালবিলম্ব না করে বিরাট আগ্নেয় কামান দাগাহল। কামান পরিচালককে হত্যা করবার জন্য সেনাপতি মাসুম বিদ্যুৎ গতিতে কামানের উপরে দাঁড়ালেন কিন্তু কয়েক সেকেন্ড পূর্বেই কামান দাগা হয়ে গিয়েছিল। অজস্র বিপ্লবী সৈন্য ইংরেজের কামানের গোলায় ছিন্ন ভিন্ন হয়ে মৃত্যুর কোলে ছিটকে পড়ল। মাসুম তো একেবারে ইংরেজদের কোলে গিয়ে উপস্থিত। আর কয়েক সেকেন্ড আগে লাফ দিতে পারলে হয়ত কামান মাসুমের হাতেই গর্জে উঠত। মাসুম বন্দী হলেন কেল্লা ধ্বংস হল। মাসুমের বিচার হল প্রাণদণ্ড, ফাঁসী। অপরাধ তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনের বীর। রাঙ্গা রক্ত দিলেন শ্রদ্ধেয় শহীদ মাসুম আর সৈয়দ নিসার আলী বা তীতুমীরও কামানের আগুনের গোলায় শহীদ হলেন। কিন্তু ইতিহাস নীরব, নিব্বুম। আর জীবন্ত যাদের পাওয়া গেল বিচারে তাঁদের জাহাজ ভর্তি করে ভারত থেকে দূরে যাবজ্জীবন দেয়া হল আর আহতদের হাসপাতালে দেয়ার নামে নদীতে নিক্ষেপ করে নিশ্চিত হওয়া গেল। কিন্তু হায়! আজ ইতিহাস কি নিষ্ঠুর, যাদের রাঙা রক্তে তার প্রতিটি পাতা আজ ধন্য সে অমর শহীদ মাসুম আর তীতুমীরের নাম অনেক দূরে নিক্ষিপ্ত। কিন্তু কেন? কি অপরাধ তাঁদের? বোধ হয় অপরাধ তাঁদের মুসলমানীত্বে।

যাহোক সৈয়দ আহমদ আর সৈয়দ নিসারের শহীদ হবার পর ইংরেজরা ভেবেছিল স্বাধীনতা আন্দোলন বোধ হয় খতম হয়ে গেল। আসলে আন্দোলন কিন্তু খতম হয়নি, খতম হয়েছিল ইংরেজদের হাতে কয়েক সহস্র মৌলভী, মাওলানা আল্লার ফকির। আর তাঁদের লক্ষ লক্ষ বিপ্লবী ভক্ত কামানে ফাঁসীতে, জেলে, দীপান্তরে নানাভাবে নিহত হয়েছিলেন।

এবার যাঁরা এগিয়ে এলেন তাঁদের মধ্যে পাটনার মাওলানা এনায়েত আলী, জৌনপুরের মাওলানা কেরামত আলী, হায়দ্রাবাদের মাওলানা জৈয়নুদ্দিন, মাওলানা মহরম আলী, মাওলানা ফরহাদ হুসেন প্রভৃতি প্রখ্যাত আলেম ও তাঁদের অনুগামীগণ। ব্রেলীর একজন পীর সাহেব ইমাতা জিমামি যাঁর পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি মুরিদ ছিল তিনি তাঁদের বলে দিয়েছিলেন এখন বেহেশত পাওয়ার সহজ পথ খ্রিষ্টান ঘাঁটি খতম করে দেশকে স্বাধীন করা। বাংলায় যে সমস্ত মাওলানা মোল্লাহ ও ওস্তাদজীরা যুদ্ধের জন্য টাকা সংগ্রহ ও লোক সংগ্রহ করতেন তাঁরা নিরক্ষর মানুষদের কাছে সৈয়দ আহমদের মৃত্যুর কথা উহা রাখতেন। এ সময় প্রত্যেক জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে জানিয়ে দেয়া হয়েছিল যাতে মুসলমান প্রচারকরা দপ্তরদলে যুবকদের উত্তেজিত করে এবং ইংরেজদের বন্ধু শিখদের সাথে যুদ্ধ করবার জন্য না

পাঠাতে পারে। আর মুসলমানদের জিহাদে যোগ দিত, প্রাণের বিনিময়ে তারা চেয়েছিল ইংরেজ শাসনের পতন। তার প্রধান কারণ সিরাজের পতন তাদের বা তাদের পূর্ব পুরুষদের চোখের সামনে ঘটেছে। মুর্শিদাবাদের ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটকে জেলা তদন্ত করতে এবং বিপ্লবীদের সম্বন্ধে রিপোর্ট পাঠাবার জন্য উপর মহলের আদেশ হয়। তাই জেলার শাসক তাঁর লোকজন দিয়ে জনসাধারণকে বুঝাতে চাইলেন দেশ, মা, বাবা, ছেলেমেয়ে ছেড়ে অজানা অচেনা জায়গা নিয়ে লড়াই করে মরা নির্বুদ্ধিতা ইত্যাদি। ১৮৪৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষেধক সুপারেনটেডেন্ট অব পুলিশ ডবলিউ, ডেমপিয়ার রিপোর্টে জানান বিপ্লবীরা খুব ধর্মাত্মক এক দাঙ্গা-একতাবদ্ধ এবং কয়েকজন বিশেষ নেতার দ্বারা পরিচালিত। তারা ব্রিটিশ শাসনেরই বিরোধী সুতরাং তাদের উপর খুব সাবধানতার সাথে নজর রাখা দরকার। আর যদি বিদ্রোহের বিস্তারিত হয় তাহলে সুত্রপাত হবে এসব ধর্মীয় গ্রন্থগুলো দ্বারাই। “The Muhammedan poputalin in it is from the excited religious fanaticism of this sect.”

এনায়েত আলীর নেতৃত্বে ছয়শত লোকের একটি জামান পদব্রজে রওনা হলেন। তাঁরা কোথায় যাচ্ছেন জিজ্ঞাসা করলে এ উত্তরই পাওয়া যায় তাঁরা সব হজযাত্রী। ছয়শত লোক ছোট ছোট দলে এক একজন নেতার নেতৃত্বে চলতে থাকে যাতে লোকের চোখে সন্দেহজনক না মনে হয়। মিঃ ডেমপিয়ার সাহেব জৌনপুরের কেরামত আলীর সাথে সাক্ষাত করে কিছু কথা বের করার চেষ্টা করলেও সাহেব বেশ সুবিধা করতে পারেননি।

রিপোর্টে আরও পাওয়া যায় মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুর এলাকায় নারায়ণপুর গ্রামে অনেকগুলো গ্রামের লোক একত্রিত হয়ে একটা সীমান্ত যুদ্ধের সাহায্য ও সহযোগিতা করবার ব্যবস্থা গ্রহণের পরিকল্পনা নিয়েছে। ফলে সরকার সন্তুষ্ট হয়ে পড়ে কারণ মুর্শিদাবাদ ইংরেজ বিদ্রোহের জন্য বিখ্যাত। মিঃ ডেমপিয়ারনিজে এ সব অঞ্চলে ঘুরেন এবং কোথাও বোঝান কোথাও বা ভয় প্রদর্শন কোথাও বা প্রলোভন দিয়ে তাঁর পক্ষে জনমত গঠনের চেষ্টা করেন। সবই প্রায় আয়ত্বে আসে শুধু নোয়াখালি, ফরিদপুর জেলা, প্রভৃতি ছাড়া উপরোক্ত তথ্য সমূহ-
Proceeding of the Judicial Department C. C. No. 21 25, 29 May, 1843 P, 454—461 দ্রষ্টব্য।

এসব মুসলমান বিপ্লবী দল সারা ভারতে কয়েকটি কেন্দ্রীয় অফিস তৈরি করে। যথা-হায়দ্রাবাদ, মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই, পেশোয়ার আটাক রওয়ালপিন্ডি, থানেশ্বর, ঝিলাম, অমৃত শহর, আঝলা, দিল্লী কানপুর ও পাটনা ইত্যাদি। এসব বিপ্লবী দলে দলে লোক যোগ দিতে থাকে। এমনকি হায়দ্রাবাদের শাসন কর্তার ভাইও আন্দোলনে যোগ দেন। তাঁর নাম মুবারেজুদ্দৌল্লাহ। তাঁর প্রভাবে বহু বিশিষ্ট লোক আন্দোলনে যোগ দেয়। ইংরেজ সরকার মুবারেজের উপর ষড়যন্ত্রকারীর অভিযোগ চাপিয়ে তাঁর কিছু বিশেষ সঙ্গী সহ বন্দী করে। কারাগারেই মুবারেজের মৃত্যু হয় সঙ্গীদেরও কঠিন কষ্টের সাথে প্রায় এগারো বছর কারাগারে রাখা হয়। (দ্রঃ R, C, Majumdar op, cit, PP 888—889).

বিদ্রোহীদের প্রধান ঘাঁটি ছিল ‘সীতানা’ কেন্দ্র বাংলা থেকে দূরত্ব প্রায় দু’ হাজার মাইল। বাঙ্গালী মুসলিমবীরেরা এ দু’হাজার মাইল পদব্রজে ধর্মের জন্য ইংরেজদের মারবার জন্য অথবা তাদের হাতে মরার জন্য কেমন করে যেতেন তা শুধু পড়ার আর জানার বিষয় নয় বরং গভীর চিন্তার বিষয়। আর ইংরেজের চোখে ধুলো দিয়ে কেমন ভাবে যোদ্ধা সংগ্রহ করা হত, আর কেমন ভাবে মা বাবা উৎসর্গ করতেন মৃত্যুর মুখে প্রিয় সন্তানকে, কেমন করে যুবতী স্ত্রী বিদায় দিত তার প্রিয় স্বামীকে সে দৃশ্য একটু কল্পনা করলে মনে ভক্তির তরঙ্গে

জোয়ার এনে দেয়। আর এ মৌলভী মোল্লা যাদের বক্তৃতা ও যুক্তিতে মানুষ পতঙ্গের মত জ্বালাতনে ঝাঁপ দিতে পারে তাদের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে আমরা বাধ্য কিন্তু নির্ভর ইতিহাস দীর্ঘ। পুরুষেরা দান করত ফসলের অংশ যা তারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কঠোরশ্রমে ফলাত। আর মেয়েরা তাদের অতি সাধের গহনাগুলো খুলে দিত মোল্লাদের হাতে। তাঁরা সে টাকা কেন্দ্রে পাঠাতেন, পত্র পাঠাতেন কিন্তু সেসব পত্রের ভাষা ছিল সঙ্কেতি। দলের লোক ছাড়া বোঝা অসম্ভব ছিল। আরও কঠিন কাজ করতে হত বিপ্লবীদের গুপ্তচর বাহিনীতে যারা স্বচ্ছল পরিবারের ছেলে হয়েও, শিক্ষিত হয়েও মূর্খের অভিনয় করে সাহেবদের বাড়ির চাকর হয়ে সংবাদ সরবরাহ করেছেন। (দ্রঃ এ পুস্তক)

ইংরেজরা শিখ সর্দার রনজিং সিং রায়ের মৃত্যুর পর ১৮৩৯ থেকে একেবারে ১৮৪৭ খ্রিষ্টাব্দে নিজেরা পাঞ্জাবের কর্তৃত্ব হাতে নেয় তখন শিখ জাতির অনেকে বুঝল ইংরেজ জাতি শিখদের আসল বন্ধু নয়।

১৮৪৯ খ্রিষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রখ্যাত পরিচালক মাওলানা বেলায়েত আলী পাটনা থেকে সীতানা ঘাঁটি রওনা হলেন এবং বিভিন্ন জেলা ও শহরে অবস্থান করে সংগ্রামের বীজ ছড়াতে ছড়াতে মানুষকে জিহাদের দিকে আকর্ষিত করতে থাকেন। এমনভাবে দিল্লীতে পৌঁছান এবং দু’মাস সেখানে থেকে দিল্লীর শেষ সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের সাথে সাক্ষাৎ করেন। দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের যোগ্যতা বীরত্ব ও মথেকুর আভাব ছিল না। কিন্তু ডানা ভাঙ্গা পাখির মত তিনি শক্তিশীল ছিলেন। সারা ভারতের শিখ ও হিন্দুদের বিরোধীতা অথবা সহযোগীতার অভাবে ইংরেজ যেন ভারতের হাতের মুঠোর মধ্যে পুরেচে। মাওলানা বেলায়েত আলী ইংরেজদের শুধু শক্তি, পদ ও সিংহাসন থেকে নয় বরং ভারত থেকে চির বিদায় নেবার প্রস্তুতির ব্যাপারে বাহাদুর শাহের সাহায্য প্রার্থনা করেন। সম্রাট বাহাদুর শাহ উত্তর দিয়েছিলেন—আমি আমার প্রাণ দিতেও প্রস্তুত, এ বিশ্বাস ঘাতক ইংরেজ সরকারকে হটাতে যথা সম্ভব আমার সবকিছু তোমরা আশা করতে পার। তারপর মাওলানা বেলায়েত আলী সীতানায় পৌঁছলেন। সেখানে তাঁর ভাই এনায়েত আলী কর্মরত কঠিন কর্তব্যে গেরিলা যুদ্ধের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। দুই ভাই-ই একই মত্রে দীক্ষিত। এনায়েত আলী প্রস্তাব করলেন ইংরেজদের সাথে সামগ্রিক যুদ্ধ করার। (Total war) কিন্তু মাওলানা বেলায়েত আলি আরও প্রস্তুতির প্রয়োজন মনে করে বললেন, সামগ্রিক যুদ্ধ করার অর্থ শুধু পরাজিত হওয়া। (দ্রঃ R. C. Majumdar, P, 890) ১৮৫২ খ্রিষ্টাব্দে বিখ্যাত বীর মাওলানা বেলায়েত আলী দেহ ত্যাগ করেন।

হযরত মাওলানা শাহ আহমাদ মুজাদ্দের সাহেবের বিষয় পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। তাঁরই স্বপ্ন সাধনা এবং বাদশাহ আলমগীরের কান্নাপুত অন্তিম মোনায়াত বা প্রার্থনার ফল স্বরূপ ফকির মাওলানা শাহ ওলিউল্লাহ রোপিত বৃক্ষের ফল মহাজের মক্কী হাজী এমদাদুল্লাহ তাঁর সম্বন্ধেও পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। তিনি যেমন আধ্যাতিক তাবাতাশাউফতত্বের মুকুটমণি ছিলেন তেমনি রাজনৈতিক চেতনাতেও ছিলেন সুদূরদর্শক নেতা। তিনি স্বয়ং বিপ্লবী সৈন্যদের উৎসাহ দিয়ে যেতে লাগলেন। ১৮৫৭ সালে তাঁকে স্বাধীনতার প্রথম যুদ্ধের পরিচালক করা হল। অপর দিকে পীর ফকির মাওলানা রসিদ আহমাদকে (রঃ)-কে যুদ্ধের প্রধানমন্ত্রী করা হয়। আর মাওলানা পীর মাহমাদুল হাসান (রঃ)-কে পররাষ্ট্র দফতরের প্রধান হিসাবে বরণ করা হয় হযরত সৈয়দ আহমাদ শহীদে (রঃ) রক্ত বিফল হবার নয়, লক্ষ লক্ষ মানুষ আরও রক্ত দিতে প্রস্তুত হল ইংরেজের বিরুদ্ধে। সামরিক কায়দায় যুদ্ধ ব্যবস্থায় তিনিই মহান নেতা, মহান শহীদ, মহান পরিচালক সন্দেহ নেই। (দ্রঃ হায়াতে মাদানী)

অনেকের ধারণা মিঃ উইলিয়াম হাণ্টার একজন মুসলমান দরদী ইংরেজ। অনেক হিন্দু বিদ্যেী মুসলমান তাঁর সে লেখারই উদ্ধৃতি দিয়ে থাকেন যেগুলোতে প্রমাণ হয় তাঁর মুসলমান প্রীতির কথা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মিঃ হাণ্টার ইসলাম তথা মুসলমানদের চরম শত্রু এবং হিন্দুদেরও পরম শত্রু। তাঁর 'দি ইণ্ডিয়ান মুসলমান' গ্রন্থটি হিন্দু-মুসলমান বিবাদ বা বিভেদ বৃদ্ধিতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী পুস্তক। যা ভারত বিভাগেও সহায়ক। যেমন পবিত্র কুরআনের উপর আঘাত হানতে মিঃ হাণ্টার বলেছেন, “কুরআনের বাণীর সরল অর্থ এই যে, ইসলামের অনুসারীরা সারা দুনিয়া নিজেদের অধিকারে আনবে এবং বিজিতদেরকে শুধু ধর্মাস্তর গ্রহণের কথা গোলামীর অবস্থা বরণের অথবা মৃত্যু বরণ করার সুযোগ দেবে। একটা আধুনিক ‘নেশানের’ অভাব সংকট সমাধানের উপযোগী করে কুরআন লিখিত হয়নি। তা লিখিত হয়েছিল একটা স্থানীয় যুদ্ধ প্রিয় আরব গোত্রের উৎপাদিত, আক্রমণকারী ও বিজয়ী সম্প্রদায়ের ক্রমিক ভাগ্য পরিবর্তনের ভূমিকার উপযোগী করে।” ইত্যাদি আরও অনেক উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁর মুসলমান বিদ্যেীতা প্রমাণ করা যায়। তবু তাঁর পুস্তকে পাণ্ডিত্যের প্রশংসা বা স্বাধীনতা আন্দোলনের অনেক সত্য তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। মুসলমানদের দ্বারা বারবার বিপ্লবে বিব্রত হয়ে সারা ভারতে জনগণের সামগ্রিক অসন্তুষ্টি সৃষ্টির কারণ অনুসন্ধান এবং তার রিপোর্ট লিখতে দিলে তিনি এ বিখ্যাত বইটি লিখেছেন। বইটির নামেও বোঝানো যায় ভারতীয় মুসলমানদের মর্যাদা ও গুরুত্ব কতখানি। অথচ ভারতে চিরদিনই হিন্দু জাতি সংখ্যা গরিষ্ঠ তবুও “দি ইণ্ডিয়ান হিন্দু” বলে কোন গ্রন্থ তিনি লিখে যাননি। স্বাধীনতা আন্দোলনের অনেক তথ্য হাণ্টারের লেখায় পাওয়া যায়।

হযরত মাওলানা সৈয়দ আহমাদ ব্রেলবী (রঃ) যিনি এতবড় ফকির সাধক ও দেশের জন্য মৃত্যু বরণকারী, যিনি আজ অলিখিত অপ্রকাশিত ইতিহাসে, স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রবর্তার, যিনি সারা ভারতে ইংরেজ জাতিকে পশু পালনের মত তাড়িয়ে নিয়ে ভারতের বাইরে রেখে আসতে চেয়েছিলেন তার জন্য মিঃ হাণ্টার লিখেছেন, “একজন বিখ্যাত ডাকাতের অধীনে তিনি একজন ঘোড়া সওয়ার সৈন্য ছিলেন। সৈয়দ আহমদ সময়ের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিলেন। তিনি ডাকাতি ছেড়ে দিয়ে দিল্লীর বিখ্যাত একজন মাওলানার নিকট শরীয়তের শিক্ষা গ্রহণ করলেন।” “অনেক বছর ধরে দুঃসাহসী মুসলমানেরা হচ্ছে এদেশের ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে চিরন্তন বিপদ। কোন না কোন কারণে তারা আমাদের মাসন প্রণালী থেকে দূরে সরে আছে। নম্রভাবে পশু হিন্দু সম্প্রদায় যেখানে আমাদের প্রবর্তিত পরিবর্তনগুলো আনন্দের সাথে মেনে নিয়েছে সেখানে মুসলমানরা তাদের জন্য ভীষণ অত্যাচার হিসাবেই ধরে নিয়েছে।” “পাঞ্জাব সীমান্তে বিদ্রোহী বসতি স্থাপন করেন সৈয়দ আহমদ।” “১৮২০ খ্রিষ্টাব্দে সৈয়দ আহমাদ ধীরে ধীরে ভারতের দক্ষিণাঞ্চল ভ্রমণ করলেন। তখন তাঁর শিষ্যরা তাঁর ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য স্বরণ করে সাধারণ চাকরের মত গোলামী করত।” এবং বহু দেশ বিখ্যাত মাওলানা গোলামেরমত খালিপায়ে তাঁর পাক্কির দুধার দিয়ে দৌড়ে দৌড়ে যেতেন।” উপরোক্ত তথ্যগুলো মুসলমান বিদ্যেী হাণ্টারের লেখা থেকে নিলেও আমাদের ইতিহাসের সত্যতার পরিপূরক। তিনি আরও লিখেছেন, “১৮২২ সালে তিনি হজ্ব করতে যান এবং পূর্বকার ডাকাতিতে হাজী সাহেবের আলখেল্লায় একেবারে ঢেকে দিয়ে তিনি অক্টোবর মাসে বোম্বাই শহরে উপস্থিত হন।” “কলকাতার দিকে রওনা হলেন। কলকাতার সাধারণ মুসলমানেরা তাঁর কাছে এমনভাবে দলে দলে মুরিদ বা শিষ্য থেকে লাগল যে প্রত্যেকের হাতে হাত রেখে শিষ্য করা তাঁর পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ল তখন মাথার পাগড়ী খুলে জনতার দিকে ছুড়ে দিয়ে বলল যে কেউ তার পাগড়ী ছুঁতে পারবে সে তার মুরিদ বা শিষ্য হবে।” “ব্রেলী জেলার তার জন্মভূমিতে এক বিরাট হাঙ্গামাবাজ অনুচরের দল তার

সহযোগী হল। ১৮২৪ সালে সে পেশোয়ার সীমান্তের জঙ্গলী পার্বত্যদের মধ্যে গিয়ে পাঞ্জাবের সম্পদশালী শিখ শহরগুলোর বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করলেন।” “১৮২৬ সালে ২১ ডিসেম্বর বিদ্যেী শিখদের বিরুদ্ধে জিহাদ আরম্ভ হয়েছে। ইতিমধ্যে ইমাম সাহেবের (সৈয়দ আহমদ) প্রতিনিধিরা উত্তর প্রদেশে জিহাদের বাণী তাঁর শিষ্যদের বাড়িতে বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছিল।” “১৮৩০ সালে জুন মাসে একবার পরাজিত হয়েও বিপ্লবী সৈন্যরা দুর্দান্ত বক্রমে সমতল ভূমি ছিনিয়ে নেয়। আর সে বছর শেষ হওয়ার আগেই পাঞ্জাবের রাজধানী পেশোয়ারও তারা ছিনিয়ে নেয়।” (দি ইণ্ডিয়ান মুসলমান দ্রষ্টব্য)

সৈয়দ আহমদ যে ইংরেজ শাসনের অবসান করতে চেয়েছিলেন তাঁর জন্য মিঃ হাণ্টার লিখেছেন, “.....এ বাণী দিয়ে নিজের নামে মুদ্রার প্রচলন করেন।” হিন্দু মুসলমান জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রবণতা বা পরিমাণ অনুমান করা যায় হাণ্টারের লেখায়—“এক ইংরেজের উত্তর ভারতে অনেক বড় বড় নীলকুঠি আছে তিনি আমায় বলেছেন : তাঁর নিযুক্ত ধর্মভীরু মুসলমান জাতির নিয়মই হচ্ছে তাদের বেতনের একটা নির্দিষ্ট অংশ নিয়মিতভাবে সিপ্তানার নগরতির জন্য পাঠিয়ে দেওয়া। আর যারা দুঃসাহসিক প্রকৃতির তারা বিপ্লবী নেতাদের অধীনে কম বেশি সময়ের জন্য কাজ করতেও যায়। তাঁর হিন্দু ওভারসিয়াররা যেমন সময়ে সময়ে ছুটির দরখাস্ত করে বাৎসরিক পিতৃশ্রদ্ধ পালন করতে যায়। সে রকম ১৮৩০ সাল থেকে ১৮৪৬ সাল পর্যন্ত তাঁর মুসলমান পেয়াদারা কয়েক মাসের ছুটি নিয়েছে এই অজুহাতে যে তাদেরকে জিহাদে যোগদান করতে হবে।” “আমাদের কর্তব্য চ্যুতিতে আমাদের প্রজারা জিহাদী বাহিনীতে যোগ দিয়েছে আমাদের শিখ প্রতিবেশিদের উপর।” আগেও একাধিকবার আলোচনা করা হয়েছে ইংরেজ ও শিখ পরস্পর একে অপরের উত্তরাধিকারীর মত ছিল বলা যায়। “আমাদের পাঞ্জাব অধিকারের পর যে ধর্মাত্মতা পূর্বে প্রচণ্ডবেগে শিখদের উপর ফেটে পড়ত, তাই শিখদের উত্তরাধিকারীরূপে আমাদের উপর বর্ষিত থেকে লাগল।”

সারা ভারত এমন কি বাংলা থেকেও স্বাধীনতা যুদ্ধে মুসলমান বিপ্লবীরা কেমনভাবে টাকা এবং যোদ্ধা সরবরাহ করত তারও প্রমাণ এ মিঃ হাণ্টারের লেখা থেকেই পাওয়া যায়, “বাংলাদেশ থেকে বিদ্রোহী বসতিতে নিয়মিত ভাবে মানুষ ও টাকাপয়সা চালান করার জন্য তারা একটা টাকা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। ঠিক সে সময় পাটনার ম্যাজিস্ট্রেট রিপোর্ট পাঠান পাটনা শহরে বিদ্রোহীদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে।” সৈয়দ আহমদ সাহেবের ১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দে শহীদ হওয়ার পর অনেকে আন্দাজ করেন মুসলমানরা বোধ হয় চূপ চাপ ছিল পরে একবার ১৮৩১ সালে ধুমকেতুর মত আবার বিপ্লব শুরু হয়ে গেল। কিন্তু আসল সত্য হচ্ছে এটাই যে, মুসলমান বিপ্লবীরা বার বার ইংরেজদের আক্রমণ করেছে। মিঃ হাণ্টার বলেছেন, “সব সময়ই জিহাদীরা সীমান্তের আদি জাতি গুলোকে ব্যস্ত রেখেছিল ব্রিটিশ শক্তির সাথে বিরামহীন সংগ্রামে। ১৮৫০ সাল থেকে ১৮৬৩ সালের মধ্যে এ যুদ্ধের সংখ্যা হল কুড়িবার।। তার জন্য দরকার হয়েছে ষাট হাজার স্থায়ী সৈন্যের। তাছাড়া অস্থায়ী এবং পুলিশ তো আছেই।” “হিংসার বশবর্তী হয়ে কেমন করে (বিপ্লবীরা) যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ জানাতে সাহসী থেকে পারে এটা বোঝা মোটেই কঠিন ব্যার নয় কিন্তু এটা বোঝা খুবই শক্ত, যে একটি সুসভ্য দেশের (ইংল্যান্ডের) সেনাবাহিনীর সুকৌশল ও সমরনীতির বিরুদ্ধে কিভাবে তারা বহুযুগ ধরেটিকে থাকতে পারে।” (দি ইণ্ডিয়ান মুসলমানস)

তখনকার মাওলানা ও পীরদের কাজই জিল দলবলকে স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগ দেওয়ানো এবং এ জিহাদ তাঁদের কাছে নামায, রোযার মত ধর্মীয় ফরয বা অবশ্য কর্তব্য ছিল। তার প্রমাণেও হাণ্টার বলেছেন, “সোয়াত রাজ্যে অবস্থিত ধর্মনেতা আখন্দ সাহেবের প্রায়

ছিয়ানব্বই হাজার মুরিদ বা শিষ্য ছিল আর তাদের প্রত্যেকটি লোক ইংরেজ আক্রমণের সম্ভাবনায় সজাগ ছিল। আর এ জন্যই তাদের খাটি বিশ্বাস ছিল এ বিধর্মীদের (ইংরেজদের) সাথে যখন যুদ্ধ করতেই হবে তখন একজন ইমাম সাহেবের অধীনেই থাকা যুক্তিযুক্ত। কারণ বিপ্লবী ইমাম সাহেবের পতাকার নীচে যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ গেলেও ধর্ম শহীদের মর্যাদা লাভ করা যাবে। ১৮৬৩ সালের অভিযানের সময় আমরা তিন্ত অভিজ্ঞতা লাভ করেছি বিপ্লবীদের সাথে যুদ্ধ করতে হলে আমাদেরকে পৃথিবীর বীরত্ব সমন্বিত বনেদী মুসলমান জাতিদের তিপ্পান হাজার সম্মিলিত সৈন্যের শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে।” (এ পুস্তক)

মিঃ হাণ্টারের উপরোক্ত লিখিত মন্তব্য গুলোতে পূর্ণভাবে প্রমাণ হয় স্বাধীনতা যুদ্ধে বিপ্লবীদের শক্তি সামর্থ সাহস ও সৈন্য সংখ্যার কথা। আসলে হাণ্টার ইংরেজ সরকারের বেতন ভোগী বিশ্বাসী কর্মচারী সিভিলিয়ান, অন্তরে ভারত বিদ্বেষে ভারপূর। তাই তিনি এ তিপ্পান হাজার সৈন্যের কথা বলেছেন। আসলে সংখ্যাটি হবে ষাট হাজার (Foreign office Records, A. Maudud)

সিপাহী বিদ্রোহ না স্বাধীনতা বিপ্লব?

১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের অনেক কথা সহজ লভ্য ইতিহাসে পাওয়া যায়। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহ নামটি ইংরেজদের দেয়া। স্বাধীনতার সম্মানীয় বিপ্লবীদের ছোট এবং হয়ে করার জন্যই এ বিলেতী বুদ্ধির ব্যবহার। ঠিক তেমনি ভাবেই ‘ওহাবী যুদ্ধ’ কথাটিও বিলেতী বুদ্ধির বিস্কোরণ। যাতে সাধারণ মুসলমানরা মনে করে ওহাবীরা হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ভক্ত অথবা শত্রু। তাঁরা নাকি নবী ও সাহাবাদের কবর ভাঙ্গার দল। যাহোক কার্লমার্কস কিন্তু প্রমাণ করেছেন, “ব্রিটিশ শাসক শ্রেণীরা অভ্যুত্থানকে কেবল সশস্ত্র সিপাহী বিদ্রোহরূপে দেখতে চায়, তার সাথে যে ভারতীয় জনগণের ব্যাপক অংশ জড়িত তা লুকাতে চায় তারা।”

(দৃষ্টব্য প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ কার্লমার্কস ফ্রেডরিক এঙ্গেলস পৃঃ-১০)

“বিদ্রোহের ইতিহাস যাঁরা প্রথমে লিপিবদ্ধ করছিলেন, তাঁদের সকলেই ছিলেন ইংরেজ। বেশির ভাগ লেখক আবার ইংরেজ রাজ পুরুষ।” ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা একে বলেছে সিপাহী বিদ্রোহ আর ভারতীয়েরা একে বলতে চান ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম।”

দ্রঃ সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস, মনিবাগচি, প্রথম প্রকাশ, ১ম পাতা)

প্রথমে কলকাতা হবে কিছু দূরে ব্যারাকপুরে সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হয় বলেই আমাদের মোটামুটি জানা ছিল। কিন্তু তা নয় সৈন্যদেরকে ইংরেজের প্রতি বিদ্বেষ পরায়ন করিয়ে দেওয়া হয়েছিল বাইরে থেকেই। বিশেষ করে এটা ছিল মৌলবী মাওলানা ও পীর ফকিরদের কাজ আর তার কারণ ছিল ইংরেজের সুকৌশলে ধর্মে হস্তক্ষেপ। আগেই বলা হয়েছে মুরশিদাবাদ জেলার ইংরেজ বিদ্বেষের কথা। মুরশিদাবাদ জেলায় ১৮৫৭ সালে ২৬ ফেব্রুয়ারি বহরমপুরেই প্রথম সিপাহী বিদ্রোহ হয়। আর তার পরের মাসে মার্চ এ আগুন লাগানোর ঘটনা ঘটে ব্যারাকপুরে (দ্রঃ কার্লমার্কস ফ্রেডরিক এঙ্গেলস পৃঃ ১৯৮) “ব্যারাকপুর থেকে একশ মাইল দূরে ভাগীরথীর তীরে এ সেনানিবাস। বিদ্রোহের ডঙ্কা এখানেই প্রথম বেজেছিল।”

(সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস পৃঃ ৩২)

কার্লমার্কস ও এঙ্গেলস মুসলমান মাওলানা পীর ওলীদের সংক্ষেপে নাম ‘ফকির’ শব্দ ব্যবহার করেছেন। কোন জায়গায় মৌলবী শব্দও ব্যবহার করেছেন। পূর্বে যে সমস্ত আলোচনা হয়েছে তাতে যেন প্রমাণ হয় যত বিপ্লব সবই যেন শুধু মুসলমানরাই করেছে আর কেউ কিছু করেনি, তা নয় মুসলমানদের সাথে অমুসলমানদেরও ভূমিকা কিছু কিছু পরিলক্ষিত

হয়, যেমন কৃষক বিদ্রোহে অনুন্নত হিন্দুদের সন্ধান মেলে। তাছাড়া ১৮৫৬-তে সাঁওতাল বিদ্রোহ এবং সন্ন্যাসী বিদ্রোহকে অনুন্নত অমুসলমানদেরই অবদান বলা যায়। (দ্রঃ মনি বাগচির সিঃ যঃ ইঃ)। তবে ফকির বিদ্রোহের নেতা মজনু শাহ-ই সন্ন্যাসী নেতা ভবানী পাঠককে বিদ্রোহে অবতীর্ণ করেন বলে অনেকে মত প্রকাশ করেন। মজনু ভবানী পাঠকের মধ্যে বেশ ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল তার প্রমাণের অভাব নেই (ক) “ফকির নেতা মজনুর সাথে সন্ন্যাসী নেতা ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরাণীর ছিল ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। (খ) সাঁওতাল বিদ্রোহেও (১৮৫৫-৫৭) স্থানীয় মুসলমান তাঁতীরা ‘সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা’ করে। (ক ও খ উদ্ধৃতি দু’টি ডক্টর মনিরুজ্জামান সাহেবের লেখা থেকে নেওয়া হয়েছে; আর তিনি নিয়েছেন নরহরি কবিরাজের লেখা ‘স্বাধীনতা সংগ্রাম বাংলা’ পুস্তকের ৫৩ ও ৮২ পৃঃ থেকে)।

সৈয়দ আহমেদ ব্রেলবীর শহীদ হওয়ার সাথে সাথে শত শত মোজাহেদ শহীদ হন তার মধ্যে বিখ্যাত নেতাদের মধ্যে মাওলানা ইসমাইল শহীদ ও মাওলানা আবদুল হাই প্রমুখ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। অবশ্য রণজিত সিং যেমন ইংরেজদের প্রকাশ্য পক্ষালম্বনকারী তার উপর ইংরেজদের চক্রান্তের শিকার হয়েছিল ইয়ার আলী নামক এক বিশ্বাসঘাতক। তাই ১৮৫৩ খ্রিঃ বালাকোটের এ মর্মান্তিক বিপর্যয়। বিপর্যয়ের পরেই মাওলানা সৈয়দ ওমর আলি সিন্তানায় উপস্থিত হন এবং সর্বসম্মত নির্বাচন ক্রমে মাওলানা নাসিরুদ্দিনের বিপ্লবীদের সেনাপতি করা হয়। তারপর মাওলানা এনায়েত আলী মাওলানা জয়নাল আবেদীন প্রভৃতি আলেমগণ সারা ভারতে বিপ্লবের আগুন জ্বালিয়ে জনতাকে ইংরেজদ্রোহী করে তুলতে লাগলেন। জৌনপুরের কেরামত আলী এবং হায়দারাবাদের জয়নুল আবেদীন এমন জ্বালাময়ী ধর্মীয় বক্তৃতা করতেন যে মহিলারা তাদের গয়না খুলে দান করতে চিন্তা করার অবকাশ পেতেন না। আরও সহস্র সহস্র আলেম প্রত্যেকে জিহাদকেই প্রধানতম গুরুতম দায়িত্ব মনে করে দায়িত্ব পালন কাতে লাগলেন। তার মধ্যে মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল গফুর ফরহাদ আলী, মহরম আলী, সৈয়দ আকবর শাহ, সৈয়দ মোবারকশাহ, শাহ মোহাম্মদ হোসেন, মুহাম্মদ বাকের আলী, মৌঃ আঃ রহমান, মালদহের আমিরুদ্দীন, মকসুদ আলী, থানেশ্বরের জাফর খান, পাটনার মৌঃ ইয়াহইয়া আলি, আবদুল গাফফার ১নং, আব্দুল গাফফার ২নং, ইলাহী বখশ, পাটনার হাসেনি, আবদুর রহিম, আঃ করিম, কাজী মিজান, টংকের নওয়াব আমির খান, জাহানাবাদে আবদুল মজিদ খাঁ, আল্লাহ বখশ খাঁ, আকবর খাঁ, মঃ বরকাতুল্লাহ প্রতি বিপ্লবীদের প্রত্যেকের জীবনী ঐতিহাসিক তথ্য বিজড়িত। লিখলে নিসার আলীর মত শরীয়াতুল্লাহর মত পড়ার ও বোঝার মত সম্পদ সম্ভার হবে। এদের মধ্যে আরও উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় শুধু ভারতের ছিলনা বরং তারা বহির্ভারত তথা সারা বিশ্ব সম্পর্কে খোঁজ-খবর রাখতেন। যেমন হাজী ইমদাদুল্লাহ, মাওলানা আহমাদুল্লাহ, মাওলানা ফজলে রহমান খাইরাবাদী, মাওঃ আবদুর রশীদ গাঙ্গুহী, মাওলানা কাসেম নানতাবী ও মাওঃ আব্বাস আলী (রহঃ) প্রভৃতি প্রত্যেকে ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত ছিলেন। তাদের বুদ্ধিমত্তা রাজনীতির ও কুটনীতির ইতিহাস আজ নিষ্ঠুর ভাবে অজ্ঞাত ও উপেক্ষিত। নীল চাষের ব্যাপারে ইংরেজরা চাষীদের উপরে যে অবর্ণনীয় অত্যাচার করেছিল ফলে খণ্ড খণ্ড ভাবে একাধিক বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল তারও মূলে ছিল এ মুসলমান দাঁড়িওয়ালা ফকির ও মৌলভীর দল আর তাদের ধর্মগত গণও প্রাণভুক্ত ও সমর্থক শ্রেণী। শ্রী যুক্ত দীনবন্ধু মিত্র তার নীলদর্পণ পুস্তকে তার প্রমাণ দিয়ে মুসলিম চাষী বীর তোরাব আলির নাম উল্লেখ করে প্রমাণ রেখেছেন নীল চাষের ব্যাপারে ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রাণগতঃ মুসলমানরাই চাষীরাই সংগ্রাম করেছেন।

বাইরের বিপ্লবীরা ইংরেজ সৈন্য শ্রেণীতে ভারতীয় সৈন্যদের বিদ্রোহী করার ব্যাপারে মুসলমান সৈন্য আগে থেকেই ইংরেজ বিদ্রোহী ছিল কিন্তু হিন্দু সৈন্যদের কোন ক্রমেই ইংরেজের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা সম্ভব হচ্ছিল না। সে আলোচনা পরে আসছে। তাই গুরু শূকরের চর্বি মিশ্রিত টোটো দাঁতে কাটার ঘটনা একটা কূটনৈতিক অজুহাত মাত্র। আসলে চতুর ইংরেজ এত বোকা ছিল যে, একাই টোটায় উভয় জাতির ঘৃণিত চর্বি মিশিয়ে উভয় জাতিকেই বিদ্রোহী করে তুলবে। মুসলমান মওলবী পীর ফকিরেরা এমনভাবে মাঝে নানা কিছু রটিয়ে বিদ্রোহের চেষ্টা করতেন 'যেমন লবনের মধ্যে হাড়ের গুড়া আছে' ইত্যাদি অনেক কিছু। ব্যাস এমনি কিন্তু হত মানুষের না কোন জন্তুর হাড়। টোটোর ঘটনাও তাই। টোটোর মসুন কাগজ যার জন্য বলা হয়েছিল চর্বিই কারণ কিন্তু তা নয়। কাগজ তৈরী হত শ্রীরামপুরে সেখানে হিন্দু কর্মচারী গোড়া থেকেই ছিল। যদি গরুর চর্বির কোন ব্যাপার থাকত তাহলে ওখানেই অশান্তি শুরু হয়ে যেত। ১৭ মার্চ ব্যারাকপুরের সৈন্য ছাউনিতে মিঃ হিয়ার্স যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তাতে গরু ও শূকরের চর্বির কথা অলীক বলা গেতে পারে। তাই কর্নমার্কসের মূল্যায়ণ উদ্ধৃতি এখানে স্বরণীয়— "১৮৫৭-র গোড়ার দিকে সেই মাত্র প্রচলিত শূকর ও গরুর চর্বি মাখানো টোটোর প্রবর্তন, ফকিরেরা বলতে লাগল ইচ্ছে করে করা হয়েছে যাতে প্রত্যেক সিপাহী খোয়ায়।" (কার্ল মার্কস ফ্রেডারিক এঙ্গেলস্, পৃঃ ১৯৮) ঐতিহাসিক দার্শনিক কার্ল মার্কসের লেখায় আরও দেখা যায় "১৮৫৭ তে মার্চ ও এপ্রিল আশা ও মিরাতের সিপাহীরা বার বার সেখানে নিজেদের ব্যারাকে নিজেরা আগুন লাগাত। অযোধ্যা ও উত্তর পশ্চিমের প্রদেশগুলোতে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে লোকদের ওসকাতে লাগল এ ফকিরেরা।" (দ্রঃ ঐ পুস্তক ১৯৮-এ ফকির কার? এ ফকির মৌলভীর দল যারা ইচ্ছাকৃত ভাবে মোটা-সোটা কাপড় আর তালি দেওয়া ঢিলা ঢালা হাতা জামা পরতেন আর কাঁধের উপর লাঠিতে ঝোলানো কাপড়ের পুটলী যার ভিতর থাকত লক্ষ লক্ষ টাকা, সোনার টুকরো আর দামী স্নায়ুচিকিৎসা চিঠি পত্র। আরও কত কি।

ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে মুসলমানেরাই আগে বিদ্রোহী হয়েছিল তারও কিছু কারণ থাকা দরকার। তা হচ্ছে এই ১৮৫৮ খ্রিঃ ৭ আগস্ট সর্দার শেখ হেদায়েত আলী ইংরেজ সরকারকে বিদ্রোহের কারণ সম্বন্ধে যে রিপোর্ট দিয়েছিলেন তাতে সিপাহীদের ক্রুদ্ধ হওয়ার কারণ গুলো বেশ বোঝার ব্যাপার। যথা—(ক) পাঞ্জাব অধিকার করার পর ইংরেজ সরকার সৈন্যদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে দাড়ি কাটা বাধ্যতামূলক থাকবে না কিন্তু পরে দাড়িওয়ালা সৈন্যদের দাড়ি কাটতে বাধ্য করা হয় এবং অসম্মত সৈন্যদের বরখাস্ত করা হয়। (খ) ইংরেজ পাদ্রীরে মারাত্মক খ্রিষ্টধর্ম প্রচারে সন্দেহ সৃষ্টি হয়, তার উপর সাহরানপুরে নতুন হাসপাতালে মহিলাদের জন্য পর্দার ব্যবস্থা তুলে দেওয়া হয় এবং সব জায়গাতে পর্দা সুনুতের বিরুদ্ধে প্রচার চালানো হয় এবং বিবাহের বিষয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয়। (গ) সৈন্যদের সরকারের প্রয়োজনে যেখানে যত দূরেই হোক নিয়ে যেতে বাধ্য থাকার অঙ্গীকারের সই হয়। ওশফত গ্রহণ করানো হয়। (ঘ) সর্বশেষে চর্বি মিশ্রিত টোটোর আমদানী প্রভৃতিতে ধারণা হয় সরকারের উদ্দেশ্য সকলকে খ্রিষ্টান করা।

মুসলমানদের রাস্তা রক্ত যেমন আযাদী আন্দোলনে ঢেলে দেওয়া হয়েছিল তিমনি বিখ্যাত কলমনবীশদের কালির জ্বালাময়ী লেখনী ও মুসলমানদের উগ্র চেতনাকে, স্বাধীনতার বাসনাকে বৃদ্ধি করেছিল। মিঃ হান্টার এর লেখায় ইংরেজ বিরোধী কিছু বইয়ের নাম লিপিবদ্ধ করে গেছেন। যেমন—(১) সিরাতুল মুসতাকীম, অর্থাৎ সোজা পথ তাতে জিহাদকে সোজা পথের স্থলবস্তু বলা আছে।

(২) কাসিদা বা জিহাদ মূলক কবিতা গুচ্ছ। (৩) সির-ই-ওয়াকিয়া তাতে যোদ্ধাদের বীরত্ব বর্ণনা আর বিধর্মীদের অত্যাচার পরিমাণ মত পৌছালেই জিহাদ ফরয বা অবশ্য কর্তব্য বলে স্বর্ণনা করা আছে। (৪) ভবিষ্যত জিহাদের ফলাফল আন্দাজ দেয়া আছে যা বিপ্লবীদের উৎসাহ বৃদ্ধির সহায়ক। (৫) তওয়ারীখ-কায়সারকুম কিয়া মিসবাহুস-সারী। আবদুল ওহাবের সত্যার্থী, হাতে লেখা প্রচারিত পুস্তক। (৬) তাবকিয়াতুল-আখওয়াই বা আবুসুলত ব্যবহার। (৭) নাসিহাতুল মুসলেমিন বা মুসলমানদের প্রতি উপদেশ। (৮) হেদায়াতুল-মুসলেমিন বা মুসলমানদের পথ প্রদর্শনা। (৯) চেহেলা হাদীস, জিহাদ সম্পর্কে হযরত মুহাম্মদের (সাঃ) চল্লিশ বাণী। (১০) তানবিরুল আইনাইন বা চক্ষু দায়ের দৃষ্টি প্রসারিত করেন। (১১) আমবিউল গাফেলিন অর্থাৎ অমনোযোগীদের প্রতি তিরস্কার।

(দ্রঃ দি ইণ্ডিয়ান মুসলমানস)

মুসলমান মৌলভী, মোল্লা, খুতবা প্রত্যেক গ্রামে বিত্তবান প্রত্যেকের কাছে শতকরা আড়াই টাকা হিসাবে যাকাত কর, এককালীন দান তো গ্রহণ করতেনই সেই সঙ্গে প্রত্যেক বাড়িতে প্রতি বেলায় এক মুঠি করে চাউল একটা পাত্রে রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন। ফলে মাসে সহস্র মন চাউল উঠত এবং আদায়কারী আসতে বিলম্ব হলে মেয়েরা তা বিক্রি করে তার পয়সা পৃথক করে রেখে দিত। শত প্রয়োজনেও তা খরচ করা হত না। কারণ তারাও নিশ্চিন্ত করত এ কাজটুকু করলে তাদেরও জিহাদে অংশ গ্রহণ করার মত পুণ্য পাওয়া সম্ভব হবে। মিঃ হান্টার এ তথ্যকে বিকৃত করে লিখেছেন, "আগে এজন্য মসজিদে যে সদকা ও ফিতরা আবশ্যিক হিসাবে আদায় হত পূর্বে তা কেবল গরীবদের জন্যই বন্টন করা হত। সেসব অর্থ জিহাদের জন্য গ্রহণ করতে লাগলেন।" "তিনি নির্দেশ দেন প্রতিটি গৃহে প্রত্যেক লোক প্রতি প্রতি বেলায় এক মুঠি করে চাল পৃথক করে রেখে দিতে হবে।" (মিঃ হান্টারের এ পুস্তক দ্রষ্টব্য) মিঃ হান্টার খুব সুদক্ষ চতুর লোক ছিলেন। তাই তিনি অতি কৌশলে তার গুণকে জানিয়েছেন 'পবিত্র জন্তু গরু' সম্বন্ধে তার দরদ অথচ সাহেব নিজে একজন ভাল গোমাংশ ভক্ষণকারী ছিলেন। শুধু মাওলানা শ্রেণীই নয় ধনী ও মধ্যবিত্তরাও বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগ রাখতেন। চামড়া ব্যবসায়ী প্রায় সকলেই ধনী মুসলমান ছিলেন, মিঃ হান্টার তাই মুচী সাপ্তাদায় ও মুসলমান চামড়া ব্যবসায়ীদের একই পর্যায়ে ফেলেছেন। আর ব্যারিষ্টারী চাল খাটিয়ে লিখেছেন, "তারা (অর্থাৎ মুসলমান চর্ম ব্যবসায়ীরা) বেশ জানে যদি ব্রাহ্মণেরা কখনো ক্ষমতা হাতে পায় তাহলে তরাই হবে তাদের প্রথম বলী। এই চামড়ার ব্যবসায়ীরাই হল ওহাবী সম্প্রদায়ের সবচেয়ে অর্থশালী ও ধনশালী সমর্থক; যে ওহাবীদের মূলমন্ত্র হচ্ছে বিধর্মীদের বিরুদ্ধে জিহাদ কনা।"

(দ্রঃ মিঃ হান্টারের ঐ পুস্তক)

মুসলমান মৌলভী মোল্লাদের সুনিপুণ কৌশলে প্রচারিত হয়েছিল "ময়দাতে হাড়ের গুড়া মেশানো আছে" এই জনরব কেবল বিরাটেই নয় সুদূর উত্তর পশ্চিম প্রদেশের হিন্দুদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। জনরব উঠল, মিরাতের খাবারের কলগুলোতে। রেজাদের তত্ত্ববধানে ময়দা তৈরী হচ্ছে এবং সেই সব ময়দার সঙ্গে গরুর হাড় মিশানো হচ্ছে।" দ্রঃ সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস ইংরেজ সরকার মনে করল ময়দার দাম চড়ছে কেবলই এই সব ফসাদ তাই ময়দার দাম সস্তা করে দেয়া হল। অমনি ফকির মৌলভীর দল নতুন কথা রটাতে লাগলো ফলে লোকের মনে সুদৃঢ় ধারণা হল হাড়ের গুড়া মেশানো ময়দা তাই এত সস্তা। কানপুরের রাজার কেউই ময়দা কিনলনা।" (দ্রঃ ঐ) মাদ্রাজে ভেলোর বিদ্রোহ হলেছিল এ ময়দার ঘটনাও তাতে বিজড়িত ছিল। প্রতিটি বিদ্রোহে এমনি আজগুবি কথা রটানো হয়েছিল। "ইংল্যান্ডের রাণী ও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অনুমতি ক্রমে বৃটিশ কর্মচারীরা ময়দাতে চিনিতে

ও নুনে হাড়ের গুঁড়া মিশিয়ে দিলে, ঘিয়ের সঙ্গে মেশানো হচ্ছে জন্তুর চর্বি। কুয়ার জলে গরুর মাংস ও গুয়ারের মাংস ফেলে দিয়ে এসব অপবিত্র করা হয়েছে তখন গুজব আরও রটেছিল যে, কোম্পানীর হুকুমে সকল ভারতবাসীকে বিলিতি রুটি খেতে হবে। পাউরুটিকে তখন লোকে বলত বিলিতি রুটি আর তাদের ধারণা ছিল এই বিলিতি রুটি খেলে জাত যাবে।”

(দ্রঃ ঐ)

এসব আলোচনায় বিপ্লবীদের উপর শঙ্কায় মন ভরে উঠে আর উলামা মোল্লা ফকিরদের রাজনৈতিক দূরদর্শিতা দেখে আবাক লাগে। তখনকার দিনে জাত যাওয়া রোগটা হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে খুব বেশী ছিল। আর সেই সময় হিন্দু নেতা বলতে জমিদার তালুকদার সরকারী কর্মচারী সাহিত্যিক কবিরা বেশীর ভাগই ইংরেজদের বিরোধীতা করতে পছন্দ করেন নি। তাই এ সমস্ত কল্পনিক রটনাগুলোর সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু এখানে একটা প্রশ্ন আসতে পারে যে ধর্মভীরু মাওলানা ফকির পীর আওলি হযরত মুহাম্মদের (সাঃ) আদর্শে চলতেন যদি মেনে নেয়া যায় তবে ঐ মিথ্যার কোন প্রশ্ন নেয়া কি করে সম্ভব হয়েছিল? তার উত্তরে স্মরণ করা যেতে পারে হযরত মিথ্যাকে ঘৃণা করতেন আর মিথ্যাতে বিশ্ব বাঁচাতে তিনি ছিলেন দৃঢ় হস্ত। শুধু কয়েকটি স্থানে তা বৈধ করা হয়েছে তার মধ্যে “ফিল হারব” অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্র একটি স্থান। মুসলিম বিপ্লবীরা সারা ভারত জুড়ে সংবাদ সরবরাহ করতে একটি নূতন বৈজ্ঞানিক কৌশল অবলম্বন করেছিল তার নাম ছিল ‘চাপাতি তকসিম’। পাতলা চাপাতি রুটি বাড়িতে বিপ্লবীদের বাড়িতে সাহায্যকারী ও সহযোগীদের বাড়িতে সেই চাপাতি চলত, ইংরেজ গুপ্তজন ঠিক করতে পারত না বিপ্লবীদের মধ্যে এত চাপাতি রুটির আদান প্রদানে প্রবাল্য কেন? কিন্তু প্রত্যেক চাপাতির মধ্যে থাকলে একটা কাগজের পত্র তাতে লেখা থাকত বিপ্লবীদের শহীদ হওয়ার সংবাদ এবং আগামী সঙ্কেত।

ভারতের হিন্দু জাতি এবং শিখ জাতি এই দুই বৃহত্তম ও বৃহৎ জাতি দুটির যদি সাহায্য ও সহযোগীতা, সমর্থন আশানুরূপভাবে ইংরেজ না পেত তাহলে হযরত সৈয়দ আহমদ ব্রেলবীর প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধই শেষ স্বাধীনতা যুদ্ধে পরিণত হত আর সহজেই স্বাধীনতা পাওয়া যেত। পাঞ্জাবের মহারাজা ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দে দীলিপ সিং জাতি ত্যাগ করে খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। (দ্রঃ কার্লমার্কস ফ্রেডারিক এ্যাসেলস্ পৃঃ ১৯৭)। মিঃ হান্টার শিখদের জন্য তার দূতকে ইংরেজদের উত্তরাধিকারী বলেছেন যা পূর্বেও উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে। বৃটিশ বা ইংরেজ তাই ১৮৫৭-র বিপ্লবে মুসলমানদের তো বিশ্বাসঘাতক ওহাবী ও বিদ্রোহী বলতেই সেই সঙ্গে হিন্দুদেরও বিশ্বাসঘাতক উপাধি দিতে কার্পণ্য করেন নি। কারণ সারা ভারতের হিন্দু সৈন্যরাও টোটার চর্বি ময়দায় হাড় গুঁড়া প্রভৃতির কারণে ক্ষেপে উঠেছিল। যেমন ব্যারাকপুরে মঙ্গলপাড়ে রোগের কারণে ইংরেজ অফিসারকে তরবারীর চোট দিয়ে আহত করতে দ্বিধা করেননি। কিন্তু পরে তিনি এত ভীত হয়ে নিজের বুক বন্দুক লাগিয়ে পায়ে করে ফায়ার করেন। অবশ্য মরবার চেষ্টা করেও তার প্রাণ হারায়নি তাই তাকে হাসপাতালে দিয়ে সুস্থ করা হয়েছিল পরে তার প্রাণদণ্ড হয়েছিল। ইতিহাসে মঙ্গল পাতেড়ার অবদান অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু ইতিহাসের ইতিহাসে আমরা দেখব প্রকৃত বীর আত্মহত্যা করেন না আত্মহত্যার পেছনে লুকিয়ে থাকে কাপুরুষতার ভীর্ণতা অথবা দুর্বলতা। ইতিহাসে আরও দেখা যায় মুসলমান রাজা বাদশাহ থেকে নিয়ে সামান্য সৈনিক পর্যন্ত আত্মহত্যা করার কলঙ্ক থেকে মুক্ত। এর পরে আমরা এমন আরও অনেক শহীদ বীর হিন্দুর কথা বলব যাদের তিলে তিলে দণ্ডে দণ্ডে মৃত্যু যন্ত্রণা দিয়ে শেষে হত্যা করা হয়েছে তবু তারা স্বৈচ্ছায় মৃত্যুবরণ করেননি। অথচ মিথ্যা প্রশংসার মুকুট পরিহিত বীর লর্ড ক্লাইভ কাপুরুষের মত

নিজের প্রাণ নিজেই শেষ করেছেন। যাহোক শিখ সম্বন্ধে কমিউনিষ্ট নেতা বলেছেন “বৃটিশ সার্ভিসে প্রায় ১০,০০,০০০ শিখ আছে এবং তারা কি রকম উদ্ধত শুনেছি, তারা বলে আজ তারা বৃটিশদের পক্ষে লড়াই, কিন্তু ভগবান যদি করেন তবে কাল তাদের বৃটিশদের বিরুদ্ধে লড়াইতে থেকেও পারে।” (দ্রঃ কার্লস ফ্রেঃ পৃঃ ১৯৫) তার পরে আরও লেখা হয়েছে—“ব্রাহ্মণ তন্ত্রের একটি বিশেষ সম্প্রদায় তারা হিন্দু এবং মুসলমানকেই ঘৃণা করে।” (দ্রঃ ঐ পুস্তক ঐ পৃঃ

১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ।..... প্রকাশ্যে বিদ্রোহ প্রায় ঘটতো, কোন ক্রমে তার দমন চলত; রেডুন আক্রমণে সমুদ্র পাড়ি দিতে সরাসরি অস্বীকার করল বেঙ্গল আর্মি ফলে তাদের জায়গায় আসতে হয় শিখ রেজিমেন্টগুলোকে।” (কার্লমার্কস) কার্লমার্কস আরও লিখেছেন, “কাগলিয়ারি ২৭ সেপ্টেম্বর তারিখের এটি বৃটিশ ডিস্ প্যাচ আমাদের বলেছে যে, ‘দিব্লীর শেষ খবর ১২ আগস্টের তখনও শহরটা বিদ্রোহীদের দখলে; কিন্তু শিখই একটা আক্রমণ চালানো হবে বলে আশা করা হচ্ছে, কেননা প্রভূত অতিরিক্ত শক্তি নিয়ে জেনারেল নিকলসনের পৌঁছাতে আর এক দিনের মার্চ লাগবে।’ উইলসন ও নিকলসন তাদের বর্তমান শক্তি নিয়ে আক্রমণ না করা পর্যন্ত যদি দিল্লী দখল না করা হয় তাহলে তার দেয়ালগুলো আপনা থেকেই পড়ে না যাওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকবে নিকলসনের প্রভূত শক্তির পরিমাণ হল প্রায় ৪,০০০ শিখ”। (কার্লমার্কস পৃঃ ১০৩-১০৪)

১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ ৫৭ সালের সৃষ্ট নয় বহু আগে থেকেই তা শুরু হয়েছে। তা আজ আমরা সকলে না জানলেও বা না মানলেও ইংরেজ জানত ও মানত তাই আমাদের কাপ্যানে নয় তাদের বাঁচার তাগিদে ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম রেল পথের প্রচলন ও ইলেকট্রিক টেলিগ্রাম নির্মাণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য কাজ করতে তারা বাধ্য হয়েছিল। যদি এতটুকু না করতে তাহলে যদিও শিখ সৈন্য ও ইংরেজ সৈন্য বিদ্রোহ দমনে প্রাণপণে লড়ে তবুও তাদের অবশ্য অবশ্যই পরাজয় বরণ করতে হত আর দেশ সর্বোত্তমভাবে ইংরেজ মুক্ত হত ১৯৪৭-এর পরিবর্তে ১৮৫৭ইং হত স্বাধীনতা দিবস। সত্য কথা যা সচারাচর সহজ প্রাপ্য সংবাদ নয় তা বিশ্বাস করা কঠিন। তাই শিখ জাতির সাথে মারাঠাদের কথাও একটু বলা প্রয়োজন। মারাঠারা ভারতে ইংরেজদের রাজত্ব কায়েম করার পিছনে কত সাংঘাতিকভাবে দায়ী তা এর আগে বলা দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়। তদানীন্তন মারাঠাদের দুই বিখ্যাত রাজা যাদের হাতে বিরাট জনতার জনবল সুসজ্জিত সৈন্য শ্রেণী তারা এ বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করেন নি। তা না করেও যদি নিরপেক্ষ থাকতেন তাহলেও তাদের চরিত্রে বিশ্বাস ঘাতকতার অথবা অদূরদর্শিতার অথবা সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ না দিলেই চলত। কিন্তু তারা ইংরেজদের পক্ষে প্রাণপ্রিয় আত্মীয়ের মত হয়ে ভারতীয় মুসলমান ও হিন্দুদের বুক বন্দুক মারতে ঝাঁকুঝাঁকু করেছেন। এখানেও একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি। “দুই মারাঠা রাজা হলকার ও সিন্ধিয়া কি পথ নেয় তার ওপরেই এ সিদ্ধান্ত। যে ডিসপ্যাচে মহাওতে ষ্ট্রয়ার্টের আগমনের কথা জানানো হয়, তাতেই বলা হয়েছে যে, হোলকার এখনও অটল থাকলেও তার সৈন্যরা বেয়াড়া হয়ে উঠেছে। আর সিন্ধিয়ার কর্মনীতি সম্বন্ধে একটি কথা বলা হয়নি, ইনি যুবক, জনপ্রিয়, তেজী, সমস্ত মারাঠা জাতির স্বাভাবিক নেতা ও সমাবেশে কেন্দ্র বলে তাকে ধরা হবে। তার নিজের হাজার হাজার সুশৃঙ্খল সৈন্য আছে। তিনি বৃটিশদের পক্ষ ত্যাগ করলে শুধু মধ্য ভারত তাদের হাতছাড়া হবে তাই নয়, বিপ্লবী সংঘটা পাবে বিপুল শক্তি ও সলতি।”

(দ্রঃ কার্লমার্কস ফ্রেডারিক এ্যাসেলস্ পৃঃ ১০২)

অতএব পরিষ্কারভাবে পরিচ্ছন্ন ভাষায় প্রমাণ হচ্ছে শিবাজী বংশের বংশধরগণ মারাঠাদের বিখ্যাত রাজা হলকার ও সিক্রিয়া ইংরেজদের পক্ষে ভারতীয়দের বিপক্ষে প্রাণপণে লড়াই করেছেন।

নেপালের গুর্খারা ভারতবাসীকে হত্যা করেছে ইংরেজ পক্ষে। এই বিরাট বিষয়ের ছোট কথটি প্রমাণের জন্য নামকরা সমাজ বিজ্ঞানীরা লেখা থেকেই উদ্ধৃতি দিচ্ছে—“ ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলা হলেছে—“সেখানকার ব্রিটিশ রক্ষী সৈন্যদের এখন একমাত্র আশা ৩০০ গুর্খার একটা সৈন্যদল তা তাদের সাহায্যের জন্য জঙ্গবাহাদুর পাঠিয়েছেন নেপাল থেকে।” জঙ্গবাহাদুর (১৮১৬-১৮৭২), ১৮৪৬ সাল থেকে নেপালের রাজা ১৮৫৭-৫৯ সালের ভারতীয় জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সময় ইংরেজদের পক্ষ অবলম্বন করেন”। (কার্লমার্কস্ ফ্রেঃ এঙ্গেলস্)

১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে সৈন্য বিক্ষোভের ধারাবাহিকতা

আগেই বলা হয়েছে কয়েক বছর আগে নানা জায়গায় নানা ভাবে বারে বারে বিদ্রোহ করেছিল ভারতের মুসলমান ধর্মীয় নেতা ও তাদের সমর্থকরা।

বঙ্গের পরিবেশ এমনভাবে বিম্বিয়ে উঠেছিল যে, জানুয়ারি মাসে হঠাৎ আশুন লেগে যায় ব্যারাকপুরে। অবশ্য অনেকের মতে সেখানেও মুসলমান ছিন্ন পরিচ্ছদ পরিহিত ফকির গুপ্তচরদের হাত ছিল। তারা ভিক্ষুক সেজে ক্যান্টনমেন্টে মোহর তার বাঁধা গোল টিন নিয়ে খাবার সময় উচ্ছিষ্ট ভাষা তরকারী ও রুটির টুকরো সংগ্রহের জন্য লালায়িত হয়ে লাইন দিয়ে বসে থাকতেন আর বাড়ি বাড়ি জিজ্ঞাসা করলে কেউ বলতেন মিট, কেউ বলতেন লাখনো ইত্যাদি। তার পরেই টুক টুক করে সেখানকার সৈন্যদের বিদ্রোহ আর ইংরেজদের কুর্কীর্তির কথা শোনাতে। আর বলতেন ইংরেজদের তাদের রাজ্য হারাতে আর দেবী নাই ইত্যাদি ভবিষ্যত বাণীও করতেন। মুসলমান ফকিরেরা হিন্দু সন্ন্যাসীর পোশাক পরে ইংরেজের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলতেন আর হিন্দু সৈন্যরাও সাধুদের কথা খুব মন দিয়ে শুনতেন।

প্রকৃতপক্ষে বিদ্রোহ বলতে বোঝা যায় বা দেখা যায়, তা হয়েছিল ২৬ ফেব্রুয়ারি বহরমপুরে। কলকাতা থেকে কাল নতুন টোটা এসেছে তাতে নাকি শূকর ও গরুর চর্বি আছে তাই শোনা যাচ্ছিল। অযোধ্যা নবাবের রাজ্য গ্রাস করাবার সময় ইংরেজ সরকার বাছাই করা বাঙালী সৈন্য নিয়ে গিয়েছিলেন সেখানে। আর ওখানে ছিল বিপ্লবী দলের প্রচারকদের প্রধান আর গুজবের ঘন্টি। ইংরেজের অযোধ্যা দখল করা হল বটে কিন্তু প্রায় প্রত্যেক ক্যান্টনমেন্ট থেকে যে সমস্ত সৈন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তাদের সাথে অনেক অযোধ্যার পদচ্যুত বেকার সৈন্যদের সাথে আলাপ হয় আর ফকিরদের অর্থাৎ মৌলভীদের অভিযানও চলতে থাকে। ফলে যখন বাঙালী সৈন্যরা বাংলার ডেরায় আসেন সে সাথে নিয়ে আসেন বিদ্রোহের বীজ। তাই বহরমপুর মুসলমান ও হিন্দু সৈন্যরা টোটা দাতে নিতে অস্বীকার করেন। এ্যাড জুটাস্টের মুখে সংবাদ পেয়ে মিঃ মিচেল দেশীয় অফিসারদের নিয়ে জমিদার, হাবিলদার ও সুবেদারদের আদেশ দিলেন সৈন্যদের কোয়াটার গার্ডের সামনে সমস্ত সৈন্যদের হাজির হবার জন্য। তারপর তিনি কঠিন কঠে বলেন, “শিখ সুবেদার মোহন সিংকে বলে দাও টোটা কিংবা ব্রহ্মদেশে চালান দেয়া হবে সেখানে গেলেই মানুষ মরে।” মিঃ মিচেলের হুকুম সৈন্যদের সন্ত্রস্ত বা বিগলিত করতে পারল না। ১৯ ফেব্রুয়ারি হঠাৎ রাতে সৈন্যরা বিকট চীৎকার ও কলরবে বিদ্রোহের পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন। মিঃ মিচেল গোলন্দাজ নেতাদের জানালেন তারা যেন যুদ্ধ কামান সৈন্যদের সামনে সাজিয়ে প্রস্তুত রাখে। কোন প্রকারে

বিপ্লবীরা একটু শান্ত হলেন। কলকাতা থেকে সংবাদ এল যেন ১৯নং রেজিমেন্টের অস্ত্র কেড়ে শেয়া হয়। চারদিকে ছড়িয়ে গেল এ সংবাদ। ব্যারাকপুরেও সংবাদ এল। এখানে সমস্ত সৈন্যদের এক সাথে দাঁড় করিয়ে মিঃ হিয়ার্স কঠিন কঠে নয় কোমল কঠে সৈন্যদের শোঝালেন যার সারমর্ম হচ্ছে চর্বি, হাড়ের গুঁড়া প্রভৃতির কথা কল্পনা মাত্র। কোন কোন সৈন্যরা একটু শান্ত হয়েছেন মাত্র এমন সময় তারা সংবাদ পেলেন রেঙ্গুন থেকে জাহাজ ভর্তি ইংরেজ সৈন্য কলকাতায় পৌঁছেছে। আর একটা খাবার এল বহরামপুর বিদ্রোহীদের ব্যারাকপুর এনে তোপের সামনে দাঁড় করিয়ে উড়িয়ে দেয়া হবে। এ সংবাদে আবার সৈন্যগণ ক্ষেপে উঠল। হুটগোল হল, একজন অফিসারকে তারা ভীষণভাবে আহত করলেন। এদিকে বহরামপুরে বাছাই করা বিপ্লবীদের বন্ধী করে বারাসাতে আনা হল। তারপর কলকাতা কিংবা ব্যারাকপুরে নিয়ে যাওয়া হবে। অফিসাররা ঠিক করে নিল। ব্যারাকপুরে বিদ্রোহের গোড়াপত্তন বলে দাবী করেন তা যে ঠিক নয় এবং গোড়াপত্তন যে অনেক আগে থেকেই হয়েছিল তার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা পূর্বে হয়েছে। তবুও আমরা জানি ৮ এপ্রিল মঙ্গলপাঁড়ের ফাঁসী হয় আর ২৯ মার্চ ইংরেজ অফিসার আহত হন। মধ্যে এ ৮-৯ দিনের ব্যবধানে একটা ফাঁসীর কেস শেষ হওয়া সন্দেহজনক। তবে বাঙালী সৈন্য ইংরেজ মিঃ বগকে আক্রমণ করেছেন মাত্র। মিঃ বগ মারাও যাননি, তবুও ফাঁসী হয়েছে যেহেতু সাহেবের আহত হওয়া ভারতীয়দের নিহত হবার চেয়েও বড় কথা।

এদিকে বহরমপুর থেকে আনীত হিন্দু মুসলমান সৈন্যদের সামনে মিঃ হিয়ার্স একটা বক্তৃতা করলেন, যার সারমর্ম হচ্ছে এটাই-তাদের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে পরিহিত পোশাক খুলে নেয়া হল না এবং প্রত্যেকের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা খরচা এবং বকেয়া বেতন শোধ করে দেয়া হল যেহেতু তারা পথে আসতে কোন প্রকার উত্তেজনা বা বিদ্রোহ মূলক ‘অসভ্যতা প্রদর্শন করেনি।

আসলে ওপর মহল থেকে আগেই পরামর্শ হয়েছিল যদি রাস্তা খরচা দিয়ে আর বেতন না দিয়ে ছেড়ে দেয়া হয় তাহলে কলকাতায় বিক্ষোভ ও প্রকাশ্যে বিদ্রোহ শুরু থেকে পারে কারণ অসংখ্য বিপ্লব সমর্থক সাধারণ মানুষ ও বিত্তবান মানুষ সে সুযোগের প্রতিক্ষায় আছে। মিঃ ক্যানিং সৈন্যদের বাড়ি ফিরে যাবার সংবাদে খুশী হলেন। আবার বলতে হচ্ছে মঙ্গলপাঁড়ে হিন্দু ছিলেন লাগলে তার নাম দিয়ে মুসলমান ফকিররা হিন্দু মহল্লায় প্রচার করতে লাগল পৈতেওয়ালা সাধু গোছের সৈন্যকে নিষ্ঠুরভাবে অত্যাচারী সাহেবদের ফাঁসী দেওয়ার কথা। ইংরেজ পক্ষের দেশীয় বুদ্ধিমান দালালরা প্রতিবাদ করে বলেছিলেন মঙ্গলের সাথে একই সাথে জমিদারদের তাহলে ফাঁসী হল কেন? আসলে তাদের জন্য অপরাধ ছিল তার উত্তরে প্রচারক দল প্রচার করল মঙ্গল পাঁড়ে যখন মিঃ বগকে অস্ত্র চালান তখন তিনি বাঁধা দেননি তাই তাকে ও বিদ্রোহী হিসাবে ফাঁসী দেয়া হয়েছে। পল্টনের জমিদার মুসলমান ছিলেন বলে কিছু লোকের মত। অথচ তার নাম সকলের নামের সাথে সমভাবে মর্যাদা পায়নি। তিনি যে জাতিরই হন ভারতীয় সৈন্য নিঃসন্দেহে। পাঞ্জাবের কাছেই আশ্বলা আর ঐ আশ্বলাতেই কাগজ তৈরীর প্রধান ঘাঁটি। অথচ এ এলাকাতেই মুসলমানের সে বিখ্যাত ঘাঁটি সিন্তানা। তাই ওখান থেকেও রটাতে সুবিধা হয়েছে শূকর ও গরুর চর্বির কথা। সুতরাং মিঃ আনসন গভর্ণর জেনারেল জানালেন “গোলাযোগ দেখে মনে হয় আশ্বলার রাইফেল ডিপো তুলে দেয়া ভাল কেননা টোটা অপেক্ষা টোটার কাগজেই সিপাহীদের বেশী আপত্তি।” পত্রের উত্তরে গভর্ণর জেনারেল জানালেন, “রাইফেল চালানো স্থাগিত রাখার আমি বিরোধী। ... প্রকৃত কথা টোটা নহে জনরব”।

মিরাটের বিরাট বিদ্রোহের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ভারতের সবচেয়ে বৃহত্তম সেনানীবাস সেখানে মুসলমানদের সংখ্যাতে খুব বেশী। পাঁচটি হাজার সৈন্য সব সময় সরগরম করে রেখেছে গোটা ক্যান্টনমেন্ট। এর ভিতরেই কারখানা। আর এ কারখানাতেই তৈরী হয় এ সকল চৰ্বি টোট। অতএব সর্ব প্রথম চৰ্বির কথা এখানে ওঠে তাই ইতিহাস প্রসিদ্ধ চৰ্বিযুক্ত পোপার ঘটনার জন্ম দাতর মিরাট ক্যান্টনমেন্ট অথবা সে শহরে সুকৌশলী বিখ্যাত প্রচারকবৃন্দ। তবে সেখানেও মৌলভী-মুবাশ্শিগ ও ফকিরদের অবদান নিষ্ঠুর ইতিহাসে একেবারে হজম করে নাই। যেমন একটি অত্যন্ত মূল্যবান উদ্ধৃতি পেশ করা হচ্ছে, “মিরাটে এক সময় একটা ঘটনা ঘটে। একদিন সকালে দেখা গেল কোথা থেকে এক মুসলমান ফকির এসে হাজির হয়েছে মিরাটে তার সাথে অনেক চেলা। কি একটা হাতির উপর চড়ে এ হাতি ফকিরকে পরপর কদিনই ক্যান্টনমেন্টের মধ্যে ঘুরতে দেখা গিয়েছিল। ফকির সেখানে কি করতে গিয়েছিল তা কেউই জানে না। পুলিশের হুকুম এল তার ওপর দলবল নিয়ে মিরাট থেকে এখনি চলে যাবার জন্যে। ফকির হুকুম পালন করল বটে, কিন্তু অনেকের বিশ্বাস ফকির মিরাট ছেড়ে যায়নি। সে ২০নং রেজিমেন্টের মধ্যে লুকিয়ে ছিল।”

(সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস পৃঃ ৪৫০)

হাতির উপরে চড়ে থাকা ফকিরটিকে ছিলেন এবং দলবলও কারা ছিলেন জানতে খুব গভীর চিন্তার প্রয়োজন নেই। মিরাটের বাজারের প্রত্যেক মুসলমান ও হিন্দুর শুধু জাত গেল রব। ২৩ এপ্রিল সৈন্যদের রত্ন মূর্তি দেখে ২৪ প্যারেড হবে ঘোষণা করলেন। সৈন্যদের দাঁড় করিয়ে পিছনে গুলি ভরা কামান সাজিয়ে কর্ণেল টোটো নেয়ার আদেশ করলেন। কামান সাজিয়ে কর্ণেল টোটো নেবার আদেশ করলেন। কিন্তু সকলেই আদেশ অমান্য করলেন। কিন্তু সৈন্যগণ বল প্রয়োগ করলেন না তাহলে কামানের গোলায় আত্মহত্যার নামান্তর হবে। ভারতীয় সৈন্যদের বন্দী করা হল। মিঃ হিউয়েট ও মিঃ স্মিথ মাসরিক আদালতে বিচার করিয়ে বিপ্লবী সৈন্যরা হাতে পায়ে লোহার কড়ি পরিয়ে সর্ব-সাধারণের সম্মুখে দু’মাইল হাঁটিয়ে একটি জেলে পাঠানো হল তাতে বিদ্রোহী সৈন্যরা ভয় পেল না বরং আরও মরিয়া হয়ে উঠল।

৬ মে ব্যারাকপুরে ৩৪ নং সৈন্য দলকে দাঁড় করানো হল। পিছনে ইংরেজ সৈন্য কামান নিয়ে প্রস্তুত। লেঃ মিঃ পামার শান্তির সংবাদ পড়ে শোনলেন। প্রত্যেকের বন্দুক ও ইউনিফর্ম কেড়ে নিয়ে চাকুরী থেকে পদচ্যুত করা হল। এখানে মনে রাখা দরকার যে, এখানে ৩৪নং সৈন্যদল আর বহরমপুরের ১০নং সৈন্য দলকে পদচ্যুত করা হল এ দল দু’টিও ডালহৌসীর অযোধ্যা আক্রমণের সময়ে লক্ষ্যেতে উপস্থিত ছিল আর এখান থেকেই বিদ্রোহের তালিম শুরু হয়। আরও জেনে রাখার কথা যে, এ ১৯নং সৈন্য দলে সাত শত সৈন্য ছিলেন যাদের বাড়ি অযোধ্যায় আর তাদের বেশীর ভাগই জাতিতে মুসলমান, ফকির, সাহেবদের অনুগত।

পদচ্যুত হওয়া এ সাত শত অযোধ্যার সৈন্য সারা ভারতে কাগজের পত্রে বা ‘চাপাতি রুটির পাত্রে’ চাকুরীতে নিয়োজিত সৈন্যদের ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করার জন্য অনুরোধ করেন। এ তথ্য লর্ড ক্যানিংকে লেখা মিঃ হেনরী লরেন্স এর পত্রে পাওয়া যায়। হেনরী লরেন্স অযোধ্যার সৈন্য শিরিরে ও পঞ্চাশ জন বিদ্রোহী দলপতিকে হঠাৎ রাত্রি বেলায় বন্দী করে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে অভিযুক্ত করার শুরুতর দণ্ড দিলেন। তার একজন হিন্দু গুণ্ডচরকে বহু সৈন্য শিবিরে পাঠিয়ে সংবাদ আনলেন। মুসলমানদের অবস্থা আমাদের জানি কিন্তু হিন্দু সৈন্যদের অবস্থা কেমন? সংবাদ যা এল তা নৈরাশ্যজনক। এ প্রসঙ্গে একটা উদ্ধৃতি খুবই যথোপযুক্ত— “জমিদারটি ব্রাহ্মণ। বয়স চল্লিশের উপরে। ভারতে বহু সেনাবাসে

ঘুরে সে এখন অযোধ্যায় এসেছে। বহু অভিজ্ঞতা জমিদারটির সাথে আলাপ করে হেনরী লরেন্স বুঝলেন যে, বর্তমানে একমাত্র তাদের অনুগত্যের উপায় নির্ভর করে রাজ্য শাসন আর সম্ভব নয়।”

(দ্রঃ জন লরেন্স, মিঃ হেনরী, জেঃ হিয়ার্স, মিঃ ক্যানিং, প্রভৃতি) বিচক্ষণ ব্যক্তির বুঝলেন বিলেতে বা ভারতের বাইরের সৈন্য না আনলে আর ভারতে টিকে থাকা সম্ভব নয়। চীন অভিযান বন্ধ করে সমস্ত সৈন্য ভারতে আনা এবং যেখানে যত ইংরেজ সৈন্য না আনলে আর ভারতে টিকে থাকা সম্ভব নয়। চীন অভিযান বন্ধ করে সমস্ত সৈন্য ভারতে আনা এবং যেখানে যত ইংরেজ সৈন্য আছে সেখানে কাজ চলাগোছের রেখে সব ভারতে পাঠাবার চূড়ান্ত কথাটি মিলিটারীর সেক্রেটারিও অনুমোদন করলেন এবং পাহাড়ী, নেপালি, গুর্খা প্রভৃতি সৈন্য আমদানির কথা পাকাপাকি হয়। লর্ড ক্যানিং বোশ বুঝতে পারলেন এতদিন হিন্দু সৈন্য তাঁদের বাধ্য ছিল এখন তাও হাত ছাড় হচ্ছে। তাই তিনি তাড়াতাড়ি মিঃ লরেন্সকে পত্র পাঠালেন শিখ সৈন্য বৃদ্ধির কথা জানিয়ে, কারণ শিখদের বরাবরে বিশ্বাস করে ফল পাওয়া গেছে। তারা বরাবরই ইংরেজ সরকারকে সাহায্য করে এসেছে। ক্যানিং তাঁর পত্রে বিশেষভাবে লিখলেন হিন্দু সৈন্যরা বিদ্রোহ করলেও হিন্দু জাতি তো মুসলমানদের মত বিশ্বাসঘাতক নয় সুতরাং পাতিয়ালায় মহারাজাও ঝিন্দের মহারাজার কাছে সৈন্য সাহায্য পাঠাতে যেন ইতস্তঃ না করেন।

(দ্রঃ এ, পৃঃ ৫৯)

মোট কথা শোষণ ইংরেজের কিছু ভয় হল। তাই দু’খানি ঘোষণা পত্র প্রচার করা হল। (ক) ভারতে কারো জাতি ধর্মে হস্তক্ষেপ করা হবে না বা ধর্ম সংস্কারে আঘাত দেয়া হবে না। (খ) কোম্পানীর অধীনস্থ সৈন্যগণ তাদের শপথ অনুযায়ী কাজ করলে কোম্পানী থেকে উপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করা হবে। যারা প্রতিজ্ঞা ও বিশ্বাস ভুলে বিপরীত পথে চলবে, অবাধ্য হয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করবে তাদের জন্য কঠিন সাজার (শাস্তির) ব্যবস্থা বিদ্যমান।

১৮৫৭ সালের ৩১ মে রবিবার ভারতে এক সাথে চারদিকে বিপ্লবের আগুন জ্বালানো হবে বলে দিন ঠিক করা হয়েছিল। আর সংবাদ চাপাতি রুটির মারফত গ্রামে গ্রামে পৌঁছে দেয়া হয়েছিল। গ্রামের নির্ধারিত দায়িত্ব প্রাপ্ত সভ্যকে চাপাতি পৌঁছে দিলেই বাকী কোথায় পৌঁছাতে হবে তা তিনি নিজেই ঠিক করে নিতেন। “বিদ্রোহের বাণী সেদিন সারা ভারতে প্রচারিত হয়েছিল এক আশ্চর্য উপায়ে—চাপাতির মারফত। এছাড়া মুসলমান সিপাহীদের প্ররোচিত করার জন্য বহু মুসলমান ফকিরের সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছিল।”

(সিঃ যুঃ ইঃ মনি বাগচি, পৃঃ ৭৩)

দিল্লীর দরবারে তখন দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ। বাহাদুর শাহের স্ত্রীর নাম ছিল জান্নাত মহল। স্বামী স্ত্রী উভয়ে বীর ও বীরাসার খ্যাতির দাবীদার। সে সময় মিঃ ডালহৌসি ছিলেন বাংলার গভর্ণর। এ সময় তাঁর পদে আসলেন লর্ড ক্যানিং। ১৭৫৭ সালে পলাশীর পুতুল খেলার যুদ্ধে ইংরেজ ভারতের সর্বময় কর্তা হয়ে পড়লেও গোপন কাপুরুষতা ও ভীকৃত্য অথবা দূরদর্শিতা প্রভৃতি যে কোন কারণে ইংরেজ নিজেদের নামে পূর্ণ ভাবে মুদ্রা তৈরি করতে সক্ষম হয় নেই। আকবর শাহের মৃত্যুর দু’ বছর আগে অর্থাৎ ১৮৩৫ সালে ইংরেজ হিম্মত করে নিজেদের নামে টাকা বা মুদ্রায় মুসলমানদের বাদশাহদের প্রাচীন ঐতিহ্য যুক্ত স্মৃতি মুছে ফেলে। ৭৮ বছর পর ইংরেজের প্রচলিত মুদ্রায় মুসলমানদের মনে আরও ক্রোধের সঞ্চার হয়। ৩১ মে বড় রকমের একটা কিছু হবার আগেই মিরাটে পাঁচশি জন ভারতীয় সৈন্যকে কঠিন শাস্তি দেয়া হয়। প্রথমতঃ নিষ্ঠুর ও প্রকাশ্য অত্যাচার অবশেষে কারাগারে সুদীর্ঘ মেয়াদী জেল। ফলে ৩১ তারিখ আসার আগেই ১০ মে সহস্র সহস্র সৈন্যের ক্রোধ ঘৃণা

ও বিদ্বেষ বিস্ফোরিত হয়ে প্রকাশিত হয়ে পড়ল। কর্ণেল স্মিথ শুধু সৈন্য বিভাগেরই লোক ছিলেন না সে সাথে সুদক্ষ সাংবাদিকও। তাঁদের সাংবাদিকতায় শুধু বিপ্লবীদের বিপ্লবকে ছোট করে দেখানো আর 'সব শান্ত' 'সব আয়ত্ত্বাধীন' লেখাই অভ্যাস তবু কিছু কিস্তিত প্রকাশ যে হয় নি তা নয়।

কর্ণেল স্মিথ লিখেছেন, 'দিল্লী গেজেট' পত্রিকার জন্য—“দিল্লী শান্ত। বিদ্রোহীদের শাস্তি দেয়ার পর মনে হচ্ছে এখানে আর কোন বিবাদ ঘটবার সম্ভাবনা নেই।” রবিবার সূর্যাস্তের পর বিখ্যাত পাদ্রী মিঃ নটন গীর্জার ঘন্টার শব্দ শুনে সপরিবারে গীর্জায় যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন অমনি একজন গুপ্তচর সংবাদ দেয় আজ ভারতীয় সৈন্যরা প্রতিশোধ নেবে। পাদ্রী বিশ্বাস করলেন না বটে কিন্তু স্ত্রী-পুত্র পরিজন নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিজেই গেলেন গীর্জায়। গীর্জার কাছে দেখলেন বন্দুক তলোয়ার আরও নানা অস্ত্র হাতে সৈন্যরা মারকাট রবে গুলি করতে করতে আর হুঙ্কার ধ্বনি দিতে দিতে জেলখানায় পৌঁছলেন। তার পর জেলের বন্ধ কয়েদীদের সব মুক্ত করে বিপুল হর্ষ নিনাদে চারদিক আলোড়িত করে তুললেন। এ সময় উদ্ধত বিপ্লবীদের বাঁধা দেয়ার সাহস কারও ছিল না। সেখানে ছিল মাত্র ২০নং পল্টনের কয়েকজন সৈন্য মাত্র। তবুও জেল খানার লোহার দরজা জানালা ভেঙ্গে প্রত্যেকের পায়ে হাতের বেড়ী খুলে দিয়ে জেলের কয়েদীদের সাথে নিয়ে মিরাত শহরকে লাল কাল আগুন আর ধূয়ার আগ্নেয়গিরিরূপে রাঙিয়ে তুললেন ভারতীয় বীর সৈন্যরা। ক্যানটনমেন্টে সংবাদ যাওয়া মাত্র ইংরেজ কর্ণেল মিঃ ফিনিস বাছাই করা কয়েক জন সৈন্য নিয়ে সকলের সামনে সামনে ঘোড়া ছুটিয়ে একবারে বিপ্লবীদের কাছে এসে ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরলেন। বিপ্লবীরা যাকে এতদিন দেখলে সম্মান জানাতেন, ভয়ে জড়সড় হয়ে পুতুলের মত তাঁর আদেশ ও উপদেশ শুনতেন। সে মিঃ ফিনিস আজও তিরস্কার করলেন আর উপদেশের সাথে তাদের বিশ্বাসঘাতকতা করা ঠিক হয়নি বোঝাতে চাইলেন। অমনি একটি বন্দুক গর্জে উঠল। সাথে সাথে ঘোড়াটি আহত হয়ে বসে গেল। কর্ণেল ফিনিস রেগে উঠে দাঁড়ালেন অমনি আর একটি বন্দুক গর্জে উঠলে গুলি বক্ষভেদ করে বেরিয়ে পড়ল। মিঃ ফিনিসের জীবনেরও ওখানে ফিনিস হয়ে গেল। তখন যাকে যাকে গুলি থেকে লাগল। বিপ্লবীদের সাহেব মেম, বৃদ্ধ, শিশু কাউকে ছাড়লেন না। সব বন্দুক বেয়েন্ট তরবারি তলে তলিয়ে যেতে লাগল। শোষণের বিরুদ্ধে শোষণের প্রতিশোধের ধারা ইতিহাসের স্তরে স্তরে এমনি ভাবে সাজানো আছে। (দ্রঃ ঐতিহাসিক মিঃ ম্যালিসনের লেখায়) মিঃ কেরী লিখেছেন, “শিকারের গন্ধ পেয়ে হিংস্র বাঘের দল যেমন গর্ত থেকে বের হয়ে পড়ে, প্রত্যেক প্রকাশ্যে রাস্তা গলিপথ আর্জনা পূর্ণ শহর তলী হত সে রূপে তারা বের থেকে লাগল।”

ক্যান্টন সেজে ইংরেজদের পাইকারী ভাবে শেষ করা হয় আবার সেনানিবাসের বাইরে ইংরেজ অফিসারদের সালামও দেয়া হয় যেন ভিতরে কিছুই ঘটে নাই। রাতে চাঁদনী উঠল তখন দেখা গেল ইংরেজদের বাসভবনগুলো ধুধু করে জ্বলছে। বহুদিনের সঞ্চিত অত্যাচারের ফল যেন অগ্নিশিখা আর তাণ্ডবলীলায় পরিবর্তিত হয়েছে। ১১ মে সকাল বেলায় সহস্র সহস্র মৃতদেহ জীবন্ত সাহেবরা দেখে ভাবতে লাগল অনেক কিছু। দেখা গেল না শুধু বিদ্রোহী বিপ্লবীদের। তাঁরা কোথায় গেলেন? তাঁদের আলোয় তাঁরা দ্রুত মৌন মার্চ করে সারারাত ধরে দুই হাজার সৈন্য সারি বেঁধে চলেছেন দিল্লীর পথে। মাঝে মাঝে ‘আব্বাহ আকবর’ দ্বীন ইসলাম জিন্দাবাদ’ ধ্বনি দেয়া হচ্ছিল। যমুনার ধারে প্রথমেই পৌঁছলেন অশ্বারোহী সৈন্য তার পরেই পদাতিক। বৃকে বিপ্লবের বিপুল বাসনা। ভয়-ভীতি যদিও নেই তবে মিরাত থেকে সম্মিলিত বিলেতি সৈন্য গোলন্দাজ বাহিনী যদি পিছনেই এসে পড়ে তাহলে মোকাবিলার জন্য

বিপ্লবীদের কামান বা গোলন্দাজ বাহিনীর ব্যবস্থাই নেই। আগে থেকেই চাপাতির কুটির সংবাদে যমুনার প্রচুর নৌকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তাই নৌকার সেতু তৈরি করে তার উপর দিয়ে নির্জন নদী অতিক্রম করলেন বিপ্লবীদল। ভীড়ের মধ্যে একজন ইংরেজ গুপ্তচর বিপ্লবী সৈন্যদের সাথে সেতু অতিক্রম করছিল। জাতিতেও ছিল ইংরেজ কিন্তু ভারতীয় সৈন্যের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়ানো সম্ভব হল না। সেতুর উপর থেকে মাথাটা গড়িয়ে পড়ল যমুনায়। শুধু একটি তরবারীর আঘাত মাত্র।

দিল্লীতে প্রবেশ করাই প্রভাত সূর্যালোককে চকমকিয়ে উঠল শাণিত ক্ষুধার্ত অস্ত্রগুলো। বিদ্রোহীরা আকাশ বাতাস, কল্পিত করে “হামারে দ্বীন-জিন্দাবাদ” হামারি বাদশাহী জিন্দাবাদ” প্রভৃতি শ্লোগানে দিগন্ত মুখরিত করে তুলল। বাংলায় দিন মানে দিবস আর দীন মানে দরিদ্র আরবীতে ধর্মকে বলা হয় দ্বীন। বাংলায় তাই দ, ব, ঙ, ন নিয়ে দ্বীনকে ‘দিন’ ও ‘দীন’ থেকে পৃথক করা হয়েছে। যাহোক মিঃ বাগচী মহাশয় এ উক্তির সমর্থনে লিখেছেন, “তারপর দিল্লীর রাজপথ মুখরিত হয়ে উঠল বিদ্রোহীদের অশ্ব খুরের শব্দে। প্রভাতের নিশ্চিন্ততা ভঙ্গ করে “দীন দীন” রবে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে বিদ্রোহীদের একদল এসে দাঁড়াল লাল কেল্লার বাদশাহী প্রাসাদের বাতায়ন তলে।” (সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস, পৃঃ ৯৯ মনি বাগচি) বাগচি মহাশয় তাঁর পুস্তকে দ্বীন না লিখে দীন লিখেছেন। মুসলমানরা যে বিপ্লব করেছেন ধর্ম ভিত্তিক তা এ “দীন দীন” শব্দে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত।

তারপর সৈন্য দলের একটা ক্যান্টনমেন্টের দিকে ছুটল। দিল্লীর কেল্লা বা সেনা নিবাসে মিরাতের কোন সংবাদ আসে নি। কারণ তার আগেই টেলিগ্রাফের তার কেটে দেয়া হয়েছিল। এবার আরাম রত ইংরেজ সৈন্যরা সংবাদ পেলে মিরাতের হাজার দুই বিদ্রোহী সৈন্য নাকি দিল্লী আক্রমণ করেছে কিন্তু তাহলে নিশ্চয়ই মিরাতের ইংরেজ সৈন্য পিছনে পিছনে ধাওয়া করত। তবে হযরত গুজবও থেকে পারে বলে মনে করল ইংরেজ বড় কর্তারা। ৫৪নং পল্টনের কমান্ডিং অফিসার মিঃ কর্ণেল রিপ্পে শহরে গোলমাল শুনে সাথে সাথে সৈন্যদের সাজতে বললেন এবং আদেশ দিলেন ‘মার্চ টু টাউন’ শহরের দিকে চল।

এদিকে দিল্লীর সৈন্যরা আগে থেকেই প্রতীক্ষায় ছিলেন তাঁরা বজ্র কঠিন কণ্ঠে ‘আব্বাহ আকবর’ ‘দ্বীন ইসলাম জিন্দাবাদ’ ফিরিসি লোণ্ডকো খতম কর’ বলতে বলতে মিরাতের সৈন্যদের সাথে দেখা করলেন আর কর্ণেল রিপ্পে দু’দল সৈন্যকে গোলন্দাজ সৈন্যের সাথে পাঠালেন এবং নিজে দিল্লী শহরে কাশ্মীরী গেটের দিকে পৌঁছলেন। শহরের মেন গার্ড ছিলেন উত্তর দিকে ৩৮নং পল্টনের সৈন্যরাই প্রধান প্রহরী। তাঁরা আগে থেকেই বিদ্রোহ করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন যেহেতু তাঁদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁদের রেঙ্গুন পাঠান হয়েছিল। রাস্তার মধ্যে উভয় বিপ্লবীদের সাথে সাক্ষাৎ ও অভিযান হল। সম্মিলিত কণ্ঠে গর্জে উঠল ইংরেজ শাসন ধ্বংস হক। বাহাদুর শাহ জিন্দাবাদ। দিল্লীর লোক আবার তুমুল কণ্ঠ নিনাদে হাঁকল ফিরিসি লোণ্ডকো মর।

হতভম্ব মিঃ রিপ্পে সৈন্যদের বলেন, “এসব কি হচ্ছে? গুলি ভর। এদিকে মেন গার্ডের কমান্ডার ক্যাপটেন ওয়ালেস বিদ্রোহীদের গুলি করার জন্য ৩৮ নং সৈন্যদের আদেশ করলেন কিন্তু সৈন্যরা কেউ বন্দুক তুলল না। সব চুপচাপ। দু’জন ইংরেজ ভক্ত গর্দভ মার্কী সৈন্য উপর দিকে নল উচিয়ে ফাঁকা গুলি করল। মিঃ রিপ্পে অত্যন্ত রেগে আশুন হয়ে দু’জন বিদ্রোহীকে গুলি করার চেষ্টা করলেন কিন্তু মিঃ রিপ্পের দেহের উপর মুহূর্তের মধ্যে বন্দুক গর্জে উঠল। মিঃ রিপ্পের দেহের উপর মুহূর্তের মধ্যে বন্দুক গর্জে উঠল। মিঃ রিপ্পে আহত হয়ে ভুলুষ্ঠিত হলেন সে সাথে আরও চারজন অফিসারকেও বন্দুক দিয়ে শেষ করা হল।

মিরাতের বীর বিপ্লবীরা শাসক ও শোষক ইংরেজদের বহু হত্যা হত করে ভারতকে স্বাধীন করার পথে আর ধাপ এগিয়ে ছিলেন। শ্রীমনি বাগচি তাঁর পুস্তকে অনেক সত্য তথ্য প্রকাশ করলেও তাঁর জ্ঞাতে অথবা অজ্ঞাতে এমন অনেক কথা লেখা হয়েছে যাতে মুসলমান বিপ্লবীদের অনেককে হয় প্রতিপন্ন থেকে হয়েছে। এমনকি বাহাদুর শাহ বিন সবংশে স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিয়ে গেলেন তাঁকেও অত্যন্ত ছোট করে দেখা হয়েছে। যাক তবুও তাঁর লেখার উদ্ধৃতি দিতে আমরা আনন্দ ও গর্ববোধ করি। তিনি মিরাতের বিপ্লবী সৈন্য ও দিল্লীর বিপ্লবী সৈন্যদের মিলনের শেষাংশে বর্ণনা করে লিখেছেন, “দেশ প্রেমের চেতনাকে এভাবে ইংরেজের রক্তে রঞ্জিত করে নিয়ে মিরাতের বিদ্রোহী অশ্বারোহী সৈন্যরা ঘোড়া থেকে নামল এবং দিল্লীর সিপাহীদের প্রাণ ভরে আলিঙ্গন করল। ঠিক সে সময় কাশীর গেট উন্মুক্ত হয়েছে। উন্মুক্ত সে তোরণ পথে প্রবেশ করল বিদ্রোহী সৈন্যরা “দীন দীন রবে।” “বাদশাহ খোদাবন্দ” “সম্রাট দীর্ঘজীবী হোন।” এ উদ্ধৃতিটিতে মুসলমানদের মুখ্য ভূমিকার পরিচয় উপরোক্ত শ্লোগানেই প্রমাণ হয়। “বাদশাহ খোদাবন্দ” অর্থাৎ বাদশা ঈশ্বর একথা নিশ্চয়ই হিন্দু বিপ্লবী সৈন্যদের কথা কারণ মানুষকে দিল্লীশ্বর, জগদীশ্বর উপাধি দেয়ার ইতিহাস ইতিহাসেই আছে কিন্তু মুসলমানদের আল্লাহ, ঈশ্বর, খোদামাত্র একজনই যিনি স্রষ্টা।

যাহোক, দিল্লীর রাজ প্রাসাদে অজস্র বিদ্রোহী সৈন্য সশস্ত্র উপস্থিত ছিলেন। বাহাদুর শাহ নামে মাত্র বাদশাহ হয়েও আসলে অভাবী, বন্দী, ইংরেজের পেনসন ভোগী খাঁচার সিংহের মত নর-সিংহ। রাজপ্রাসাদে ইংরেজেরই নিযুক্ত ইংরেজ সৈন্যরা প্রহরী হয়ে পাহারা দেয়। তাদেরই নেতা ক্যাপটেন ড্যাগলাস। ড্যাগলাস বিক্ষুব্ধ বিদ্রোহীদের ধমক দেবার চেষ্টা করলেন বারান্দায় দাঁড়িয়ে জানালেন বাদশাহ আপনাদের সাক্ষাত চাননা। সদরগেটখোলা না পেয়ে বিদ্রোহী সৈন্য ও গণবিপ্লবীরা রাজঘাটের ফটকে দিয়ে হাজির হলেন। বাহাদুর শাহ আর ইংরেজদের অনুমতি নেয়ার কথা চিন্তা না করে গেট খুলে দিলেন সৈন্যদল জলস্রোতের মত ভিতরে প্রবেশ করলেন। এবার আরম্ভ হল ইংরেজ নিধনের পালা, সম্রাট সামান্য ভিক্ষুকের মত মিটমিটে আলায় জীর্ণ তক্ত পোষে সামান্য ছেঁড়া তোষকে শয়ন করেন আর ভাবেন ভাগ্যের পরিহাস কত বিচিত্র। মুদ্রাতে এতদিন প্রহসন হলেও সম্রাটের নাম থাকত তাও আজ নেই। আত্মীয়-স্বজনের খরচা ইংরেজ সরকার দিত তাও বন্ধ করেছে। বাবর থেকে বাহাদুর শাহ পর্যন্ত ইংরেজ দেশী বিলেতি দর্শনার্থী সম্রাটের সাথে সাক্ষাত করতে হলে অনুমতি নেয়া হত এবং হাদিয়া সম্মানজনক ভাবে নজরানা দেয়া হত এখন এ বাহাদুর শাহের সময়ে তাও বন্ধ করা হয়েছে এবং বছরে মাত্র এক লক্ষ টাকা খরচা দেয়া হত তাও কমিয়ে কমিয়ে শেষ করে আনা হয়েছে। অথচ আজও সম্রাটদের দয়া দাক্ষিণ্য অব্যাহত রাখতে বাধ্য থেকে হয়েছে। সাধারণ মানুষ সম্রাটের কাছে হাত পাতে সম্রাট মনে করেই কিন্তু তিনি যে নিঃস্ব তা কয় জনই বা জানে? আবার ইংরেজ ঘোষণা করেছে এর পর থেকে সম্রাটের আর কোন ছেলেকে বাদশাহ বা রাজা উপাধি নিতে দেয়া হবে না। শাহজাদা বা রাজার ছেলে বলা হবে। তার পরেই মুছে যাবে সম্রাট বংশের শেষ চিহ্নটুকু।

যাঁদের কোটি কোটি টাকার স্বর্ণ মুদ্রা, হীরা, পান্না, জহরত, মতি, ইয়াকুত ও মূল্যবান ধনের ধনাগার ছিল সে ধনাগার আজ গড়ে উঠেছে ইংল্যান্ডে। যাঁদের পূর্ব পুরুষদের তাজমহল, লাল.কেল্লা, দেওয়ানি আম, দেওয়ানি খাস, মতি মসজিদ প্রভৃতি প্রাসাদগুলো তৈরি করা তাঁদের বংশধর বাহাদুর শাহকে এখন বিহারে মুসির জেলায় একটি নূতন ঘরে রেখে আসা হবে এখানে তাঁর ঠাই নেই। শুধু এখানেই শেষ নয় যেখানে হত.কুরআন পাঠ, পবিত্র নামায সম্পাদন সে মতি মসজিদে সাহেবরা মেমদের নিয়ে গাল ভরা হাসি নিয়ে কেঁক,

মাংস ও মদ পান করে শুধু বিজয়ীর স্বাদ গ্রহণের জন্য আর ভারতবাসীকে হত্যা কেমন ভাবে করা হয়েছে তা গুছিয়ে লিখলে এক বিরাট গ্রন্থ হবে।

ঐতিহাসিক মিঃ কেরী বলেছেন, তারা (বিদ্রোহীরা) শুনে ছিল কমিশনার, ফ্রেজার সাহেব প্রাসাদরক্ষী দলের ক্যাপ্টেন ডাগলাস এবং আরো বড় বড় ইংরেজকে সেখানে দেখতে পাবে। উৎসাহে “দীন দীন” ধ্বনি করতে করতে তারা সে ফটকের দিকে দ্রুত বেগে অশ্রু চালাল। ঘন ঘন চিৎকার করতে লাগল জয় বাহাদুর শাহের জয়। ফিরিস্তি লোণ্টকো খতম করো। ফ্রেজার ও ডাগলাস বাঁচার চেষ্টা করলেন। থানায় আশ্রয় নিতে গেলেন সেখানেও সুবিধা হল না। একজন প্রহরীর হাত থেকে বন্দুক নিয়ে ফ্রেজার দেশীয় আক্রমণকারী অগ্রবর্তীকে হত্যা করলেন। পরক্ষণেই বিদ্রোহী দল তাদের টুকরো টুকরো করে শেষ করেন। এ রাজ-প্রাসাদে সারা ভারতে খ্রিষ্টান ধর্ম প্রচার ও প্রসারে প্রচারক পাদ্রীদের প্রায় আসতে হত আজও পাদ্রী মিঃ জিনিং তাঁর কন্যা মিস জিনিং আর একজন সুন্দরী যুবতী মেম বান্ধবী হাচিনসন ও মিঃ ক্রিফোর্ড প্রাসাদ থেকে দূরবীক্ষণ দিয়ে দৃশ্য দেখছিলেন। পরস্পর প্রত্যেককেই বিপ্লব দিল খতম করলেন। তাছাড়া ডাগলাস মৃত্যুর আগে পড়ে গিয়ে আহত অবস্থায় সম্রাটকে তাঁদের মেয়ে ছেলের সাথে যে মেম সাহেবদের রাখা হয়। বাহাদুর শাহ নারীদের রক্ষা করার আদেশও অনুরোধ করলেন কিন্তু দুঃখের বিষয় উন্মত্ত জনতা তার আগেই তাদের শেষ করে দিয়েছিল।

বিশাল জনতা বাহাদুর শাহকে অনুরোধ জানাল যদিও আপনি আমাদের সাথে আগেই এ বিপ্লবে পক্ষপাতিত্ব করেছেন সাহায্য সহযোগীতা সম্ভাব্য সব কিছু দিয়েছেন। তবু চাই আপনি আমাদের প্রকাশ্য ঘোষিত ভারত সম্রাট হবেন। আমরা মিরাতে ইংরেজদের পরাজিত করেছি, দিল্লীও আয়ত্তে আনতে চলেছি এখন সারা ভারতে ভারাল ও ধারাল নেতা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে আপনি ছাড়া আমাদের নজরে দ্বিতীয় কেউ নেই। সুতরাং নিজে হাতে ইসলামের সেরা সুন্দর রং, সবুজ রঙের পতাকা নিজে হাতে তুলে দিন।

সম্রাট বাহাদুর বলেন, “আমার প্রিয় সন্তানেরা আমি তো তোমাদের সম্পদ শুন্য সুলতান। অতএব কিসে থেকে তোমাদের বেতন দেব?” বিপ্লবীরা জানালেন, ধনাগার লুট করব, আপনাদের নিয়ে যেখানে যা জমিয়েছে অত্যাচারী ইংরেজ আবার আপনার কাছে তা আনব।” বাদশাহ বাহাদুর শাহ পাঞ্জা গ্রহণ করে বলেন আজ থেকে আমি বিপ্লব চালনার জিম্মাদারী (দায়িত্ব) নিলামাদশা নিজের হাতে সবুজ পতাকা উড়িয়ে দিলেন। আর সাথে সাথে সহস্র বীরের সমগ্র কণ্ঠের চিৎকার আর উল্লাস।

ওখান থেকে দিল্লীর কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে হানা দিলেন। সমস্ত ইংরেজ কর্মচারীকে শেষ করে সমস্ত টাকা ও সোনা নিয়ে নেয়া হল। ম্যানেজার ভয়ে স্ত্রী পুত্র নিয়ে ছাদের উপর আশ্রয় নিলেন কিন্তু তিনি সপরিবারে খতম হলেন। তার পর ইংরেজের দিল্লী গেজেটের ছাপা খানা, গার্ডা, ও বাসগৃহ বিপ্লবীরা গুড়া গুড়া করে ফেললেন। চারদিকে মার মার রব। রাজপ্রাসাদের কাছেই কেন্দ্রীয় অস্ত্রাগার। এটার দিকে সবার লক্ষ। অস্ত্রাগারের ভারপ্রাপ্ত অফিসার ছিলেন লেফটেন্যান্ট জর্জ উইলোবি। আর তার সাথে তেমনি যোগ্য বিশ জন সৈন্য সহকারী হিসেবে।

বাহাদুর শাহর পরামর্শ আগে অস্ত্রাগারে হাত কর। তাই তিনি অফিসারকে পত্র পাঠালেন অস্ত্রাগারে আমার সৈন্যদের চুকতে দেয়া হোক এবং আপনারা আত্মসমর্পণ করুন। কোন উত্তর এল না। বিপ্লবীরা প্রাচীর উপরে প্রবেশের চেষ্টা করতই ইংরেজ সৈন্য গুলি করল। প্রাচীর থেকে মৃত দেহ পরপর পড়ে লাগল প্রাচীরের গায়ে। শেষে দলে দলে উঠতে

লাগলেন বিদ্রোহী দল। তখন নিরুপায় হয়ে মিঃ উইলোবী বারুদের ত্বপে আগুন দিতে আদেশ করলেন। সাথে সাথে আকাশ ফাটানো শব্দ আর আগুনের বিরাট লেলিহান শিখা বারে বারে গগন চূষন করতে লাগল আর কাল ধূয়া চারদিক অন্ধকার করে ফেলল। বারুদের বিস্ফোরণে রাজপথের নিরীহ পথিক ও কুটীরবাসী পাঁচ ছয় শত জনকে প্রাণ ত্যাগ করতে হয়েছিল।

বিদ্রোহীরা যাকে যেখানে পান শেষ করেন তাই শহরের শেতাজ তাদের ছেলে মেয়ে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে অপথে বনে জঙ্গলের উপর দিয়ে পালায়নের পন্থাই ভাল মনে করল। পথে অনেক ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয় ক্লান্তিতে মারা গেল। বহু ব্যবসায়ী ইংরেজ দিল্লীর একটা বড় বাড়িতে শেষ আশ্রয় নিয়ে ছিল। ১৬ মে তাদের ভাল বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হবে বলে বের করে সমস্তকে হত্যা করার কাজ চলতে থাকে। শুধু “ফিরিসি লোগকো খতম কর” শব্দ। যেন মনে হল মুসলমান শাসন বুঝি এসেই গেল। শুধু একজন মহিলাকে মারা হল না তিনি বলেন আমি আমার তিনটি সন্তান সহ মুসলমান থেকে চাইছি কোন বিপ্লবীরা কিছু বোঝেন না। কিন্তু এ খ্রিস্টান মহিলাটি যা বলেছেন তাকে তথায় মারা যায় না কারণ দেশ ও ধর্ম রক্ষা করাই তো সংগ্রামের উদ্দেশ্য। তাই তিনি রেহাই পেলেন। তার নাম মিসেস আলডোয়েল। হত্যা কাণ্ডের পর মূর্দা ফরাসেরা গরুর গাড়ীতে মৃত দেহ বোঝাই করে যমুনায় নিক্ষেপ করে। (দ্রঃ History of the Indian Mutiny, Malleson)

দিল্লীর সংবাদ সারা ভারতে পৌঁছে গেল। সমস্ত দুর্গ ও সেনানিবাসে ইংরেজ জানিয়ে দিল সতর্ক থাক, সজ্জিত হও।

এখানো কলকাতা ভারতের রাজধানী। এখানে মাত্র গভর্ণর জেনারেলের অধীনে দুই দল ইংরেজ সৈন্য। ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে ৫৩নং আর রেঙ্গুন থেকে প্রত্যাগত এ দু’টি দল। এ দু’টি দল বঙ্গদেশ রক্ষার জন্য খুবই দরকার কিন্তু চারিদিক থেকে খবর আসছে দিল্লী বাঁচাতে ইংরেজ সৈন্য পাঠাও। কলকাতা তখন সারা ভারতের হৃৎপিণ্ড। ইছাপুরে বারুদ কারখানা, কাশীপুরে বন্দুক কারখানা, কলকাতার মুদ্রা তৈরীর টাকশাল, ধনাগার, ব্যাঙ্ক, অলিপুরে বিখ্যাত জেল যেখানে ভারতের বিখ্যাত বাঘারে বাঘারে বন্দী আছেন। ২৪ মে ইংল্যান্ডের রাণী ভিক্টোরিয়ার জন্মদিন, কলকাতায় রটে গেছে “হিন্দুরা যে পুকুরে স্নান করে গভর্ণর জেনারেল সে পুকুরে নাকি গরুর মাংস ফেলার হুকুম দিয়েছেন আর রাণীর জন্মদিনে বাজারে সমস্ত চাল ও আটার দোকান বন্ধ রাখা হবে হিন্দুরা অপবিত্র নিষিদ্ধ খাদ্য ভোজনে বাধ্য হবে।”

(দ্রঃ সিং যুঃ ইঃ পৃঃ ১২০)

রাণীর জন্মদিন মুসলমানের ঈদের দিনেই হয়েছিল। মিঃ ব্যানিং প্রতি বছরের মত এবারেও রাত্রিতে নাচ গানের অনুষ্ঠান করলেন কিন্তু আমন্ত্রিত অতিথি অত্যন্ত অল্প এসেছিলেন। কারণ তাদের ভয় এত খ্রিস্টান এক জায়গায় জড় হওয়া মানে ঈদের আনন্দে হয়ত খ্রিস্টানদের সর্বনাশ হবে।

মোট কথা কলকাতাতে অবস্থা অপেক্ষাকৃত থম থমে। কারণ ইংরেজের সংখ্যা গরিষ্ঠ নেতৃত্ব স্থানীয় অনেক মানুষ সংখ্যা লঘিষ্ঠ দলের বিপ্লবের সমর্থক ছিলেন না অথচ তারা তদানীন্তন যুগে নামী-দামী লোক ছিলেন। এ দামী লোকদের মধ্যে কিন্তু কিছু মুসলমান মনীষীও ছিলেন। সে আলোচনা পরে করা যাবে।

সারা ভারতে ব্যাপক বিদ্রোহে ইংল্যান্ডের খুব ভাবনা চিন্তা। শোষণের ভাল রসাল স্পঞ্জ ভারতবর্ষ হাত ছাড়া হলে বিলাতের রসে ভাটা পড়বে। তাই মিঃ ক্যানিং সংবাদ পাঠাল, মদ্রাজ থেকে ও রেঙ্গুন থেকে মোট দু’দলে সৈন্য আনাচ্ছি। পারস্য থেকে এটা দল বোম্বেতে

এলেই কলকাতার জন্য আনিবে নিশ্চি। স্যার জন লরেন্স এর জন্য করাচী থেকে একদল সৈন্য ফিরোজাপুরে পাঠাবার ব্যবস্থা করেছে, সিংহলে স্যার হেনরী ওয়ার্ডকে কিছু সৈন্য পাঠাবার জন্য অনুরোধ করেছে। চীনের জন্য প্রেরিত সৈন্যদের আগে ভারতে পাঠাবার জন্য মিঃ এলগিনকে লিখেছেন।

১৫ মে হাত ছাড়া দিল্লী দখল করার জন্য জেনারেল আনসন আশালা থেকে কর্নাল যাত্রা করলেন। প্রতুতির অসুবিধা তবুও বহু কষ্টে পাঁচ শত গরুর গাড়ী, দুই হাজার উট ও দুই হাজার কুলী সংগৃহীত হল আর ৩০ হাজার মণ রসদ ও মজুদ হয়ে গেল। আর পথে দেখা হবে মিরাত আশালা সৈন্যদের সাথে। তারপর এক সাথে হবে দিল্লী উদ্ধার।

ওদিকে রুড়কী টাউন থেকে দেশীয় সৈন্য সহ মিরাতের দিকে রওনা হলেন মিঃ ফ্রেজার। মিরাতে পৌঁছে ফ্রেজার ভারতীয় সৈন্য দলকে আদেশ করলেন, “সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র বোমা গ্রেনেড ঘরে রাখা হবে তোমরা এ অস্ত্র ত্যাগ কর”, “সাথে সাথে সৈন্য দল আপত্তি করলেন কেন? কেন? তারপর তারা মাল বোঝাই গাড়ী আটকালেন। ইংরেজ অফিসার ফ্রেজার খুব গাট দেখিয়ে শাসালেন। সাথে সাথে পাঠান সৈন্য আবদুল কাহার চিৎকার করে বলে উঠলেন, “বেঈমান ফ্রেজার -লে -লো” সাথে সাথে বন্দুক থেকে গুলি একবারে ফ্রেজারের বুকের মাঝে বিদ্ধ হল সে সাথে সাথে বিনা শব্দে ফ্রেজার লুটিয়ে মাটিতে! তারপর আরও গুলি চালালেন বিপ্লবী বিদ্রোহী সৈন্যরা অনেকে হতাহত হয়। বিদ্রোহীগণ যেদিকে সেদিকে গা ঢাকা দিলেন। তার মধ্যে পঞ্চাশ জন বিদ্রোহী বীর ধরা পড়লেন তাদের হাত বেঁধে তোপের সামনে পিটে পিটে এক লাইনে দাঁড় করা হল, কামান দাগা হল, ৫০ জন অপরিচিত ভারতীয় বীর শহীদ হলেন। বলাবাহুল্য ভারত আজ তাদেরই তাজা রক্তে স্নাত হয়ে স্বাধীনতার গর্বে সমুন্নত।

অনেক আগেও বলা হয়েছে, একটু পূর্বেই ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে ভারতের জমিদার বড় হিন্দু রাজা মহারাজা প্রায় সকলেই ইংরেজদের বান্ধব ছিলেন। তাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্যে পরপর কয়েকটি স্বাধীনতা সংগ্রাম পও হয়েছে। অবশ্য খুবই অল্প মুসলমান নবাব যদিও স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন নি তবে সরাসরি সৈন্য দিয়ে ইংরেজের পক্ষে লড়াই করার ইতিহাস দুর্লভ। যেমন কর্ণেলের নবাব এ সময়ে ইংরেজদের পক্ষে লোক লোক বলে জানিয়েছিলেন কিন্তু তা নেহায়েত মৌখিক। কিন্তু মিঃ জন লরেন্স এর অনুরোধে হিন্দু মহারাজাগণ প্রত্যাসভাবে ঢালাও ভাবে সাহায্য করলেন। যেমন পাতিয়ালা, নাভা ও ঝিন্দের মহারাজা। ঝিন্দের রাজা ইংরেজ সৈন্যদের গাড়ীর ব্যবস্থা করলেন; শুধু তাই নয় তাদের খাদ্যাদি ও রসদের সুব্যবস্থা করতেও তার বিবেকে বাঁধনি আর পাতিয়ালা মহারাজা ঢালাও ভাবে বাছাই সৈন্যদল দান করে উদারচিত্তের পরিচয় দিয়েছেন। মিঃ জনলরেন্স সে সৈন্যদের খাদ্যে ও লুণ্ঠিনায় পাঠালেন। ফরিদপুরের রাজাও তার সৈন্য দিয়ে ইংরেজের প্রশংসা লাভের যোগ্যতা অর্জন করলেন। আর ইংরেজ কোম্পানীর পুরাতন সুহৃদ শিখ সর্দাররা ইংরেজের পক্ষ অবলম্বন তো করলেনই সে সাথে জীবন গ্যারান্টি দিয়েও ইংরেজকে চাস্তা করে ফেললেন। দিল্লী হাত ছাড়া হবার অন্যতম অঙ্কুর রোপিত হয়ে গেল। এটাই ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামে ব্যর্থ করতে ভারতীয় বিশ্বাস ঘাতকদের বিষাক্ত পদক্ষেপ।

২৬ মে জেনারেল আনসনের কলোরা হয় তাতে তিনি জেনারেল বারনাডকে তার সৈন্যদের দায়িত্ব দিয়ে মারা গেলেন। ৩০ মে সামনা সামনি লড়াই। এক পক্ষে শুধু ভারতীয় মুসলমান আর ভারত প্রিয় হিন্দু বিদ্রোহী অপরপক্ষে ইংরেজের অল্প সৈন্য আর তার সাথে যুক্ত ইংরেজের ভারতীয় দালাল ও তাদের গোলামেরা। উভয় পক্ষে হতাহত হল অনেকে। কিন্তু

বিপ্লবীরা বুঝতে পারলেন পরাজয়ের কার মেঘ হয়ত সামনেই আসছে কারণ ভারতীয়বাসী আজও বৈষ্ণব ইংরেজকে চিনতে ভুল করছে। ইংরেজরা আশাশ্রিত আর আনন্দিত হল কিন্তু মিঃ উইলসন ভাবলেন যদি আগামীকাল বিদ্রোহীদের সাথে সৈন্য আরও যোগ দেয় তাহলে ইংরেজ সৈন্যের পরাজয় হবে। কারণ ইংরেজ সৈন্য এতে কমতেই পারে বাড়বে কোথেকে। পরের দিন সৌভাগ্যক্রমে ক্যান্টন রীড প্রেরিত পাঁচ শত গুর্খা সৈন্য পৌঁছাল। বিদ্রোহীরা নির্ভয়ে চালিয়ে যেতে চান অব্যর্থ অভিযান। সমস্ত বিদ্রোহীরা প্রথম পুরস্কার দিল কামানের গোলা। ইংরেজ ও ভারতের যাতক সৈন্যরাও উত্তর দেয়। ইংরেজ সৈন্য বহু হতাহত হয়। অপর পক্ষেও আহত রিহত হয় অনেকে কিন্তু অপেক্ষা কৃত ভাবে কম। যুদ্ধে ইংরেজেরই জয় হল। কিন্তু অনেক নামজাদা নেতার মধ্যে প্রধান সেনাপতির পুত্র ক্যান্টন বারনাড খতম হন। ইংরেজ সৈন্য এক সাথে চারদিক থেকে আক্রমণ করল। রাজশক্তি তাদের হাতে অতএব প্রকাশ্য প্রভুত্বিত্তে বাঁধা নেই কিন্তু বিপ্লবীরা যা করেন অত্যাশু গোপনে তাও আবার দেশীয় বিশ্বাস যাতকরা অর্থের লোভে ইংরেজকে অনেক সংবাদ জানিয়ে দেয়। তাই তেইশটি কামান ইংরেজরা পেয়ে যায় বিদ্রোহীদের সামান্য মূলধন থেকে।

তখনকার বারনাডীতেও হিন্দু সংখ্যা মুসলমানদের চেয়ে বেশী ছিল। এখানে এক দল ফকির মৌলভী গিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বীজ ছড়িয়ে বেশ সুবিধা করতে পারেনি। তাই বাহাদুর শাহের বংশীয় রাজপুত্রগণ ও নিকটাত্মীয়গণ অনায়াসে পৌঁছালেন। তখন তাদের দেখার জন্য ভীড় হয় এবং তাদের কথা জনসাধারণ আগ্রহ সহকারে শুনতে থাকেন এবং তাদের দেয়া জমি যা রেনারসের মন্দিরে দেয়া ছিল, দলিল পত্রে এখনো হাতের পাঞ্জার ছাপ মারা বাদশাহী চিহ্ন আজও সংরক্ষিত। জনসাধারণের মন গলে যায় এবং সেখানে বিদ্রোহের বীজ রোপিত হয় এবং পরক্ষণে অঙ্কুরিত হয় ১৮৫৭ সালে মার্চ মাসে। এ মিছিলে ইংরেজ বিরোধী কিছু মহারাজ্যীয় এবং পাঞ্জাবীও ছিল। টোটার চর্বির চটকদার কতাত্তে ধর্ম ভীরা কাশীবাসী উত্তপ্ত হয়ে উঠল। বেনারসের উত্তর পশ্চিম কোনে সিকরোল সেখানে সৈন্যগার আদালত, জেলখানা, গীর্জা, গোরস্থান, মিশনারী স্কুল সবই মজুত আছে। তাছাড়া বড় বড় ইংরেজ নেতারা সেখানে আছেন যেমন ব্রিগেডিয়ার পনসনবি, মি হেনবী ট্যাকা প্রভৃতি। তবু সকলে ভয়ে শঙ্কিত শুধু মনে হয় মিরাতের মত যদি সব নিহত থেকে হয়। সমস্ত ইংরেজ অফিসারদেরমত নারী ও শিশুদের চুনীর দুর্গে রেখে আসা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু মিঃ লিও প্রস্তার বাতিল করলেন। কারণ তাহলে ইংরেজ নেতাদের উপর সকলে আস্থাহীন হয়ে পড়বে ফলে বিপদকে আরও ডেকে আনা হবে।

কমিশনার কলকাতায় কমিশনারকে লিখলেন, “কলকাতা ও দানাপুর থেকে কি সৈন্য পৌঁছাবে না? ইংরেজ সৈন্য চায়।” কনপু থেকে ঘন ঘন সংবাদ আসছে কত করুণ! কত উৎকণ্ঠ প্রদ! “দৈবের দোহাই কিছু ইংরেজ সৈন্য পাঠিয়ে দিন।” আবার কানপুর থেকে বেনারসে খবর আসছে “কিছু ইউরোপীয় সৈন্য পাঠান” বিপ্লবীরা গোপনে কাশী, কানপুর ও আজিম গড় ক্যান্টনমেন্টের সাথে সংযোগ যথার্থ ভাবে অব্যাহত রেখে চলছেন।

৩রা জুন আজমগড়ের বিদ্রোহী বিপ্লবীরা কোম্পানীর সাত লক্ষ টাকা হস্তগত করতে সক্ষম হলেন। এ টাকা ইংরেজ অশ্বারোহী সৈন্যরা আনছিল গোরক্ষপুর থেকে পাঁচ লাখ আর আজমগড়ের থেকে দু'লাখ। বিপ্লবী ও বিদ্রোহী সৈন্যদের মিলিত শক্তিতে অভিযান চলছিল। শহরে ইংরেজ কাউকে যেন পাওয়া গেল না। যাদের পাওয়া গেল জীবন্ত পরক্ষণেই তার মৃত্যু কালে লুকিয়ে গেল।

মিঃ কর্ণেল নীল একদল মাদ্রাজী সৈন্য নিয়ে কাশী বা বেনারসে এলেন। এদিকে দানাপুর থেকে একদল ইংরেজ সৈন্যও এসে পৌঁছেছে। তাই নীলের খুব সাহস বেড়ে গেল স্বাভাবিক ভাবেই। মিঃ নীল সমস্ত ভারতীয় সৈন্য দাঁড় করালেন অহঙ্কার পূর্ণ আঞ্চালন করতে লাগলেন। পিছনে কামান প্রস্তুত আর ইংরেজ সৈন্যরা এমন অবস্থায় আছে একটু হুকুম দিলে আর রক্ষা নেই। ভারতীয় সৈন্যদের বুকের রক্ত রাগে টগবগ করতে লাগল তাই অসহ্য হয়ে গুরুম গুরুম করে গুলি ছুঁড়লেন তারা। সাথে সাথে দশ-বার জন সৈন্য মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে মাটির উপর ছটফট করতে লাগল। ইংরেজ কামান ও পেছন থেকে গর্জে উঠল। এক লাইনে অনেক বিদ্রোহী শহীদ হলেন। মৃত্যু যন্ত্রণায় রক্ত মাখা মুখে শেষ কথা শোনা গেল, “বৈষ্ণব ইংরেজ দূর হও, আল্লাহ্ আল্লাহ্!”

যাহোক হৈ-হট্টগোলে বিদ্রোহীগণ অস্ত্র ফেরত না দিয়ে যে দিকে সেদিকে পালানোর চেষ্টা করলেন কিন্তু গেটে প্রহরীদের সাথে সংগ্রাম ছাড়া উপায় নেই। তার আগেই মুসলমান ছেড়া কঞ্চল কাঁধে ফকিরের দল কঞ্চল ভিজিয়ে দেয়ালে ঝুলিয়ে রেখে ছিলেন আর প্রচুর দড়িতে ইটের টুকরো বেঁধে এদিকে ঝুলিয়ে দেয়া হল। ওদিকে বিদ্রোহী বিপ্লবী ফকিরদের শক্ত কজীর টানে ক্যান্টনমেন্ট থেকে বিদ্রোহীরা বাইরে আসতে সক্ষম হলেন। আর বাকী সৈন্য গেটে লড়াই করে অনেক শহীদ হয়েছেন এবং বেশীর ভাগই বাইরে আসতে সক্ষম হয়েছেন। বিপ্লবীরা নম্বর মারা নেতা ইংরেজদের না পেয়ে ফেজাবাদের দিকে ছুটলেন।

আজকের দিনে যেখানে ভারতের প্রকৃত স্বাধীনতা আন্দোলনের চরম মুহূর্ত সেখানে ইংরেজের বড় প্রিয় বিশ্বাসী শিখ প্রহরীরা প্রহরা দিচ্ছে শাসক প্রভুর মাল- সম্পত্তি, অফিস, গুদাম ইত্যাদি।

তার চেয়েও দুঃখ ও বেদনার কথা কাশীর যিনি শক্তিশালী সম্মানীয় রাজা তিনি ইংরেজের সমর্থক। আরও আশ্চর্যের কথা রাজা মশাই আজ ৪ জুন ইংরেজের পক্ষে সরাসরি নেমে পড়লেন লড়াই এর ময়দানে অর্থাৎ সৈন্য সাহায্য অর্থ সাহায্য সবই চলতে লাগল। এছাড়া ইংরেজ প্রেমিক রাজা ইংরেজ পাদ্রীদের ও সর্দার নেতাদের নিয়ে গিয়ে নিরাপদ স্থানে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করলেন। তার কারণ বোধ হয় এটাই যে, মুসলমান বিপ্লবে যেখানে আল্লাহ্ আকবার প্রোগান ঘীন ইসলাম জিন্দাবাদ ধ্বনি সেখানে গোখাদক মুসলমানকে সাহায্য করার চেয়ে তাদের চির শত্রু ইংরেজের পক্ষ অবলম্বন করাই শ্রেয়।

উপরোক্ত বক্তব্যের প্রমাণের পরিপ্রেক্ষিতে একটি মূল্যবান উদ্ধৃতি পেশ করা গেল—“৪ জুন রাতে কাশীর রাজা ইংরেজ মিশনারীদের নিরাপদ স্থানে আশ্রয় দান করেছিলেন। এমনকি অর্থ ও সৈন্য সাহায্য করতেও তিনি কৃপণতা করেননি। শহরের জনতা, আতঙ্ক ও গোলমাল মুসলমানেরা উড়িয়েছে সবুজ পতাকা।” এ মূল্যবান উদ্ধৃতিটি কোন মুসলমান লেখকের নয় বরং শ্রী মণিবাগচির পূর্ব উল্লিখিত বইয়ের বাক্য, পৃঃ ১৪৯।

এই ফেজাবাদের কথা মনে করলেই স্মরণ হয় বিখ্যাত বিপ্লবী মাওলানা লিয়াকত আলীর কথা যার সংগঠন ক্ষমতা ছিল সারা ভারতে বৈদ্যুতিক তারের মত। যেখানেই সংগঠনে শৈথিল্য দেখা দিয়েছে সেখানেই হাজির হয়েছেন মাওলানা লিয়াকত আলী। কিন্তু তার জীবনের ত্যাগ, বীরত্ব, শ্রম, শীলতা ও চাতুর্যের প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও ইতিহাসে তাকে স্থান দেওয়া হয়নি। দোষ ইতিহাসের না ঐতিহাসিকের তা সুস্থ বুদ্ধি সম্পন্ন পাঠক পাঠিকার বিবেচনাধীন। এমনভাবে জৈনপুর, ফিরোজপুর, আলীগড়, মৈপুরী, টপোয়া প্রভৃতি স্থানে বিদ্রোহীরা বিপ্লব বাধিয়ে ছিলেন। কলকাতায় যেমনি ইংরেজ সৈন্য এসে পৌঁছেছিল অমনি ক্যানিং সেগুলি উত্তর প্রদেশে পাঠাচ্ছিলেন গরুর গাড়িতে করে। পাঠানো আরম্ভ হয়েছিল ব্যাপক ভাবে ৩ জুন থেকে।

৬ জুন এলাহাবাদ এলাকায় বিদ্রোহের বহিঃভীষণভাবে প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে। এখানে বেশীর ভাগই মুসলমান। হিন্দু বা অপর জাতির সংখ্যা খুবই কম। আগে থেকেই কর্নেল সিপসন এখানে দু'দল সৈন্য আনিয়া ফেলেছেন। কিন্তু শুধু বিদ্রোহী সৈন্যরাই সমস্যা নয় সমস্যা হচ্ছে সমস্ত মুসলমান জনসাধারণ। আর সমস্ত নষ্টামীর মূলে হচ্ছে একটি মৌলভী। তিনিই হচ্ছেন মাওলানা লিয়াকত আলী। মাওলানা লিয়াকত আলী শিখ নেতাদের বোঝালেন ইংরেজদের পক্ষে সারা জীবন শিখ জাতি যুদ্ধ করে এসেছে কিন্তু তবুও ইংরেজরা পাঞ্জাব দখল করেছে। শুধু তাই নয় সেনারসে মিঃ নীল সাহেব প্রকাশ্য রাস্তায় গাছে গাছে অজস্র সাধারণ মানুষকে ফাঁসী দিয়েছে। সে কথা আজ ভুললে চলবে না। একদল শিখ সৈন্যকে শুধু মাত্র সন্দেহের বশবর্তী হয়ে গুলি করে মারা হয়েছে। মাওলানা লিয়াকত আলী আরো বলেন, একথা ভোলা ঠিক নয় যে, নির্বাসিতা রাণী ঝিন্দনের মুকুটের বহু মূল্য মণি রত্ন ছিনিয়ে এনে এ ইংরেজরাই তাদের ধনাগার পূর্ণ করেছে। দেশ আজ বিদ্রোহী আর আপনারা তাদের একান্ত বিশ্বাসী গোলামের মত ধনাগারে পাহারা দেবেন? এ অসম্ভব। মুসলমানদের সাথে আপনাদের যে যুদ্ধ হয়েছিল আহমদ ব্রেলবীর সময়, আসলে সেটাও ইংরেজের চাল। আমাদের ভাই-এ ভাই-এ লড়াই লাগিয়ে আমাদেরও শহীদ করেছে আর তাদের কাজ মিটে যাবার পর আপনাদের স্বাধীনতাও ছিনিয়ে নিয়েছে।

মাওলানার যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা শিখদের বুকে যেন ডিনামাইটের মত আঘাত হানল শিখরা এখন উত্তপ্ত, উগ্র, হিংস্র বিদ্রোহী তাই জৌনপুরের কমান্ডিং অফিসার লেফটেনেন্ট ম্যারা শিখ সৈন্যদের দিকে তাকিয়ে বারান্দায় মুক্ত হাওয়া খাচ্ছিলেন আর ভাবছিলেন। আসলে এরা বেশী নিরক্ষর তাই এখনো এদের আমাদের গোলামী করানো সম্ভব হচ্ছে। কিন্তু তিনি জানেন না যে, শিখরা চারিদিকে বিদ্রোহ করার সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত। শিখদের বন্ধু হুঙ্কার ছাড়ল। মিঃ ম্যারা মারা গেলেন সাথে সাথে। জয়েন্ট মেজিস্ট্রেট চ্যাপেচ সাহেব জেল পরিদর্শন করতে যাচ্ছিলেন। রাস্তায় বুলেটের আঘাতে তাকেও ধারাত্যাগী করলেন বিদ্রোহীরা। শিখরা ট্রেজারী লুট করতেও ভুললেন না। শহরবাসীরা বিদ্রোহীদের সাথে যোগ দেয়ায় বিদ্রোহ বড়ই মারাত্মক রূপ পরিগ্রহণ করল। তিন লাখ টাকা হাতে আসল। মাওলানা লিয়াকত জানতেন একতার মূল্য কত। অযোধ্যায় যতবার মুসলমান বিপ্লবীরা মাথা তুলেছেন ততবার হিন্দুদের সাহায্য থেকে তারা বঞ্চিত তো হয়েছিলেনই বরং বিরোধীতাও করতেন তারা। মাওলানা লিয়াকত আলী হিন্দু মুসলমান সম্মিলিত জনতার সামনে বক্তৃতা করলেন আর সমস্ত মানুষকে বিপ্লবের বহিঃতে ফেঁপিয়ে তুললেন। শ্রী বাগচী মহাশয়ের লেখাতেও একথার প্রমাণ মিলে—“ইংরেজ কতৃপক্ষ তাই ভেবেছিলেন যে, এখানে হিন্দু মুসলমান একত্র হয়ে কখনই দাঁড়াবে না। কিন্তু এলাহাবাদের বিদ্রোহ নির্মম ভাবেই তাদের সে ধারণা ভঙ্গ করে দিল। চারদিকে অগ্নি সংযোগ, গুলি, কামানের গোল, আর তরবারির চাকচিকা যেন বিভীষিকা সৃষ্টি করল। টেলিগ্রাফের তার কাটা হল, জেলখানা ভাঙ্গা হল, হাজার কয়েদী রণ মূর্তিতে রাক্ষস পালকের মত শহরে তাড়ব লীলা শুরু করল। ইংরেজ বেশ বুঝতে পারল ভারতে রাজত্ব করা আর সম্ভব নয়। অবশ্য আমাদের দেশের বিশ্বাস ঘাতকদের পরিমাণ নির্ধারণ করতে পারলে বোধ হয় ইংরেজের মনে এ ধরনের চিন্তা স্থান পেত না।

যাহোক, মধ্যে মধ্যে “দ্বীন ইসলাম জিন্দবাদ! আগরেজী হুকুমাত খতম কর” শ্লোগান আর সামনে উড়ছে মুসলমানদের পছন্দ মত সবুজ পতাকা। শ্রী বাগচী মহাশয়ও লিখেছেন, “দুর্গের বাইরে যেখানে যত ইংরেজ ছিল তাদের প্রায় সবাই নিহত হল। কোতোয়ালির মাথায় উড়ল মুসলমানদের সবুজ পতাকা। বিদ্রোহীদের তোপে তোপে রেল ইয়ার্ডের ইঞ্জিন চূর্ণ হয়ে যেতে লাগল।”

(দ্রঃ সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাসে, পৃঃ ১৫৮)

পরের দিন টেজারী আক্রমণ ও ত্রিশ লক্ষ টাকা করায়ত্ত্ব করা হয়। ইংরেজরা ভয়ানক বিপদে পড়ে। কেন্দ্র কলকাতা থেকে মিঃ ক্যানিং কাশীর মিঃ নীলকে টেলিগ্রাম করলেন সৈন্যে এলাহাবাদ রওনা হবার জন্য। ১৮ জুন তিনি সৈন্যে এলাহাবাদ পৌঁছান কিন্তু ইংরেজ সৈন্যদের মুখ দেখে মনে হচ্ছিল যেন সব ফাঁসীর আসামী। আকাশে শকুন উড়ছে নর মাংসের গন্ধে তারাও সুযোগ পেয়েছে। মিঃ নীলের মুখও নীল হয়ে গেল সেখানকার কাও কারখানা দেখে। কিন্তু ইংরেজদের মত এত কামান তো নাই বিদ্রোহীদের হাতে। তাই কামান দেখে শহরটাকে ধ্বংস রূপে পরিণত করার উপক্রম হলে বিদ্রোহীরা টিকতে পারল না সরে পড়লেন। মিঃ নীল দুর্গ থেকে শিশু মহিলা প্রভৃতিদের কামান সজ্জিত ষ্টীমারে কলকাতা পাঠিয়ে দিলেন। ষ্টীমার চলতে লাগল আর পথের দু'পাশের গ্রাম গুলিতে গোলা বর্ষণ করে সহস্র সহস্র ভারতবাসীকে হত্যা করে গর্ববোধ করতে লাগল ইংরেজরা। ১৬ মে কানপারের অন্তর্গত বিঠুরে একটি গোপন বৈঠক হয়। মারাঠ বংশের ‘নানা’, ‘বাজীরাও’, এর পালিত পুত্র। পরামর্শ করার জন্য ডেকেছেন তার দুই ভাইকে ‘বাবা’ ও ‘বাবা’ কে আর ভাগিনেয় ‘রাও সাহেব’ আর আছেন বাসীর রাণী ‘লক্ষ্মীবাই’ এবং সাহসী ‘তাতীয়াটোপী’ প্রভৃতি। রাণী ঝফরমী বাই জানালেন যে, ইংরেজকে বারে বারে আমরা সাহায্য ও সহযোগিতা দিয়েছি বা এখনো অনেক দিয়ে যাচ্ছি তাতে লাভ কিছুই হয়নি বরং ভারত স্বাধীন থেকে চলেছে পরে আমাদের বংশ কলঙ্কিত হবে। আমাদের প্রত্যেকের বংশ মর্যাদার এবং ধন সম্পত্তিতে পর্যন্ত আঘাত দিয়েছে। এক্ষেত্রে কিসের জন্য আমরা এখনো তাদের তাবোদারী করব? তাতীয়া টোপী বললেন, নানা সাহেবের মতই আমার মত। কিন্তু আমার মনে হয় মুসলমানরা ঠিকই বুঝেছে ইংরেজ এক এক করে সকলকে গ্রাস করবে। বাবা ও বাবা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, “আমার পিতা যেভাবে ইংরেজকে প্রাণপণ সাহায্য করেছেন ইংরেজ তার বিনিময়ে তার মৃত্যুর পূর্বেই তাকে লাঞ্চিত করেছে এবং নিঃশ্বাস করার ব্যবস্থা করেছে। তার সমস্ত মারাঠা শক্তিকে ইংরেজের পক্ষে লাগিয়েছি; কত গোপন পরামর্শ আমার যে হয় তা তোমাদের কাউকে জানাই নি কোন দিন। কত গোপনে উপকার করেছি যা তোমাদের সামনে প্রকাশ করলে আমাকে বিশ্বাস ঘাতক বা দালাল মনে করবে। কিন্তু আমার সাথে তারা খুবই খারাপ ব্যবহার করল। এখানে অনেক আবেদন নিবেদন করে যখন কোন ফল হলনা তখন এমন কোন ইংরেজ বন্ধু পেলাম না যে আমার খরচে একবার আমার তরফ থেকে প্রতিনিধি হয়ে ইংল্যান্ড গিয়ে আবেদন পেশ করে। ভারতেন হিন্দু, মারাঠা, শিখ কাউকে পেলাম না অবশ্য এমন এক লোকের দরকার ছিল যে ভাল ইংরেজি জানে। শেষে যাদের চিরশত্রু মনে করি তে মুসলমান জাতের আজিমুল্লাহ খানকে অনুরোধ করি। তিনি আগ্রহের সাথে বিলেতে গেলেন এবং বহু আবেদন করলেন। তাতেও কিছু ফল হল না। এখন ইংরেজদের ওপর আমার খুব ভক্তি বা বিশ্বাসের কোন কথা নেই। তবে একটা কথা ভাবছি ইংরেজ সত্যিই যদি ভারত থেকে চলে যায় তাহলে তো আবার সে মুসলমান রাজত্বই স্থাপন করা হবে। কারণ শুনেছি এখন বাহাদুর শাহ্-ই নাকি সারা ভারতের সুলতান” সকলেই চিন্তিত হলেন, পরামর্শে সিদ্ধান্ত হল নানা সাহেবের একবার ভারতের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে দেখা দরকার যুদ্ধের অবস্থা কেমন। যদি দেখা যায় ইংরেজকে ভারত ছাড়তেই হবে তাহলে বীর বিক্রমে শেষ প্রতিশোধ নেয়া হবে আর যদি দেখা যায় সামান্য কিছু হিন্দু স্থানী সৈন্যের উত্তেজনা বিপ্লবী আজিমুল্লাহ খান বাচ্চা বেলা থেকেই ইংরেজ বিরোধী ছিলেন। তাই অল্প বয়স থেকেই বিপ্লব করতে গিয়ে তার লেখা-পড়ার যথেষ্ট ক্ষতি হয়। কিন্তু উচ্চ শিক্ষার আকাংখ্যা থেকে যায়। তার ইংরেজী শিক্ষার আগ্রহ ছিল। চেহারা ছিল অতি সুন্দর। এক ইংরেজের বাবুটি বিভাগে চাকুরী করতে থাকেন। ইংরেজটি ফরাসী ভাষায় সুদক্ষ ছিলেন

আরতো তার মাতৃভাষা ছিলই। কিছু দিনের মধ্যেই ইংরেজটির সাহচর্যে তিনি ইংরেজি ও ফারসী ভাষা আয়ত্ত্ব করলেন। এবার চাকুরী ছেড়ে গিয়ে কানপুরে ইংরেজি স্কুলে ভর্তি হলেন। এত মেধাবী ছিলেন প্রতি বছর তিনি প্রথম স্থান অধিকার করে পড়া শেষ করেন। পরে তাকে ইংরেজ সরকার এ স্কুলেরই শিক্ষক রূপে বরণ করে নেয়। পরে তিনি চাকুরী ছেড়ে দেন। অতপর নানার সাথে তার আলাপ হয় নানাও ছিলেন একজন ভারতীয় রাজা। আর ভারতের প্রায় সব রাজাই ছিলেন ইংরেজ ভক্ত ছিলেন তা ভজিতেই হোক আর ভয়েই হোক। তাই আজিমুল্লাহ বিপ্লবীদের সাথে যোগ রেখে নানার সাথে ব্যক্তিগতভাবে বন্ধুত্ব গড়ে তোলেন। এ আজিমুল্লাহ খানই রাজা নানা সাহেবের পক্ষ থেকে ১৮৫৩ খ্রিষ্টাব্দে ইংল্যান্ড যান এবং নানার আবেদন পেশ করেন কিন্তু সফল কাম হননি। তখন তিনি ফিরে আসলেন। ইংল্যান্ডের একজন ভারতীয় রঙ্গ বাপুজী সেতারা রাজার ত বদন নিয়ে এসেছিলেন। তাকেও বিমুখ থেকে হয়। আজিমুল্লাহ সাহেব তার দ্বারা নানাকে জানালেন তার ফিরতে দু-তিন দিন বিলম্ব থেকে পারে। আমার কথায় যেমন কাজ হল না এখন ইংরেজকে শক্তি প্রয়োগ করে ভারত থেকে তাড়ানোর রাস্তা করে তবে ফিরব।

এদিকে বিলেতে বিদ্রোহী দলের অনেক মুসলমান ইংরেজ ধ্বংসের কাজে আসা-যাওয়া ও ঘাঁটি করার কাজ আগেই শুরু করেছিলেন। সকলে আজিমুল্লাহকে এ পরামর্শই দিলেন যে নানার দ্বারা প্রত্যেক ইংরেজ প্রেমিক হিন্দু রাজাকে বিদ্রোহী দলে টাকার কথা। আজিমুল্লাহর মনেও এ এক কথাই ছিল। আজিমুল্লাহ খুব ভাল প্রচারক ও মিশুক লোক ছিলেন আর স্বাস্থ্য ও চেহারা ছিল খুব সুন্দর। তাই অনেক রাজনৈতিক নেতার বাড়ীর মেয়েদের সাথে তার আলাপ করতে অসুবিধা হয়নি। অনেকে তাকে ভালবেসেও ফেলেছিলেন। কিন্তু বিপ্লবীর লক্ষ্য বিপ্লবই। যখন তিনি দেশে ফেরেন তখন প্রচুর পত্র আসত ভারতের আজিমুল্লাহ বলে। কিন্তু আজিমুল্লাহ খান এই ফাঁকে অনেক গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহ করেছিলেন যা কেউ টের করতে পারেনি। ১৮৫৭ সালের বিপ্লবে ইংল্যান্ড থেকে তিনি তুরস্ক যান এবং সে সময়ে তুরস্কের বাদশাহ মুসলিম দুনিয়ার খলিফা বলে খ্যাত ছিলেন। ইংরেজ বিশ্বে বহু জায়গায় পরাজিত হচ্ছে সে খবর পেলেন আজিমুল্লাহ খান। যেমন-সিবাঙ্গপালের যুদ্ধ। ওখান থেকে তিনি গেলেন রাশিয়া। এখানে লণ্ডনের 'টাইমস্' পত্রিকার নিজস্ব সংবাদ দাতা মিঃ রাসেল রাশিয়াতে থাকতেন তার আশ্রয় আশ্রয়ীদের পরিচয় ও পত্র দেখিয়ে তিনি তাবুতেই থাকতেন। তখন তুমুল যুদ্ধ চলছে রাশিয়া ও তুরস্কের মধ্যে। আজিমুল্লাহ সংবাদ পেলেন রাশিয়ার সৈন্যরা ইংরেজ ও ফারসী সৈন্যের মিলিত শক্তিকে পরাস্ত করতে সক্ষম হয়েছে। এবার যুক্তি ও সহায়তায় তিনি রাশিয়া থেকে মিশরে যান সেখানে প্রয়োজনের পরিশ্রমিতে ও অপপ্রচারের রাজনৈতিক পর্ব শেষ করে ভারতে ফিরলেন। কানপুরের ক্যান্টনমেন্ট খুবই বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ। ইংরেজরা চিন্তিত এখানেও যে বিদ্রোহের আগ্নেয়গিরি উদ্গীরিত হবেনা তা জোর দিয়ে বলা যায় না। তবে বিটুরে নার সাহেব যুগ যুগ ধরে ইংরেজের হাতের লোক। এখনও যদি তাকে একটু প্রলোভন দিয়ে কাজ বাগানো যায় তাহলে বিদ্রোহের বিপদ থেকে বাঁচা যেতে পারে। ১৮৫৭ সালের ১৮ মার্চ জেনপারেল হুইলার নানার কাছে পুরাতন বন্ধুত্ব স্মরণ করিয়ে দিয়ে সহযোগীতা ও সাহায্য তথা তার সৈন্য বাহিনী চেয়ে পাঠালেন। কারণ নানার সৈন্য, ইংরেজ সৈন্য ও শিখ সৈন্য ছাড়া কাউকে বিশ্বাস করা যায় না তবে শিখ যদিও পুনরায় আমাদের কথা মত চলছে কিন্তু কিছুদিন আগে তাদের কয়েকটি বিশ্বাস ঘাতকতার হুইলার কথা চিন্তা করলেন।

নানার চির বন্ধু ইংরেজের পত্র পেয়ে বাছাই করা পদাতিক ও মিঃ হুইলার একটি সাময়িক দুর্গ মাটির দেয়াল আর চারদিকে কামান বসানো ঘাঁটি তৈরী করলেন তাতে প্রায় এক মাসের মত খাদ্য পানীয় নিয়ে নিলেন আর ইংরেজ মহিলা ও শিশুদের সেখানে স্থানান্তরিত করলেন।

৪ জুন মাতাল অবস্থায় এক ইংরেজ অফিসার একজন ভারতীয় অশ্বারোহীকে গুলি করে হত্যা করে। ভারতীয় সৈন্যরা সুযোগ খুঁজছিলেন। তারা বিচার চাইলেন। বিচারে এ রায় হয় সে নির্দোষ, কারণ ইচ্ছাকৃত নয় অনিচ্ছাকৃতভাবেই এগুলো ভারতীয়রা আগে থেকেই জানতেন কেমন রায় থেকে পারে। সৈন্যরা ঘোষণা করলেন আমাদের হাত থেকেও মনের ভুলে গুলি বেরিয়ে গেলে আমরাও নিশ্চয় নির্দোষী হব। সে রাতেই ভারতীয় সৈন্য ফটাফট গুলি করল কয়েকজন ইংরেজ অফিসারকে, কিছু হতাহত হল। কিন্তু মরতে ও মারতে ভয় নেই তারা যে বিপ্লবী। কানপুরের অশ্বারোহী বাহিনীটি এক রকম মুসলমান সৈন্য নিয়েই গঠিত হয়েছিল। তারাই প্রথম নারায় তাকবীর ধ্বনি দিয়ে আল্লাহ আকবর বলে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তখন সৈন্যদের সুবেদার মোটা পুরস্কারের আশায় সৈন্যদের বোঝালেন, “তোমরা ক্ষান্ত হও। আমি ও হিন্দু স্থানী তোমরাও হিন্দু স্থানী সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে”। বিদ্রোহী দল তাকে ভারতীয় বলে হত্যা করতে মায়া করেন, কিন্তু তরবারির উল্টো দিক দিয়ে আঘাত করে আহত করে ব্যারাক থেকে বের করেছেন। ধনাগার, অস্ত্রাগারের দিকে ছুটে লাগলো মুখে শ্লোগান হামারে দ্বীন জিন্দাবাদ! আঙ্গরেজী হুকুমাত খতম ক্যারো।

নবাবগঞ্জে নানা সাহেবের সাথে সাক্ষাত করতে এলেন একদল ভারতীয় বিপ্লবী। নানা সাহেব স্বাস্থ্যে খুবই সুদর্শন ছিলেন কিন্তু শামসুদ্দিন আর মুদত আলীর চেহারা যেন নানার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দণ্ডায়মান। শামসুদ্দিন নানাকে বললেন, “সারা ভারত আজ ইংরেজকে ত্যাগে চায় আর আপনি এখনো আপনার সৈন্য নিয়ে শয়তান শোষক ইংরেজদের ধনাগার পাহারা দিচ্ছেন? মনে রাখবেন, ইংরেজের হাতে যদিও এখনো রাজ ক্ষমতা, তবুও তাদের সারা ভারতে মেরে শেষ করে ফেলেছি আর তারা ভয়ে থরথর করে কাঁপছে। কিন্তু আপনাদের মত বিশ্বাস ঘাতকদের জন্য তারা আজও টিকে আছে। যে আঘাত হানা শুরু হয়েছে তাতে আজ না হলেও কাল তাদের মার খাওয়া কুকুরের মত পালাতেই হবে। আমরা আপনাদের মত রাজার বিরুদ্ধে যদি অস্ত্র ধরি এক সপ্তাহের মধ্যে কোন বিশ্বাস ঘাতক রাজার অস্তিত্ব থাকবে না। আপনার সাথে আমাদের লড়াই এর ইচ্ছা ছিল কিন্তু আপনি আমাদের বিখ্যাত বিপ্লবী বিলেত থেকে প্রত্যাগত আজিমুল্লাহর বন্ধু। তাই তার অনুরোধে আপনি শেষ সুযোগ নিন। হয় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন অথবা ভারতের জন্য যুদ্ধ করণ আপনার দুশমনের সাথে।” নানা সাহেব একটু হাসলেন এবং বললেন আপনাদের চেয়ে আমার ক্ষতি বেশী করেছে ইংরেজ। আমি ইংরেজের সাথে যে দহরম মহরম করি তা আমার ছলনা মাত্র। জেনে রাখবেন, আজিমুল্লাহর আদেশও নিষেধের বাইরে আমি যাব না। তিনি আমার পরিচালক মনে করতে পারেন। শামসুদ্দিন এবং মুদত আলী ছুটে এসে তার সাথে কর্মমর্দন করলেন। তারা পরের দিনই আজিমুল্লাহ খান দেখা করলেন নানার সাথে। নানা বলেন, আমি আপনার মতের বাইরে চলতে চাইনি। আজিমুল্লাহ নানাকে এখন দু’টি পরামর্শ দিলেন। একটি হচ্ছে আজ থেকে পূর্ণভাবে বিদ্রোহী দলে যোগদান। আর হিন্দু রাজাদের কাছে আপনার পক্ষ থেকে বিদ্রোহী দলে সাহায্যের জন্য পত্র প্রেরণ। নানার কপালে অনেক গুলি রেখার সঞ্চালন হল পরক্ষণেই বলেন তবে তাই হোক। কিন্তু আমাদের বংশের সম্মানীয় পেশোয়া পদ বজায় রাখা হবে তো? আজিমুল্লাহ জানালেন নিশ্চয়। আপনি আজ থেকেই পেশোয়া পদ পেয়েছেন বলে মনে করুন। পদ দেবে কে? ইংরেজ? তাকেই তো হটাতে চাই আমি, আপনি, সকলে!

নানা সাহেব তার সৈন্যদের জানিয়ে দিলেন তিনি এখন বিদ্রোহীদের দলে অর্থাৎ আজিমুল্লাহর সঙ্গী। বিদ্রোহী সৈন্যরা নানার নিকটবর্তী হলেন। নানার সৈন্যরা ধনাগারে প্রবেশ করতে দিলেন বিদ্রোহীদের নানার সৈন্য জেলের ফটক খুলে দিলেন। এবং সকলেই বিজয় উল্লাসে মন দিলেন। সারা কানপুরে তোলপাড়। ইংরেজ অবাক। ভারতবাসী কত যেন বিশ্বাস ঘাতক! তারা ইংরেজকে শোষণ, পীড়ন ও প্রভুত্ব প্রদর্শন করতে দিবে না। এটাই তাদের কাছে বিরাট অপরাধ।

পরের দিন দিল্লী যাবার পালা। সমস্ত বিদ্রোহী দল নানার সৈন্য ও অর্থসহ বাহাদুর শাহের সাথে সাক্ষাত করে আরও সাহায্য ও শক্তি নিয়ে আবার যুদ্ধাভিযান চালাবেন। নানা দিল্লী যেতে রাজী হলেন বটে কিন্তু মন মোটেই মানে না। পরের দিন ক্লাস্ত দেহে কানপুরে রাত কাটিয়ে সকালে নানা দিল্লী গেলেন না। অনেকে বোঝালেন কিন্তু তিনি অনেক কিছু চিন্তা করলেন। তার জীবনে বহু যুদ্ধ, আক্রমণ, চক্রান্ত, যত কিছু হয়েছে তা ভারতবাসীর বিপক্ষে আর বেশীর ভাগই ইংরেজের পক্ষে। সুতরাং বাহাদুর শাহ যদি ক্ষমা না করে শাস্তি দেন বা অবজ্ঞা করেন। যাহোক, আজিমুল্লাহ খানও নানা সাহেবের সাথে ঘুরে এলেন কারণ নানাকে চালনা করতেই তাকেই নিয়োগ করা হয়েছিল।

নানা ও আজিমুল্লাহ দু'জনে এসেই বিপুল বিক্রমে আক্রমণের আয়োজন করলেন। ২৩ জুন মিঃ হুইলারের পুত্র লেফটেন্যান্ট হুইলার আহত হলেন। তারপর তাকে যেখানে রাখা হয়েছিল সেখানে গোলা ছোড়া হল। পুত্রের মাথাটা বিচূর্ণ হয়ে গেল। হিলাসডনকেও শেষ করা হল। তার স্ত্রীও স্বামীর সঙ্গিনী হলেন। কর্নেল ষ্টুয়ার্ড আহত হয়ে তিন দির পর মারা গেলেন। ক্যাপটেন হ্যালিডে তার স্ত্রীর জন্য একটু খাবারের সন্ধানে যাচ্ছিলেন। একটি নিখুত গুলি হ্যালিডের মাথা জড়িয়ে দেয়। নামী ও দামী লোকদের তো এমনি অবস্থা; তাছাড়া সাধারণ ইংরেজ সৈন্য যে কত মরছিল তার সঠিক হিসেব নেই। হুইলার মনের মুগ্ধ চিন্তায় একটা কূপ তৈরী করলেন তাতেই প্রত্যেকটি মৃত দেহকে ফেলে কূপটিকে একটা মহা কবরে পরিণত করা হয়েছিল। কানপুরে এমন অবস্থার কথা কেউ কল্পণাও করতে পারেনি। খাবার শেষ তাই পথের কুকুর বিড়াল ধরে তারই মাংস সুখাদ্যের মত গ্রহণযোগ্য হল ইংরেজদের। সবচেয়ে সমস্যা হল পানির। পানি আনতে বাইরে গেলেই মৃত্যুর সাথে সাক্ষাৎ হবে। যে যায় সে আর ফেরে না।

আজিমুল্লাহ হুইলারকে আত্মসমর্পণ করার প্রস্তাব দিয়ে পত্র পাঠালেন। পত্রে জানানো হল যদি তারা কামান গোলা ও অর্থাতি ছেড়ে দিতে রাজি হন তাহলে তাদের নিরাপদ স্থানে এলাহাবাদে পৌঁছে দেয়া হবে। পত্রের শেষে আজিমুল্লাহর সাক্ষর। জেঃ হুইলার রেগে বলেন; নো, আই স্যাল নেভার সারেণ্ডার। কিন্তু ক্যাপ্টেন মুর আত্মসমর্পণ সমর্থন করে বলেন, 'উই কান্ট গোন্ড এনি লংগার, বেটার উই স্যারেণ্ডার।' আত্ম সমর্পণই সাব্যস্ত হল। ২৭ জুন সতীতোরী ঘাটে নানা সাহেব অনেক নৌকা প্রস্তুত রেখেছিলেন। প্রত্যেকের উপর খড়ের চাল যাতে সাহেব মেমদের সূর্যের তাপ না লাগে। দলে দলে উঠতে লাগল নৌকায় সাহেব মেমের দল কিছুক্ষণের মধ্যেই নৌকা ছাড়বে কিন্তু নদীর দুই ধার থেকে কামানের গোলা ছোড়া হল। খড়ের চাল আগেই ছিল উপরে আগুনের পাশে কামান বন্দুক আর নীচে নদীর পানি উনচল্লিশটি নৌকা চূর্ণ হয়ে গেল আর শুধু একটি নৌকা বেঁচে ছিল যাতে আগুন লাগানো হয়নি তাতে ছিলেন মেজর ভাইরাট, ক্যাপ্টেন টমসন ও মিঃ মুর আর তাদের সঙ্গীরা। ভাসা নৌকা গুলো ভাসতে ভাসতে গিয়ে এক জায়গায় আটকে যায়। কয়েক জন আহত হয়ে বেঁচে ছিলেন তখনো। তারা একটি মন্দিরে আশ্রয় নেয়। নানা সংবাদ পেয়ে নির্দেশ দিলেন তাদের মেরে ফেলতে। তাদের তাড়া করা হয় এবং পিছন থেকে গুলি করা হয় প্রায় সবাই প্রাণ হারায় কিন্তু দু'একজন যারা তার মধ্যেও বেঁচে ছিল তারা অযোধ্যার রাজা দিল্লিজয়ীর বাড়িতে আশ্রয় পায়।

কলকাতায় মিঃ ক্যানিং খুব চিন্তিত হয়ে বিখ্যাত বীর শ্রীরামলুরের পাক্সা পাদ্রী বাসমানের জামাতা হেনরী হ্যাভলককে কানপুর উদ্ধারের জন্য নির্দেশ দেন। আজিমুল্লা খান ও নানা হ্যাভলক আসার সংবাদ পেলেন এবং ঠিক করলেন 'বিবি ঘরে' বন্ধী ইংরেজদের সব শেষ করা হবে তাদের আসার আগেই। তাই করা হল তরবারী দিয়ে প্রত্যেককে হত্যা করা হয় এবং তাদের মৃতদেহ শব্দের মধ্যে দিয়ে মাটি চাপা দেয়া হয়।

হ্যাভলকের সাথে আছে ইংরেজ সৈন্য আর শিখ সৈন্য। শিখরা একবার মাত্র বিদ্রোহ করে পরে বুঝে দেখেছে সারা জীবন তারা ইংরেজের তাবেদারী করে এসেছে শেষ সময়ে বিদ্রোহ করে বিশ্বাস ঘাতক নাম না নিয়ে বরং ইংরেজকে সন্তুষ্ট রেখে বিপ্লবের শেষে বড় পুরস্কারকে হাত ছাড়া করে বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। তাই আবার শিখ সৈন্য আর ইংরেজ সৈন্য যেন মায়ের পেটের ভাইয়ের মত মিলে গেল।

হ্যাভলক বিপুল আয়োজনে ইংরেজ ও শিখ সৈন্য পাঠালেন ফতেপুরে! সেখানে নানাও অকুতো সাহসে বিপ্লবীদের নিয়ে এগিয়ে চললেন। নানার সাথে আছে দেড় হাজার সৈন্য ও দেড় হাজার বিপ্লবী জনসাধারণ। মারাত্মক যুদ্ধ হল। নানার মরনের ভয় নেই। যুদ্ধে নানা জয় লাভ করলেন। শেষে অজস্র কামান আমদানি করল ইংরেজরা। এবার সৈন্য ও বিপ্লবীরা গোলার আঘাতে টিকতে পারল না। অবশেষে নানা ও আজিমুল্লাকে পরাজয়ই স্বীকার করতে হয়। কিন্তু বীরত্বের বিচারে নানা যা করেছেন তাতে ইংরেজরা নিজেরাই উপলব্ধি করেছে যদি বিপক্ষগণ সমান সৈন্য সমান অস্ত্র দিয়ে লড়তে পারত তাহলে এক সপ্তাহেই সারা ভারত থেকে ইংরেজকে বিতাড়িত থেকে হত। নানা সাহেবের বীরত্ব প্রদর্শনে ফতেপুর পঁয়ত্রিশ দিন নানা ও আজিমুল্লাহর হাতে ছিল।

কানপুরের দু'দল মুসলমান বিপ্লবী কিছুদিন আগেই ফতেপুর পৌঁছেছিলেন। তাদের সাথে দেশীয় বিদ্রোহী ও সৈন্য মিলে ইংরেজ নিধন যেভাবে চালানো হয়েছিল এবং ধনাগার, কোটকাহারী, জেল, থানা যেভাবে দখল করা হয়েছিল তার প্রতিশোধে তোপের মুখে ঘর-বাড়ি পর্যন্ত ধ্বংস করতে ইংরেজের বিলম্ব হয়নি। আর শিখ সৈন্য ইংরেজের আদেশে প্রতি বাড়িতে বাড়িতে ঢুকে যে ভাবে লুণ্ঠন ও পৈচাশিক কর্ম করেছে তাতে তেমন কেউ আবার হয়নি। কারণ সারাজীবনে তারা শিখদের যা দেখেছে এটা তার পুনরাবৃত্তিই মাত্র।

হ্যাভলক কানপুরে বিপুল সংখ্যক শিখ সৈন্য ও ইংরেজ সৈন্য নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। নানাও নির্ভয়ে ১৬ জুলাই সৈন্য ও বিপ্লবী প্রায় পাঁচ হাজার আর সাতটি কামান নিয়ে রওয়ানা হলেন। নানা, আজিমুল্লা ও মাওলানা লিয়াকত আলীকে বলেন যদি শিখ সৈন্য আর ভারতীয় হিন্দু রাজাদের সৈন্য সাহেবরা না পেত তাহলে দেখিয়ে দিতাম যুদ্ধ কাকে বলে। নানা আড়াই ঘণ্টা ধরে সমুখ সমরে লড়লেন। অবশেষে নিজের সৈন্যদের জানিয়ে দিলেন যদি পরাজিত হও তাহলে পালায়নের পূর্বে আমাদের বারুদে আগুন লাগিয়ে দিও। যেন আমাদের নিজের বারুদে আমার দেশবাসীকে মারতে না পারে। শেষে তাই হল সৈন্যরা বারুদে আগুন দিয়ে সরে পড়লেন। নানাও সরে গেলেন।

নানাকে জীবন্ত ও মৃত অবস্থায় পেলে ইংরেজরা পৈচাশিক আনন্দ পেত বেশী। কিন্তু নানা চিরদিনের মত নিখোঁজ হলেন। অতীতের জন্য তার উৎসর্গ ভারতবাসীর জীবনে নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক গর্ব। কিন্তু ইতিহাসে তার নাম যদিও আছে কিন্তু আজিমুল্লা, লিয়াকত আলী, সামসুদ্দিন, মুদ্দত আলীর নাম সমপর্যায়েও স্থান পায়নি। তার কারণ অবশ্যই উহ্য।

তিনজন বড় কর্তা মিঃ নীল, হ্যাডলক ও আউট্রাম এক সাথে লাক্সের দখলের জন্য গেলেন সাথে সে শিখ সৈন্যের সাথী আর ইংরেজ সৈন্য। একজন বিদ্রোহী বহু দূর থেকে তাদের লক্ষ্য করে গুলি করলেন। নাম তার আবদুল জব্বার অব্যর্থ লক্ষ্য গুলি মিঃ নীলের মাথা ভেদ করল। গোড়া থেকে সে গড়িয়ে পড়লেন আর কোন কথা তিনি বলতে পারেননি। অবশ্য ইংরেজরা নিষ্ঠুর ভাবে প্রতিশোধ নিল। বিপ্লবীরা পতাকা নামিয়ে দিয়ে নিজেদের পতাকা তুলল। বিঠরের রাজার তৎপরতায় নানার রাজবাড়ী আক্রমণ করা হল। কিন্তু বহু আজিমুল্লাহর সুনিপুণ সম্পাদনায় কোন ছেলে মেয়ে, অলঙ্কার বা টাকা কড়ি ঘরে ছিল না। ঘর ছিল খালি। কিছু বই আর সামান্য বিছানা ইত্যাদী মাত্র। হ্যাডলক নানার প্রাসাদ ধ্বংস করলেন। (দ্রঃ কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলস্ পৃঃ ২০১)

এমনি ভাবে লাহোর বিদ্রোহের পূর্বাভাস ইংরেজ জানতে পারে। হিন্দু মুসলমানের গোপন ষড়যন্ত্র যিনি ফাঁস করেছিলেন তিনি হচ্ছেন ইংরেজের বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণ গুপ্তচর নাম দৌব। শ্রীমনি বাগচির লেখার উদ্ধৃতি দিয়ে এ উক্তির যথার্থতা প্রমাণ করা যায়—“দৌব জাতিতে ব্রাহ্মণ। অযোধ্যার লোকতাকে গোয়েন্দা নিযুক্ত করল। প্রভু ভক্তির বিশ্বস্ত অযোধ্যাবাসী সে ব্রাহ্মণ সুচারু রূপে তার কর্তব্য সাধন করল। তাদের মধ্যে বিদ্রোহের ভাব কতখানি বুঝলে? জিজ্ঞাসা করলেন ক্যাপ্টেন লরেন্স। ব্রাহ্মণ তার গলা পর্যন্ত হাত দিয়ে দেখিয়ে বলে এতখানি।”

৪ জুলাই হেনরী লরেন্সের মৃত্যু হয়। কলকাতায় মিঃ ক্যানিং তার ও হুইলারের মৃত্যু সংবাদে সবচেয়ে বেশী দুঃখ পেয়েছিলেন। শুধু পুরুষরাই পৌরষ দেখিয়েছেন বিপ্লব করে তাই নর নারীরও ভূমিকা ছিল। অযোধ্যায় নবাব ওয়াজেদ আলী যখন কলকাতায় বন্দী তখন তার বেগম হযরত মহল নিজেই বিদ্রোহের বা বিপ্লবের সাথে যুক্ত ছিলেন। জুলাই মাসে তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং দিল্লীর বাহাদুর শাহকে এ সংবাদ দিয়ে পাঠান। সম্রাটের স্ত্রী জিন্নাত মহল তাকে পত্র মারফত ধন্যবাদ জানিয়ে সহযোগীতার আশ্বাস দেন। কিন্তু চারদিকেই ইংরেজরা ভারতীয়, শিখ সৈন্য, মারাঠা, রাজপুত ও হিন্দু মহারাজাদের সাহায্যে আবার যেন মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে সক্ষম হচ্ছিল। ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাই পুরুষের পোশাকে বিপ্লবীদের সাথে যোগ দিয়ে ঝাঁসি রক্ষার চেষ্টা করলেন। বীর তাতিয়াতোপীও তার সৈন্য সমর্থকদের নিয়ে তার সাথে যোগ দিলেন। বিপুল বিক্রমে তারা যুদ্ধ করলেন কিন্তু স্যার হিউরোজ কাপুরুষের মত পিছন থেকে আক্রমণ করে তাদের অগ্রগতি রোধ করেন। তাতিয়াতোপীও রাণী গোয়ালিয়ার পলায়ণ করেন। ওখানকার রাজা সিক্কিয়া বিশ্বাস ঘাতক ইংরেজদের পক্ষের দালালিতে গুস্তাদ ছিলেন। রাণী এবং তাতিয়াতোপী সিক্কিয়াকে আক্রমণ করেন। তার পূর্বেই ফকির দল বা মৌলভী দল জনমত তৈরী করার কাজ সমাধা করে রেখেছিলেন। তাই রাজার সমস্ত লোকজন সিক্কিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে বিপ্লবীদের সমর্থন করে। রাজাকে তাড়া করে হত্যা করতে চাইলে তিনি প্রাণ নিয়ে পলায়ণ করতে বাধ্য হন। এখানে কার্ল মার্কসের আর একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি—“২ জুন নবীন সিক্কিয়া (ইংরেজদের পোষা কুকুর) কঠিন লড়াই এর পর নিজের সৈন্যদল কর্তৃক গোয়ালিয়ার থেকে বিতাড়িত হয়ে প্রাণ ভয়ে পালালেন অগ্রায়; গোয়ালিয়ার যাত্রা করলেন রোজ; বিদ্রোহীদের পরিচালনা করে ঝাঁসীর রাণী এবং তাতিয়াতোপী তার সাথে—” (দ্রঃ কার্ল মার্কস্ ফ্রেডরিক এঙ্গেলস্ পৃ. ২০৫)

তাতিয়াতোপী ছিলেন রাজার নানার খুল্লতাতে ভ্রাতা। তিনি কল্লি থেকে এসে ১ এপ্রিল যুদ্ধ করলেন বটে কিন্তু পরাজিত হন। কার্ল মার্কসের মতে “১৮৫৯ এর গোড়ার দিকে তার তাম লুকিয়ে থাকার স্থান (এক ভারতীয় বিশ্বাস ঘটক মান সিংহের সংবাদ জানিয়ে দেয়ার

কালে) ধরা পড়ে গেল তার বিচার এবং প্রাণদণ্ড হয়।” বিচারের নামে অবিচার করা হয় মাত্র। আসল তথ্য এটাই যে ১৮৫৯ সালের ৭ এপ্রিল তাতিয়া ধরা পড়েন। ৮ই তার সামরিক আদালতে বিচার হয় আর দু’টি অভিযোগে তাকে অভিযুক্ত করা হয়—(ক) ইংরেজের উপর আনুগত্যের অভাব। (খ) বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। (গ) নিরপরাধ ইংরেজ নারী ও শিশুদের হত্যা করা। তাতিয়া প্রতিবাদ মূলক উত্তর দিয়েছিলেন তাই শেষের অভিযোগ অভিযোগ বাতিল হয়। আর দু’টি অভিযোগের কারণে ইংরেজের আইনে তার ফাঁসী হয়েছিল। তাতিয়া উত্তর দিয়েছিলেন, “যারা আমার বিচার করছেন তাদের ও প্রাণদণ্ড হওয়া উচিত তাদের বিরুদ্ধেও ভারতবাসীরা অভিযোগ করতে পারে। পর রাজ্য প্রাসাদের অভিযোগ, কুশাসনের অভিযোগ, প্রজার সম্পত্তি লুণ্ঠনের অভিযোগ ও ভারতবাসীদের হত্যা করার অভিযোগ। আমি যা কিছু করেছি আমার নেতা নানার আদেশে করেছি। নর হত্যা আমি করি নাই তবে ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আমি করেছি। মৃত্যু দণ্ড নিতেও আমি প্রস্তুত আছি তবে তোপের মুখে আমাকে মারতে অনুরোধ করি। সত্যিই অমূলমানদের মধ্যে দেশের জন্য নানা, তাতিয়া ও ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাই এর প্রাণ বলিদানকে অস্বীকার করলে সত্যকে অস্বীকার করা হয়।

ঝাঁসীর রানীর কথঅও ইতিহাসে স্থান পেয়েছে। কিন্তু যিনি রাণীকে সাহস দিয়েছিলেন এবং নিজে প্রাণ দেবার ভরসা দিয়েছিলেন, যিনি বিপ্লবী পার্টিতে যোগাযোগ করে মৌলভী বা ফকির বাহিনীকে ঝাঁসীতে আনিয়েছিলেন, যিনি রাণীর গোলন্দাজ বাহিনীর প্রধান ছিলেন সে বিখ্যাত লৌহ মানব পঠান বীর গাউস খান নাম আমরা ভুলে গেছি। ঐতিহাসিক মেলিসনের মতে রাণীর সৈন্য ছিল এগার হাজার। কিন্তু একথা যথার্থ নয় যে সৈন্য অল্প ছিল। যারা সৈন্যের মত যুদ্ধক্ষেত্রে নেমেছিলেন তারা আন্দোলনের সেক্ষাসেবক বিপ্লবী ফকিরের দল এবং হিন্দু মুসলমান জনসারণ। তাদের হৃদয়ে ছিল দেশ প্রেম ও বাহুতে ছিল ইম্পাত কঠিন শক্তি। কিন্তু উপযুক্ত অস্ত্র তাদের ছিলনা। যুদ্ধের আবহাওয়া যখন রাণীর প্রতিকূলে বইতেছিল তখন গাউস খা একটা কামান নিয়ে যেভাবে ইংরেজ সৈন্যকে ঘায়েল করেছিলেন তাতে যুদ্ধের গতি আবার উল্টা দিকে ফিরে যায় এবং গাউস খাঁ বীরত্বময় বাহাদুরীতে তের দিন পর্যন্ত যুদ্ধকে ঠেকিয়ে রাখা হয়েছিল। কিন্তু তিনি আজ অজ্ঞাত অপ্রত্যাশিত ও উপেক্ষিত কেন জানি না। শ্রী বাগচী মহাশয় দে তার ইতিহাসে এ গাউস খাঁর মুক্ত কণ্ঠে প্রশংসা করেছেন, “অন্য দিকে সশস্ত্র ফকিরগণ নিশান হাতে নিয়ে রাণীর জয় ধ্বনি করতে লাগল। হর্ষ ধ্বনি ও তাপের শব্দে ঝাঁসীর দুর্গ প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল। ঘাউশ খাঁ ছিলেন রাণীর প্রধান গোলন্দাজ। এ দিন ঘাউশ খাঁ দক্ষিণ দিকের বুরুজ থেকে এমন তীব্র ভাবে বৃষ্টি করলেন যে, তাতে ইংরেজ পক্ষের তোপ বন্ধ হয়ে গেল। এই ঘাউস খাঁ-ই আসলে ঘাউস খাঁ।

(সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস দ্রঃ)

বিহারেও বিদ্রোহী ও বিপ্লবীদের মধ্যে অগ্রগণ্য ভূমিকায় মুসলমান ও মাওলানা বা ফকিরদের প্রাধান্য ছিল। অযোধ্যায় ইংরেজ অধিকৃত হওয়ায় বিপ্লবীরা ঘর সংসার নিয়ে পাটনায় পালিয়ে যান। এখান থেকে দানাপুর, পাটনা, গয়া, ছাপরা সারণ, আরা, মজফরপুর ও মতিহারী সব জায়গায় মুসলমান ফকির ও মৌলভী দল বিদ্রোহের দাবাদানল জ্বালিয়ে তুললেন। বিশেষ করে এ সময় তিনজন আলেম ইংরেজ সরকারকে তথা মিঃ টেলন সাহেবকে ভাবিয়ে তুললেন। তারা হচ্ছেন মাওলানা আহমাদুল্লা, মাওলানা ওয়াজউল-হক, আর শাহ মোহাম্মদ হোসেন। এদের প্রত্যেকের হাজার হাজার শিষ্য ও সমর্থক ছিল। তারা প্রকাশ্যে বক্তৃতা করতেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে। ফলে মিঃ টেলর জনতার মাঝে এ্যারেট

করতে সাহস পেলেন না। শেষে তাদের আমন্ত্রণ জানালেন নিজের বাসায়। উদ্দেশ্য বিদ্রোহ সম্বন্ধে আলোচনা করা। অসম্ভব সাহসী তিনজন আলেমই টেলরের বাসায় এলেন। টেলর পূর্ব প্রতুতির পরিপ্রেক্ষিতে সৈন্য দিয়ে বন্ধি করে তাদের সার্কিট হাউসে পাঠালেন। এ বিশ্বাসঘাতক শাসক ইংরেজের সহজ সুলভ স্বভাব হলেও ইংরেজ ঐতিহাসিক ফরবেস-মিচেল পর্যন্ত নিন্দা করে লিখেছেন, “সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের বন্ধু ভাবে আমন্ত্রণ করে যে এ রকম ব্যবহার করতে পারে তাকে বিশ্বাসঘাতকের মত না বলে পূর্ণ বিশ্বাসঘাতক বলাই ভাল।

(দ্রঃ সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস, ২৮৩ পৃঃ)

মাওলানাদের বন্দী করার পর বিদ্রোহের আগুন আরও তীব্রতর হয়ে উঠল। বিদ্রোহীরা প্রায় শতকরা সাড়ে নিরানব্বই পারসেন্ট মুসলমান ছিলেন। তাদের মধ্যে বিবেদ সৃষ্টির জন্য ইংরেজরা “ওহাবীরা আসলে মুসলমান নয়” বলে অপপ্রচার করল কিন্তু বিফল হল। তাদের এ কুৎসিত মতলব। এ সম্বন্ধে শ্রী বাগচী মহাশয়ের একটি উদ্ধৃতি দেয়া হচ্ছে—“মৌলভীদের প্রেফতারে শহরে কিন্তু শান্তি স্থাপিত হল না। পাটনায় বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠল। বিদ্রোহীদের বেশীর ভাগই ওহাবী মুসলমান। মৌলভীদের আটকের পর পাটনার অধিবাসীদের নিরস্ত্র করার চেষ্টা করা হয়। এ চেষ্টা ব্যর্থ হয়। অনেকেই অস্ত্র সস্ত্র গোপন করে ফেলল। ইংরেজদের বিশ্বাসঘাতকতা ধর্মোন্মত্ত মুসলমানদের মনে তুমুল উত্তেজনা সঞ্চার করল। ৩ জুলাই সন্ধ্যা বেলায় মুসলমান বিদ্রোহীরা দ্বীন ইসলাম জিন্দাবাদ, আল্লাহ আকবর আওয়াজে আকাশ বাতাস কম্পিত করে পতাকা উড়িয়ে যুদ্ধের ডঙ্কা বাজিয়ে জনসাধারণকে জিহাদের দিকে আহ্বান করতে লাগলেন। তখন মিঃ টেলর তাদের অত্যন্ত বিশ্বস্ত একদল শিখ সৈন্য নিয়ে বিপ্লবীদের আক্রমণ করলেন। বহু বিপ্লবী শহীদ হলেন। ইংরেজদের ও অনেক আহত নিহত হল, বিদ্রোহীদের গুলিতে একজন ইংরেজ ডাক্তারেও মৃত্যু হয় কিন্তু অপেক্ষাকৃত কম।

(সিঃ যুঃ ইঃ)

পাটনায় বিপ্লবীদের নেতা ছিলেন পীর আলী। তিনি পীর ছিলেন না তবে তার নামই ছিল পীর। ইংরেজদের ধারণা হয়েছিল পীর লোকটির দ্বারাই পাটনা শহর শুধু নয় গোটা বিহার বিপ্লবের দাবানল জ্বলে উঠেছে। তাই তাকে প্রকাশ্যে ২৩ জুলাই ফাঁসী দেয়ার ব্যবস্থা করা হল। জনতার মধ্যে বীর বিপ্লবী ধীরে স্বীর ভাবে ইংরেজ কর্তাদের বলেন—ওহে বেঈমান ইংরেজ শোষকেরা, তোমরা আমার ফাঁসী দিতে পার কিন্তু আমার মত হাজার হাজার পীর আলী আরও তৈরী আছে যারা আমার পরে আমার জায়গায় দাঁড়িয়ে তোমাদের শায়েস্তা করবে।” পীর আলী আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন হয়ত। কিন্তু পরক্ষণেই তার ফাঁসীর হুকুম দেয়া হয়। হাসি মুখে ফাঁসী কাঠে মৃত্যু বরণ করে অমর বিপ্লবী হাজার হাজার ভারতবাসীর সামনে এক অক্ষয় আদর্শ স্থাপন করে গেলেন। এ দৃশ্য বিপ্লবীদের বা বিদ্রোহের প্রতীকিত চলল।

দানাপুরে ২৪ জুলাই পীর আলীর মৃত্যু দণ্ডের কথা এসে পৌঁছাতেই দানাপুরের সেনানিবাসের ভারতীয় মুসলমান ও হিন্দু সৈন্য উত্তেজিত হয়ে ইংরেজের উপর তীব্র আক্রমণ করার জন্য রাওরই শাহাবাদ জেলার আরাতে গিয়ে পৌঁছালেন। সেখানে কুমার সিংহ নামে এক বৃদ্ধ বিপ্লবীদের দলে যোগ দিলেন। তিনিও একজন রাজা বা জমিদার ছিলেন। সারা জীবন তিনি ইংরেজদের তোষণ পোষণ করেই আসছিলেন। ইংরেজদের তিনি বন্ধুই মনে করতেন। কিন্তু ইংরেজ সরকার কুমার সিংহকে ছলে বলে করে কৌশলে তাকে এমন ফাঁদে ফেলেছেন তাকে জমিদারী থেকে বঞ্চিত করা হবে। সে বাজারে কুড়ি লাখ টাকা সংগ্রহ করতে পারলেন না। তবে মাত্র আর কয়েকদিন সময় দিলেই তিনি তা পরিশোধ করতে ইচ্ছা

করেছিলেন। কিন্তু তাকে সে সময় না দিয়ে বরং জমিদারী থেকে বঞ্চিত করা হয়। তখন শোকে দুঃখে ইংরেজের বিশ্বাসঘাতকতায় তিনি সীমাতিরিক্ত বিদ্রোহী থেকে চাইলেন। সে সময়ে তার পুত্রের মৃত্যু হয়। তাই তিনিও মরবার জন্য প্রস্তুত হলেন। ঠিক সে সময়ে চলছিল সাতানুর বিপ্লব। তাই তিনি একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা এটাই যে, ঠিক এ সময়ে রাজা নানা সাহেবের পত্র এসে তার উৎসাহকে আরও বৃদ্ধি করে। তাই এখানে নানার পত্র আর আজিমুল্লার সংগঠন ক্ষমতা স্বরণ রাখার মত ঐতিহাসিক সত্তার। কুমার সিংহ ছিলেন রাণা প্রতাপ সিংহের বংশধর।

৩০ শে জুলাই মিঃ ভিনসেন্ট আয়ার একদল ইংরেজ ও শিখ সৈন্য নিয়ে দানাপুরে আসেন। বিদ্রোহীদের হাতে বন্দুক, বর্শা বা তরবারী, শাসকদের হাতে বড় বড় কামান। তাই ২রা আগষ্ট তুমুল যুদ্ধে কুমার সিংহ ও বিপ্লবীদের দল ইংরেজদের সাথে যুদ্ধে পরাজিত হন। ইংরেজরা মুসলমানদের আগে থেকেই জানে যে মুসলমান জাতি সারা ভারতে তাদের শত্রুতা করেছে। অতএব তারা তাদের চিরশত্রু কিন্তু যে কুমার সিং চিরদিন তাদের সাথে এ দহরম মহরম রেখে এল সে এত বড় বেঈমান বা বিশ্বাসঘাতক হয়ে বিদ্রোহী দলে কেন যোগ দিয়েছে অতএব তাকে উচিত শিক্ষা দেয়ার দরকার।

জগদীশপুরে কুমার সিংহের বাড়ী ও তাঁর ভাই দয়াল সিংহ এবং অমর সিংহের বাড়ী আক্রমণ করা হয়। আর নানা সাহেবের মত আগে থেকেই মেয়ে ছেলে সরিয়ে ফেলেছিলেন। ইংরেজরা রাজপুতদের প্রতিষ্ঠিত ঠাকুর বাড়ী পর্যন্ত ধ্বংস করেছিল। এ প্রসঙ্গে একটা উদ্ধৃতি খুবই প্রণিধানযোগ্য—“পবিত্র দেবালয়ও ইংরেজদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেল না। কুমার সিংহ বহু অর্থ ব্যয়ে একটি দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, ইংরেজ সেনাপতি তা বিনষ্ট করে ফেললেন। প্রতিষ্ঠিত দেবমূর্তির সাথে মন্দিরটি ধ্বংস হওয়াতে বৃদ্ধ রাজপুতের প্রাণে মর্মান্তিক আঘাত পেয়েছিল।” (দ্রঃ সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস, পৃঃ ২৯১)। যুদ্ধ করতে গিয়ে কুমার সিংহের একটি হাত নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। জগদীশপুরের যুদ্ধে মিঃ লেখাও ও বিপ্লবীদের প্রচণ্ড আক্রমণে নিহত হলেন। উভয়পক্ষের অনেক হতাহত হয়। কুমার সিংহ আহত হয়ে আর সেরে উঠলেন না। চির নিদ্রায় নিদ্রিত হলেন। তাঁর মৃত্যু ভারতের নর-নারীর কাছে এক ঐতিহাসিক সামগ্রী।

অবশ্য ইতিহাসে কুমার সিংহের নাম স্থান পেয়েছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আরও যাদের অনেক বেশী ঐতিহাসিক অবদান যেমন মাওলানা শাহ মুহাম্মদ হোসেন, মাওলানা আহমাদুল্লাহ, ওয়াজহুল হক এবং পীর আলীর কথা সহজ সাধারণ ইতিহাসে ঠাই পায়নি। তার বড় কারণ কি জানি না তবে অনেকে অনুমান করেন ভারতের জন্য এ সমস্ত প্রাণদাতা শহীদদের বড় অপরাধ ছিল তাঁরা মুসলমান।

একটি নম্র মেজাজের মওলুবী সাহেব পলাতক বিদ্রোহীদের মধ্যে অন্যতম। তিনিও অনেকের মত বেগম কুটিতে বাস করছিলেন। তিনি নামায পড়তেন আর প্রার্থনায় প্রায় কাঁদতেন। লোকে প্রশ্ন করলে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, আমি একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী কিন্তু এখন আল্লাহর কাছে চাই দিল্লীর বুকে সম্রাটের বাচ্চাদের হত্যাকারী হডসনকে যেন আমি আমার বন্দুকে গুলি করতে পারি।

১০ই মার্চ যেদিন পিশাচ মিঃ হডসন বেগমকুটি আক্রমণ করেন তখন এ মাওলানা সাহেব হডসনের মস্তক লক্ষল করে গুলি করলেন। হডসন মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। এ মৌলুবী সাহেবের নাম সঠিকভাবে রিপোর্ট না পাবার জন্য এখানে জানানো সম্ভব হলনা। কালমার্কস, মিঃ হান্টার প্রভৃতি খ্রিস্টানের পুস্তকেও অনেক মাওলানার নামের ইঙ্গিতও উল্লেখ

আছে। কিন্তু তাঁদের প্রত্যেকের পিছনে পিছনে এতবড় স্বর্ণোজ্জ্বল ঐতিহাসিক উপাদান আছে যার দ্বারা পৃথক পৃথক পুস্তক হওয়া সম্ভব। সে বিষয়ে আজকের এবং আগামী কালের অনুসন্ধিৎসু লেখক লেখিকার প্রতি দায়িত্ব নেয়ার প্রতি আশরা রাখি এমন মাওলানা আহমাদুল্লাহ। সাতান্নর বিপ্লবে তাঁর নেতৃত্ব এক প্রাণবন্ত ভূমিকা। যার কাটা মাথার জন্য সহস্র সহস্র টাকা ঘোষণা করা হয়েছিল। মুসলমানদের এক প্রতিদ্বন্দ্বী এক ইংরেজের লেখার দু-একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি। “ইংরেজের ক্ষমতা নাশে তিনি তেমনি বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। ধর্মের নামে তিনি উত্তেজিত সিপাহীদের আরও উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। মুসলমানগণ তাঁর উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা শুনিয়া স্বধর্ম রক্ষার জন্য আত্মোৎসর্গে কাতর হন নাই। কথিত আছে তাঁর হাতে একটি কোড়ামাত্র থাকিত। তিনি যুদ্ধস্থলে এই কোড়া হস্তে করিয়া সিপাহীদিগকে উত্তেজিত করিয়া তুলিতেন।” (দ্রঃ My Diary in India, by Russell)

এ মৌলবীর সাথে মিলে ছিলেন লক্ষর শাহ নামে এক ফকীর। এ দুজনের উত্তেজনায় বিদ্রোহীরা সাহস ও বল দুটিই পেয়েছিল। ইংরেজ সৈন্য ২১শে মার্চ মৌলবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করে। তিনি তখন সাদতগঞ্জে প্রতিপক্ষের সামনে মৌলবী সাহেব এমন দৃঢ়তা ও সাহস প্রদর্শন করেন যে সেনানায়ক লুগার্ড তাতে অতিমাত্রায় বিস্মিত হন। ইংরেজের প্রচণ্ড আক্রমণের ফলে তার দলের অনেক গুলি সৈন্য নিহত ও অনেক গুলি গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত হয়। অবশেষে মৌলবীর দল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ইংরেজ সৈন্য এদের পিছু তাড়া করে। মৌলবী স্বয়ং অক্ষত শরীরে প্রস্থান করেন। বহু সৈন্য নিয়ে তাঁকে অনুসরণ করলেন প্রধান সেনাপতি (ইংরেজ)। মোহমদীর দুর্গ ধ্বংস করে মৌলবী আবার এলেন শাহজাহানপুরে। সমগ্র নগর মৌলবীর পদানত হল। তারপর ১৮টি কামান যথাস্থানে সন্নিবেশিত করে ওরা থেকে ১১ই মে পর্যন্ত তিনি প্রতিপক্ষের দিকে তীব্রভাবে গোলা বৃষ্টি করতে থাকেন। শাহজাহানপুরের ইংরেজ সৈন্যের অধিনায়ক তখন জেলখানায় আত্মরক্ষা করছেন। সংবাদ পেয়ে অবরুদ্ধ সেনানায়কের সাহায্যের জন্য সৈন্য পাঠালেন প্রধান সেনাপতি। তবু মৌলবীর পরাজয় সুসাদ্য হল না। অশ্বারোহী সৈন্যে তিনি অধিক বল সম্পন্ন ছিলেন। পানাহাটের রণক্ষেত্রে কোন পক্ষেরই জয় পরাজয় স্থির হল না। অবশেষে জুন মাসের প্রথম ভাগে পোয়াইনের রাজা জগন্নাথ সিংহের ভায়ের বিশ্বাসঘাতকতার করে ইংরেজের মহাত্মা এ মৌলবীর মৃত্যু হয়। গভর্ণমেন্ট সে সময়ে এ বিদ্রোহীর মাথার দাম ধার্য করেছিলেন পঞ্চাশ হাজার টাকা। বিশ্বাসঘাতক রাজা মৌলবীর ছিন্ন মস্তকের বিনিময়ে শাহজাহানপুরের ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে এ পুরস্কার লাভ করেছিলেন। ফৈজাবাদের মৌলবী আহমদউল্লাহর মৃত্যু হল।” তাঁর বীরত্ব ও স্বদেশ প্রেমের প্রশংসা ইতিহাসে পূর্ণমাত্রায় অথবা অর্ধমাত্রায় তো দূরের কথা একেবারে নেই বললেও অত্যুক্তি হবে না।

ভারতের উত্তর প্রদেশে রোহিলা খণ্ড বলে এক জায়গা আছে যার মধ্যে একটি বড় শহরের নাম হচ্ছে বেরেলী। ইংরেজরা যখন রোহিলা খণ্ড দখল করে তখন মুসলমান পাঠানদের পুরষদের উপরই শুধু আত্যাচার করেনি নারীদের উপরও হস্তক্ষেপ করেছিল। তাই আজ কোনদিন সে কথা পাঠানরা ভোলেনি। হাফেয রহমত সাহেবের নেতৃত্বে একবার রোহিলা খণ্ড মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চেয়েছিল কিন্তু ইংরেজদের শোষণ আর পোষণের ষাঁড়াশীতে ১৭৭৪ খ্রিষ্টাব্দের কাতার যুদ্ধে বিপ্লবী হাফেজ রহমতকে শহীদ থেকে হয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে কর বৃদ্ধির প্রতিবাদে আর একবার রোহিলারা বিদ্রোহী হয়ে বিপ্লব সৃষ্টি করে। কিন্তু ইংরেজদের নিষ্ঠুর অত্যাচার ঐ অভ্যুত্থানকে দমন করতে সক্ষম হয়।

আবার ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের ৩১শে রবিবার সে শহীদ হাফেয রহমতের বংশধর খাঁ বাহাদুর খাঁ নামক নেতার নেতৃত্বে সারা দেশকে কঠিন একতার বন্ধনে বেঁধে শুধু বিদ্রোহী করা হয়নি বরং ইংরেজ রাজত্বকে অস্বীকার করে নিজেদের শাসনতন্ত্র চালু করা হয়। রোহিলায় যদিও সব মুসলমান তবুও সেখানের ব্যবসায়ী সম্প্রদায় মোটামুটি হিন্দু। তাই তাঁরা সংখ্যায় অল্প হলেও প্রভাবশালী ছিলেন। এ রহিলার মুসলমান ও হিন্দু সকলের নির্বাচিত ও সমর্থিত নূতন শাসনকর্তা ঘোষিত হলেন খাঁ বাহাদুর খাঁ। খাঁ সাহেবের নির্দেশে ইংরেজদের বাংলাগুলোতে আশুন ধরানো হল। কোন ইংরেজকে দেখামাত্র গুলি করে হত্যা করার পর্ব রীতিমত শুরু হয়ে গেল। সরকার অবাধ হয়ে যায় রোহিলাদের পূর্ব পরিকল্পনার ব্যবস্থাপনা দেখে। খাঁ সাহেব প্রচুর সংখ্যক বন্দী ইংরেজের বিচার করে ফাঁসী দেন। মনে হল ছয় ঘণ্টার মধ্যেই ইংরেজ শাসন বিলুপ্ত হয়ে ভারতীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। ‘মুসলমানী পতাকা উড়িয়ে’ আল্লাহ্ আকবার শব্দে প্রকাশ্যে বখ্ত খাঁকে বিদ্রোহীরা সমস্ত সৈন্যের নায়ক নির্ধারণ করেন। এবার দিল্লীর বাহাদুর শাহকে পত্র লিখে জানালেন তিনি স্বাধীন হয়েছেন।

রোহিলা খণ্ডের সহিত মোরাদাবাদ, শাহজানপুর বাদায়ুন প্রভৃতি স্থানেও বিপ্লবের আশুন জ্বলে উঠল। মোরাদাবাদ শহরের জর্জ ছিলেন মিঃ উইলসন। তাঁকে বিশেষ ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল। সিভিলিয়ান মিঃ উইলসন জনসাধারণকে বিদ্রোহের বিপক্ষে খুব বোঝাতে চেষ্টা করলেন কিন্তু একজন মুসলমান প্রাক্তন মুনসেফ সারা মোরাদাবাদে প্রবলভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। তাঁর ভাব ভাষাও ভীষণ জনসাধারণকে উত্তেজিত করে তোলে। মুসলমান ও ইংরেজ প্রভাবের লড়ায়ে উইলসন পরাজিত হলেন। বাইরে থেকে একটি গুপ্ত বিদ্রোহীদল আনিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে তিনি স্থানীয়দের ডাকলেন। তখন বাইরের ও ভিতরের দুই দল এক হয়ে ইংরেজের শক্ত শক্তিকে প্রকম্পিত করে তোলে। এ বিখ্যাত নেতার নাম নিজামাত উল্লাহ সাহেব। তিনিও বিখ্যাত বীর ও বক্তা ছিলেন। জেলখানার সমস্ত কয়েদীদেরকে মুক্ত করে দিয়ে তাদেরও ইংরেজ বিরোধী কাজে লাগিয়ে ছিলেন। তখন মওলুবী বা ফকীর দলের যে পরিমাণ ত্যাগ বা অবদান ছিল তা আজ ইতিহাসের পাতায় উপেক্ষিত। তাই শহীদ হাফেয রহমত খাঁ, বাহাদুর খাঁ, নিজামাতউল্লাহ প্রভৃতি প্রতিভা যারা আজ যুগে যুগে জীবন্ত হয়ে থাকার কথা তাঁদের আজ ইতিহাসের মানুষ বলে মনে হয় না, মনে হয় যেন কিংবদন্তী বা কল্পনামাত্র। এমনভাবে রাশিয়ার ঐতিহাসিকদের ইতিহাসে বিশেষতঃ মিঃ কার্ল মার্কস এর এখাতেও যাদের নাম বাদ দেয়া সম্ভব হয়নি তাঁদের সম্বন্ধেও আমরা আমাদের স্বদেশের ইতিহাসে কোন সন্ধান পাইনি। উদাহরণ স্বরূপ মিঃ মার্কস এর লেখা থেকে কিঞ্চিৎ মাত্র উদ্ধৃতি দেয়া হল—“মা মুখা ১৮৫৭-৫৯ সালের জাতীয় মুক্তি অভ্যুত্থানের সময় লক্ষ্মী এলাকায় অযোধ্যা বিদ্রোহীদের দলপতি।” মৌলভী আহমদ শাহ (১৮৫৮) ভারতীয় ১৮৫৭-৫৯ সালের জাতীয় মুক্তি অভ্যুত্থানের একজন বিশিষ্ট নেতা, জনস্বার্থের প্রবক্তা, অযোধ্যা বিদ্রোহে নেতৃত্ব করেন; লক্ষ্মী রক্ষায় কেনিষ্ঠ বীরের মত দাঁড়ান, বিশ্বাসঘাতকতার ফলে নিহত হন ১৮৫৮ সালের জুনে।”

(দ্রঃ কার্ল মার্কস ফ্রেডারিক এঙ্গেলস প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ ১৮৫৭-১৮৫৯, পৃষ্ঠা ২৫৬)

বেরিলীর ত্রিশ মাইল দূরে বদায়ুনের ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর এডওয়ার্ডস সাহেব সংবাদ পেলেন “২৫শে মে কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে মুসলমানেরা গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধাচরণে উদ্যত হবে।” (সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস, পৃঃ ৩০৩ দ্রঃ)। সংবাদ জানাজানি সত্ত্বেও ইংরেজরা রোধ করতে পারেনি সে বিপ্লবের আকস্মিক আগ্নেয়গিরিকে। ইংরেজরা যেমন শিখ জাতিকে কলাকৌশল ও লোভ দেখিয়ে স্বপক্ষে টেনে নিতে সক্ষম হয়েছিল তেমনি হিন্দু

জনসাধারণকেও বহু লোক মারফত এবং নিজেরা তাদের বাড়ীতে গিয়ে বা কাউকে ডেকে এনে বুঝিয়ে প্রলোভন প্রদর্শন করে নিজ পক্ষ টানতে চাইলেন। ফলে হিন্দুরা দোটাচা চিন্তায় পড়লেন। ঠিক সে সময় খাঁ বাহাদুর খাঁ ইংরেজ ফিরিস্দিদের বিরুদ্ধে একটি লিখিত বিজ্ঞাপন প্রচার করেন। সেটি ছিল এই রকম—“ফিরিস্দিরা যদি তোমাদিগকে পুরস্কার দিবার লোভ দেখাইয়া তাহাদিগের মতের পোষকতা করিতে অনুরোধ করে, তাহাতে তোমরা বিশ্বাস করিও না। ফিরিস্দিরা অঙ্গীকার পালন করিতে জানে না। তাহারা বিদেশী, তাহারা প্রতারক, তাহারা বিশ্বাসঘাতক। তাহাদের পরামর্শ শুনিলে তোমাদের নিজেরই অনিষ্ট হইবে।” (দ্রঃ সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস, পৃঃ ৩০৫)। এ ইস্তাহার প্রচারিত হবার পরই হিন্দু জনতা ইংরেজ পক্ষ অবলম্বন করা থেকে বিরত হয়। এবার বিপ্লবীরা মারাত্মকভাবে ইংরেজদের আক্রমণ করেন এবং জেলখানা ভেঙ্গে বন্দীদের মুক্তি দেন, ড্রেজারী দখল করেন। বিদ্রোহীরা এবং ইংরেজ ও শিখ সৈন্যের গুলিতে অনেকে প্রাণ ত্যাগ করলেন।

এমনিভাবে ফরাসীরাও ভারতের বিপ্লবীদের শহীদ হবার সংবাদ এসে পৌছাল। একজন বিখ্যাত নেতার নেতৃত্বে সারা অঞ্চল উত্তেজিত হয়ে উঠল। তাদের কিছু করবার আগেই ইংরেজরা রাত্রির অন্ধকার থাকতে থাকতেই বহু ভারতীয় মানুষকে নিহত করে নৌকা যোগে দুজন কর্নেল ও একজন মেজরের তত্ত্বাবধানে পলায়নের ব্যবস্থা করে। তখন ভাগরথী নদীতে বান ছিল। হঠাৎ একটি নৌকা বিকল হয়ে যায়। ইংরেজরা তখন বুঝল তাদের ভাগ্যই এখন বক্র। তাই এ নৌকার আরোহীরা অন্য নৌকায় চড়ে ক্ষিপ্ত গতিতে নৌকা চালনা করা হল। কিন্তু বিপ্লবী নেতার নেতৃত্বে ভুল হয়নি। একদল বন্দুকধারী বিপ্লবী নদীর ধারে নৌকার পাশে এসে হাজির। সাহেবরা তাড়াতাড়ি নৌকা নদীর মাঝে দিয়ে চালাবার চেষ্টা করল কিন্তু বিপ্লবীদের তিনশত বন্দুক বারুদের আঘাত হানল বজ্রাঘাতের মত। দলে দলে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে কেউ বা নৌকার উপরই প্রাণ ত্যাগ করে এবং কিছু বন্দী থেকে বাধ্য হয়। বন্দীদেরও পরে প্রাণদণ্ড দেয়া হয়।

এ বিদ্রোহের নায়ক আজ আমাদের কাছে এক অজানা মানুষ হলেও প্রকৃত ইতিহাসের পাতায় তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে ও থাকবে চিরকাল ধরে। তিনি হচ্ছেন অধিনায়ক সুলতান খাঁ। সুলতান খাঁ ফরাসীদের আর একজন বিচক্ষণ বিপ্লবী ব্যক্তি তাহফজুল হোসেনকে ফরাসীর নবাব নির্ধারণ করেন।

(দ্রঃ A History of the Sepoy war, by Kaye)

প্রধান, প্রধানতর আর প্রধানতম গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি সম্বন্ধে এখনো তথ্য প্রকাশ করতে বাকী রয়েছে। স্থানগুলো যথাক্রমে আশা, দিল্লী আর ভারতের রাজধানী কলকাতা। ১৫ই মে সকাল বেলায় মিঃ বলভিন সমস্ত সৈন্যদের এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে রক্তা দিলেন আর ইংরেজ সৈন্যদের বলেন, যেখানে যাইহোক আশ্রয় তা হবেনা কারণ আমরা ভারতীয় মুসলমান হিন্দু ও শিখ সৈন্যদের ভালবাসি আর সমস্ত সৈন্যও আমাদের উপর ভরসা রাখে। কলভিনের বক্তৃতায় ভারতীয় সৈন্যরা কলভিনের দিকে মেনভাবে অগ্নিবর্ষক ভঙ্গিতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল যাতে কলভিনের বুঝতে বাকী রইল না যে, বিস্ফোরণে বিলম্ব নেই। পরক্ষণেই কলভিনের ইস্তিতে ইংরেজ নরনারী দলে দলে দিল্লীর দিকে ছুটল।

২রা জুলাই নিমচ থেকে বিদ্রোহী দল ফতেপুর সিক্রিতে উপস্থিত হল। তাদের বাধা দেয়ার জন্য কয়েকজন ইংরেজ ফকিসারের সাথে ভারতীয় সৈন্য পাঠানো হল। সৈন্যরা হঠাৎ অফিসারদের গুলি করে বিদ্রোহী দলে যোগ দিয়ে নিজেদের আসল রূপ ধারণ করেন। এ সংবাদে মিঃ কলভিন স্বয়ং দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। ইংরেজরা ভয়ে ভীত হয়ে ভাবতে

লাগল সারা দেশ ভরতপুরের হিন্দু রাজা তিনশত অশ্বারোহী কয়েকটি কামান এবং আরও কিছু সমরোপকরণ নিয়ে ইংরেজের পক্ষে যোগ দিলেন। শাহগঞ্জে যুদ্ধ হল। সামান্যসামান্যভাবে এক দিকে আঘাতী আন্দোলনের বিপ্লবী দল আর এক দিকে ইংরেজ শিখ, আর হিন্দু রাজার সশস্ত্র সৈন্য। যুদ্ধে বিদ্রোহী দল অসীম বিক্রমে যুদ্ধ করে অনেক আহত নিহত হবার পর জয়লাভ করলেন। ইংরেজরাও বহু আহত নিহত হয়ে দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে। অতপর বিদ্রোহীরা দিল্লীর দিকে প্রস্থান করে। “এ সময় মতি মসজিদকে ইংরেজরা সেদিন হাসপাতালে পরিণত করেছিল।” (দ্রঃ সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস, মনিবাগচি, পৃঃ ৩১১)

বিপ্লবীরা আশ্রয় চলে গেলেও ইংরেজদের আতঙ্ক কমেনি। মুসলমান অনেকের সে সময় কাল পোশাক পরার প্রচলন ছিল। আর এ কাল পোশাক দেখলেই ইংরেজের হৃদয় ভয়ে শুকিয়ে যেত। উদ্ধৃতিতে দেখা যায়, “মুসলমানদের কাল রঙের পোশাক পরিচ্ছদ দেখলেই ইংরেজদের ভয় করত। বিদ্রোহের সময় কাল রঙের পরিচ্ছদ ইংরেজদের মনে বিভীষণ জাগিয়ে তুলেছিল।” (দ্রঃ ঐ পুস্তক, ৩১১)

কলকাতার মিঃ ক্যানিং এ পরাজয়ের সংবাদ পেয়ে বিগ্রেডিয়ার পলজোয়েলকে পদচ্যুত করে তাঁর জায়গায় কর্ণেল কটনকে নিয়োগ করার ব্যবস্থা করলেন।

মোঘল আমল থেকে দিল্লী ভারতের রাজধানী ছিল। যদিও এখন কলকাতার গুরুত্ব বেশী তবুও দিল্লীর পুরাতন ঐতিহ্য ঐতিহাসিক আকর্ষণীয় সন্দেহ নেই। তাই সেনাপতি উইলসন দিল্লী উদ্ধারে উদ্যমী হইলেন। কিন্তু বিপ্লবীদের সাথে সরকারী সৈন্যদের অবিরাম যুদ্ধের ফলে ইংরেজ সৈন্য ও শিখ সৈন্য সংখ্যায় খুবই কম হয়ে গেছে আর গোলাগুলি রসদ প্রায় শেষ থেকে চলেছে। তার চেয়েও বড় জিনিস মনোবল ভেঙ্গে গেছে। শুধু ক্ষীণ আশা হিন্দু রাজা মহারাজা, রাজপুত, মারাঠা প্রভৃতি ভারতবাসীরা যদি সকলেই শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহী না হয়ে ইংরেজের পক্ষে যোগ দেন তাহলে হয়ত আবার শোষণ সরকারের মনের কোণের ক্ষীণ কল্পনা বাস্তবায়িত থেকে পারে। দিল্লীতে পাঁচজন সেনানায়ক উপস্থিত আছেন মিঃ চেম্বারলেন, মিঃ নিকলসন, উইলসন, আলেকজান্ডার, টেলর, ও মিঃ রেয়ার্ড স্মিথ।

চল্লিশটি বলদে টানতে পারে এরকম দারুণ ভারী ভারী কামান, গোলা, বারুদ, সৈন্য নিয়ে রাত্রির অন্ধকারে দিল্লীকে সজ্জিত করা হল। ১৩ই সেপ্টেম্বর ইংরেজরা গুরু করল কামান থেকে মুঘলধারে গোলা বর্ষণ। চারিদিকে আগুনের হালকা সাদা কালো ধূঁয়ার বক্রশিখা আর বজ্র বর্ষণের মত শব্দেও বিপ্লবীরা সব যেন চুপচাপ। ১৪ই সেপ্টেম্বর ইংরেজরা প্রস্তুত হয়ে নিল। সকাল বেলায় ইংরেজ সৈন্যের বিপুল সমাবেশ দেখা গেল। তিনি জাতীয় সৈন্য ইংরেজ আর শাসকপ্রিয় শিখ আর গুর্খা সৈন্য। নিকলসন একদল সৈন্য নিয়ে কাশ্মীর গেট দখল করলেন তারপর আর একদল সৈন্য দিল্লীর কাবুল গেট দখল করলেন।

বিদ্রোহী সৈন্য ও বিপ্লবীদের নেতা ক্যান্টন বখত খাঁ ঠিক প্রতিক্রীত সময়ে গোলাবর্ষণ করলেন তাঁর পূর্ব পরিকল্পিত ব্যবস্থার। বিপ্লবীদের স্ত্রীরা ছাদে তুলে রাখা ইট ও পাথর বর্ষণ শুরু করলেন। ইংরেজ শিখ ও গুর্খা সৈন্যরা আকস্মিক আক্রমণে আহত আর নিহত হয়েছিল হাজারে হাজার। পাঁচজন নেতার দুজন রেয়ার্ড স্মিথ ও চেম্বারলেন আহত হলেন। আর সত্তর জন বড় বড় অফিসারকে প্রাণ হারাতে হল সে আক্রমণে। ছ’দিন ধরে যুদ্ধ চলল। ইংরেজরা হটাতে পারল না ভারতীয় বীরদের। মাঝে মাঝে দীন ইসলাম জিন্দাবাদ, আল্লাহ্ আকবর শব্দে দিল্লী থরথর করে কাঁপতে লাগল।

মুসলমান নেতাদের অনেকের নামায পড়ার অবসর নেই শুধু যুদ্ধ আর যুদ্ধ। তাই এ রকম কর্মব্যস্ত নেতাদের মাথায় একটা মতলব এল যদি প্রত্যেক দোকানে দামী দামী কড়া

মদের সুদৃশ্য বোতল রাখা যায় তাহলে সৈন্যরা লুটপাট করবার সময় এ মদ পান করবে আর নেশা অবস্থায় তাদের শিশু ঠেঙ্গানোরমত শায়েস্তা করা যেতে পারে। অনেকে আপত্তি করলেও তখন কিছুটা শৃঙ্খলার অভাব পরিলক্ষিত হয়। এখানে বড় রকমের আরও দুটি ভুল হয়েছিল, প্রথমতঃ নিজেদের মধ্যে একতাবদ্ধ না হওয়া, দ্বিতীয়তঃ মুসলমানদের মদ খাওয়াও যেমন অপরাধ অপরকে মদ খাওয়ানোও তেমনি অপরাধ। অথচ মদ খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা। যাইহোক, ১৫ই সেপ্টেম্বরের যুদ্ধে ইংরেজ যথাযথ ভাবে দোকান লুট করতে গিয়ে মদের মনোলোভা বোতল গ্রহণ করে এবং পান করে নেশাগ্রস্ত হয়ে সেনাপতিদের আদেশ যথাযথভাবে পালন করতে অবহেলা করে। অনেক আরও অপঘটন ঘটায়। ফলে ১৬ই তারিখে ইংরেজ সৈন্যদের জন্য নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত একেবারে মদ পান নিষিদ্ধ করা হয় এবং ছোট বড় সমস্ত সৈন্যদের সংরক্ষিত মদ রাজপথে ঢেলে দেয়া হয়। এটা যেন অনেকটা ইসলামি পদক্ষেপের মত।

এবার ইংরেজ সৈন্য ঠাণ্ডা মাথায় সূচিভিত্তি পদক্ষেপে ১৮ তারিখে প্রবলভাবে আক্রমণ চালান লাহোর গेट দখল করবার অভিপ্রায়ে কিন্তু পারল না। অবশেষে ২০ তারিখে ইংরেজ, শিখ, গুরখা ও রাজা মহারাজাদের প্রেরিত সাহায্যে লাহোর গेट, আজ মীড় গेट, জুমআ মসজিদ ইংরেজরা দখল করে। ক্রমে ভারতের শেষ সম্রাট বাহাদুর শাহের রাজ প্রাসাদেও ইংরেজদের পতাকা উঠানো সম্ভব হয়। যদিও ইংরেজদের হাতে রাজশক্তি তবুও চার মাস ধরে বহু লোক ক্ষয় আর অর্থ ব্যয়ে দিল্লীর রাজপ্রাসাদ ভারতের ইংরেজ প্রিয় বিশ্বাসঘাতকদের বিশ্বাসঘাতকতায় দখলে আসে। আজ তারা আনন্দে আত্মহারা। এখনো তাদের আশা যতদিন ভারতে রাজা মহারাজা, শিখ, গুরখা রাজপুত্রা তাদের দলে থাকবে ততদিন তারা শোষণ চালাতে পারবে। তাই দেওয়ানি খাসে চলল মদপানের আনন্দোচ্ছ্বাস। তখনো খাঁটি ঈমানদার মুসলমান বিপ্লবী অনেক প্রহরী বন্দুক নিয়ে তাদের নির্দিষ্ট স্থানে প্রহরায় নিযুক্ত।

দিল্লীর বিপ্লবীদের বীর নেতা বখত খাঁ বুঝতে পারলেন পলায়নই এখন একমাত্র পথ। অবশ্য সর্ব ভারতীয় সর্বজন নির্ধারিত সম্রাট বাহাদুর শাহকে দিল্লী থেকে সরিয়ে নিয়ে কোন গোপন ঘাঁটি থেকে তিনি পূর্ণোদ্যমে বিপ্লব পরিচালনা করবেন। তাই গভীর রাত্রে তিনি বাহাদুর শাহকে তাঁর প্রস্তাব পেশ করতেই তিনি বলেন, “আমার প্রাণ প্রিয় বিপ্লবীরা লাখে লাখে ঝাঁকে ঝাঁকে মারা গেল আর আমাকে এখন বেঁচে থাকা কি শোভা পায়? তাছাড়া বাইরে গিয়ে পরিশ্রম করবার দৈহিক শক্তি আমার নেই, আমি বার্ষিক্যের জন্য অত্যন্ত দুর্বলতাবোধ করছি। অতএব তোমরা কেউ আমার দায়িত্ব পালন করতে সম্মত হলে আমার বাইরে যেতে আপত্তি নেই। বখত খাঁ বলেন, “আপনার বেঁচে থাকাতে ভারতের মাটিতে আপনার পরিবর্তে কারো পক্ষে সম্ভব নয় যে সম্রাট হয়ে নেতৃত্ব দেয়া।” সম্রাট আর উত্তর না দিয়ে চোখের অশ্রু মুছে বলেন, “নিজে নিজের মৃত্যু ঘটানো তো মুসলমানদের কল্যাণেই আসে না তবুও আমার মনে হয় আমার চলে যাওয়া মানে প্রাণের দায়ে পলায়ন। সেটা মনে চাইছে না বরং শহীদ হওয়াই ভাল। শোন বখত খাঁ,, আমাদের পরাজয় থেকে চলেছে কেন জানো তোমাদের বীরত্বের অভাব নেয় শুধু ভারতবাসীর বিশ্বাসঘাতকতা। এ শেষ সময়ে যদি অন্ততঃ আমার প্রিয় দেশবাসী হিন্দু রাজা মহারাজারা বিপ্লবীদের সাহায্য না করত তাহলে.....। আমি মরে গেলে আমার দুঃখ বড় থাকবে কি জান? সেটা হচ্ছে মাত্র কয়েক দিন আগেও আমি হিসেব করে দেখিছিলাম ওদের সৈন্য মরতে মরতে অনেক কমে গেছে কিন্তু উদয়পুরের রাজপুত্র রাজা, জয়পুরের রাজা, যোধপুরের রাজা যেভাবে সৈন্য অস্ত্র আর অর্থ দিয়ে সাহায্য করল তার শোক আমায় আহত করেছে। দেখ বখত খাঁ, আজমীর থেকে সৈন্য

আনবার জন্য যখন রাজপুতানায় সংবাদ যায় সে খবর পেয়ে আমি নির্দেশ দিলাম সেখান থেকে সৈন্য আনা মানেই রাজপুতানা বা আজমীর ইংরেজ শূন্য হওয়া। ঠিক এ সময়ে আজমীর তোমার আক্রমণ করলেই আমাদের হাতে এসে যেত। ইংরেজদের ভারত থেকে তাড়াবার জন্য অস্ত্র কামান অর্থও সামান্য। কিন্তু সৈন্য দিল্লীতে পাঠান হল বটে সাথে সাথে ভারতের বিশ্বাসঘাতক বিরাট সংখ্যক সৈন্য তাদের জায়গায় প্রহরীর মত দাঁড়াল। এ দুঃখ ভোলার নয়। এ মনে কর গোয়ালিয়রের রাজপুত্র রাজাকে কত সান্নিধ্যেরে পত্র পাঠালাম। আট হাজার সৈন্য আর ছাব্বিশটি বড় বড় কামানোর মালিক তিনি। আমার মত বৃদ্ধ নন, তেইশ বছরের যুবক। অথচ ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে সে সুসজ্জিত সৈন্য আর কামান গুলি আমার ভারতীয় হিন্দু মুসলমান প্রজাদের বিরুদ্ধে প্রবলভাবে প্রয়োগ করল। এ দুঃখ ভোলার নয়। ইন্দোরের রাজায় সমস্ত সৈন্য ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চাইলে তিনি তা নিষেধ করলেন। বোম্বাই এর গভর্ণর এফিফিন ষ্টোনের কাছ থেকে সাহায্য চাইলেন তাঁর ভারতীয় ভাইদের হত্যা করার জন্য। তিনি সাহায্য পেলেন এক হাজার বন্দুক, তিনশত পিস্তল আর লাখ লাখ টোটা তাই নিয়ে তিনি বিদ্রোহীদের মারালেন। এসব রিপোর্ট আমার কাছে রয়েছে। অথচ মহারাজা তুকাভীরাও যে সাহায্য পেলেন তা আসলে ইংরেজের সাহায্য নয় আমারই প্রিয় ভারতের রাজা হোলকারের পক্ষ থেকেই এসব সরঞ্জাম। আর মুর্খ শিখরা যদি নিরপেক্ষও থাকতো তাহলেও চলত কিন্তু নিজেরাও মরল বিপ্লবীদেরও মারল। তুমি যুদ্ধক্ষেত্রের সংবাদ রাখ আর আমি সারা ভারতের নানা সংবাদ পাই এবং অবাধ হই। রাজা জঙ্গবাহাদুর কি বিপুল পরিমাণে সৈন্য দিয়ে, অস্ত্র দিয়ে আর অর্থ দিয়ে সাহায্য করলেন যে দুঃখ বারে বারে আমায় আঘাত দেয়। আবার মাত্র সেদিন (১০ই মার্চ) তিন হাজার সৈন্য দিয়ে ইংরেজের হাতকে শক্ত করল।” বলতে বলতে বাহাদুর শাহ, দেশ প্রেমিক ভারত সম্রাট বাহাদুর শাহ অবোধ শিশুর মত কাঁদতে লাগলেন। তরপর কোন রকমে চোখ মুছে বলেন, “বখত খাঁ তুমি চলে যাও, তোমার মত লোকের বাঁচার প্রয়োজন আছে। আর আমার মৃত্যু হোক ইংরেজদের হাতে যেমন করে আমার প্রিয় প্রজা ‘মুসলিম গাইল মুসলিম’ শহীদ হয়েছে।” বাহাদুর শাহ মদ, মাংস, গীত, বাদ্য উন্মত্ত নৃত্যে কলুষিত পরাধীন পরিবেশ থেকে আশ্রয় গ্রহণ করলেন হুমায়ুনের সমাধি বাগানে।

এদিকে মিঃ হডসন রাজ প্রাসাদ অনেক খোঁজাখুঁজি করেও সম্রাটের সাক্ষাত পেলেন না। সারা ভারতের বিপ্লবীদের নেতা বাহাদুর শাহ তখন এলাহি বক্সের পরামর্শেই সম্রাট হুমায়ুনের সমাধি বাগানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইংরেজরা গুপ্তচর মারফত এ সংবাদ জানতে পেরে তাঁর বাড়ীতে পৌঁছাল এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, “আমি বলতে পারবো না সম্রাট কোথায়, অবশ্য আমি জানি।” ইংরেজরা ভয় দেখাল তবুও তিনি উত্তরে বলেন, “আমার শেষ শাস্তি যদি মৃত্যুদণ্ড হয় তাও নিতে রাজী কিন্তু সম্রাটকে হত্যা করার জন্য তোমাদের হাতে তুলে দিতে পারব না। শেষে বিরাট আর্থিক প্রলোভন প্রদর্শন করা হল। তাতেও তিনি বলেন, শুধু অর্থ নয় বরং পৃথিবীর বাদশাহীর পরিবর্তেও আমি এতে প্রস্তুত নই। মিঃ হডসনের কাছে সংবাদ পৌঁছালে তিনি বলেন, যদি তোমাদের পবিত্র কোরআন ছুঁয়ে শপথ করে বলি যে, বাদমার ক্ষতি করব না তাহলে বিশ্বাস করা চলবে কি না। তাতে এলাহি বখশ বলেন শুধু কোরআন নয় বাইবেল ছুঁয়েও শপথ করতে হবে। তাই হল। হডসন কোরআন ছুঁয়ে শপথ করলেন তারপরে একটি বাজে বই বাইবেল বলে ছলনা করে শপথ করার পর ইলাহী বখশ হডসনকে সম্রাটের সন্ধান বলে দিয়ে নিশ্চিত হলেন। ভাবলেন সম্রাটের বোধ হয় আর কোন ক্ষতির আশঙ্কা নেই। এলাহি বখশ যে সম্রাটের সংবাদ জানতেন এ খবর যিনি জানতেন তিনি বাহাদুর শাহের একজন কেরানী বা মুন্সী শ্রীরায় জীবন।

হডসন একটা পালকী নিয়ে তাতে সম্রাট আর সাম্রাজ্ঞী জিন্মত মহলকে চড়তে বলেন। সম্রাট আর সাম্রাজ্ঞী পালকীতে উঠলেন। সামনে পিছনে ইংরেজ সৈন্য বুক ফুলিয়ে চলেছে সকলের সামনে আছেন মিঃ হডসন। আর পিছনে গরুর গাড়ীতে দীনহীন দরিদ্রের মত সম্রাটের সন্তানদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তার আগে ইংরেজ সৈন্য সারা দিল্লীতে রক্তের স্রোত বইয়ে দিয়েছিল তার উল্লেখ ইতিহাসে নেই। তবুও দিল্লীর জনসাধারণ রাস্তার দুই ধারে সশস্ত্র দাঁড়িয়ে, চোখে অশ্রু। দিল্লীর সহস্র সহস্র নারী বোরকা পরে রাস্তায় সন্তানের বা পিতার মৃতদেহকে শেষ বিদায় দেয়ার মত কান্নার রোলে ভরিয়ে তুলল।

মিঃ হডসন বাহাদুর শাহ আর বেগমকে সৈন্যদের মাঝে রওনা করে দিয়ে একটু পিছিয়ে এলেন। তারপর শাহজাদা মির্জা খিজির, সুলতান মির্জা গোঘল ও মির্জা আবু বকরকে গরুর গাড়ী থেকে নামতে বলেন। শাহজাদারা নামতেই প্রকাশ্য রাজপথে তাঁদের দাঁড়া করানো হল তারপর হাতগুলি পিছন দিয়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে দেয়া হল। অতপর হডসন নিজে তাদের বকের সামনে বন্দুক উঠিয়ে ধরে বলেন, বিদ্রোহের মূলে তোমাদের বাবা আর তোমরা। সারা ভারতে আমাদের শেষ করার জন্য নেতৃত্ব দিয়েছে তোমরাই। তাই এই তোমাদের স্বাধীনতার পুরস্কার। তার পরেই শব্দ। পর পর প্রত্যেকের বুকে গুলি করে হডসন যে শব্দ সৃষ্টি করতেন তার চেয়েও এক মারাত্মক শব্দ গুরু হল মিলিত হিন্দু মুসলমান নর-নারীর কান্নারুলে। তারপর নিষ্ঠুর নরপিশাচ হডসন স্বাধীনতা আন্দোলনের সম্রাট বংশের শেষ প্রদীপগুলো নিভিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হননি তাঁদের মৃত দেহগুলো প্রকাশে টাঙ্গিয়ে দিলেন যাতে দিল্লীর লোক ভবিষ্যতে আর কখনও বিপ্লব না করে।

বাহাদুর শাহের একটি কাঠের পায়ের শয়ন খাট, একটি পুরাতন ময়লা মখমলের বিছানা, একটি ছিন্ন ময়লা বালিশ আর অসময়ে অর্ধাহারে রেখে ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দে ২৭শে জানুয়ারী বিচারের নামে প্রহসন পর্ব সমাধা হল। বিচারে জজদের রায় প্রকাশ হল চিরজীবন নির্বাসন দণ্ড দেয়া হল সে অস্বাস্থ্যকর রেপুনে। কারণ তিনি ছিলেন ভারতে বিপ্লবী ও বিদ্রোহীদের প্রধানতম নেতা। তাঁর স্ত্রীকেও সেখানে পাঠান হল। কিন্তু পরে তাঁদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল। ষাঁ-বাহাদুর ষাঁও বন্দী ছিলেন। তাঁরও বিচার হল। বিচার হল ফাঁসি। সবই যেন মনে হচ্ছে নতুন কথা। কল্পলোকের গল্পের মত।

চুরাশি বছরের বৃদ্ধ বাহাদুর শাহের স্বর্ণোজ্জ্বল ইতিহাসকে গোপন করে রাখা হয়েছে আর তাঁর মৃত্যুর জন্য বিশ্বাসঘাতক বলে বর্ণনা করা হয়েছে ইলাহী বংশ প্রভৃতি কয়েকজন মুসলমানকে। এও ইংরেজের এক সুকঠিন ষড়যন্ত্র। সমস্ত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে যাবে, ইলাহী বংশের বিরুদ্ধে পাঠকের কোন অভিযোগ থাকবে না যদি মনে রাখা হয় যে ইলাহী বংশ ছিলেন জিন্মত মহলের পিতা অর্থাৎ সম্রাট বাহাদুর শাহের স্বপুত্র।

সপ্তদশ অধ্যায়

ঐতিহাসিক নেতাদের গুপ্ত ঐতিহাসিক রহস্য

তাহলে ভারতের বিভিন্ন স্থানের বিপ্লবের মোটামুটি তথ্য জানা গেল কিন্তু ভারতের রাজধানী, প্রাণকেন্দ্র কলকাতা তথা বঙ্গদেশের বিপ্লবের কথা জানবার কন্যাই পাঠকমাত্রই উদ্বিগ্ন হয়ে প্রতীক্ষায় আছেন। বঙ্গের বিষয়ে বলতে গিয়ে বলতে হয় যে চতুর ইংরেজ নিজের রপ্তা মাফিক নাগরিক তৈরী করতে কিছু স্কল, কলেজ ও ইউনিভার্সিটির জন্ম দেয় আর সুদক্ষ বিচক্ষণ ইংরেজ সৃষ্ট ভারত প্রেমিককে, ভারতবাসীকে শিকার করার জন্য লেলিয়ে দেয়া হয়। অনেকের মতে মিঃ ডেভিড হেয়ার হিন্দু প্রেমিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন আর মিঃ শং মুসলমান প্রেমিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

মিঃ ডেভিড হেয়ার ১৭৭৫ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন আর ১৮৪২ খ্রিষ্টাব্দে মারা যান। তিনি প্রথমে সুস্ব ছুঁচের মত কলকাতায় মাত্র একজন ঘড়িওয়ালার হয়ে দোকান করেন। আর তখন ঘড়ি পরত সাধারণ মানুষের পরিবর্তে হোমরা চোমরা নামী ও দামী লোকরা। এ খরিদদারগুলোই তাঁর প্রথম শিকারে পরিণত হয়। প্রত্যেক চলতি ইতিহাসে কতকগুলো সর্বজন স্বীকৃত তথ্য পাওয়া যায় যেমন তিনি নাস্তিক ছিলেন সুতরাং খ্রিষ্টান ধর্ম ও খ্রিষ্টান রাজত্ব তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য ছিলনা। এবং ভারতবাসীর শিক্ষার উন্নতির জন্য আর ভারতের মানুষের ধর্ম ও সমাজের গোড়ামী যুক্ত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকা নাকি অতুলনীয়। ১৮০০ থেকে ১৮১৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ঘড়ির কাজে প্রায় লাখ খানেক টাকা রোজগার করলেন এবং তা ভারতবাসীর শিক্ষা-দীক্ষার জন্য দান করলেন। ১৮২০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ঘড়ি ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে তার গোটা দেহ, মন, সময় সবই ব্যয় করলেন ভারতের জনসাধারণের জন্য। তাই কলকাতা কলেজ স্কোয়ারে কিছু জমি কিনেন এবং ১৮১৫ খ্রিষ্টাব্দে হিন্দুদের নিয়ে হিন্দু কলেজের পরিকল্পনা প্রকাশ করেন। কিছু দিনের মধ্যেই হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

কিন্তু এখানে প্রশ্ন হচ্ছে যিনি নাস্তিক, কোন ধর্ম মানেন না তিনি এমন কলেজ কেন করবেন যা মুসলমান ও অন্য জাতিকে বঞ্চিত করবে?

তারপর হিন্দু মহিলাদের জন্য ১৮২৪ খ্রিষ্টাব্দে লেডিজ সোসাইটি ফর নেটিভ ফিলেম এডুকেশন স্থাপন করলেন। রাধাকান্ত দেব একজন বিখ্যাত গোঁড়া হিন্দু, যিনি সতীদাহ প্রথার পক্ষপাতি। একবার মুসলমান ছাত্র ভর্তি করা চলতে পারে কি না কথা মূলে রাধাকান্তদেব তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং জয়ী হন। সে রাধাকান্তের সাথে ডেভিড হেয়ারের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা ছিল। গোঁড়া রাধাকান্তদেবের বাড়ীতে যখন হিন্দু মেয়েদের বাৎসরিক পরীক্ষা হত তখন নিয়মিতভাবে হেয়ার উপস্থিত থাকতেন। রাধাকান্ত মুসলমানদের বরণ করতে পারল না। কিন্তু কেমন করে নাস্তিক গো-ভক্ষক ডেভিডকে গ্রহণ করতে পারলেন তা চিন্তা করলে ইংরেজদের বাহাদুরীর প্রশংসা করতে হয়। (দ্রঃ যোগেশচন্দ্র বাগল, বাংলার জনশিক্ষা, বিশ্ব ভারতী গ্রন্থালয়, Amit Sen, Notes on the Bengal Renaissance, P.14-15)

সর্ব ভারতীয় অফিস আদালতে ফারসী ভাষা তুলে দেয়ার গোড়াপত্তন তিনিই করেন এবং সরকার থেকে তা মঞ্জুর করিয়ে হিন্দুদের জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। ভারতীয় কুলীদের বাইরে চালান দেয়ার ব্যাপারে হেয়ার হিন্দুদের সাথে নিয়ে আন্দোলন গড়ে তুললেন এবং এ কু-প্রথা ইংরেজ সরকারকে বন্ধ করতে বাধ্য করেন। আর ইংরেজ জজদের সাথে ভারতীয় জুরী প্রথার প্রবর্তন করেও তিনি সুখ্যাতি লাভ করেন। তাই আমরা বেশীর ভাগ মানুষ তাঁকে ভারত দরদী বলে মনে করি কিন্তু সূক্ষ্ম বিচারশীল মানুষ আজ অন্য রকম বুঝতে দ্বিধাবোধ করছে না যে এ নেতাকে কারাগারে তো পঁথেকে হয়নি, কেউ ফাঁসী দেয়ার ভয় তো দেখায়নি। কেউ তাঁর কোন দাবীই তো প্রত্যাখ্যাত হয়নি? তাহলে চোরে চোরে মাসতুত ভাই বললে বাধা দেয়া যাবে কি করে? আর একজন তাঁর বিখ্যাত সহকর্মী ও সহমর্মী তিনি হচ্ছেন মিঃ ডিরোজিয়ো। তিনিও দাবী করতেন তিনি নাকি নাস্তিক। তাই ইংরেজ বিরোধী ১৮৪২ খ্রিষ্টাব্দে হেয়ার মারা গেলেও তাঁর চক্রান্ত চালাবার দায়ি দিয়ে যান ডিরোজিয়ো সাহেবের হাতে। অবশ্য কায়দা এটিই ছিল হেয়ার যা কিছু করেছিলেন তিনি কাগজে কলমে বা মার্বেল পাথরে নিজেকে লাগিয়ে রাখেন নি, করে ছিলেন অত্যন্ত গোপনে। যখন মারা যান তখন খ্রিষ্টানদের কবর স্থানের পরিবর্তে তিনি তাঁর নিজের কেনা জায়গার উপর কবর দেয়ার ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। কিন্তু যিনি নাস্তিক তাঁর দেহ তাঁর প্রাণপ্রিয় হিন্দু জাতির মত দাহ করলেই তো উদারতা প্রকাশ পেত অথবা নদীতে মৃত দেহ ভাষার কথাও তো করে যেতে পারতেন অথবা মৃত দেহ ভাষাবার কথাও তো বলে যেতে পারতেন অথবা মৃত দেহ কবরস্থ করার নিয়ম-কানুন খ্রিষ্টান মতে নাও তো করতে পারতেন? তার সে সন্তার বাজারে মাত্র কয়েক বছর গাড়ির কাজ কর দুহাতে লক্ষ লক্ষ টাকা যা তিনি দিয়েছেন তা যদি হিসাব করা হয় তাহলে দেখা যাবে তাঁর রোজগারের বহুগুণ বেশী। এ বেশী টাকাকে দিয়েছিল তাঁকে কাল মানুষ চিন্তা করেনি আজ করতে শিখেছে।

এ হেয়ার ও ডিরোজিয়োর স্বপ্ন ও ডিউটি ছিল হিন্দু জাতিকে শিক্ষিত করা এবং শিক্ষার সাথে তাদের হাতের পুতুল তৈরী করে মুসলমানদের বিরুদ্ধবাদী করে তোলা স্বধর্মের পরিবর্তে খ্রিষ্টান ধর্ম, দর্শন সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপর শ্রদ্ধাশীল করে তোলা। এখন কথা হচ্ছে ইংরেজরা কতটা সাফল্য অর্জন করেছিল তা পরবর্তী আলোচনায় স্বচ্ছ হয়ে উঠবে।

আমাদের ভোলা উচিত হবে না যে বিশ্ব আন্দোলন, বিদ্রোহ, প্রভৃতি গুণগোল বা হটগোলগুলো অস্ত্রশস্ত্রের সাথেই সীমিত নয় বরং অস্ত্র উৎস বা গোড়া হচ্ছে কলম আর কালি আর কালি কলম এবং কাগজের পিছনে থাকে মগজ। তাই ইংরেজ নিজেদের তৈরী কলেজ বা মাদ্রাসাগুলো করেছিল নিজের স্বার্থে মগজ ধোলাইয়ের জন্যই।

ইংরেজরা মুসলমানদের দুর্ব্যবহারের প্রতিশোধে যত রকমের অত্যাচার আছে সবই প্রয়োগ করতে কুষ্ঠাবোধ করেনি। মুসলমানদের জাতে মারতে না পেলে ভাতে মারতে এমন ব্যবস্থা করা হয়েছিল যাতে সারা ভারতের মুসলমান দরিদ্র শ্রেণীতে পরিণত থেকে নিশ্চিতভাবে বাধ্য হয়। তবুও এত অভাব অনটন আর প্রতিকূলতার ভিতরেও বন্দুক তলোয়ার চালু রাখার জন্য পত্র পত্রিকা প্রচার করে যে ভূমিকা পালন করেছে তা খুবই প্রবিশদযোগ্য। হাতে লেখা প্রচুর পত্র পত্রিকা বা বুলেটিনগুলোর নাম দিলে বইটি খুব বেড়ে উঠবে তাই কয়েকটি ছাপা পত্রিকার কথা জানানো হচ্ছে এবং সেগুলোই জানানো হচ্ছে যেগুলো প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলন ব্যর্থ হয়ে যাবার পর বের করা হয়েছিল। তার কারণ আন্দোলনকে জিইয়ে রাখার জন্য এবং ইংরেজের স্বপক্ষে পত্রিকাগুলোর প্রতিবাদ ও তাদের বিপক্ষ পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য।

পারিল বার্তাবহ : সম্পাদক মুহাম্মদ আনিসুদ্দিন, ১৮৭৪ খ্রীঃ ঢাকা। আখবारे ইসলামিয়া: ১৮৮৪ খ্রিঃ ময়মনসিংহ। হিন্দু মুসলিম সম্মিলনী : ১৮৮৭ খ্রিঃ যশোহর। সুধাকর ১৮৮৯ খ্রিঃ কলকাতা। হিতকরী : ১৮৯০ খ্রিঃ কুষ্টিয়া, সম্পাদক মোশাররাফ হোসেন। ইসলাম প্রচারক : ১৮৯১ খ্রিঃ, সম্পাদক রেয়াজুদ্দিন আহমদ ও শেখ আঃ রহিম। মিহির : ১৮৯২ খ্রিঃ সম্পাদক আঃ রহিম। কোহিনূর : ১৮৯৮ খ্রিঃ পূর্ববঙ্গ, সম্পাদক মওলবী রওশন আলী। প্রচারক : ১৮৯৯ খ্রিঃ কলকাতা নূরুল ইমান : ১৯০১ কলকাতা। নূরুল ইসলাম : এটিও ১৯০১ খ্রিঃ যশোর থেকে প্রচারিত হত। ভারত সুহৃদ : ১৯০১ কলকাতা থেকে বের হ। সুলতান : কলকাতা থেকে প্রকাশিত হত ((১৯০২)। হানিফঃ ঢাকার ময়মন জেলা থেকে আত্মবিকাশ করেছিল (১৯০৩)। নবনূর : এটিও ১৯০৩ সালেই কলকাতা থেকে বের হয়েছিল। মোসলেম হিতৈষী : বঙ্গীয় চৌদ্দ শতাব্দীর প্রথম দশকে, সম্পাদক মুন্সী আরবদুল রহিম সাহেব তিনি 'মোসলেম সুহৃদ' নামক এক পত্রিকার সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট ছিলেন বলে জানা যায়। মুসলমান : কলকাতা থেকে প্রকাশিত হত (১৯০৬)। ইসলাম সুহৃদ : ১৯০৬ মৌলানা আবুল সোবহান, ঢাকা। বাসনা: ১৯০৮ রংপুর। ইসলাম : বিংশ শতকের প্রথম দশকে কলকাতা 'ল' কলেজে আইন অধ্যয়নরত মৌলানা তসলীমুদ্দিন আহমদ ও মৌঃ একিনুদ্দিন আহমাদ এবং কয়েকজন তরুণের ছাত্র জীবনের প্রচেষ্টায় বাংলার প্রথম মুসলিম পরিচালিত সাহিত্য মাসিক। মোসলেম হিতৈষী : ১৯১১, কলকাতায়। আল এসলাম: ১৩২১ সালে, সম্পাদক মৌলানা আকরাম খাঁ, সহকারী সম্পাদক, সাংবাদিক মৌঃ মনিরুজ্জামান ইললামাবাদীশ তেজস্বী লেখক মাওলানা ফজলুল হক সেলবর্সীও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ইসলাম : ১৯১৫ সম্পাদক আবদুল রশীদ। আহলে হাদীস : এটিও ১৯১৫ সালে জন্মলাভ করেছে। প্রথম দুই এক সংখ্যার প্রধান সম্পাদক ছিলেন মৌলানা আবদুল হাকিম সাহেব। যুগ্ম সম্পাদক মৌঃ মোঃ বাবর আলী। পরে বাবর আলীই ছিলেন স্থায়ী সম্পাদক। মসজিদ : ১৯১৭ সম্পাদক মুন্সী গোলাম রহমান সাহেব, কলকাতা। ইসলাম দর্শন : ১৯২০ প্রকাশনায় জনাব মুন্সী আবদুর রহিম সাহেব। ধুমকেতু : এই প্রখ্যাত অর্ধ সাপ্তাহিক পত্রিকাটি ১৯২২ খ্রিঃ ১২ই আগষ্ট বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম কর্তৃক পরিচালিত ও সম্পাদিত। এর কর্ম সচিব ছিলেন শ্রী শান্তিপদ সিংহ, আর মুদ্রাকর ও প্রকাশক ছিলেন মুসলিম পাবলিশিং হাউসের কর্মকর্তা মৌলানা আফজালুল হক সাহেব। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নজরুলের 'ধুমকেতু'র সম্বন্ধে যে বাণী পাঠিয়েছিলেন তা নিম্নরূপ :

কাজী নজরুল ইসলাম কল্যাণীয়েষু—

আয়, চলে আয়, রে ধুমকেতু,

আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু,

দুর্দিনের এই দুর্গশিরে

উড়িয়ে দে তোর বিজয়কেতন।

অলক্ষণের তিলক রেখা

রাতের ফালে হোক না লেখা,

জাগিয়ে দে রে চমক মে রে

আছে যারা অর্ধচেতন।

—শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২৪শে শ্রাবণ, ১৩২৯

ধুমকেতু কেবলমাত্র একটি পত্রিকাই নয়, ইতিহাসও। এতে স্বাধীনতা আন্দোলনের অনেক ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান মেলে। মোসলেম জগত ১৯২২ খ্রিঃ কলিকাতায় প্রকাশ। এর সম্পাদক ছিলেন মৌলানা আঃ রশিদ সাহেব। সম্পাদকীয় বিভাগে সংশ্লিষ্ট কবি শাহাদত হোসেন এবং কবি খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দিন প্রমুখ খ্যাতনামা ব্যক্তিদেরকে সরকার বিরোধী রচনার জন্য করাবরণ করতে হয়েছিল। সাম্যবাদীঃ প্রথম দিকে বিখ্যাত সাংবাদিক মৌঃ মুহাম্মদ ওয়াজেদ আলী এবং পরে সুসাহিত্যিক, সুসাংবাদিক ও সুকবি রূপে বিশিষ্ট জনাব মঈনুদ্দিন খান সাহেবের সম্পাদনায় এটিও ১৯২২ খ্রিঃ প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। সোনার ভারত ১৯২৩ খ্রিঃ আত্মপ্রকাশ করে। সম্পাদক ছিলেন সাংবাদিক জনাব মৌঃ জবেদ আলী। ইনি সাপ্তাহিক মোহাম্মদীর সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করেছিলেন। সৌরভঃ মুর্শিদাবাদের বহরমপুর থেকে ১৯২৫ খ্রিঃ এর প্রকাশ। সম্পাদক ছিলেন সুখ্যাত অধ্যাপক, সাহিত্যিক ও রাজনীতিবিদ মোহাম্মদ রেজাউল করিম সাহেব। তরুণ পত্রঃ সাহিত্যিক আবুর হোসেন সাহেবের প্রকাশনায় ও জনাব ফজলুল করিম মল্লিকের সম্পাদনায় ১৯২৫ অব্দে ঢাকা থেকে বের হয়। জিয়াউল ইসলামঃ মৌঃ আবদুশ শুরুর সাহেব কর্তৃক প্রকাশিত ও জনাব মৌঃ আঃ ওয়াহিদ কর্তৃক সম্পাদিত ১৯২৫ এর জানুয়ারীতে প্রকাশ। অভিযানঃ ১৯২৬ খ্রিঃ ঢাকায় 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' এর মুখপাত্র রূপে বের হয়েছিল। সুসাহিত্যিক মৌলানা আবুল হোসেন ছিলেন এর অগ্রনায়ক। সাহিত্যিক সুবিখ্যাত সাহিত্যিক মুহাম্মদ ইয়াকুব আলী চৌধুরী ও স্বনাম ধন্য কবি গোলাম মোস্তফা সাহেবদ্বয়ের সম্পাদনায় 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির'র মুখপাত্র রূপে ১৯২৬ খ্রিঃ প্রকাশিত হয়েছিল। হেলালঃ মৌলানা সামসুর রহমান সাহেবের সম্পাদনায় সাহিত্য গগনে এরও প্রথম উদয় ১৯২৬ সালে কলকাতায়। ইসলামঃ মেওলানা মোহাম্মদ আঃ মেনয়েম সাহেবের প্রকাশনায় বর্মা মূলকের রেঙ্গুন থেকে এটি ১৯২৭ খ্রিঃ সেপ্টেম্বর প্রকাশ হয়েছিল। তবলীগঃ ১৯২৭ সালে প্রকাশ লাভ করেছিল। সম্পাদক ছিলেন মৌলানা মামসুর রহমান ও মাওলানা দেলোয়ার হোসেন সাহেবান। নওরোজঃ এর প্রথম প্রকাশ ঐ ১৯২৭ সালেই। সম্পাদক ছিলেন মৌলানা আফজালুল হক। পত্রিকাটি বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম ও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা সম্ভারে পরিপুষ্ট ও চিত্তাকর্ষক ছিল। জাগরণঃ এটিও মুন্সী আহমদ সাহেবের সম্পাদনায় ঢাকার সাত রওজা থেকে ১৯২৭ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। তরুণঃ জনাব এম মেসের আলী সাহেবের সম্পাদনায় ১৯২৮ সালে বগুড়া থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। তাইদে ইসলামঃ এটিও ১৯২৮ সারে রংপুর থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক ছিলেন জনাব মাওঃ সৈয়দ আবুল কাশেম আল কাদেরী সাহেব। তরক্কীঃ নব মুসলিম মিঃ সিরাজুল হকের অধিনায়কত্বে ১৯২৮ সালেই পত্রিকাটি উন্নতির সোপানে আরোহণ কর। সহচরঃ এই সহচরের সাহচর্যে পাওয়া গিয়েছিল ১৯২৮ সালে। এর প্রথম দিকের সম্পাদক ছিলেন মৌলানা সৈয়দ নওশের আলী সাহেব। পরে সুখ্যাত সাহিত্যিক মৌলানা এমদাদ আলী সাহেব ছিলেন এর স্থায়ী সম্পাদক। জয়ন্তীঃ কবি আবদুল কাদের সাহেবের সুসম্পাদনায় ও বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম এর রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে ১৯৩১ সালে কলকাতা থেকে বের হয়েছিল। সুনাত-অল-জামাতঃ ১৯৩২ খ্রিঃ এর জন্ম। সম্পাদক ছিলেন খ্যাতনামা সাহিত্যিক মাওলানা মোঃ রুহুল আমিন সাহেব। গুলিস্তাঃ কলকাতার বিখ্যাত সাহিত্যিক ও তৃতীয় ম্যাজিস্ট্রেট এস, ওয়াজেদ আলী (বি-এ-ক্যান্টব, বার-এট-ল) সাহেবের প্রচেষ্টা ও অর্থে এটিও ১৯৩২ খ্রিঃ প্রতিষ্ঠিত। জনাব এস, শামসের আলী ও জনাব আবদুল রউফ উকীল সাহেবদ্বয়ের নামে পত্রিকাটি চলেও এর সম্পাদক ছিলেন খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক জনাব ইদ্রিস আলী সাহেব। আল ইসলামঃ এটিও ১৯৩২ খ্রিঃ সিলেট থেকে প্রকাশিত। এর সম্পাদক ছিলেন 'সিলেট কেন্দ্রীয় সাহিত্য সংসদের

মুখপাত্র নুরুল হক সাহেব যিনি স্বদেশ সমাজ ও সাহিত্য সেবায় স্বীকৃতি স্বরূপ পাক সরকারের কাছে টি, কে, উপাধি সহ প্রচুর পরিমাণে অর্থ সাহায্য পেয়েছিলেন তাঁর সংসদের জন্য। তিনি তাঁর পাঠাগারে আঠারো হাজার পুস্তক সংগ্রহ করেছিলেন। মার্কস পন্থীঃ কমরেড আবদুর হালীম কর্তৃক পরিচালিত এর আত্মপ্রকাশের কাল ১৯৩৩ খ্রিঃ। আলফারুকঃ সম্ভবতঃ এটিও ঐ ১৯৩৩ খ্রিঃ জন্ম লাভ করেছিল। সিরাজ, আনুমানিক ১৯৩৩ সালে পূর্ববঙ্গের পুড়া নামক স্থান থেকে প্রকাশিত হত। এতে কবি নজরুল, কবি গোলাম মোস্তফা ও অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর প্রমুখ কীর্তিমানদের রচনা পরিবেশিত হত। ছায়া বীথিঃ কথা শিল্পী জনাব নাজিরুল ইসলাম সাহেবের সম্পাদনায় কলকাতা থেকে ১৯৩৪ খ্রিঃ জন্মগ্রহণ করেছিল। হেদায়েতঃ ১৯৩৬ খ্রিঃ খুলনা থেকে প্রকাশিত। এর প্রচার কর্মী ছিলেন মৌলানা মোয়েজুদ্দিন হামিদী। আজাদঃ ১৯৩৬ সালে মুসলিম পরিচালিত বাংলার দৈনিক পত্রিকার অন্যতম রূপে এটি ১৯৩৭ আপার সার্কুলার রোড ঐ কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। এর সম্পাদক ছিলেন খ্যাতনামা সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক মৌলানা মোহাম্মদ আকবরাম খাঁ সাহেব। মৌলবী নাজির আহমদ চৌধুরী সাহেবের প্রকাশনায় এবং মৌলানা মুহাম্মদ খায়রুল আনাম খাঁ নাদভী সাহেবের কর্মধ্যক্ষে এখানি অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। সন্ধানীঃ মৌলানা মোহাম্মদ আবু বকর (বি, এ) সাহেবের সম্পাদনায় এটি অবিভক্ত বঙ্গের কুষ্টিয়ায় ১৯৩৬ সালে জন্ম নিয়েছিল। পাকিস্তানঃ এটি ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত। সম্পাদক ছিলেন জনাব মৌলানা মোহাম্মদ মোদায়েব সাহেব। গুল বাগিচা, সুসাহিত্যিক মৌলানা আবদুল ওহাব সিদ্দিকী কর্তৃক এখানিও ১৯৩৭ সালে কলকাতা থেকে বিকাশ লাভ করেছিল। কৃষকঃ ১৯৩৮ সালে সম্পাদক মিঃ আবুল মনসুর আহমদ সাহেবের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় এই কৃষকের অভিযান শুরু। আঙ্গুরঃ ১৯৩৯ সালে জন্মকাল। গবেষক, অগ্রগণ্য সাহিত্যিক ও বহু ভাষায় অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী মৌলানা ডাক্তার মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ এম, এ, বি-এল, ডি-লিট সম্পাদিত এটিই ঢাকার মুসলিম পরিচালিত প্রথম শিশু মাসিক। চতুরঙ্গঃ কলকাতা থেকে এখানিও ১৯৩৯ সালে আত্মপ্রকাশ করেছিল। সম্পাদক ছিলেন ভারত রাষ্ট্রের প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পণ্ডিত, কবি ও সুসাহিত্যিক মিঃ হুমায়ুন কবীর। পত্রিকাটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য শিক্ষিত ব্যতিরেকে এর গ্রাহক করা হত না। মীনারঃ জনাব সাহিত্যিক মওলবী ময়নুদ্দিন হোসায়েন সাহেব সম্পাদিত কলকাতার বুক ঐ ১৯৩৯ সালেই এই মীনারটি নির্মিত হয়। মোসলেমঃ ১৯৪১ সালে কলকাতার ৪৭নং রিপন স্ট্রিটে এর জন্ম। সম্পাদক ছিলেন জনাব হাশেম সাহেব ও খ্যাতনামা নেতা এবং দেশ ও জাতির সেবক, বাংলা মায়ের সুসন্তান ও সুপ্রসিদ্ধ সাংবাদিক জনাব মোঃ এ, কে, ফজলুল হক। নওরোজঃ পাকিস্তান সরকার কর্তৃক টি, কে উপাধি প্রাপ্ত সাহিত্য সেবায় হাজী মোহাম্মদ হেমায়েত আলী সাহেবের সম্পাদনায় এটি ১৯৪১ সালে দিনাজপুর থেকে প্রকাশিত। আজানঃ ১৯৪২ সালে এর জন্ম। মৌঃ এ, কে, এম নূর মুহম্মদ ও সহকারী মৌঃ মোহাম্মদ আবদুল কাদের সাহেব ছিলেন এর সম্পাদক। আল-আমানঃ এর প্রথম দিকের সম্পাদক মৌলানা আবদুর রহিম চৌধুরী ও শেষের দিকের মৌলানা আবদুস সাত্তার। পৃথিমপাশার সিলেট নামক স্থান থেকে ১৯৪২ সালে প্রকাশিত। মীনারঃ এটি বেগম ফাত্মাজয়া সাহেবার প্রচেষ্টায় ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত সর্বপ্রথম মহিলা সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য সাহিত্য। মিল্লাতঃ চৌদ্দ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এর জন্ম (আনুমানিক ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে)। সম্পাদক ছিলেন প্রখ্যাত নেতা মৌলানা আবুল হাশেম সাহেব। যাঁর নাম আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। ইত্তেহাদঃ ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দে অন্যতম বাংলা দৈনিক পত্রিকারূপে প্রকাশ। সম্পাদক ছিলেন মৌলানা আবুল আহমদ সাহেব। সাপ্তাহিক তকবীরঃ মৌলানা আজিজুর রহমান সাহেবের সম্পাদনায় ১৯৪৭ সালে প্রথম প্রকাশ।

জিন্দেগী জনাব এস, এম, বজলুল হক সম্পাদিত ১৯৪৭ সালের সাপ্তাহিক পত্রিকা। আবার অনেকে মনে করেন এটা ছিল দৈনিক পত্রিকা।

সাপ্তাহিক দৈনিক : সম্পাদক মৌঃ আবদুল গফুর সাহেবের সুসম্পাদনায় ১৯৪৮ সালে ঢাকা থেকে বের হত। কোরআন প্রচারঃ জন্ম ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে সম্পাদক ছিলেন আলেম, সাহিত্যিক জনাব মৌঃ মোহাম্মদ রফিকুল হাসান সাহেব কলকাতা থেকে প্রকাশিত। আজান : এই আজানের ধ্বনি প্রথম ধ্বনিত হয়েছিল ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে বর্ধমান থেকে। এর পরিচালক ছিলেন খ্যাতনাম সন্তোষ রাজনীতিবিদ বাগী ও সাহিত্যিক জনাব মৌঃ আবুল হাসেম সাহেব যিনি “ইসলাম ও অর্থনৈতিক সমস্যা” Islam and Economic problem, creed & Islam প্রভৃতি অনেক গ্রন্থের প্রণেতা। তবলীগঃ জন্ম ১৯৫১ এর ২০শে সেপ্টেম্বরে সম্পাদক মৌঃ ফজলুর হক সাহেব। ওয়াতনঃ ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে তাইয়েবুল হক সাহেবের সম্পদনায় এ পত্রিকাটি প্রকাশ হত। কাজী নজরুল ইসলামের কয়েকটি অপ্রকাশিত কবিতা এতে প্রকাশ পেয়ে ছিল। জনাব তাইয়েবুল হক সাহেব ছিলেন স্বাধীনতা বিপ্লবে বিশেষ অংশ গ্রহণকারী নেতা। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের সাথে তাঁদের পরিবারে সৌহার্দ্যতা ছিল। ডঃ বিধানচন্দ্র রায়, শ্রী প্রফুল্ল সেন প্রভৃতি জননেতাদের তিনি অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। সিরাজঃ মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ান থেকে ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে কবি মোদাশ্বর হোসেন এবং মৌঃ জসিমুদ্দিন ও সোহরাব আলীর প্রচেষ্টায় বের হয়েছিল। ত্রিলেখা : ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে মালদহ থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক ছিলেন দেলোয়ার হোসেন। ইনসাফ : জন্ম ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে। পরিচালক মৌঃ শেখ শামসের আলী এবং সম্পাদক মৌঃ মোসলেম আলী। আওয়াজ : আনুমানিক ১৯৫৪-৫৫ অব্দে জন্ম। জনাব মাওলানা আবুল হান্নান আসকারী সাহেবের পৃষ্ঠপোষকতায় ও সাহিত্যিক আঃ আজিজ আল-আমানের সম্পদনায় কলকাতা থেকে প্রকাশিত। হিন্দোল : জনাব আবুল হোসেন সাহেবের সম্পাদকীয়তে ১৯৫৫ সালে মালদহ দক্ষিণ বালুচর থেকে প্রকাশিত। মশালঃ জন্মগ্রহণ করেছিল ১৯৫৫ সালে। সম্পাদক ছিলেন ২৪ পরগনা জেলার গোবরডাঙ্গা নামক স্থানের তরুণ সাহিত্যিকদ্বয় জনাব মনিরুজ্জামান ও আখতারুল জামাত। মাসিক আজাদঃ এর জন্মও ১৯৫৫ সালে কলকাতায়। সম্পাদক ছিলেন সুসাহিত্যিক খন্দকার নুরুল ইসলাম ও জনাব গোলাম আহমদ সাহেবান। উন্মেষ : ১৯৫৬ - তে কাটোয় থেকে প্রকাশ। প্রথম দিকের সম্পাদক ছিলেন দিলীপ কুমার দাস ও নুরুল হুদা। শেষে মুহাম্মদ হুদাই এককভাবে ছিলেন। আজঃ মোহাম্মদ মোস্তাফা হোসেনের সম্পদনায় সাপ্তাহিকরূপে ১৯৫৭ - তে প্রকাশ হয়েছিল। দিশারীঃ সম্পাদক মণ্ডলী জনাব অধ্যক্ষ মিঃ ইব্রাহিম খান জনাব মিঃ আবুল হাসেম, জনাব ডাঃ মৌঃ সিরাজুল হক ও মৌঃ মহিউদ্দিন খান সাহেবদের প্রচেষ্টায় দারুল ইসলামিক একাডেমীর মুখপাত্র রূপ ১৯৬০ সারে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। আভাষ : আসামের শিলচর নামক স্থান থেকে ১৯৬৬০ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। সম্পাদক ছিলেন তরুণ সাহিত্যিক এম, জি, কিবরিয়া সাহেব। ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা : পত্রিকাটির সম্পাদক মৌলানা আবুল হাশেম ও সহ সম্পাদক মৌঃ ফারুক আহমদ সাহেবানের অক্লান্ত পরিশ্রমে ঢাকার ইসলামিক একাডেমীর মুখপাত্র রূপে ১৯৬১ সালে জন্ম লাভ করেছিল। মিঃ আবদুল মওদুদ সাহেব কর্তৃক অনূদিত “The Indian Mussalmans” নামক মিঃ হান্টারের লেখা ইংরেজী গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ পত্রিকাটির বিশেষ আকর্ষণ। আকাশ : এর আবির্ভাব ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দে। প্রদান পৃষ্ঠপোষক এস, এস, আবদুল্লাহ। যুগ্ম সম্পাদক এম রওশন হালদার ও কোরবানী সিরাজ ওয়াই। কলকাতা থেকে প্রকাশিত। তওহিদ : আবু তাহের কর্তৃক সম্পাদিত ও কলকাতা থেকে ১৯৬৩ সালে প্রথম প্রচারিত। জাগরণ : সাহিত্যিক আঃ আজিজ আল আমান সম্পাদিত মুসলিম পরিচালিত

পত্রিকাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতায় জন্ম। সন্ধান : “ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান” এর মুখপাত্র রূপে পশ্চিম পাকিস্তানের রাওয়ালপিণ্ডি থেকে ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। সম্পাদক ছিলেন ডাক্তার ফজলুর রহমান এবং ডাঃ এম সগীর হাসান মামুদী। খেদমতগার : সর্বসাধারণের খেদমতে একটি প্রথম আবির্ভূত হয় ১৯৬৪ সালেই। সম্পাদক ছিলেন জনাব কাজী মোহাম্মদ আলী আর আবদুল গণি সাহেব ছিলেন এর তত্ত্বাবধায়ক। তরুণ পত্র : ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দে। সম্পাদক ছিলেন অধ্যাপক কাজী আবদুর ওদুদ সাহেব। “সংকল্প” নামেও আর একখানি পত্রিকা তিনি ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশ করেছিলেন। মাসিক নবাবুগ : জনাব মিঃ এ, এম, সফিক জনাব মি হামিদুল হক এবং জনাব হাসিনুর রহমান সাহেবদের প্রচেষ্টায় সুপ্রতিষ্ঠিত এই নবাবুগের প্রথম উদয় কাল ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে। আমান : তরুণ সাহিত্যিক মৌলানা আঃ হোসেন মজুমদারের সম্পাদনায় এটিও ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে আসামের হাইলাকান্দি থেকে প্রকাশিত। সাপ্তাহিক জনবর্তী : সাহিত্য সেবক জনাব সোহরাব আলী সাহেবের সুদক্ষ সম্পাদনায় ১৯৬৬ - তেই প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। দামামা : জনাব এস, এ, মোস্তালি ও এন, এ, হান্নান সাহেবানের সম্পদনায় কলকাতা থেকে এই দামামার প্রথম আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হয়েছিল ১৯৬৬ সালে। মোসলেম প্রতিভা : সুসাহিত্যিক মুন্সী আবদুর রহিম সাহেবের সুসম্পাদনায় ১৯৬৭ সালে কলকাতায় প্রকাশিত হয়েছিল। সাহিত্য কাণ্ডারী : নবীন সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম মল্লিক সাহেবের উদ্যমে ও প্রচেষ্টায় এটিও ১৯৬৭ - তে প্রকাশ লাভ করেছিল। পত্রিকাটি নিঃসন্দেহে সর্বসাধারণের প্রশংসার দাবী রাখে।

এছাড়া আরও অসংখ্য পত্র-পত্রিকা স্বাধীনতার পূর্বেও পরে প্রকাশিত হয়েছিল। যেমন-দর্পণ : লণ্ডন থেকে প্রকাশিত। যেটি পাঠরত ভারতীয় ছাত্রদের দ্বারা প্রযোজিত। সংবাদপত্র থেকে জানা যায় দর্পণ একটি অসাধারণ সাহিত্য সংবাদপত্র যার সব কিছু মূল্যবান। পাক হিতৈষীঃ জনাব এ, কে, এম, আজিজুল হক সাহেবের সম্পদনায় পাবনা থেকে প্রকাশিত। আরাফাত : এটি ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং মাওলানা মৌঃ আবদুর রহমান সাহেব কর্তৃক সম্পাদিত। তরুণ নকীবঃ জনাব মীম ওবায়দুল্লাহ সাহেবের সম্পদনায় এবং হাজী শাহ মোহাম্মদের প্রকাশনায় এটি মালদার বাটনা জামেয়া মাদরাসা থেকে বের হয়। অগ্নিশিখা : ২৪ পরগনা জেলার বজাজ অঞ্চল থেকে এর প্রকাশ। সম্পাদক শেখ রওশন আলী। মুর্শিদাবাদ সাহিত্য সংকলন : জনাব ফজলুল হক সাহেবের সম্পদনায় মুর্শিদাবাদের সাদাবাগ থেকে এটি প্রকাশিত হয়েছিল। জাগরণ : দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সব সময়ে National war front এর মুখপাত্র রূপে যশোর বনগাঁ থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক মিঃ মিজানুর রহমান। বাঙলা একাডেমী পত্রিকাঃ গবেষণামূলক উচ্চাঙ্গের পত্রিকা ‘বাংলা একাডেমী’র মুখপাত্র রূপে ঢাকা, বর্ধমান হাউস থেকে প্রকাশ হত। দীলরুবা : এখানির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন স্বনামধন্য কবি গোলাম মোস্তফা। আমাদের দেশঃ এখানি বাংলা ভাষায় পূর্ব পাকিস্তানের পাবনা থেকে উর্দুতে পশ্চিম পাকিস্তানের লায়লপুর থেকে বেং ইংরেজীতে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হত। বাংলার সম্পাদক ছিলেন মিঃ এম, এ, হামিদ-টি, কে, এম, এস, সি। আজিজুন নাহার : বিখ্যাত সাহিত্যিক মীর মোশাররফ হোসেন সাহেব পরিচালিত এটি এক অনবদ্য সৃষ্টি। মোজাহেদ : স্বাধীনতা পূর্ব যুগে মৌলানা আবদুল লতিফ সাহেবের সম্পাদনায় প্রকাশিত মুসলিম ন্যাশনাল গার্ডের মুখপাত্র। মোসলেম পতাকা : এর ধারক ও বাহক ছিলেন পুঁথি লেখায় ও সংগ্রহে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী সাহেব। ফরিয়াদ : জনাব চৌধুরী আবদুর রহিম সাহেবের সম্পদনায় কলকাতা থেকে প্রকাশিত। আল হাকিম : এটি ঢাকা থেকে বের হত। সম্পাদক ছিলেন প্রখ্যাত হেকিমী চিকিৎসক হাফেজ আজিজুল

ইসলাম সাহেব। জমজম : সম্ভবতঃ বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের শেষের দিকে কলকাতায় জন্ম। প্রকাশক ছিলেন নূর লাইব্রেরীর সত্বাধিকারী মোহাম্মদ মঈনুদ্দিন হোসেন সাহেব। সম্পাদক ছিলেন সুসংবাদিক মৌঃ শামসুর রহমান সাহেব। হেদায়েত : কলারোয়া খুলনা থেকে প্রকাশিত হত। এর প্রচার কর্মী ছিলেন মৌলানা মোয়েজুদ্দিন হামিদী সাহেব। মাহেনও : কবি আবদুল কাদের সাহেবের সুসম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত। খুবই উচ্চ স্তরের পত্রিকা হিসাবে প্রশংসনীয়। সমকাল : সুখ্যাত সাহিত্যিক সেকেন্দার আবু জাফর সাহেবের সম্পাদনায় নাম করা কাগজ। সংবাদ : জনাব জহর হোসেন সম্পাদিত ঢাকা থেকে প্রকাশিত নামী দৈনিক। স্বাধিকার : এটি জনাব জোয়াদ আলী সাহেবের সম্পাদনায় কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। বৈভব : জনাব আবদুল মালিক সাহেবের সম্পাদনায় এর প্রাথমিক উদয় ঢাকার খৈকরা গ্রামে। আস্তানা : জনৈক মুসলমান সম্পাদকের পরিচালনায় আজমীর থেকে প্রকাশিত হত। পৃথিবী : এটি ঢাকা থেকে প্রকাশিত হত। সম্পাদক ছিলেন জনাব মোহাম্মদ নূর উদ্দিন আহমদ সাহেব। দরদী : স্বাধীনতার পূর্ব যুগে জনাব সৈয়দ জাহেদুল হক সাহেবের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে বের হত। সংহতি এখানি বর্ধমান থেকে প্রখ্যাত ব্যবহারজীবী মৌলানা নজীর উদ্দিন আহমদ সাহেবের পরিচালনায় বের হত। 'বর্ধমান বাণী' : নামক একখানি পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক ছিলেন। শিক্ষক সুহৃদ : পূর্ব পাকিস্তানের প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির মুখপাত্র রূপে ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত হত। সম্পাদক ছিলেন হাজী শেখ আলফুদ্দিন সাহেব। প্রচেষ্টা : তরুণ সম্পাদক সমাজ ও সাহিত্য সেবায় উদ্যোগী জনাব আইউব আলি খানের প্রযত্নে প্রকাশিত দামী পত্রিকা। প্রথমে এর নাম ছিল 'প্রান্তিক' পরে নাম বদল করে রাখা হয় প্রচেষ্টা। আলোক : আনুমানিক বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের প্রথম দিকে ঢাকা থেকে মৌলানা এস, এম, আলী সাহেবের সম্পাদনায় প্রকাশিত হত। আলোক : বর্ধমান তে বের হয়েছিল। এর সম্পাদক ছিলেন মৌলানা আবদুল হায়াত সাহেব। ইনি ইংরেজী Neda-i-Islam নামক মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তরুণ বয়সে তিনি সরকারের অধীনে চাকরী করতেন পরে স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে কংগ্রেসে যোগ দেন। কংগ্রেসের এলাহাবাদ অফিসের একটা বিভাগের তিনি ভারপ্রাপ্ত কর্মী ছিলেন। ঐ সময়ে পণ্ডিত জওহর লাল নেহেরুর সাথে তাঁর হৃদয়তা পড়ে উঠে। উর্দু ইংরেজীর উপর তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। ১৯৬৬ সালে তাঁর স্বরচিত গ্রন্থ Mussalmans of Bengal" ইংরেজী শিক্ষিত সমাজে দারুন চাপচালের সৃষ্টি করেছিল।

এমনভাবে আরও বহু পত্রিকা, পুস্তক-পুস্তিকা স্বাধীনতার প্রাণ্ডির পূর্বে প্রকাশ করে ঐতিহাসিক পদক্ষেপ নিতে মুসলমান মনীষীগণ যেমন আত্মপ্রকাশ করেছিলেন আর স্বাধীনতা বিপ্লবে রক্তাক্ত পরিস্থিতি আর শাসকের আগ্রয়ে অস্ত্র ও অত্যাচারের মাঝখানেও এগিয়ে এসেছিলেন পত্রিকার সম্পাদক, প্রকাশক ও মুসলিম লেখক-লেখিকারদের আর স্বাধীনতার পরেও ভারতের প্রায় প্রতিটি ভাষায় পত্রিকা ও পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশে মুসলিম সমাজ কোন সময়েই পিছিয়ে নেই। তবে বর্তমানে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবস্থা 'প্রান্তিকের শাঁখের মত'।

যারা নিজেদের ইতর, অনুন্নত অথবা উপজাতি বংশীয় বলে মনে করে, যারা নিজেরাই জানে না নিজেদের ইতিহাসের ঐতিহ্য পূর্ণ জীবনধারা, যারা ধর্ম গ্রন্থাদি বা আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুত পয়গম্বর হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বিশ্বজনীন বাণীর পূর্ণ সংবাদ রাখে না তারাই তাদের কলমে জাতিকে নেতৃত্ব দেয়ার নামে শোধানবাদীর সং সেজে সহজ সরল জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করতে উঠে পড়ে লেগেছে। তাদের ধারণা ধর্ম আলাদা আর সমাজ

আলাদা, ধর্ম আলাদা আর রাজনীতি আলাদা, ধর্ম একবস্ত্র আর আধুনিক উন্নতির অন্য বস্ত্র। এটা একটা মারাত্মক মূর্খামী। ইসলাম ধর্ম পরিপূর্ণভাবে পালন কর প্রত্যেকের পক্ষে যে কোন স্তরের নেতা বা আদর্শবান পূর্ণাঙ্গ পূর্ণ নাগরিক হয়ে আত্মপ্রকাশ করা সম্ভব। তাই প্রত্যেকের মনে রাখা দরকার বহুল প্রচলিত প্রান্তিকের শাঁখ শাঁখ নয় বরং শঙ্খ বা শাঁখ খাঁটি জিনিস।

আমাদের দেশের কলমধারী ও অস্ত্রধারী বলে যারা আমাদের কাছে স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা ও পিতা-মাতা হয়ে আছেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম করা যাচ্ছে মাত্র। মহাত্মা গান্ধী জন্ম ১৮৬৯, মৃত্যু জওহর লাল নেহেরু জন্ম ১৮৮৯ মৃত্যু ১৯৬৪। আবুর কালাম আযাদ ১৮৮৮-১৯৫৮। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ১৮৭০-১৯২৫। সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল ১৮৭৫-১৯৫০। স্যার সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১৮৪৮-২৫। মুহাম্মদ আনসারী ১৮৮০-৬৩। রাজেন্দ্র প্রসাদ ১৮৮৫-১৯৬৩। রাজা গোপালাচরী ১৮৭৯-৪৯। রাধা কৃষ্ণান ১৮৮৮-১৯৭৫। সৈয়দ আমীর আলী ১৮৪৯-১৯২৯ প্রভৃতি। বিচক্ষণ পাঠকদের উপরে জন্ম মৃত্যুর সালগুলো লক্ষ্য করলেই প্রমাণ পেতে বাকী থাকবে না যে সকলেই প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলন যা বহু পূর্ব থেকে যুগ যুগ ধরে চলতে চলতে ১৮৫৭ সালে চরমতম রূপ গ্রহণ করে যেটাকে চক্রান্তকারীরা সিপাহী বিদ্রোহ বলে অভিহিত করেছে সে সময় ভারতের জাতির বা স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্মদাতাদের পৃথিবীতে জন্মই হয়নি অথচ কোটি কোটি মানুষকে ভ্রান্তির সমুদ্রে হাবুডুবু খাওয়ানো হয়েছে ইতিহাসের পাতায়।

এবার আর কিছু কলম নবীশ বা বুদ্ধিজীবীদের নাম লিখছি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্ম ১৮৬১, মৃত্যু ১৯৪১। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮২০-১৮৯১। উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৪৪-১৯০৬। রঙ্গলাল ১৮২৭-১৮৮৭। নবীনচন্দ্র সেন ১৮৪৭-১৯০১। যোগীন্দ্রনাথ বসু ১৮৫৭-১৯২৭।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত : নামটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি জন্মেছিলেন বাংলা সনের ১২২৮ সালের ২৫শে ফাল্গুন খ্রিষ্টাব্দ হিসেবে উনিশ শতকেই তাঁর জন্ম। তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচয় তিনি বাংলার প্রাচীন কবি, বিশেষতঃ দীনবন্ধু ও বঙ্কিমের গুরু পথ প্রদর্শক। বাড়ী কাচড়া পাড়া। কেউ কেউ বলেন প্রথমে লেখা-পড়ায় অমনোযোগী ছিলেন এবং চরিত্র দোষে দুষ্ট ছিলেন তাই তাঁর আত্মীয়গণ তাঁর মাত্র পনের বছর বয়সেই বিয়ে দেন কিন্তু স্ত্রীকে তিনি কোনদিন অর্ধাঙ্গিনী হওয়ার সুযোগ দেননি।

আশুতোষ দেব লিখেছেন, 'বাল্যকালে তিনি লেখা-পড়ার আদৌ মনোযোগী ছিলেন না.....১৫ বৎসর বয়সে তাহার বিবাহ হয়নি দুর্গামনি দেবীর সঙ্গে তিনি আজীবন সংসার করেন নাই.....১২৩৭ হইতে বঙ্গাব্দে সাপ্তাহিক 'সংবাদ প্রভাকর' বাহির করেন। ১২৪৬ হইতে দৈনিক রূপে বাহির হয়। সংবাদ প্রভাকর ছাড়াও 'সংবাদ রত্নাবলী' 'পাষাণ্ড গীড়ন' প্রভৃতি তাঁর পরিচালিত সাময়িক পত্রাদি ছিল। তিনি বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধুর গুরু।' (দ্রঃ নতুন বাংলা অভিধান, পৃঃ ১১১৫)। বঙ্কিম যে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণকারী তার প্রমাণে বঙ্কিমের লেখাগুলিই দৃষ্টব্য "মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ শিক্ষিত বাঙালীর কবি-ঈশ্বর গুপ্ত বাংলার কবি, এখন তাঁর খাঁটি বাঙালী কবি জন্মে না জন্মিবার যো নাই- জন্মিয়া কাজ নাই।" (দ্রঃ বঙ্কিমচন্দ্রের ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবন চরিত ও কবিত্ব)। গুপ্তের আরও দুইজন বিশেষ শিষ্য ছিল যেমন রঙ্গলাল, দ্বারকানাথ অধিকারী। উপরোক্ত চারজন শিষ্যের মধ্যে বঙ্কিম ভারত সম্মানের উচ্চতম শৃঙ্গে উপবিষ্ট আর সাহিত্য সম্রাট উপাধিপ্রাপ্ত এবং তিনি নাকি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বীজরোপক। তাই তাঁর রচিত বন্দেমাতরম গীত যেন সারা ভারতের মূলমন্ত্র। তাই ভারতবাসী তাঁর লেখা ইউনিভার্সিটির সর্বোচ্চ শ্রেণীতে ছাত্র-ছাত্রীদের কত কায়দায় কত ব্যাখ্যা পড়ি পড়াই যা হয়ত বঙ্কিম নিজেও জানতেন না।

এখন গুরুদেব পথ প্রদর্শক ঈশ্বর গুপ্তের কিছু লেখার নমুনা দেয়া দরকার অবশ্য এ গ্রন্থের ৮২ পৃষ্ঠায় দীনবন্ধু ও গুপ্তের লেখায় দুটি উদাহরণ দেয়া আছে।

একেবারে মারা যায় যত চাপ দেড়ে।
হাঁস ফাঁস করে যত পঁাজ খোর নেড়ে॥
বিশেষতঃ পাকা দাড়ি পেট মোটা ভুড়ে।
রোদ্র গিয়া পেটে ঢোঁকে নেড়া মাথা ফুঁড়ে॥
হাঁদু বাড়ী খেনু ব্যাল, প্যাটাতে মাখিনু ত্যাল
নাতি তবু নিদ নাহি হয়।
এঁদে দেয় ফুফু নানী, কলুই ডেলের পানি,
কাঁচা ক্যালা কেচুর ছালন॥
আসমানে পানি নাই' পৌঁজিতে কি ন্যোখে ভাই
বরাহ্মনে পুছকর গিয়া।.....

মুসলমান বিদ্বেষের উদারণ মুসলমানদের জন্য আর প্রয়োজনে নেই এটুকুই যথেষ্ট। দেশ প্রেমিক অমুসলমান শিক্ষিত পাঠকদের সামনে তুলে ধরছি মুসলমানরা যখন সারা ভারতে মরা ও মারার ভূমিকায় উন্মত্ত যখন সারা ভারতে সৈন্যদের মধ্যেও বিদ্বেষের দাবানল ছুঁ করে ঝলছে তখন তিনি লিখলেন, “কয়েকদল অধার্মিক অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হিতাহিত বিবিচনা বিহীন এতদ্দেশীয় সেনা অধার্মিকতা প্রকাশ পূর্বক রাজ বিদ্রোহী হওয়াতে রাজ্যবাসী শান্ত স্বভাব অধন প্রজা মাঝেই দুঃখিত” ইত্যাদি।

তিনি আরও লিখেছেন, “যবনাধিকারে আমরা সর্বদাই স্বাধীনতা প্রাপ্ত হই নাই।, সর্বদাই অত্যাচার ঘটানো হইত।...এক্ষণে ইংরাজাধিকারে সেই মনস্তাপ একে কালেই নিবারিত হইয়াছে। আমরা অনায়াসেই ‘চার্চ’ নামক খৃষ্টীয় ভজনা মন্দিরের সম্মুখেই গভীর স্বরে ঢাক, ঢোল, কাড়া, তাসা, নহবৎ, সানাই, তুরী, ভেরী, বাদ্য করিতেছে। ছাড়াং শব্দে বলিদান করিতেছি, নৃত্য করিতেছি, গান করিতেছি, প্রজাপালন রাজা, তাহাতে বিরক্ত মাত্র না হইয়া উৎসাহ প্রদান করিতেছেন, মুসলমান জাতি যখন যুদ্ধরত এবং হিন্দুদের দরজায় দরজায় যুদ্ধের করুণ আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন তখন ঐ লেখক, কবি ও কয়েকটি পত্রিকার স্বনামধন্য সম্পাদক হিন্দু জাতির উদ্দেশ্যে লিখেছেন, “জগদীশ্বর আপনা ইচ্ছায় বিদ্রোহীদিগকে শাসন করুন। যাহারা বিদ্রোহী হন নাই তাহাদিগের মঙ্গল করুন, কোন কালে যেন তাহাদের রাজ ভক্তির ব্যতিক্রম না হয়। হে ভাই আমাদের শরীরের বল নাই মনে সাহস নাই, যুদ্ধ করিতে জানি না। অতএব প্রার্থনাই আমাদের দুর্গ, ভক্তি আমাদের অস্ত্র এবং নাম জপ আমাদের বল এত দ্বারাই আমরা রাজ সাহায্য করিয়া কৃতকার্য হইব।” ঐ সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১৮৫৭ সালে যখন হাজোরে হাজোরে মানুষ আমাদের জন্য মরছেন ও মারছেন মে মাসে বিশ তারিখে ‘সংবাদ প্রভাকর’ পত্রিকায় সম্পাদকীয়তে লিখলেন একটি মনমাতানো কবিতা।, “চিরকাল হয় যেন বৃটিশদের জয়, বৃটিশের রাজলক্ষী, স্থির যেন রয়।” আরও লেখা হয়েছে “উত্তর পশ্চিম প্রদেশের যে সকল স্থানে বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে ভাবত স্থানেই যবনেরা অস্ত্র ধারণ পূর্বক নিরাশ্রয় সাহেব বিবি, বালক, বালিকা এবং প্রজাদিগের প্রতি হৃদয় বিদীর্ণকর নিষ্ঠুরাচরণ করিয়াছে... যবনদিগের অন্তঃকরণে কি কারণে গভর্ণমেন্টের প্রতি বিরূপ ভাবের আবির্ভাব হইয়াছে তাহা আমরা কিছুই নিরূপণ করিতে পারিলাম না।” (দ্রঃ সংবাদ প্রভাকর ২৯-৬-১৮৫৭) মুসলমানদের উপর যখন যথেষ্টভাবে

ইংরেজ গুলি করে পাইকারী ভাবে হত্যা করতে লাগল তখন সমবেদনা বা মৌনতার বদলে লেখা হয়েছিল “বন্য পশু শিকার নিমিত্ত শিকারীগণ পরমানন্দে দলবদ্ধ হইয়া গমন করে শেতাঙ্গ সৈন্যগণ সেই রূপ পুলকিত চিত্তে সিপাহী শিকারে গমন করিতেছে,, নরাধম অকৃতজ্ঞদের আর রক্ষা নেই। (দ্রঃ ২২-৬-১৮৫৭, সংবাদ প্রভাকর) তাতীরা তোপী নানা সাহেব ও ঝাঁসীর রাণী তিন জনই অন্ততঃ মুসলমান নন তবু সে যুগের ঐ রকম সম্পাদক আর অধীন কবি সাথেকোকেদের দল তাঁদেরও বিরাট অপরাধ আবিষ্কার করেছিলেন তা হচ্ছে জগদীশ্বর ইংরেজ সরকারের সঙ্গে লাড়াই করা আর ইংরেজদের ছেলে মেয়েদের হত্যা করা। তাই লেখা হয়েছিল—নানা পাপে পটু ‘নানা’ নাহি শুনে না, না।

অধর্মের অন্ধখারে হইয়াছে কানা॥

ভাল দোষে ভাল তুমি ঘটালে প্রমাদ।

আগেতে দেখেছ ঘৃণু শেষে দেখ ফাঁদ॥

এমনিভাবে ঝাঁসীর রাণীর রক্তাক্ত মৃত্যুর উপর যে কৌতুকময় কলঙ্ক সীমাহীন ভাবে আরোপ করা হয়েছে তা কোন শিক্ষিত মানুষ ক্ষমা করতে পারে না। যথা—

“হ্যাদে কি শুনি বাণী, ঝাঁসীর রাণী

ঠোঁট কাটাকাটী।

মেয়ে হয়ে সেনা নিয়ে সাজিয়াছে নাকি।

নানা তার ঘরের ঢেকি।

হয়ে শেষে নানার নানী মরে রাণী

দেখে বুক ফাটে

কোম্পানীর মূলকে কি বাবুগিরি খাটে!”

আগেই বলা হয়েছে মুসলমানদের সঙ্গে কতক হিন্দুদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন তাই সেই সময় প্রচারিত হল “নানাপাপে নানা দন্ডতার লবে। এ বলে কি হিন্দু মাঝে দোষী হয়ে রবে? বিশেষ বাঙ্গালী ভেতো আমরা সবাই। কোন কালে কোনরূপ দোষমাত্র নাই। জয় হোক বৃটিশের, জয়, রাজ অনুগত যারা তাদের কি ভয়!”

১৮৫৭ সালে ঐ ঐতিহাসিক যুগ সন্ধিক্ষণে সংবাদ প্রভাকরে রাণী ভিক্টোরিয়ার প্রতি জানানো হল, “এই ভারত কিসে রক্ষা হবে ভেবনা মা সে ভাবনা। সেই “তাতীরা তোপীর” মাথা কেটে আমরা ধরে দেব “নানা” ॥ এইবার শেষ করছি সাংঘাতিক সংবাদ দিয়ে স্বাধীনতা বিপ্লবী বন্দীদের যখন ফাঁসী থেকে লাগল তখন “সংবাদ প্রভাকর” ইংরেজ সরকারকে সন্তুষ্ট হয়ে সাবাস দান করতেও এটুকু লজ্জাবোধ করেননি।

(দ্রঃ ২২-৬-১৮৫৭ ঘোষ, পৃঃ ২৪৩ সংবাদ প্রভাকর)।

উপরের এতকাত পড়ার পর ঈশ্বর চন্দ্র সন্দ্বন্ধে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমের একটি বিস্ময়কর মন্তব্য।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সন্দ্বন্ধে বঙ্কিম বাবু যে সব কথা লিখেছেন তার তিন টুকরো কথা এখানে উদ্ধৃতি দেয়া হচ্ছে। (১) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত খাঁটা জিনিষ বড় ভালবাসিতেন, মেকির বড় শত্রু, (২) অনেক সময়েই (কবির) ইয়ারকি বিশুদ্ধ...পরের প্রতি বিদ্বেষ শূন্য এবং...। (৩) এতটা প্রতিভা ইয়ারকিতেই ফুরাইল।” (দ্রঃ আধুনিক বাংলা কাব্যে হিন্দু মুসলমানদের সম্পর্ক মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, পৃঃ ২৩০)।

সুধী সমাজই বিচার করবেন ওপাত কতটুকু বিদ্যে শূন্য? আর বঙ্কিম বাবু কতটুকু সত্যবাদী?

বঙ্কিমচন্দ্র : বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন আর ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে মারা যান ৩৮ অব্দে জন্ম হিসাবে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে তিনি তরুণ বা পূর্ণ যুবক ছিলেন। আর সেই সময় সহস্র সহস্র যুবক স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপ দিয়ে গর্বের ইতিহাস সৃষ্টি করতে চাইছিলেন কিন্তু সেখানে বঙ্কিমের ভূমিকা নেগেটিভ না পজিটিভ তা আজ বিচার করতে বাকী নেই তবুও যতদিন সরকারী সাহায্যে বঙ্কিম একজন ঋষি, তিনি একজন সাহিত্য সন্নাট, তিনি একজন ভারতের স্বাধীনতার প্রথম শ্রেণীর জন্মদাতা বলে খ্যাতি লাভ করেছেন তাইতো তাঁর লেখা 'বন্দেমাতরম' আওয়াজ ভারতের আকাশে বাতাসে হুঙ্কার ছাড়ে।

কিন্তু ঋষি বঙ্কিম ইংরাজী শিক্ষায় এবং তাদের অন্ধ অনুকরণ উন্নতি করে একেবারে ভগবান ঈশ্বর ঠাকুর দেবতা সব কিছু অস্বীকার করে নাস্তিক হয়ে গিয়েছিলেন। (শ্রীম শ্রী শ্রী রাম কৃষ্ণ ও বঙ্কিমের কথোপকথনে বিবরণ দ্রঃ)। অবশ্য পরে তিনি নাস্তিক হয়ে এবং আরও উন্নতি করে মুসলমান বিদেষী হয়ে ইংরেজদের অত্যন্ত অনুগত হয়ে পড়েন। ঈশ্বর গুপ্তকে লেখার দিকে দিয়ে গুরু বলে মেনে নিন এবং গুরু ভাইদের মত নবীন চন্দ্র সেন, চন্দ্র নাথ বসু প্রভৃতি রক্ষণশীল হিন্দুর 'নব জীবন' পত্রিকায় নিজেই যুক্ত করেন। বঙ্কিম স্বীকার না করলেও আসলে তিনিও রামমোহনের অনুসরণকারী ছিলেন। কিন্তু কাউকে নিজের গুরু বলে মেনে নেয়ার মত উদারতা তাঁর ছিল না। বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেও যেমন তাঁর বাধনি তেমনি ভাবে রামমোহনের সাথে তাঁর ঠান্ডা লড়াই হয়েছিল। বঙ্কিম বুঝেছিলেন তাঁর নাস্তিকতার পড়তা ভাল নয়। কারণ রামমোহন আস্তিক হয়ে ইংরেজ দরদী হওয়া দেশের লোকের কাছে ততটা খারাপ লাগত না। যতটা খারাপ লাগত নাস্তিক অবস্থায় বঙ্কিমের ইংরেজ প্রেমিক হওয়া। তিনি আরও লক্ষ্য করেছিলেন রামমোহন মরেও অমর থাকবেন নতুন ধর্ম মত ব্রহ্ম ধর্মের স্রষ্টা হিসেবে। অথচ ইংরেজী শ্রেণী সকলেই তখন ব্রাহ্ম ধর্মে আকর্ষণ কিন্তু প্রাচীন পন্থীগণ ঠাকুর দেবতাদের পরিত্যাগ করতে খুব দ্বিধাবোধ করছিলেন। ঠিক সে মুহূর্তে তিনি হিন্দু ধর্ম আর ব্রাহ্ম ধর্ম ফিরিয়ে নতুন ধর্ম সৃষ্টি করলেন যেটার নাম "অনুশীলন ধর্ম"। কিন্তু সত্য কথা বলতে হলে বলতে হয় এটা ব্রাহ্ম ধর্মের বাচ্চা ছাড়া কিছু নয়। (বিপিনচন্দ্র পালের "নব যুগের ব্যঙলা" ১৩৬৪, পৃ ১৯০)

অনেকে বলেন বঙ্কিম আসলে অত্যন্ত সুবিধাবাদী আত্ম প্রচারক ও পরশ্রী কাতর ব্যক্তি। তাই তিনি ব্রাহ্ম ধর্মকে কাঠামো করে প্রাচীন হিন্দুদের ব্রাহ্ম ধর্মে যে সব আপত্তিকর সুর ছিল যথা-বিধবা বিবাহ, বহু বিবাহ রোধ, অস্পৃশ্যতা বর্জন, মূর্তিপূজার বিলোপ সাধন ইত্যাদি। এ সবগুলোর স্বপক্ষে ওকালতি আরম্ভ করলেন ফলে সেকালে লোকগুলো সহজেই তাঁর করতলগত হয় আর আধুনিক লোকরাও চিন্তায় পড়ে গেলেন কি করা যায়। অত্যন্ত দুঃখের কথা ব্রাহ্ম ধর্মে 'ছোট লোক' 'ভদ্র লোকের' ব্যবধান দূর করে যে মিলনের পথ চরিত হয়েছিল। তিনি বিদ্যাসাগর আবার ছোট লোককে ছোট লোক করে বাকীদের ভদ্রলোকের পাক্সা সার্টিফিকেট ধর্ম থেকেই বিতরণ করলেন। (দ্রঃ সৌরেন্দ্র মোহনের বাঙ্গালীর রষ্ট্র চিন্তা পৃঃ ১০৮)

রবীন্দ্রনাথ যে বিদ্যাসাগরের প্রশংসা করে বলেছিলেন, "তাঁহার প্রধান কীত্তি বঙ্গভাষা" তিনি আরও বলেন, "বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন তৎপূর্বে বাংলা ভাষার প্রথম সূচনা হইয়াছিল কিন্তু তিনিই সর্ব প্রথমে বাংলা গদ্যে কলা নৈপুণ্যের অবতারণা করেন.....গ্রাম্য পাণ্ডিত্য এবং গ্রাম্য বর্বরতা উভয়ের হস্ত হইতেই উদ্ধার করিয়া তিনি ইহাকে ভদ্র সমাজের সভার উপযোগী আর্য্য ভাষারূপে গঠিত করিয়া গিয়াছেন।"

বঙ্কিমও তাই সুরে সুর মিলিয়ে বলেছিলেন, "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা অতি সুমধুর বাংলা গদ্য লিখিতে পারে নাই আর পরেও পারে নাই। দ্রঃ বাংলা সাংখ্যিকো প্যারী চাঁদ মিত্রের স্থান-বঙ্কিমচন্দ্র ট্রট্রোপাধ্যায় যে হাতে বঙ্কিম লিখলেন 'আগে ও পরে পারেন নাই' সে হাতেই সুস্থ মস্তিষ্কে লিখলেন, 'বিদ্যাসাগর কঠিন সব সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করে বাংলা ভাষার ধাপটা খারাপ করে গেছেন।" বিদ্যাসাগরের বিখ্যাত বই 'সীতার বনবাস' এর জন্য তিনি "কান্নার জোলাপ ব্যতীত" কিছুই নয় বলেছেন।

বিদ্যাসাগরের মত লোককেও তিনি মূর্খ বলতে লজ্জবোধ করেননি। (দ্রঃ খণ্ড পৃঃ ২৭৯) বঙ্কিমের সাধারণ ভদ্রতা কতটুকু ছিল বিচারের জন্য আর একটি লেখা দেয়া হচ্ছে—“ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর নামে কলিকাতায় কে নাকি বড় পণ্ডিত আছেন, তিনি আবার একখানি বিধবার বিবাহের বহি বাহির করিয়াছেন। যে বিধবার বিবাহ দেয় সে যদি পণ্ডিত হবে তবে মূর্খ কে?”

(দ্রঃ অধ্যাপক বদরুদ্দিনের ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ দ্রষ্টব্য)।

মুসলমান জাতির ক্ষতি করেও হিন্দু জাতিকে উন্নতি করতে হবে এই কথাটি কারো মগজে থাকলেও অন্ততঃ কাগজে প্রকাশ করতে ন্যূনতম সভ্যতাতেও বাধা পড়ে। কিন্তু বঙ্কিম লিখছেন, "হিন্দু জাতি ভিন্ন পৃথিবীতে অনেক জাতি আছে। তাহাদের মঙ্গল মাত্রাই আমাদের মঙ্গল হওয়া সম্ভব নহে। অনেক স্থানে তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল। যেখানে তাহাদের মঙ্গরে আমাদের অমঙ্গল সেখানে তাহাদের মঙ্গল যাহাতে না হয় আমরা তাহাই করিব। ইহাতে পরজাতি গীড়ন করিতে হয় করিব। অপিচ যেমন তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল ঘটিতে পারে তেমনি আমাদের মঙ্গলে তাহাদের অমঙ্গল ঘটিতে পারে। হয় হউক আমরা সেজন্য আত্ম জাতির মঙ্গল সাধনে বিরত হইব না। পর জাতির মঙ্গল সাধন করিয়া আত্মমঙ্গল সাধিতে হয়, তাহাও করিব।" (দ্রঃ বঙ্কিম রচনাবলী, ২৩৯, ২ খণ্ড)

ইংরেজ সারা ভারতের জন্য ও গণশক্তিকে শক্ত কঠিন হাতে ভারতীয় ষাড়াশী দিয়ে চেপে পিষে তিলে তিলে শোষণ করত। ভারতীয় ষাড়াশী ছিল আমাদের দেশের অধিকাংশ দালাল জমিদারই কিন্তু সে জমিদারের তথা ইংরেজদের পরম প্রিয় ঋষী মহাশয় লিখলেন, "সকল জমিদার অত্যাচারী নহেন দিন দিন অত্যাচারী জমিদারের সংখ্যা কমিতেছে। কলিকাতাস্থ সুশিক্ষিত ভূস্বামীদিগের কোন অত্যাচার নাই যাহা আছে তাহা তাহাদের অজ্ঞাতে এবং অভিমত বিরুদ্ধে নায়েব গোমস্তা দ্বারা হয়।

"আমরা জমিদারের দ্বেষক নহি। কোন জমিদার দ্বারা কখনও আমাদের অনিষ্ট হয় নাই বরং অনেক জমিদারকে আমরা প্রশংসা ভাজন বিবেচক মনে করি।" (দ্রঃ বঙ্কিম রচনাবলী, ২ খণ্ড পৃঃ ২৯২) জমিদার মহা রাজাদের ভূমিকা প্রথম আযাদী আন্দোলনের আলোচনায় এক এবং সিরাজউদ্দৌলাকে অপসারণের বিষয়ে বেশ কিছু আলোচনা হয়েছে। কিন্তু বঙ্কিম নিজেই একজন কলিকাতাস্থ সুশিক্ষিত ভূস্বামী" বা জমিদার ছিলেন (দ্রঃ অধ্যাপক বদরুদ্দিন উমরের লেখা)।

সারা ভারতের প্রকৃত দরদীরা এমন কি জমিদার বংশের সৎ সন্তানরাও প্রকৃত শিক্ষিত হবার পর জমিদারী প্রথার বিরোধী হয়েছেন তার অনেক নজির আছে।

কিন্তু শিক্ষিত বঙ্কিম বললেন, "যাহারা জমিদারদিগকে কেবল মিথ্যা নিন্দা করেন আমরা তাঁদের বিরোধী। জমিদারদের দ্বারা অনেক সংস্কার হইতেছে। (বঙ্কিম রচনাবলী পৃঃ ২৯৭) জমিদারদের হাতে যতক্ষণ শক্তি থাকত ততক্ষণ খাজনা আদায়ের নামে তাদের বিলাসিতা ও ভোগবিলাসের খরচাও আদায় করা হত। এ জমিদারী ইংরেজ সরকার চিরস্থায়ীভাবে

জমিদারদের দেওয়ার ব্যবস্থা করেন এ ঐতিহাসিক কুখ্যাত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে বৃহত্তম দরিদ্র শ্রেণী, শোয়িত শ্রেণী বা প্রজা শ্রেণী সরকারের বিরুদ্ধে মৃদুমন্দ গুঞ্জন আরম্ভ করতই বক্ষিম বাণী অবতীর্ণ থেকে বিলম্ব হল না। “চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ধ্বংসে বঙ্গ সমাজে ঘোরতর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। আমরা সামাজিক বিপ্লবের অনুমোদক নহি।”

বিশেষ যে ব্যবস্থা ইংরেজরা সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া চিরস্থায়ী করিয়াছেন তাহার ধ্বংস করিয়া তাঁহারা এই ভারত মণ্ডলে মিথ্যাবাদী বলিয়া পরিচিত হন, প্রজাবর্গের চিরকালের অবিশ্বাস ভাজন হন এমত কুপরামর্শ আমরা ইংরেজদিগকে দিই না। যেদিন ইংরেজদের অমঙ্গলাকাজী হইব সেই দিন সেই পরামর্শ দিব।” (দ্রঃ ঐ পৃঃ ৩১০) ইংরেজদের ইঙ্গিতে জমিদারদের প্রজা পীড়নের বিরুদ্ধেও তিনি কিছু বলতে পারতেন কিন্তু তিনি লিখেছেন উল্টো “অনেক জমিদারের প্রজারাও ভাল নহে। পীড়ন না করিলে খাজনা দেয় না। সকলের উপর নালিশ করিয়া খাজনা আদায় করিতে গেলে জমিদারের সর্বনাশ হয়।” (দ্রঃ ঐ পৃঃ ২৯৮)

উপরোক্ত তথ্যগুলিতে আধুনিক গবেষকেরা প্রমাণ করতে সক্ষম থেকে পারেন যে তিনি ব্যক্তিগতভাবে মুসলমান বিদেষী জমিদার হিসাবে জমিদারের পক্ষীয় লোক ছিলেন বা পরশ্রী কাতর বা মিথ্যাবাদী ছিলেন কিন্তু স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরুদ্ধবাদী ছিলেন প্রমাণিত হওয়া কঠিন। কিন্তু ঐ অপরাধই হচ্ছে তাঁর ঐতিহাসিক অপরাধ, অবশ্য যদি প্রমাণের অভাব না হয়।

স্বদেশী আন্দোলনে যখন চারিদিকে বিলিতে জিনিস পত্র ব্যবহার করা বন্ধ করার নীতি প্রচারিত ও প্রচলিত থেকে থাকে সে সময় ইংরেজরা খুব ভীত হয়ে ওঠে যেহেতু তাদের ব্যবসার নামে শোষণের রাস্তা বন্দ হয়ে যাবার ব্যবস্থা এটা।

তখন ইংরেজ প্রেমিক বক্ষিম লিখলেন, “যদি (ইংরেজরা) কাহারো ক্ষতি না করিয়া মুনাফা করিয়া থাকে তবে তাহাতে আমাদের অনিষ্ট কি? যেখানে কাহারো ক্ষতি নাই সেখানে দেশে অনিষ্ট কি? আপত্তির সীমাংসা এখনো হয় নাই, আপত্তি কারকেরা বলিবেন যে, ঐ ছয়টি টাকায় দেশী তাঁতীর কাছে থান কিনিলে টাকা ছয়টা দেশেই থাকিত। স্থূল কথা, এ ছয় টাকা যে দেশী তাঁতী পাইল না তাতে কারো ক্ষতি নাই। তार्কিক বলিবেন তাঁতীর ক্ষতি আছে। এই থানের আমদানীর জন্য তাঁতীর ব্যবসা মারা গেল। তাঁতী থান বুনে না ধুতি বুনে। ধুতির অপেক্ষা থান সস্তা। সুতরাং লোকে থান পরে ধুতি আর পরে না। এজন্য অনেক ব্যবসায়ী লোপ হইয়াছে।”

“উত্তর। তার তাঁত বুনা ব্যবসা লোপ পাইয়াছে বটে, সে অন্য করুক না কেন? অন্য ব্যবসায়ের পথ রহিত হয় নাই। তাঁত বুনিয়া আর খাইতে পারেনা, কিন্তু ধান বুনিয়া খাইবার কোন বাধা নাই।” (দ্রঃ বক্ষিম রচনাবলী ২ খণ্ড পৃঃ ৩১১-৩১২)

এহু কলেরব বুদ্ধির ভয়ে কোন বিষয়েরই পূর্ণ তথ্য পরিবেশন সম্ভব নয় তবুও বক্ষিম ইংরেজকে শোষণ মনে করতেন না তাই ইংরেজদের শোষণের একটু চিত্র তুলে ধরা প্রয়োজন।

১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে টাকায় ১ মণ ৫ সের চাল পাওয়া যেত। ১৮১৪ সালে শোষণের ফলে টাকা প্রতি মাত্র ৩৭ সের চাল পাওয়া যেত। ১৮২১ সালে আরও শোষণে টাকায় ৩০ সের হয়। ১৮৩৫ সালে টাকায় ২৪ সের চাল। ১৮৭৫ সালে টাকায় ১৭ সের চাল। ১৯২৫ সালে এসে দাঁড়ায় টাকায় সাড়ে চার চাল মাত্র।

আমাদের দেশের কাপড় প্রস্তুতকারকদের বংশ ধ্বংস করবার জন্য কি পরিমাণ কাপড় আমাদানি করা হয়েছে তা একটু দেখা যাক, ১৮১৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বিলেতী কাপড় খুব একটা আসেনি। কিন্তু ১৮১৪ খ্রিষ্টাব্দে আট লক্ষ গজ কাপড় কলকাতায় পৌছায়। ১৮২১ সালে একেবারে দুই কোটি গজ। ১৮৩৫ সালে পাঁচ কোটি গজ। ১৮৭৫ সালে আনা হয় একষটি কোটি গজ। ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে একেবারে বিলেতী কাপড়ের পাহাড় এসে পরিমাণ হয় এক অব্যবহৃত ছাপান্ন কোটি গজ।

এবার ভারতকে শোষণ করে কি পরিমাণ বিলেতে নিয়ে যেত তার পরিমাণ দেখলেই বুঝতে সহজ হবে কেন বিপ্লবের প্রয়োজন ছিল। ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে ৬ কোটি ৫০ লক্ষ মণ গম আর দেড় কোটি মন তুলা নিয়া যাওয়া হয়েছে। পাট আড়াই কোটি মণ আর চা নিয়া যাওয়া হয়েছিল ৩৬ লক্ষ মণ। (দ্রঃ মায়ীশাতুল হিন্দ পৃঃ ৯৫)

উপরোক্ত হিসেবে ছাড়াও ভারতের বাইরে ১৯১৮ থেকে ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দের মাঝে আও ৫৬ কোটি ৫০ লক্ষ মণ চাল পাচার হয়ে যায়।

(বর্ণনাকারী শ্রী দয়াশংকর দোবে, “মজলুম কিষণ” পৃঃ ৮২)

এইগুলো জানার পর এইবার মহামিত ঋষি বক্ষিমের উপরের ওকালতিগুলি এবং নীচের উদ্ধৃতিগুলি পড়লেই অনুসন্ধিৎসুরা তাঁদের কর্তব্য ঠিক করবেন। বক্ষিম বলেন “বাণিজ্য বিনিময় মাত্র। আমরা যদি ইংল্যান্ডের বস্তাদি লই তাহার বিনিময়ে আমাদের কিছু সামগ্রী ইংল্যান্ডে পাঠাইতে হইবে নহিলে আমরা বস্ত্র পাইব না। আমরা কি পাঠাই? অধিকাংশের বিনিময়ে আমরা কৃষিজাত দ্রব্য যথা চাউল, রেশম, কার্পাস, পাট, নীল ইত্যাদি। ইহা বলাবাহুল্য যে, যে পরিমাণে বাণিজ্য বৃদ্ধি হইবে সেই পরিমাণ এই সকল কৃষিজাত সামগ্রীর আধিক্য আবশ্যক হইবে। সুতরাং দেশে চাষীও বাড়িবে। বৃটিশ রাজ্য হইয়া এ পর্যন্ত দেশের বাণিজ্য বাড়িতেছে সুতরাং বিদেশে পাঠাইবার জন্য বৎসর বৎসর অধিক কৃষিজাত সামগ্রীর আবশ্যক হইতেছে, অতএব এদেশের প্রতি বৎসর চাষ বাড়িতেছে। চাষ বৃদ্ধির ফল কি? দেশের ধন বৃদ্ধিও শ্রীবৃদ্ধি।” (দ্রঃ বক্ষিম রচনাবলী ২য় খণ্ড, পৃঃ ১১৩)

অতএব বক্ষিমের মুসলমান বিদেষ আসলে ইংরেজদের পদ সেবার নামান্তর। ইংরেজ চেয়েছিল কৃষক বা প্রজাদের শোষণ আর মুসলমান ও হিন্দুর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি। তাই তাদের স্বার্থেই করতে হয়েছিল কলকাতায় বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়। আর তারই ভিতর থেকে বাছাই করা ডিগ্রী পাওয়া দালাল নির্ধারণ। বক্ষিম উচ্চ শ্রেণীর ইংরেজ প্রেমিক ও ভারতের ক্ষতিকারক হিসেবে শীর্ষ স্থানীয় রূপে উল্লেখযোগ্য কি না তা বিচার করিতে কঠিন নেই।

তাই অধ্যাপক বদরুদ্দিন উমর লিখেছেন, “বক্ষিমচন্দ্র যে শুধু চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সৃষ্টি ভূমি ব্যবস্থা এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল প্রকার স্বার্থ ও সংস্কারের রক্ষক ছিলেন তাই নয়, তিনি ছিলেন তৎকালীন বুদ্ধিজীবী মহলে প্রতিক্রিয়ার সর্ব প্রধান প্রতিনিধি। এই কারণেই বক্ষিমচন্দ্রের সাহিত্য প্রচেষ্টা কোন দিকে যেমন নিযুক্ত ছিল কৃষক স্বার্থের বিরুদ্ধে, অন্যদিকে তেমনি তা সমান নিষ্ঠার সাথে নিযুক্ত ছিল ঈশ্বরচন্দ্রের সমগ্র চিন্তা ও সংস্কারের আন্দোলনের বিরুদ্ধে।” (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ, পৃঃ ১০৫-১০৬)

সাধারণ হিন্দুদের কাছে তিনি ঋষি উপহার পেলেও আসলে ওটা ইংরেজদেরই দেয়া পরোক্ষ উপাধি। তিনি আসলে ইংরেজ শাসককেই দেবতা বলে জানতেন। “তাই বক্ষিমচন্দ্র কঠোর ধর্মনিষ্ঠ হয়েছেন যেদিন ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও শিল্প এবং ভারতবর্ষের এ নিক্রাম ধর্ম একত্র হবে সেদিন মনুষ্য দেবতা হবে। (বাঙালীর রাষ্ট্র চিন্তা, সৌরেন্দ্র, পৃঃ ১০২)

ইতিহাসে যেটাকে সিপাহী বিদ্রোহ বলা হয়েছে সেই বিপ্লবের যারা যোগ না দিয়ে বিরোধিতা করেছে তারা যদি নেতা হয় যারা নীলকরদের অত্যাচারকে সমর্থন করেছে তারা যদি নেতা হয় তাহলে দেশের শত্রু কারা তা বলা খুবই কঠিন।

সৌরেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় তাই ঋষি মহাশয়ের জন্য লিখেছেন, “বাংলার সমকালীন বুদ্ধিজীবীদের মত তিনিও সিপাহী বিদ্রোহ সমর্থন করেন নি। আবার দীনবন্ধু মিত্রের একান্ত বান্ধব বঙ্কিমচন্দ্র নীরকরদের অত্যাচারদের অত্যাচার প্রত্যক্ষ করেও সে বিষয়ে নীরব থাকেন।” (বাঙ্গালীর রাষ্ট্র চিন্তা, পৃঃ ১১৪)

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা ‘উপরোক্ত সমকালীন বুদ্ধিজীবী’ বলতে কাদের বলা হয়েছে? যে কথা আগেই জানানো হয়েছে সারা ভারতের বিপ্লবের অবস্থা বা প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলনে নানা স্থানের জঙ্গী ভূমিকার আত্মত্যাগের কথা কিন্তু কলকাতা নীরব ছিল কেন? তার একমাত্র কারণ আশুতোষ, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি বিরাট প্রতিভাধারী ব্যক্তিরা শোষণ সরকারের ডিগ্রি প্রাপ্ত শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের সরকার চাকুরী দিয়ে, উপাধি দিয়ে, বশে রেখেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ‘বঙ্গ দর্শন’ পত্রিকা একটি ছেলে ধরার ফাঁদ ছিল বলা যেতে পারে। “বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনকে ঘিরে যেসব জ্ঞানী গুণীর সমাবেশ ঘটে তাঁদের মধ্যে ছিলেন দীনবন্ধু মিত্র, রামগতি ন্যায়রত্ন, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়, রামদাস সেন, ভূতেব মুখোপাধ্যায়, লালবিহারী দে, হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমুখ চিন্তানায়কগণ।”

তাই ‘বঙ্গ দর্শনের’ জন্য রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, বঙ্কিমের ‘বঙ্গ দর্শন’ আসিয়া বাঙ্গালীর হৃদয় একেবারে লুট করিয়া লইল।” অতএব প্রমাণ থেকে বাকী নেই যে অখণ্ডিত ভারতের রাজধানী কলকাতার বিপ্লবের বিরাট বহিঃশিখাগুলিকে ছাই। এর মত ঢেকে রেখেছিলেন তদানীন্তন উচ্চ শ্রেণীর নেতৃবৃন্দ। (রবীন্দ্র রচনাবলী, পঃ সরকার প্রকাশিত সংস্করণ, খণ্ড ১০, পৃঃ ৫৫) বঙ্কিম যে কোন তত্ত্ব অবলম্বন করেছিলেন তা এক কথায় বলা শক্ত। প্রথম জীবনে আন্তিক পরে নাস্তিক তার পরে আবার আন্তিক তারপর আবার ঋষি। তিনি একদিকে বলছেন, “সম্পূর্ণ ধর্মের সম্পূর্ণ আদর্শ, ঈশ্বর ভিন্ন আর কেই নেই। কিন্তু নিরাকার ঈশ্বর আমাদের আদর্শ হইতে পারেন না।” আরও বলেছেন, “জগদীশ্বর এক ছিলেন, বহু হইতে ইচ্ছা করিয়া এই জগত সৃষ্টি করিলেন” আবার তিনিই এই মত পোষণ করতেন যে, “ঈশ্বর এক, কিন্তু তিনটি পৃথক সত্তায় তিনি বিভক্ত। সেই ত্রিসত্তার একজন করেন সৃজন, অন্যজন পালন করেন ও অপরজন ধ্বংস করেন।” (দ্রঃ বাঙ্গালীর রাষ্ট্র চিন্তা, সৌরেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় পৃঃ ১১৬-১১৭)

আবার ঐ বঙ্কিমই যা দেখা যায় না ভাববাদ বা কল্পনাবাদ একেবারে উড়িয়ে দিয়ে বলেছিলেন, “প্রত্যক্ষই জ্ঞানের একমাত্র মূল, সকল প্রমাণের মূল” আবার তাঁরই লেখা ‘ধর্মতত্ত্বে’ তিনি পাগলের প্রলাপের মত লিখলেন, “সকল জ্ঞান প্রত্যক্ষমূলক নহে।” (দ্রঃ ঐ) এই প্রলাপের প্রলেপ চড়িয়ে বলতে দ্বিধা করলেন না “এই সকল মত এখন আমি পরিত্যাগ করিয়াছি।”

কমিউনিস্টরা তাঁকে গোড়ার চেয়ে গোড়ামীতে শীর্ষস্থানীয় মনে করলেও ভারতীয় কংগ্রেস কর্মীরা বোধ হয় তাঁকে এক নম্বর খাঁটি কংগ্রেসী মনে করবেন তারাও উপায় নেই। ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দে কংগ্রেস মহলে তিনি একটি বাণী পাঠিয়েছিলেন যার অর্থ কংগ্রেসীদের তিনি বিশ্বাস করতেন না যথা—“.....কিন্তু যে প্রণালীতে উহার কার্য পরিচালিত হইতেছে আজ পর্যন্ত উহা সাধারণে যোগদানের উপযুক্ত হয় নাই। উহার সমস্ত আন্দোলন যেন ক্ষণস্থায়ী ও অন্তসার শূন্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়।” (দ্রঃ ঐ)

ঐ বঙ্কিমই আবার ঠাকুর দেবতার কথা উল্টিয়ে দিয়ে সমাজকেই দেবতা বলেছেন, যেমন “সমাজকে ভক্তি করিবে। ইহা স্বরণ রাখিবে যে, মনুষ্যের যত গুণ আছে সবই সমাজে আছে। সমাজ আমাদের শিক্ষাদাতা, দণ্ড প্রণেতা ভরণ-পোষণ ও রক্ষাকর্তা। সমাজই রাজা, সমাজই শিক্ষক। ভক্তিভাবে সমাজের উপকারে যত্নবান হইবে।” (বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড পৃঃ ৬৭১ ধর্মতত্ত্বে) কিন্তু ঋষি একথা বলবার সময় হয়ত ভুলে গিয়েছিলেন যে সমাজের বৃহত্তর অংশ মুসলমান জনগণ ও হরিজন।

সাম্যবাদের গতি কোন দিকে বইবে সঠিক বুঝতে না পেরে তিনি ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৭৫ পর্যন্ত ‘বঙ্গদর্শনে’ সাম্যবাদের পক্ষে অনেক বাণী দান করেন। অবশ্য মুসলমান নিধন আর ছোট লোক নির্ধারণে তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান থাকলেও তিনি অনেকের কাছে সাম্যবাদী। “পরে গ্রন্থকারে (বঙ্কিম) সেগুলি প্রকাশের পর বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন যে ঐ বিষয়ে তাঁর মতের পরিবর্তন ঘটে। তাঁর বহুরূপী চরিত্রের বিচিত্রতা বেশী হলেও ঋষি উপাধি নেওয়ার দারুণ সখ তাঁর মনের মধ্যে ছিল তাই তিনি নিজেই তার জন্য ব্যবস্থা করেছিলেন। তাই লিখেছেন, “প্রাচীন ঋষি ও পণ্ডিতগণ অতিশয় প্রতিভা সম্পন্ন এবং মহাজ্ঞানী তাঁদের প্রতি বিশেষ ভক্তি করিবে, কদাপি অমর্যাদা ও অনাদর করিবে না.....আমিও সেই আর্ঘ্য ঋষিদের পদারবিন্দ ধ্যান পূর্বক তাঁহাদিগের প্রদর্শিত পথেই যাইতেছি।” (দ্রঃ ঐ)

বঙ্কিম আসলে মিঃ কোং এর মতালম্বী ছিলেন কিন্তু বাজারে চাহিদার সাথে তিনি ঘনঘন মত পরিবর্তনে খুব পটুতা প্রদর্শন করেছেন। মত পরিবর্তনের পরিমাণ এত বেশী হয়ে গিয়েছিল যে, ঋষি অমর্যাদা করা হলেও অন্ততঃ অল্প বিস্তার প্রতিবাদের ঝড় বইতে শুরু হয়, সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিম তাঁর বাণী বর্ষণ করলেন “আমার জীবনে আমি অনেক বিষয়ে মত পরিবর্তন করিয়াছি, কে না করে? মত পরিবর্তন বয়োবৃদ্ধি, অনুসন্ধানের বিস্তার এবং ভাবনার ফল। যাহার কখনও মত পরিবর্তন হয় না তিনি হয় অভ্রান্ত, দৈব্যজ্ঞান বিশিষ্ট নয় বুদ্ধিহীন এবং জ্ঞানহীন।”

বিশেষতঃ বাঙ্গালীরা বঙ্কিমকে নানা কারণে শ্রদ্ধা করে আসছেন। কিন্তু যাঁর বন্দোমাত্রম মন্ত্র ভারতের মাটিতে সর্বত্র প্রচারিত যাঁর ‘আনন্দ মঠ’ পুস্তক স্বাধীনতা যুদ্ধের বেদ, তাঁর একটু ইঙ্গিত হলে ভারতের সর্ব ভারতীয় ভাষা বাংলাই হত কিন্তু বাংলা, উর্দু, হিন্দি কোন ভারতীয় ভাষার জন্য তিনি সুপারিশ না করে ইংরেজীকেই তিনি সর্বভারতীয় ভাষা হিসাবে গ্রহণ করতে মত প্রকাশ করেন। (দ্রঃ বাঙ্গালীর রাষ্ট্র চিন্তা, পৃঃ ১৪৩)

ভারতের পলিটিক্যাল বেদ আনন্দমঠকে অনেকে ভক্তি শ্রদ্ধায় ভাষার ভাবে ভারাক্রান্ত করে ঐতিহাসিক উপন্যাস ও বিপ্লবাত্মক রই বলে মনে করেন কিন্তু স্বাধীনতার প্রকৃত প্রথম বিপ্লব ১৮৫৭ - তে প্রথমাক্ষ শেষ হয়, তখন তিনি নীরব। তাঁর আনন্দ মঠ প্রকাশিত হয় ১৮৮২ সালে।

যাঁরা আনন্দ মঠকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলেন তাঁরা ভ্রান্ত না বঙ্কিম ভ্রান্ত বোধবার সুবিধার জন্য মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, ‘রাজসিংহ’ বই ‘আনন্দমঠের’ পরে প্রকাশ হয়। তাতে তিনি ভূমিকায় লিখেছেন “পরিশেষে বক্তব্য যে আমি পূর্বে কখনও ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখি নাই।.....এই প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিলাম।” অন্যত্র আরও বলেন, “ইংরেজ ভারতের পরম উপকারী। ইংরেজ আমাদিগকে নতুন কথা শিখাইতেছে যাহা আমরা কখন জানিতাম না তাহা জানাইতেছে। যাহা কখন দেখি নাই, শুনি নাই, তাহা দেখাইতেছে, শুনাইতেছে, বুঝাইতেছে; যে পথে কখন চলি নাই, সে পথে কেমন করিয়া চলিতে হয় তাহা দেখাইয়া দিতেছে। সেই সকল শিক্ষার মধ্যে অনেক শিক্ষা অমূল্য। যে সকল অমূল্য রত্ন

আমরা ইংরেজদের চিত্ত ভাঙার হইতে লাভ করিতেছি, তাহার মধ্যে দুইটি আমরা এই প্রবন্ধে উল্লেখ করিলাম স্বাভাবিকতা এবং জাতি প্রতিষ্ঠা। ইহা কাহাকে বলে তাহা হিন্দু জানিত না।” (বঙ্কিম রচনাবলী, পৃঃ ২৪০-১)

অথচ তিনি ভারতের প্রাচীন ঋষিদের পথে চলছেন বলে ঋষি উপাধি পেলেন কিন্তু তিনিই জানাচ্ছেন তাঁর নয়, তাঁদের বরং ভারতের সমগ্র হিন্দু জাতির পথ প্রদর্শক ইংরেজ জাতি।

কোন ইংরেজ আসামীর বিচার ভারতীয় জজরা করতে পারতেন না এটা খুবই অসভ্য আভিজাত্য সন্দেহ নেই কিন্তু ভারতবাসী প্রতিবাদীদের প্রতিবাদে বঙ্কিম বলেছিলেন “ভারতীয়রা ইংরেজদের বিচার করতে পারেনা। কিন্তু শূদ্রেরা কি ব্রাহ্মণের বিচার করতে পারত?”

তাই বিপ্লবের জন্য যে কলম চলে সে কলম এ কলম নয়। উপন্যাস লেখায় গাঁজার গন্ধ আর বাজার হাত করার ইচ্ছা থাকে আর বিপ্লবীর লেখায় রক্তের রঙ, গন্ধ আর প্রাণ দেয়ার আকৃতি, বিপদকে ডেকে নেয়ার সুস্পষ্ট স্পর্ধা বিদ্যমান থাকে সেখানে।

স্বাধীনতার জন্য শিক্ষিত ছেলেরা যাতে মাথা না তুলে ভেড়ার মত মাথা নীচু করে থাকে তার জন্যই তিনি কি লেখেন নি? স্বাধীনতা দেশী কথা নহে, বিলাতী আমানী, ‘লিবার্টি’ শব্দের অনুবাদ..... ইহার এমন তাৎপর্য নয় যে রাজা স্বদেশীয় হইতেই হইবে।”

বঙ্কিমের জন্য আসল তথ্য প্রকাশ করে পূর্ণভাবে লিখলে একটি চিত্তাকর্ষক স্বতন্ত্র গ্রন্থ থেকে পারে আর তার জন্য আমাদের দেশে যোগ্য ছেলেও বহু আছে কিন্তু তা লিখে ‘ডক্টর’ টাইটেল পাওয়া যাবে কি? বরং তিনি ঋষি ছিলেন কি না? বিজ্ঞানী ছিলেন কি না? বিপ্লবী ছিলেন কি না? এগুলোর ‘হ্যাঁ’ উত্তরের পিছনে লেখা দিতে পারেন নামের সাথে ‘ডক্টর’ শব্দ যোগ হবে এ এক রকমের গ্যারান্টি বলা যায়। মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীরা এবং নিরপেক্ষ প্রকৃত শিক্ষিত হিন্দু বা যে কোন পাঠক যাঁর বঙ্কিম সম্বন্ধে সত্যিকার অভিজ্ঞতা আছে তিনি এক মুহূর্তেও বঙ্কিমকে শ্রদ্ধা করতে পারবেন বলে আমা করা যায় না। মুসলমান জাতির বিরুদ্ধে কলম ধরে সীমা অতিক্রম করেছিলেন কি না আজ পরিস্কার হয়ে গেছে তাঁর সহস্র সহস্র বাণীর মধ্যে দু এক টুকরা উত্থাপন করে শেষ করছি। “ঢাকায় দুই চারিদিন বাস করিলেই তিনটি বস্ত্র দর্শকদের নয়ন পথের পথিক হইবে। কাক, কুকুর এবং মুসলমান। এই তিনটিই সমভাবে কলহপ্রিয়, অতি দুর্দম, অজেয়। ক্রিয়া বাড়াতে কাক আর কুকুর। আদালতে মুসলমান।” বঙ্কিম বিখ্যাত আনন্দমঠেও লিখেছেন, “ধর্ম গেল, জাতি গেল, মান গেল, কুল গেল, এখন তো প্রাণ পর্যন্তও যায়। এ নেড়ীদের না তাড়াইলে আর কি হিন্দুর হিন্দুয়ানী থাকে?”

সবশেষে একথা বলা যায় ভারতবাসীকে তিনি ইংরেজের দাসে পরিণত করতে যে ‘নেমক’ খেয়েছিলেন সে ‘নেমকের’ বিনিময়ে তিনি পুরোমাত্রায় কাজ করেছেন নেমকহারামী বা ইংরেজের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেন নি। তাই সাহিত্য সন্মিতি, ঋষি, স্বাধীনতার মন্ত্রের স্রষ্টা, সেকালের শিক্ষিত ভারতবাসীর পথ প্রদর্শক বঙ্কিমের অসংখ্য বাণীর একটি মূল্যবান বাণী দিয়েই শেষ করছি “গৃহস্থ পরিবারের যে গঠন সমাজের সে গঠন। গৃহতীর ন্যায় পিতা মাতার ন্যায় রাজা সমাজের শিরোভাগ। তাঁর গুণে তাঁর দণ্ডে, তাঁর পালনে সমাজ রক্ষিত হয়ে থাকে। পিতা যেরূপ সন্তানের ভক্তির পাত্র রাজাও সেরূপ প্রজার ভক্তির পাত্র।” বঙ্কিম অবশ্যই ইংরেজ রাজত্ব রাজা ও রাণীর ক্ষেত্রে বাবা ও মার মতই শ্রদ্ধা রেখে কাজ করেছিলেন সন্দেহ নেই আর তাঁর দলবল ও পর পুরুষরাও তাঁর এ বাণী অক্ষরে অক্ষরে পালন করছিলেন

কিন্তু মুসলমান জাতি ইংরেজের প্রতি একেবারেই নেমকহারামী করেছে। অন্ততঃ ঋষির উপদেশ ও আদেশের উপেক্ষা করে এবং শেষে দলে দলে হিন্দুরাও ইংরেজকে শোষণ মনে করে হত্যা করতে দ্বিধা করেন নি।

রাজা রামমোহন রায়

রাজা রামমোহন রায় ১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৩৩ সালে পরলোক গমন করেন। রামমোহনকে হিন্দু সমাজের সংস্কার সাধনে বিশেষ ঐতিহাসিক ভূমিকায় দেখতে পাওয়া যায়। তবুও ঐতিহাসিক তথ্যের উপর দৃষ্টিপাত করলে বলা যায় যে, তার পূর্বেও হিন্দু ধর্ম বিশেষ করে ব্রাহ্মণবাদের বিপরীত অনেক পথ ও মতের প্রচারক বা প্রচারের সন্ধান মেলে। যথা—কর্তাভজা, বাউল, দরবেশ, সাঁই, ন্যাড়া, সংযোগী, জগমোহনী, সাহেব ধনী, বলরামী, সহজী, বিশ্বাসী, খুশী, যদু পাতিয়া প্রভৃতি অমুসলমান দল। এরা প্রত্যেকেই হিন্দু ধর্মাবলম্বী হলেও ধর্মে ও সমাজে পছন্দ সই স্থান না পেয়েই স্বধর্ম বিরোধী হয়ে উঠে। দু-একটি দল রাজনৈতিক বললে ভুল হয় না। বহু প্রাচীন মত যা আকবরের সময় ইরান হত আমদানী হয়েছিল তাদেরই বিবর্তন বাদ বিশেষ করে আউল বাউল ও ভণ্ড মারেফাতি ফকিরের দলগুলো ধর্ম বলে প্রচারিত হলেও এগুলো আসলে ইসলাম ধর্মে ক্ষেতের আগাছা।

উপরোক্ত দলগুলোর জন্য প্রখ্যাত ঐতিহাসিক অমলেন্দু দেবের মতানুযায়ী বলা যায় যে, “অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে হিন্দু সমাজের মধ্যে কয়েকটি ধর্মীয় দল পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে একেশ্বরবাদের স্বপক্ষে জাতিভেদ প্রথা ও অন্যান্য কুসংস্কারের বিরুদ্ধে জনমত গঠনে প্রয়াসী হয়।” (দ্রঃ বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ, পৃঃ ১-২) ফলে হিন্দু ধর্মের ক্ষয়িষ্ণুতা একটু কমে যায়। কাশীর রাজার মুখ্য সচিব শ্রী শীতল সিং এবং সেখানকার কলেজের লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ মুখরানাথ ফার্সী ভাষায় অনেকগুলো বই লিখেছেন এবং তাতে অনেক সম্প্রদায়ের মতামত, আচরণ প্রভৃতি লিপিবদ্ধ করেছেন। সমস্ত লেখক তাঁদের লেখাতে স্বাভাবিকভাবেই নিজস্ব প্রভাব প্রকাশে সক্ষম হন। পরে ফার্সী ভাষা বিলোপ থেকে লাগল ও এক শ্রেণীর মুসলমান এগুলোকে কেন্দ্র করে স্বধর্মে বিভ্রান্ত থেকে বাধ্য হয়েছে। কারণ তাদের অনেকের কাছে এ কুসংস্কার বদ্ধমূল ছিল যে যা আরবী, ফার্সী ভাষায় লেখা থাকে তাই পবিত্র, তাই নির্ভুল এবং গ্রহণযোগ্য। ফলে আউল বাউল প্রভৃতি দলগুলো না হিন্দু না মুসলমান রূপে পরিণত হয়। তাছাড়া তাদের অধিকাংশ লোকের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি মানবতা শূন্য।

আমরা কবির ভাষায় ছোট বেলা থেকেই আউল বাউল প্রভৃতি দলের লোকের উপর শ্রদ্ধাশীল। কিন্তু ভিতরের ইতিহাস এদের অত্যন্ত নোংরা, কদর্য বরং কুপরিষ্কার প্রসূত। এ প্রকার আউল বাউল, জিকির, নিরঞ্জন, শাহ সাহেব প্রভৃতি দলগুলো হিন্দু বা মুসলমান ছিল না। এরা গীত বা গানের মাধ্যমে বাহ্যিক উদার মতের প্রচারক ছিল। কালের বিবর্তনে আউল বাউল, মুসলমান ছিলনা। বাউলকে হিন্দু বলা হয় আর মারেফাতি ফকীর ও আউলকে অনেকে নির্বুদ্ধিতার কারণে মুসলমান মনে করেন। আসলে তারা উৎকট গোপনবাদী দল। (ক্ষিতিশ মোহন লিখিত ‘ভারতীয় মধ্য যুগে’ পুস্তক দ্রঃ)

রামমোহনের সমসাময়িক কৃষ্টিয়া জেলার দেউরিয়া গ্রামের লালন শাহ ও একজন বিখ্যাত বাউল কবি ছিলেন এবং তারই পাশের গ্রামে হরিশঙ্করপুরের মকসুদ সাঁই ও একজন খ্যাত বাউল গায়ক ছিলেন। এঁদের অনেক তথ্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪২ সালে প্রকাশিত মুহাম্মদ মনসুর উদ্দিন সম্পাদিত ‘হারানো লোক সঙ্গীত সংগ্রহ’ সংকলনে পাওয়া যায়। এসব যথেষ্টাচারী দলের প্রভাব সর্ব ভারতে বহুল প্রচারিত হয়েছিল। তবে এদের প্রায়

সকলেই ছিল মূর্থ নিরক্ষর প্রভৃতি নিম্নমানের মানুষ। অবশ্য কতিপয় শিক্ষিত বা প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সন্তান এতে যোগদান করে। উদ্দেশ্য ছিল অনুপযুক্তদের মাঝে নিজেদের উপযুক্ত রূপে প্রতিষ্ঠিত করে নেতা হয়ে নেতৃত্ব দেয়ার উৎকট বাসনা। একদিকে এরা পেত সম্মান অন্যদিকে ঐ শাহ সাহেব বাড়ল আউল মারেফাতি সাই এর দল তাদের প্রশংসা করে সাধারণ মানুষকে নিজেদের দিকে প্রলোভিত, প্রভাবিত আর আকর্ষিত করত।

এছাড়া ব্রাহ্মণদের গৌড়ামীর জন্য চারিদিকে একটা আন্দোলনের চাপা পড়া আশুত যেন ধিকি ধিকি জ্বলছিল। মাঝে মাঝে তার বহিঃপ্রকাশ হত। যেমন ইংরেজী ১৭৭১ সালে দেধরাজ ব্রাহ্মণ হয়েও বৈশ্য কন্যা বিবাহ করেন এবং পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। শেষে অনেক কারণে বা অনেকের আবেদনের ফলে অঞ্চলে শান্তি রক্ষার জন্য ঝাঝারের নবাব জনাব নজারত সাহেবের আদেশে তাঁকে কারাগারে আটক করা হয়। পরে তিনি মুক্ত হন এবং পুনরায় তাঁর পূর্ব প্রচার শুরু করেন। তাঁর নীতিতে মুসলমান ধর্মের গাঢ় রং দেখা যায়। কিন্তু তিনি পর্দা প্রথার সমর্থক ছিলেন না এবং রামায়ণ মহাভারতকেও সঠিক ও নির্ভুল মনে করতেন না।

(“ভারতীয় মধ্যযুগে” পুস্তক দ্রঃ)

ঠিক এ সময় আর এজন সাবক পলটু সাহেব ফৈজাবাদ আইরওয়ার অধিবাসী গোবিন্দর শিষ্য ছিলেন। পলটু বানিয়া বংশের লোক। তিনি ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর মূল কথা ছিল—“নীচ জাতিকে নষ্ট করিল উচ্চ জাতিরা, এবং নিজেরাও নষ্ট হইল।” “ভগবান কোন সম্প্রদায় বিশেষের সম্পত্তি নহেন।” এভাবে সারা ভারতে অন্ততঃ নাম করা দুই শত জন হিন্দু বিভ্রান্ত হয়ে নানা পথে স্বধর্মের বিরোধী হয়ে ওঠেন। তাঁরা ইসলাম গ্রহণকারী বলে স্বীকার করে মুসলমান হিসেবে নিজেদের প্রচার করতেন না। এসব স্বপক্ষে অনেক তথ্য পাওয়া যায় I. N. Sarkar এর লেখা In Indo Iranica - তে এঁদের প্রচারে প্রায় লক্ষ লক্ষ লোক দলভুক্ত হয়ে পড়েছিল। এঁরা না মুসলমান আর না হিন্দু ভাব নিয়ে থাকতেন। আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন তাঁর পুস্তক ‘ভারতীয় মধ্য যুগের ভূমিকায় তাদের সংখ্যা পঁয়ত্রিশ হাজার লিখেছেন। আসলে তিনি ১৯১১ সালের Census of India অবলম্বন করেই পঁয়ত্রিশ হাজার লিখেছেন। কিন্তু এমন বেশীর ভাগ লোকই ছিল যারা কাগজ বা কলম, সরকার আর সরকারী কাগজ পত্রের ধার ধারত না। লেখা পড়াও জানত না। আবার টিপ দিতেও আপত্তি ছিল। সে সমস্ত লোকের তালিকা নির্ধারণ করা এ রকম সেন্সাসের দ্বারা সম্ভব ছিল না।

পরে রাজা রামমোহন যে ব্রাহ্ম ধর্ম সৃষ্টি করেন তার উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু ধর্মের ক্ষয়রোধ করে আবার নূতন জীবন ধারা ফিরিয়ে আনা। তবে যাই হোক, তাঁর ব্রাহ্ম ধর্মে ঐ প্রকার পৈশাচিক এবং এবং নোংরামীর স্থান ছিল না। এটা ছিল একটা মুসলমান ধর্মের হিন্দুয়ানী রূপ। তবে তিনিও তাঁর ধর্ম প্রচারে কৃতকার্যতা লাভ করতে পারেন নি। প্রমাণ স্বরূপ ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা দেখলেই যথেষ্ট হবে। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে সর্ব ভারতীয় লোক সংখ্যার মধ্যে ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা ছিল সারা ভারতে মাত্র পাঁচ হাজার পাঁচ শত চার জন।

Census of India, 1911. vol-1. Part-1, Page-123. Calcutta ফাইল দ্রষ্টব্য)

ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে রামমোহনের মনোভাব নিয়ে যথেষ্ট বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে শ্রী সুপ্রকাশ রায়ের লেখা ‘ভারতের কৃষক বিদ্রোহ’ এবং রমেশ চন্দ্র মজুমদারের লেখা ‘রামমোহন’ ইত্যাদি প্রমাণিক পুস্তক থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাজা রামমোহন রায়ের ইংরেজ প্রীতি যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল। তিনি ইংরেজ রাজত্বকে স্বাগতম জানিয়ে ছিলেন। ভারতবর্ষে “ব্রিটিশ কলোনাইজেশন্” অর্থাৎ ব্রিটিশ উপনিবেশকে তিনি সমর্থন করতেন। নিঃসন্দেহে

এই অভিযোগ যেকোন ক্ষেত্রে সত্য হলে তাঁকে স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা বলে বরণ করার কোন কথাই ওঠেনা বরং তাঁকে স্বাধীনতার শত্রু বলতে প্রকৃত বুদ্ধিজীবীদের কাউকে বিরত রাখা সম্ভব নয়।

রামমোহনের দাবী ছিল অসভ্য ভারতে ইংরেজ না থাকলে ভারত সভ্য হবেনা। ইংরেজদের টিকিয়ে রাখতে এবং ইংরেজদের অত্যাচারের হাতিয়ার ছিল জমিদার শ্রেণী। তিনি ছিলেন এই জমিদারী প্রথার একজন পাকা সমর্থক। ইংরেজ আমলে নিষ্ঠুর নীলকরদের অত্যাচারকেও তিনি প্রশংসা করতে ছাড়েননি। তাঁর মতে ‘নীলকররা দেশের উপকার করছে।’ ইংরেজের ভারত আক্রমণ এবং ছলে বলে কৌশলে ভারতকে গ্রাস করার অন্যায়কে দোষ না দিয়ে তাদের অপরাধকে চাপা দিয়ে রামমোহন বলেছেন, ‘দেশীয় শাসকদের পারস্পরিক কলহ, ভারতের তদানিন্তন নেতাদের কাপুরুষতা, সামরিক শক্তি বিশেষ করে নৌবিভাগের দৌর্বল্য প্রভৃতি কারণে ইংরেজ আধিপত্য স্থাপিত হয়। অবশ্য কথাগুলি অনেকাংশে সঠিক হলেও তাই বলে ভারতবাসীর কাপুরুষতাকে মোটেই স্বীকার করা যায়না।

Susovan Chandra Sarkar লিখিত Rammohan Roy on India Economy - তে রামমোহনের দোষগুল ওজুহাতের আচ্ছাদনে ঢেকে ফেলার প্রয়াস পেয়েছে। যেমন বলা হয়েছে তিনি ইংরেজদের টিকে থাকা চেয়েছিলেন বটে, কিন্তু মাত্র কয়েক যুগের জন্য, চিরদিনের জন্য নয়। ইংরেজের উপর বিদেশী বলে যাঁরা ঘৃণা পোষণ করেন আসলে তার ন্যায্য কারণ হচ্ছে এই যে ইংরেজ এদেশকে নিজের মনে করতে পারেনি, তাই বাস করবার চেষ্টাই করেনি। শুধু এখানকার সম্পদ শোষণ করে বিলেতকেই সমৃদ্ধশালী করেছে।

মিঃ সরকারের ঐ পুস্তকে আরও পাওয়া যায় যে রামমোহন ইংরেজ জাতিকে ভারতের উন্নতির জন্য বসবাস করার অনুরোধ করেন এবং ভারতবাসীকেও নানাভাবে নানা দিকে নানা পদ্ধতিতে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে প্রয়াস পান। B. N. Ganguli - মশাই তাঁর পুস্তকে রামমোহনের উপরোক্ত অভিযোগকে ঢাকা দেওয়ার বিষয়ে বিশেষ আগ্রহী। ইংরেজ কর্তৃক নীলচাষ সারা ভারতে এক অত্যাচারের ইতিহাস, নিপীড়ন আর শোষণের ইতিহাস। কিন্তু রামমোহন লর্ড উইলিয়াম বেনটিক এবং শ্রী দ্বারকানাথের মতে মত মিলিয়ে সুরে সুর মিলিয়ে এই মত সমর্থন করতেন যে, ইংরেজ কর্তৃক নীলচাষ দেশের কল্যাণ হয়েছে বা হবেও যেহেতু জমির দাম বৃদ্ধি হবে এবং ভারতবাসী তাদের কাছে চাকুরী পাবে বা পাচ্ছে আর রাস্তা-ঘাটের উন্নতি হয়েছে এবং আরও হবে। তবে অত্যাচার যদিও স্বীকার করা হয় তবে তার চেয়েও তুলনামূলকভাবে ভারতবাসীর লাভ অনেক বেশী। তাই ইংরেজ শাসনকে তিনি “বিধাতার আশীর্বাদ” বলে মনে করতেন। অথচ H. C. Sarkar লিখিত Life and letters. সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা, ‘ভারতের শিক্ষা বিপ্লব ও রামমোহন’, হুমায়ুন কবীরের সুবিখ্যাত পত্রিকা “চতুরঙ্গ” এর ১৯৬৬ সালে বৈশাখ ও চৈত্রের লেখা থেকে বেশ প্রমাণ করা যায় যে শুরু থেকেই ইংরেজদের নীলচাষ অভিযান অত্যাচারের উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছিল।

ইংরেজ জানত ভারতবাসীর বেশ একটা অংশ লবণ তৈরী করে জীবিকা নির্বাহ করে, যাদের বলা হত মলাঙ্গী। তবুও তারা বিলেত থেকে লবণ আমদানী আরম্ভ করে দিল। বলাবাহুল্য ইংরেজ প্রেমিক রামমোহনই ইংরেজকে বিলেত থেকে লবণ আনতে প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এ বিষয়ে নিম্নের একটি উদ্ধৃতি খুবই অনুধাবনযোগ্য।

“ইংরেজ স্বার্থ উদ্ধারের উদ্দেশ্যেই রামমোহনের মত ব্যক্তি ইংরেজ কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন বাংলাদেশে লবণ প্রস্তুত বন্ধ করে ইংল্যান্ড থেকে লবণ আমদানীর।

হয়েছিলও তাই। এর ফলে একদিকে দেশীয় লবণ শিল্পের উচ্ছেদ হয়েছিল, লক্ষ লক্ষ লবণ শিল্প শ্রমিক বেকার হয়েছিল এবং অন্যদিকে রামমোহনের শ্রেণীভুক্ত ব্যবসায়ীরা সেই ব্যবসাতে অংশগ্রহণ করে ইংরেজের মুনাফার এক ক্ষুদ্র অংশ নিজেদের পাতে উঠিয়েছিলেন। রামমোহনের ও তাঁর শ্রেণীভুক্ত অন্যান্যদের এই কর্মের ফলে দেশীয় অর্থনীতির বিকাশ না ঘটে তার ধ্বংসের পথই প্রশস্ত হয়েছিল।”

(দ্রষ্টব্য The Economic History of India, Romesh Dutta, Vol-2, P-103-10)

ভারতীয় লবণ ও বিদেশী লবণের মধ্যে মূল্যের বিশেষ পার্থক্য ছিলনা। কিন্তু ইংরেজ এক প্রকার বিনা লাভে বা অল্প লাভেই লবণ আমদানী করে। উদ্দেশ্য ছিল গরীব ভারতবাসী প্রতিদ্বন্দীতায় দাঁড়াতে না পেরে ব্যবসা ছেড়ে দিলেই ইংরেজদের ওটা একচেটিয়া হবে ফলে শোষণ আর শাসনের অবস্থা আর একধাপ উন্নত হবে। তাই ইংরেজ চেয়েছিলো দরিদ্র ভারতীয় লবণ ব্যবসায়ীদের লবণের কাজ ছাড়িয়ে দিয়ে অন্যদিকে অন্য কাজে জুড়ে দিয়ে ব্যবসা হাতে করা এবং ইচ্ছামত দর চড়াবার রাস্তা খোলা। এক্ষেত্রেও রামমোহন মল্যঙ্গীদের মিষ্ট পরামর্শ দেন যে, তারা বেকার হলেও তাদের জন্য অন্য কাজ দেওয়া যেতে পারে। যথা বাগানের মালী, বাড়ীর চাকর ও দিনমজুর প্রভৃতি।

ইংরেজের উপর সাধারণ দরিদ্র শ্রেণীর নাগরিকদের অনেক অভিযোগগুলোও স্মরণ করা যেতে পারে আর রামমোহনের সঙ্গে ইংরেজদের সম্পর্কের পরিমাণ ও গভীরতাও উপলব্ধি করা সম্ভব হবে। অভিযোগকারীদের উত্তরে রামমোহন বলেন—সাধারণ লোকের উন্নতি না হওয়ার কারণ তাঁরা সরকারের সম্বন্ধে ‘অজ্ঞ এবং উদাসীন’। যেসব অত্যাচার তাঁরা ভোগ করেন তার জন্য দায়ী করকার নয় বরং সরকারী কর্মচারী। আর চাকরী না পাওয়ার কারণ ইংরেজের অধীনে চাকরী করা তাঁরা অসম্মানবোধ করেন। ফলে যারা সরকারের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়েছেন তাঁরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদারীর মালিক হয়েছেন এবং ব্যবসা বাণিজ্য করে সম্পদশালী হয়েছেন। তাঁরা উপলব্ধি করেছেন “ব্রিটিশ শাসন দেশের পক্ষে আশীর্বাদ স্বরূপ”। আর যারা খাপ খাইয়ে নিতে পারেন নি তাঁরা আজ অনুন্নত। এর জন্য দায়ী তাঁরা নিজেরাই সরকার নয়। S. C. Sarkar এর On India Economy পুস্তকে রামমোহনের লেখা উল্লিখিত আছে—

“But I have no hesitation in stating, with reference to the general feeling of the more intelligent part of the native community, that the only course of policy which can ensue their attachment to any form of the government would be, that of making them eligible to gradual and merits, to Situations of trust and respectability in the State.”

যাই হোক, রামমোহন নাস্তিক ছিলেন না অবশ্যই। এর অনেক প্রমাণ তাঁর লেখা এবং কর্মের মধ্যে পাওয়া যায়। তাছাড়া ইংরেজী ১৮৩৩ সালে ইংল্যান্ডের কমিউনিষ্ট নেতা মিঃ রবার্ট আওয়েন তাঁকে সমাজতন্ত্রে দীক্ষা দিতে গিয়ে ধর্ম নিয়ে একমত থেকে পারেন নাই। আওয়েনের মতে রাজনীতিতে ধর্মের কোন স্থান নেই। কিন্তু রামমোহনের ধারণা ছিল মানবিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টি প্রসূত। এমনকি পারিবারিক ক্ষেত্রেও ধর্মের এক বিরাট অবদান এটা তিনি স্বীকার করতেন। তাই শুধুমাত্র সমাজতন্ত্রে নিজেকে মিশিয়ে দিতে পারেন নি।

ইংরেজ শাসনের সময় তদানীন্তন জমিদারই শাসকের সহায়, পৃষ্ঠপোষক, প্রচারক ও প্রশংসাকারী ছিলেন। রামমোহন নিজেও একজন জমিদার সন্তান। তাই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথার বিপক্ষে তিনি প্রতিবাদ করা তো দূরের কথা তৎপরিবর্তে প্রশংসা ও সমর্থনই করে গেছেন। তাই জনৈক প্রভাবশালী লেখক লিখেছেন—“তথাকথিত স্বাধীনতার পূজারী রামমোহন। যখন গ্রামাঞ্চলে স্বাধীনতার জন্য, ইংরেজ বিতাড়নের জন্য এর দরিদ্রতার বিরুদ্ধে লড়াবার জন্য গুরু করতাই ব্যস্ত ছিলেন। রামমোহন জমিদারী প্রথাকেই আদর্শ ভূমি ব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণ করেন। এইসব উক্তি গভীর তাৎপর্য বহন করে।”

অবশ্য রামমোহন সারা জীবনে যত কিছু লিখেছেন ও বলেছেন তাতে খুঁজলে হয়ত দেখা যাবে তাঁর মতের প্রতিকূল কথাও আছে কোথাও কোথাও। কিন্তু এতদু সত্ত্বেও বলা যায়, তাঁর লেখা ও বলাই সব সময় মাপকাঠি না হয়ে যদি বলা, লেখা এবং তাঁর কাজের দিকে লক্ষ্য করা যায় তবে তাঁর সম্বন্ধে আমাদের উপরি উক্ত ধারণা পোষণ করতে কোন বাধা থাকে না। নিরপেক্ষ দৃষ্টি ভঙ্গীতে রামমোহন রায়কে একজন যথার্থ আন্তিক বলা যেতে পারে কিন্তু স্বাধীনতা আন্দোলনের নায়ক বলে কঠিন এবং অনেকের দৃষ্টিতে অসম্ভব। একজন ব্যাধের নিষ্ঠুরভাবে পাখী মারাই ঐতিহাসিক কর্ম যদিও সে কোন দিন আহত পাখীর জন্য সমবেদনা জানাই। দুঃখের বিষয় শুধু রাজা রামমোহন নয় আর আরও অনেক তদানীন্তন নেতার লেখনীর মধ্যেও ঐ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুনাম ঘোষিত হয়েছে। মাননীয় রমেশ দত্ত তাঁর ‘Famines in India’ গ্রন্থে এ কুপ্রথার স্বপক্ষে ওকালতি করেছেন। দত্ত মহাশয়ের ‘Economic History of India Under Early British Rule’ গ্রন্থেও পাওয়া যায় “চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে দেশে এমন কোন দুর্ভিক্ষ হয়নি যার ফলে বহুলোক মারা গেছে, বরং এই ব্যবস্থায় সমগ্র কৃষক সমাজ উপকৃত হয়েছে।”

অনেকের মতে, ইংরেজ সৃষ্ট বিরাট একটি শিক্ষিত শ্রেণী ছিলেন যারা ইংরেজের ভারত শোষণের মাধ্যম ছিলেন। তাদেরও উভসত্ত্ব ভোগী নাম দেওয়া চলে। অনুন্নত জনসাধারণের কাছেও তাঁরা ছিলেন গুরু দেব। অজ্ঞ মানুষেরা তাঁদের পালকি, ঘোড়া ও ঠাটবাট দেখেই শ্রদ্ধায় ও সম্মানে মাথা নত করত আর দু-একটি ইংরেজী দরখাস্ত প্রভুর দরবারে লিখে সঙ্গে সঙ্গে সুফল দেখিয়ে সাধারণ মানুষ কৃতজ্ঞতা নিবেদনে গদ গদ হয়ে পড়তে। অন্যদিকে ইংরেজ দরবারেও তাঁদের সম্মান ছিল। মধ্যে উভসত্ত্ব ভোগীর দল ইংরেজের বিরুদ্ধেও সময়ে সময়ে বলতেন ও লিখতেন যা নিছক অভিনয়ের নামান্তর ছিল।

ইংরেজ জাতি সিরাজদ্দৌল্লার পতনের পর থেকেই ভারত শোষণের মাত্রা পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করে। কেনে এক সাহেবের মতে প্রতি বছরে দু মিলিয়ন পাউণ্ড ধন-সম্পদ ভারত থেকে পাচার থেকে থাকে। এ বহন নীতির উপর দৃষ্টিপাত করেন বিখ্যাত রাজনীতিজ্ঞ মিঃ বাকু তাঁর রচিত Ninth Report গ্রন্থের মাধ্যমে। রামমোহনের পক্ষে বলা যায় যে, তিনি ভারতে ইংরেজদের স্থায়ী বসবাসের পক্ষপাতী। তার কারণও তিনি একটা মনে করতেন যে ইংরেজ এখানে স্থায়ীভাবে বাস করলে দেশের সম্পদ দেশেই থাকবে। কিন্ত স্বাধীনতাকামী নেতার পক্ষে এটাই স্বাভাবিক ছিল যে ইংরেজকে ভারত থেকে বিতাড়নের ব্যবস্থা করা। ফলে চারিদিকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ছোট বড় অনেক বিদ্রোহই যখন ঘটে চলেছিল তখনও বাবু রামমোহনের ইংরেজ মুক্ত ভারতবর্ষ, শোষণমুক্ত ভারতের জন্য স্বাধীনতার পরিবর্তে অধীনতার যুক্তি প্রদান সঠিক হয়েছে বলে আজকের বুদ্ধিজীবীরা এক বাক্যে স্বীকার করে নেবেন—এ রকম ভাববার পিছনে কোন যুক্তি আছে বলে মনে হয় না।

শোষণের ফলে দেশের অর্থনৈতিক মান এত নীচে নেমে গিয়েছিল যার প্রমাণ রামমোহনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ থেকে পাওয়া যায় “গ্রামের গরীবদের তরকারী খাবার সাধ্য ছিলনা, শুধু ‘লবণ ভাত’ খেত ‘বলাবাহুল্য ইংরেজদের দোষ দেয়ার পরিবর্তে তিনি দেশের ও দেশের দোষ ধরে সমাজের কল্যাণ করতে চেষ্টা করেছেন। তিনি মাংস খাবার উপর খুব জোর দিয়েছিলেন। নানা দেশের জনসাধারণের পরিবেশ, পরিস্থিতি ও আহাৰ্যের সমালোচনা করে তিনি জাত হিন্দুদের খুব জোর দিয়ে বলতেন মাংস খেতে। বহুদিন দিন পর বিবেকানন্দের কণ্ঠে যেন এসব কথাই অনেক বলিষ্ঠতার সাথে উচ্চারিত হয়।

রামমোহন শুধু ব্যক্তিগত ভাবে ইংরেজকে থাকতে আবেদন করেছিলেন তাই নয় বরং তাঁর অনুগত বান্ধবদের সাথে নিয়েই তাঁর এ আবেদন। ১৮২৯ খ্রিষ্টাব্দে রামমোহন, দ্বারকানাথ, প্রসন্ন ঠাকুর প্রমুখ বিখ্যাত নেতাগণ ইংরেজদের এখানে বাস করবার আইনগত অনুমতি প্রার্থনা করেন। আর ১৮৩২ খ্রিষ্টাব্দে হাউস অব কমন্স এর কাছে তিনি নিজেও বিশেষভাবে প্রার্থনা করেছিলেন।

[(ক) রামমোহন রচনাবলী, ৫২৯ (খ) সমাচার দর্পন ২৬-১২-১৮২৯, উদ্ধৃত সিত কুমার ভট্টাচার্য রচিত বাংলার নব যুগ ও বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাধারা, পৃঃ ২৯]

সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ঘটনা হল এটাই যে, যখন স্বদেশে নীলকর অত্যাচারের স্তীমরোলার চলছিল প্রকাশ্য চাবুক মারা আর আঙ্গুল কেটে দেয়া ইত্যাদির মাধ্যমে ঠিক সে সময়েই আবেদন। তাই আবেদনটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ও গবেষণার বস্তু।

রামমোহনের একটা সুনাম আছে যে, ইংরেজ যখন সংবাদ পত্রের স্বাধীনতার আঘাত হেনেছিল তখন তিনি খুব জোরালো প্রতিবাদ করেছিলেন। কিন্তু আজকের সমীক্ষায় আমরা এই সিদ্ধান্তে পেরেছি যে, তিনি দেশের স্বার্থে প্রতিবাদ করেন নি বরং সরকারের পক্ষেই ওকালতি করছিলেন। তিনি কিভাবে প্রতিবাদ করেছিলেন তার অন্তর্নিহিত স্বরূপ তুরে ধরলেই এ সত্য সহজে প্রমাণিত হয়। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার প্রয়োজনে রামমোহন বলেছিলেন, “....এই স্বাধীনতা দরকার কারণ তা না হলে জনসাধারণ অভাব অভিযোগ স্বাধীনভাবে সরকারকে জানাতে পারবে না এবং ফলে সরকারের পক্ষে দেশের প্রকৃত অবস্থা বিপুলী শক্তি জোরদার হবে এবং পরিণতিতে তা হয়ে দাঁড়াবে বৃটিশ শাসনের পক্ষে বিপজ্জনক।” (দ্রঃ অধ্যাপক বদরুদ্দিন উমর সাহেবের লেখা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ পৃষ্ঠা, ১৪।)

উল্লেখ করা যেতে পারে এই দুই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে এদেশে সংবাদপত্র ও মুদ্রা যন্ত্রের স্বাধীনতা প্রয়োজন এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই ইংরেজ কর্তৃপক্ষের কাছে সংবাদ পত্রের স্বাধীনতার জন্য রামমোহনের জোরালো আবেদন। এর মধ্যে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য আর দেশপ্রেম কোথায় আছে তা সুবিবেচক পাঠক পাঠিকারাই বিবেচনা করবেন।

দেশের দরিদ্র কৃষক আর ইংরেজ সরকারের সাথে যখন সংগ্রামের বহিঃশিখা জুলে উঠেছে ঠিক সে সময় ‘সংবাদ প্রভাকর’ পত্রিকা যে ভূমিকা নিয়েছিল তা থেকে পরিষ্কার প্রমাণিত হবে রামমোহন পুরোপুরি ইংরেজের সাহায্যকারী ও পরম আত্মীয়ের ন্যায়। (দ্রষ্টব্য ‘সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজ চিত্র’। প্রথম খণ্ড সংবাদ প্রভাকর। বিনয় ঘোষ)

রামমোহন হিন্দু ধর্মের কঠিন পুরোহিতবাদ বা ব্রাহ্মণবাদের বিরুদ্ধে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহস করেন নি। অবশ্য তিনি ঠিকই বুঝেছিলেন যে এ অসম্ভব তাই নূতন ধর্ম

স্রষ্টার ভূমিকায় ব্রাহ্ম ধর্মের জন্ম দিলেন। কিন্তু তাতেও তিনি অনেক শ্রম, অর্থ আর সময় কাটিয়ে নাস্তিক, মুসলমান, মৌলবী, (রামমোহনকে ‘জবরদস্ত মৌলবী’ বলা হত। কারণ সে যুগে পাটনার বড় মাদ্রাসা থেকে তিনি ফারসী ও উর্দুতে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন।। তিনি এ সমস্ত ভাষায় কিছু বই পুস্তকও লিখেছেন।) প্রভৃতি উদ্ভট উপাধি লাভ করেও সাফল্য অর্জনে ব্যর্থ হন। কারণ তিনি অনেক সংগ্রামী সমাজ সংস্কারক নেতা তৈরী করে তাঁদের পুরানো মনোভাবের পরিবর্তন ঘটিয়ে অনেক কিছু করলেন কিন্তু নিজে স্বয়ং ব্রাহ্মণের পৈতা পরিত্যাগ করতে পারেন নি। (দ্রঃ রামমোহন রচনাবলী ভূমিকা ডক্টর অজিত কুমার ঘোষ। পৃষ্ঠা ২১।)

রামমোহন জাতিভেদ প্রথার বিরোধী ছিলেন এবং খাদ্যাদির ব্যাপারে যা পুষ্টিকর তাই খেতে বলতেন। তিনি মূর্তিপূজার ঘোর বিরোধী ছিলেন এবং এক স্রষ্টাতে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর লেখায় কথায় যা পাওয়া যায় তার সাথে তাঁর কাজের অনেক গরমিল দেখা যায়। যেমন তিনি যে মতবাদই প্রচার করুন না কেন অব্রাহ্মণদের খাদ্য তিনি কোন দিনও গ্রহণ করেন নি এবং অন্য জাতিভুক্ত লোকদের সাথে একত্রে আহার পর্যন্ত করতেন না। ব্রাহ্মণের পবিত্র সূত্র উপবীতও তিনি নিজদেহে দারণ করতেন। (দ্রঃ রামমোহন রচনাবলী পৃষ্ঠা ২১)

১৮৪৭ সালেই তাঁর মতবাদের উপর ধর্মের নাম ‘ব্রাহ্ম ধর্ম’ বলে প্রথম ঘোষণা করা হয়। তিনি হিন্দু ধর্মের ‘সনাতন ধর্ম’ বলতে যা বোঝা যায় তার সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে লড়াই করে তৃপ্তি পেতেন। যেমন তিনি নিজের এক পুত্রের বিবাহ দিয়েছিলেন একজন বিধবার সঙ্গে।

রামমোহনকে শিক্ষিত মুসলমান সমাজের জন্য ইংরেজের আনুকূল্যে অনেক কিছু লিখতে ও বলতে হয়েছে। কারণ সারা ভারতে মুসলমান শিক্ষিত সমাজ মানেই ফারসী ও আরবী জানা লোক। এদিকে রামমোহনও আরবী ফারসী আগে থেকেই জানতেন। তিনি বাংলা ইংরেজী বাদ দিয়ে তথা কথিত মুসলমানী ভাষায় কয়েকটি বই লিখেছিলেন। যথা ‘তহফাৎ-উল-মুয়াহহিদিন’ ও ‘মোনাজারাৎ-উল-আদিয়াম’ প্রভৃতি। শুধু তাই নয় শিক্ষিত মুসলমান সমাজের উদ্দেশ্যে একটি ফারসী পত্রিকারও তিনি প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। পত্রিকাটির নাম ছিল ‘মীরাৎ-উল-আখবার’। তিনি হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের উদ্দেশ্যে যে বইগুলি লিখেছিলেন তা বেশীর ভাগ মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে বাংলা ও ইংরেজীতে। তার মধ্যে ‘হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ধর্ম প্রণালী’ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

রামমোহন বিলেতে যাওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন একবার নয় একাধিক বার। তাই তিনি স্বদেশী ও বিদেশীর চোখের সামনে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিলেন। তিনি অনেকখানি বিলেতী প্রভাবে প্রভাবিত ছিলেন। অবশেষে বিলেতেই তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ হয় আর প্রথম বিলেতে পদার্পণের জন্য প্রচুর অর্থ ও প্রাজ্ঞানীয় ব্যবস্থা যিনি করে দিয়েছিলেন তিনি হচ্ছেন দিল্লী মোঘল সম্রাটের বংশধর শাহ আলম। যদি শাহ আলম অর্থের ব্যবস্থা না করে দিতেন তাহলে জীবনেও হয়ত রামমোহনের ইউরোপ যাওয়া হয়ে উঠতনা তিনি নামে মাত্র রাজপুত্র হলেও খুব অর্থভাবে দিনাতিপাত করতেন যেহেতু পিতার ত্যাজ্যপুত্র ছিলেন।

(দ্রঃ বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা, সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ৩০)

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অনেক ‘হঠাৎ নেতা’ স্বাধীনতা কল্পনাই করতে পারেননি। অনেক এইমত পোষণ করতেন যে, “ভারতের প্রশাসন ব্রিটিশ পার্লামেন্টের অধীনেই অধিক কল্যাণকর হবে।” আমাদের আলোচ্য রামমোহনও ছিলেন এই মত বা দলের সমর্থক। দ্রঃ বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা। ভারতের জাতীয় স্বাধীনতার প্রশ্নে রামমোহনের আমলে অচিন্তনীয় ছিল.....। তিনি মনে করতেন ইংরেজদের সংস্পর্শে এসে ভারত কিছু লাভ করেছে.....। শিবপ্রসাদ শর্মার নামে লিখিত প্রবন্ধেও তিনি এ মত প্রকাশ করেন। তিনি

পরমেশ্বরকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন-".....for having unexpectedly delivered this country, from the long continued tyranny of its former rulers and placed it under the Government of the English,as well as free enquiry into liberty and religious subjects, among those nations to which that in fluence extends.....".

(দ্রঃ The English works of Raja Rammohun Roy. Part III, P-105)

সারা বিশ্বে যেখানে স্বাধীনতা আন্দোলন হয়েছে সেখানেই রামমোহনের সমর্থন ও উৎসাহ প্রদানের প্রচুর প্রমাণ আছে, কিন্তু নিজের দেশের ক্ষেত্রে তাঁর 'ইংরেজ শাসনের যৌক্তিকতা প্রদর্শন' তথা তাঁর বিপরীত মনোভাব ও বিরুদ্ধে ভূমিকা দেখে যারা তাঁকে ইংরেজদের গোপন কর্মচারী বা চর মনে করেন তাঁরা যে তাঁকে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা বলতে অস্বীকৃত হবে তাতে অবাক কিছু নেই। তাঁর মতে মুসলমান, শিখ, মারাঠা প্রভৃতি জাতি যখন ইংরেজদের বিতাড়নে কৃত সংকল্প সে সময় তিনি ইংরেজদের আহ্বান জানিয়েছিলেন।

(দ্রঃ Modern India Political thought, by V. P. Varma. P-26)

সারা ভারতে জমিদারগণ রাজা সেজে ইংরেজের দালালের ভূমিকায় দরিদ্র জনসাধারণকে শোষণ করতো। রামমোহন এহেন জঘন্যতম শোষণ প্রক্রিয়াকে সুপ্রথা বলে মনে করতেন। জমিদারী প্রথা বা মধ্যসত্ত্বভোগ করা তাঁর দৃষ্টিতে নিন্দনীয় ছিলনা। শুধু জমিদারদের মাত্রাধিক অত্যাচার পছন্দ করতেন না মাত্র।

শুধু বাংলা নয় সারা ভারতের অবস্থা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন রামমোহন। হুগলী থেকে ১৮১৫ সালের পরেই তিনি স্থায়ীভাবে কলকাতায় বাস করতে থাকেন। "তারপর থেকে তিনি হিন্দু ধর্মের প্রাচীন প্রথা, যেমন বহু দেব-দেবীর পূজা, মূর্তিপূজা, সতীদাহ বা সহমরণ ইত্যাদি দূরকরবার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠেছিলেন। হিন্দুদের ধর্ম বিশ্বাস ও সামাজিক আচারের বিরুদ্ধে এই অভিযানে গোঁড়া হিন্দুরা ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন এবং সম্ভবতঃ সেই কারণে একমাত্র হিন্দু ছাত্রদের জন্য স্থাপিত এই নূতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে (বিখ্যাত শিক্ষাবিদ ও ব্যবসায়ী ঘড়ি ডেভিড হেয়ার এবং বিচারপতি এডওয়ার্ড হাইড ইস্টের সহায়তায় কয়েকজন বিশিষ্ট বাঙালী ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের জন্য ১৮১৭ সালে কলকাতায় স্থাপিত একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। যার নাম ছিল হিন্দু কলেজ, মহাবিদ্যালয় ও এলো ইণ্ডিয়ান কলেজ। বর্তমানে সেই শিক্ষা নিকেতনটিই কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে রূপান্তরিত হয়েছে) রামমোহনের কোনও সাহায্য তাঁরা নিতে চান নি।.....রামমোহন তাঁর নীতিতে অটল থেকে আমহাস্টকে লিখিত এক পত্রে তিনি ভারতে শিক্ষা বিস্তারের ব্যাপারে গভর্ণমেন্টের প্রাচ্য বিদ্যামুখী নীতির বিরোধীতা করেন এবং কলকাতায় সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবে তীব্র সমালোচনা করেন। তার অনুরোধ প্রগতিশীল শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের যার মধ্যে থাকবে "গণিত শাস্ত্র, প্রকৃত বিজ্ঞান, রসায়ন শাস্ত্র, শরীর বিদ্যা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিজ্ঞানশাস্ত্র-যেগুলি যথাযথ অনুশীলনের ফলে ইউরোপীয় জাতিরা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের অধিবাসীদের চেয়ে অনেক উন্নতি করতে পেরেছে।"

(দ্রঃ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বিনয় ঘোষ, পৃঃ ১৬)

ইংরেজরা ১৮১৬ সাল থেকে ১৮২০ সাল পর্যন্ত রামমোহন আশ্রয় চেষ্টা করেছিলেন যাতে সর্ব ভারতীয় ভাষা হিসাবে ইংরেজী ভাষাটাকে চালু করা হয়। এদিকে এটি কয়েক বছর মধ্যে এই হিন্দু কলেজে পাঠ করা একটি তরুণ গোষ্ঠী ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজন

অনুভব করে ইংরেজী ভাষাকে ভারতের রাষ্ট্র ভাষা করতে তাঁরাও আন্দোলন আরম্ভ করলেন। এটি ঘটিছিল ১৮৩০ সালে। সুচতুর ইংরেজ সরকার তবুও অপেক্ষা করতে লাগল।

সংস্কৃত কলেজ নামে হিন্দু হলেও ব্রাহ্মণ আর বৈদ্য ছাড়া আর কোন গোত্র বা বংশের ছাত্রের সেখানে প্রবেশাধিকার বা পাঠ্যাধিকার ছিলনা। আর মুসলমান ছাত্রের কথা তো উল্লেখ না করাই শ্রেয়। কিন্তু যদিও হিন্দু কলেজে ব্রাহ্মণ বৈদ্য ছাড়া সকল বংশের ছাত্র পড়তে পারত কিন্তু মুসলমানদের সেখানে ঢোকবার উপায় পর্যন্ত ছিলনা। হিন্দু কলেজে বিখ্যাত একজন বিলেতী সাহেব কলেজের মুখ্য দায়িত্ব নিয়ে থাকতেন। তাঁর নাম ছিল 'ডিরোজিও'। তাঁর প্রযত্নে বড় একটি ছাত্র দল তাঁর গোঁড়া ও পূর্ণ ভক্ত সৈনিকে পরিণত হয়। তাঁরাই হিন্দু ধর্মের পুরান আইন-কানুনগুলোকে বিলেতী কায়দায় চলে ভারতকে নূতন বিলেত বানাতে আত্মপ্রকাশ করেন। ঐ দলটিকে বলা হয় 'ইয়ং বেঙ্গল' বা ইয়ং ক্যালকাটা। তাঁরা হিন্দু ধর্ম বা জাতিকে ধ্বংস করতে চান নি, চেয়েছিলেন নূতন করে ঢেলে সাজাতে-তাই তাঁরা ধর্মের প্রত্যেক জিনিসকে যুক্তি দিয়ে বিজ্ঞান নিয়ে যাঁচাই করতেন। তাঁরা শিখেছিলেন "প্রশ্ন করতে, সন্দেহ করতে, কোন বিধান বা নির্দেশকে নির্বিচারে মেনে না নিতে।"

ইংরেজ সাহেবদের পৃষ্ঠপোষকতায় ঐ 'ইয়ং বেঙ্গল' দল একটি সংগঠন করেছিলেন, যার নাম ছিল "দি এ্যাকাডেমিক এ্যাসোসিয়েশন"। রেভারেন্ড লালবিহারী দে তাঁর 'রিকালেকশন' নামক গ্রন্থে লিখেছেন যে উপরোক্ত এ্যাসোসিয়েশনের সাপ্তাহিক সভায় "ইয়ং ক্যালকাটা দলের শ্রেষ্ঠ সভ্যরা সপ্তাহের পর সপ্তাহ সামাজিক, নৈতিক ও ধর্ম বিষয়ক সমস্যা সম্বন্ধে ভাষণ দিতেন। এইসব আলোচনার মূল সূর ছিল প্রচলিত ধর্ম সম্বন্ধীয় বিধি বিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।....সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে একাডেমীর সিংহ শিশুদের গর্জন শোনা যেত, 'হিন্দু ধ্বংস হউক', 'গোঁড়ামি ধ্বংস হউক'।"

(দ্রঃ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, পৃঃ ২১)

রামমোহন এমনই স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন যে, ১৮২৯ সালের ১৫ই ডিসেম্বর টাউন হলে অনুষ্ঠিত এক সভায় ইংরেজদের ভারতে বসবাস করবার যে নিবেদন তিনি করেছিলেন তার উপকারিতা বর্ণনা করতে গিয়ে রাজনৈতিক উন্নতির কথাও তিনি উল্লেখ করেছিলেন যা অনেকের মতে অত্যন্ত উন্নতির কথাও তিনি উল্লেখ করেছিলেন যা অনেকের মতে অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। তিনি বলেছিলেন, "I am impressed with the conviction that the greater our intercourse with European gentlemen, the greter will be our improvement in literary. Social and plitlital affairs".

(দ্রঃ Raja Rammohun Roy and progressive Movements in India, by Jatindra Kumar Majumdar, P. 439-49)

ইংরেজী ১৮২৯ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর সতীদাহ প্রথা রহিত হওয়ার উপর আইন প্রণয়ন করা হয় আর রাজা রামমোহন রায় আর ইয়ং বেঙ্গল ছিল সরকারের আইনের পক্ষে আর বাকী প্রাচীনপন্থীরা প্রায় বিরুদ্ধবাদী হয়ে 'ধর্মসভা' গঠন করেন বিরোধীতা করার জন্য। ঠিক ক্ষেত্র তৈরী হয়েছে বুঝতে পেরেই ১৮৩০ সালে ২৭শে বিখ্যাত খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারক মিঃ আলেকজান্ডার কলকাতায় এসে পৌঁছালেন। এবং দেখতে পেলেন বাংলাদেশের তরুণ বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে একটা বিপ্লব চলছে। মিঃ ডাফ তাঁর 'ইণ্ডিয়া এ্যাণ্ড ইণ্ডিয়া মিসন' গ্রন্থে লিখেছেন, "তখনকার অবস্থা খুব অনুকূল ছিল। এই অবস্থার জন্যই আমরা এতদিন প্রতীক্ষা করেছি, এই অবস্থার জন্যই গভীরভাবে কামনা করেছি।"

তিনি প্রকাশ্য নাস্তিক ছিলেন তবে মদ খাওয়া পছন্দ করতেন না। সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়ও এ উক্তির সমর্থনে বলেছেন, “রামমোহন সুরা পানের বিরোধী ছিলেন না, কিন্তু অক্ষয় কুমার সুশ্পষ্টভাবেই সুরা পানের বিরোধিতা করেন।” (দ্রঃ বাঙ্গালীর রাষ্ট্র চিন্তা, পৃঃ ৭৯)

কিন্তু তবুও অক্ষয় কুমারের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক তিনি স্বাধীনতা আন্দোলন না সংগ্রামের পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনিই ইংরেজদের করুনার উপর চরম ও পরমভাবে নির্ভরশীল ছিলেন। “তিনি মনে করতেন যেহেতু ভারতীয়েরা ইংরেজদের সার্বভৌম কর্তৃত্বে

এ কংগ্রেসেরই মধ্যে আবার একটি দল নিজেদের খাঁটি হিন্দু জাতীয়তাবাদী রূপে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এঁরা হচ্ছেন “মহারাত্রের গঙ্গাধর তিলক, পাঞ্জাবের লাল লাজপত রায় এবং বাংলার অরবিন্দ ঘোষ ও বিপিন চন্দ্রপাল। ইহারা নিজেদের জাতীয়তাবাদী অথবা গোঁড়া জাতীয়তাবাদী রূপে অভিহিত করিলেন।” (দ্রষ্টব্য পনেরই আগষ্ট, পৃঃ ৯৯।) এঁরা লক্ষ্য করেছিলেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে মুসলমান জাতি প্রায় একাই লড়াই করে যাচ্ছে এবং এও বুঝতে পারলেন যে ইংরেজরা বেশ বিব্রতবোধ করছে এবং আমাদের দালাল শ্রেণীতে মর্যদা দিয়ে নিজেদের রক্ষা করতে চায়। এঁরা আরও লক্ষ্য করে ছিলেন মুসলমানদের সংগ্রাম শুধু ইংরেজ বিতাড়নের উদ্দেশ্যে হলেও সে সাথে নিজেদের ধর্মের পুরাতন দারাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে তারা সমানভাবে সচেষ্ট। অপরদিকে হিন্দু শিক্ষিত সম্প্রদায় নাস্তিক বা খ্রিষ্টান হয়েছে, হচ্ছে বা থেকে চলেছে, ফলে মুসলমান যখন একাই স্বাধীনতা নিয়ে আসবে তখন হিন্দু জাতির অস্তিত্ব না থাকতে পারে। তাই এঁরাও হিন্দু ধর্মের পুরাতন সব নিয়ম নীতিকে আবার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে বদ্ধ পরিকর হলেন। ফলে তখন স্বাভাবিক ভাবেই এঁদের সংগ্রামে সম্প্রদায়িকতা মিশ্রিত হয়। অবশ্য কেউ কেউ বলেন, এ চরমপন্থী ও নরম পন্থীর বিভাজন চতুর ইংরেজরাই সুদক্ষ ইঙ্গিতে।

সে যাই হোক, আপাতত চরমপন্থী দলের উদ্দেশ্যও কাজে প্রমাণ পাওয়া যেতে লাগলো যে তারা পুরোপুরি মুসলমান বিরোধী দল। অতএব তাঁদের কার্যকলাপে দলে দলে সহজে জাতীয় কংগ্রেসে মুসলমানদের যোগ দেয়া নিঃসন্দেহে সম্ভব ছিলনা। হিন্দু ধর্ম ধর্মের অনেক কুসংস্কার ও কুৎসিত প্রথাকে বর্জন করে যেমন উন্নত থেকে শুরু করেছিল যথা-বর্ণাশ্রমের কারণে অস্পৃশ্যতা, বাল্যবিবাহ, সতীদাহ, সীমাহীন প্রাত্যহিক পূজাপার্বন প্রভৃতি। এ নতুন দলটি সমস্ত কিছু আবার যথাস্থানে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করে ফলে সহজেই প্রাচীন সংস্কার পন্থী হিন্দুরা এ দলকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন। সত্যেন সেন মহাশয় লিখেছেন, “বাল গঙ্গাধর, তিলক এই সনাতন পন্থীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দে বালিকাদের বিবাহের বয়স দশ হইতে বারো বৎসর করিবার উদ্দেশ্যে আনিত একটি বিলের বিরুদ্ধে তিলক প্রবল আন্দোলন শুরু করিয়া দিলেন। রানাডে প্রমুখ উদারপন্থীগণ এই বিলের সমর্থক ছিলেন। অতঃপর তিলক গোহত্যা নিবারণের উদ্দেশ্যে গো-রক্ষা সোসাইটি নামে একটি সমিতি সংগঠন করিলেন। এতদ্ব্যতীত শিবাজী উৎসব, হস্তীমুখো দেবতা গণেশ প্রভৃতির পূজাও মহা সমারোহে অনুষ্ঠিত হইতে লাগল।

মুসলমান জাতির নায়ক হিসেবে তখন কয়েকজন আলেম এ মনে করলেন যে, মুসলিম জাতি যুগ যুগ ধরে ইংরেজদের সাথে সংগ্রাম করে তাদের শক্তি, সামর্থ ও আশা ভরসা নিঃশেষ করে এনেছে এ মুহূর্তে হিন্দুদের সাথে তাদের রাগ বা দুঃখ করে সরে দাঁড়ালে মুসলিম জাতির আসল ইতিহাসে পাল্টে যাবে। বিশেষ করে মাওলানা মহম্মদ আলী ও মাওলানা শওকত আলী এ দুই ভায়ের ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁরা গান্ধীজীর সাথে বিশেষ এক গোপন বৈঠকে পরামর্শ করে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের কথা প্রস্তাব করেন। তাতে সুফল ফলেছিল। দুইদল আপাতত এক হয়, একটি কংগ্রেস অপরটি খিলাফত কমিটি। খিলাফত নাম আরবী। আরবীর চিন্তাধারা নামেই বোঝা যায়।

১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে আহমাদাবাদে কংগ্রেসের মিটিং এ খেলাফত নেতৃবৃন্দ কংগ্রেসের ইংরেজ জোষণ, আংশিক স্বাধীনতা, স্বরাজ প্রভৃতি কথার উচ্ছেদ করে মাওলানা হযরত মোহানী পূর্ণ

স্বাধীনতার দাবী করেন। এটি খুবই উল্লেখযোগ্য এবং অকল্পনীয় ব্যাপার ছিল এটাই যে, ভারতে কংগ্রেসের সভায় স্বাধীনতার দাবী এটাই সর্ব প্রথম। সেদিন মুসলমান খিলাফত কমিটির কথায় প্রায় সকলেই যখন চুপচাপ ভাবছিলেন তখন মহাত্মা গান্ধী। মহাত্মার পরিচয় দিয়ে স্বাধীনতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে বলেছিলেন, “.....The demand has grived me because it shows lack of responsibility” - “পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী আমাকে বেদনা দিয়েছে। কারণ প্রস্তাবটি দায়িত্ব জ্ঞান হীনতার পরিচায়ক।”

গান্ধীজী লোক হিসেবে ভাল হলেও তিনি নেতা হিসেবে একেবারেই অনুপযুক্ত বলে অনেকের ধারণা। তাঁর সন্ন্যাসীর মন রাজনীতির সূক্ষ্ম স্তর উপলব্ধির উপযুক্ত ছিলনা। তাই তাঁর মতের কোন দৃঢ়তা ছিল না এবং কোন কথা বললে তার প্রতিক্রিয়া কি থেকে পারে তা তিনি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই আঁচ করতে পারতেন না। অনেকের মতে তাঁর ভুলভ্রান্তিই দেশ বিভাগের প্রধান কারণ। ১৯২২ সালে পুনরায় লাক্ষৌতে খিলাফত কমিটি ও জমিয়তে উলামায়ে হিন্দু স্বরাজের পরিবর্তে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী করে-“The best interests of India and the Moslems demand that in the Congress creed the term 'Swaraj' be substitute hence forth by the term "Complete independence" - “ভারতবর্ষ এবং মুসলমানদের স্বার্থের খাতিরে এখন হইতে কংগ্রেসের মূলমন্ত্র ‘স্বরাজের’ পরিবর্তে ‘পূর্ণ স্বাধীনতা’ হওয়া উচিত।”

এবারেও কংগ্রেস মুসলমান সৃষ্ট না করে প্রকাশ করে “এতদ্বারা কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রের আমূল পরিবর্তন হইবে।” (দ্রঃ পনেরই আগষ্ট সত্যেন সেন, পৃঃ ১০৬) কিন্তু তবুও হিন্দু মুসলমানে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়নি। এ অবস্থায় ইংরেজ হিন্দু মুসলমানের আকস্মিক মিলনে ভীত হয়ে পড়ে। হঠাৎ গান্ধীজী এ ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারীতে খিলাফত আন্দোলন বন্ধ করে দিলেন। গান্ধীজীর নিজস্ব মতের কোন স্থায়িত্ব ছিলনা, যে পক্ষ যা বোঝাতো তিনি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তাইই সঠিক মনে করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। এর অপর এক কারণ এটাই যে, তিনি ছিলেন খুব সরল ও সিধা মানুষ।

যখন তিনি মুসলমানদের বিপ্লবী চিন্তাধারা সারা বিশ্বে তাদের প্রভাব, প্রচার সংখ্যা প্রভৃতি লক্ষ করতেন তখন মুসলিম ও কুরআন হাদীসের পক্ষে অনেক বড় বড় কথা বলতেন যা মানুষকে চমক লাগাত। ফলে গোঁড়া হিন্দুর দল তখন রেগে তাঁর সমালোচনা করত তখন তিনি আবার এমন মত পরিবর্তন করতেন যে স্বাভাবিক স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন কোন ব্যক্তি অবাক না হয়ে পারত না। গান্ধীজীর উদার নীতি মুসলমানদের এবং উদার পন্থী হিন্দুদের মনে এক আশার আলো জ্বালিয়ে তোলে। কিন্তু ১৯২৫ সালে লাল লাজপত রায়ের সভাপতিত্বে তিলক, অরবিন্দ ঘোষ প্রভৃতি মুসলমান বিদেষী নেতারা হিন্দু মহাসভা গঠন করলেন। এদিকে গান্ধীকে মুসলমানের দালাল ইত্যাদি উপাধিতে আখ্যায়িত করা হয় তখন গান্ধীজী দেখলেন যে মুসলমানরা তো আমাকে হিন্দু বলেই জানেন কিন্তু সংখ্যা গরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায় যদি আমাকে হিন্দু বলে মনে করে তাহলে আমার নেতা হয়ে প্রশংসা অর্জন করা সম্ভব নয়। তাই ১৯২১-২২ সালে যখন তিনি আন্দোলনের পুরোভাগে ভারতের অবিসংবাদিত নেতারূপে সুপ্রতিষ্ঠিত; যখন খিলাফত কমিটির সহযোগিতায় হিন্দু মুসলমান ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংহত ও সক্রিয় তখন তিনি গোঁড়া হিন্দুদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে ঘোষণা করলেন-“I call myself a Santanist Hindoo, the Puranas and all the gose by the name Hindoo Seriphires, and therefore in avatars and rebirth, (b) I believe in the Varnasram Dharma, in a sense in my opinion strictly vedic, but not in its

present, popular and crude sense, (c) I believe in the protection of the cow in its much larger sense than the popular, (d) I do not disbelieve in idol worship. (Young India oct. 12, 1921)

“আমি নিজেকে প্রাচীনপন্থী সনাতনী হিন্দু বলি যেহেতু (ক) আমি বেদ, উপনিষদ, পুরাণ অর্থাৎ হিন্দুশাস্ত্র মতে যাঁহা কিছু বোঝায় সূত্রাৎ অবতার বাদ এবং পুনর্জন্ম বিশ্বাস করি। (খ) বেদের বিধান সম্মত বর্ণাশ্রম ধর্ম আমি বিশ্বাস করি অবশ্য প্রচলিত ব্যবস্থায় আমার আস্থা নেই। (গ) প্রচলিত অর্থে নয় বৃহত্তর অর্থে আমি গো-রক্ষা নীতি সমর্থন করি। (ঘ) মূর্তিপূজা আমি অবিশ্বাস করি না।”

গান্ধীর উপর যাদের ধারণা ছিল তিনি হিন্দু মুসলমানের মিলনের মিলন সেতু তাঁদের ঐ ধারণা উপরোক্ত মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বদলে যেতে বাধ্য হয়। হিন্দু মহা সভাও তাঁর দুর্বলতা লক্ষ্য করে তাঁর উপর নূতন আশা আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতে থাকে। তাই স্বাধীনতার প্রত্যক্ষ সংগ্রামী সত্যেন সেন বলেন যে, “ব্রিটিশ সরকারগণ আন্দোলন দমন করিবার জন্য সাম্প্রদায়িক ভেদ বৈষম্যের সুযোগ লইয়াছিল সন্দেহ নাই; কিন্তু সেই ভেদ নীতির অন্তর্কে তিলক ও গান্ধীবাদ যে তীক্ষ্ণ ধার করিয়াছে তাহাও নিঃসন্দেহ।” (পনেরই আগষ্ট, পৃঃ ১০৯)

এরপর থেকেই একদলের ইঙ্গিতে গান্ধীজীর কণ্ঠে ও কর্মে প্রকাশ হতে লাগলো আদর্শের পরিবর্তে ব্যক্তিগত আনুগত্য। এমন কি কোন প্রকার প্রতিবাদ করার উপায়ও বন্ধ হয়ে যায়। “যাঁরা এর প্রতিবাদ করেন তাঁদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যস্থা অবলম্বিত হতে থাকে। এ সম্পর্কে গান্ধীজীর মন্তব্য উল্লেখযোগ্য—Those who are inside the Congress, must remain silent and those who will not must go out”— (দ্রঃ ঐ পুস্তক, পৃঃ ১০৯, ১ম মুদ্রণ।) অর্থাৎ যাঁরা কংগ্রেসের ভিতরে আছেন তাঁরা অবশ্যই মৌনতা অবলম্বন করবেন আর যাঁরা এটা পারবেন না তাঁরা বাইরেই থাকবেন।

মুসলমান বিপ্লবীদের মধ্যে একজন বিচক্ষণ আলেম অনেক দিন হতে চিন্তা করছিলেন যে, কি উপায়ে সৈন্যদের ক্ষেপানো যায়, কি উপায়ে সরকারের শয়তানীর স্বরূপ তাদের কাছে পৌঁছানো যায়। যাঁরা ঐ মারাত্মক এবং দুঃসাহসিক কাজে নেতৃত্ব দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে মাওলানা হুসাইন আহমদ (রহঃ), মাওলানা মহম্মদ আলী ও মাওলানা শওকত আলী প্রমুখের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯৪৬ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী ভারতীয় নৌবাহিনী কর্তৃক বোম্বকে কেন্দ্র করে মাদ্রাজ ও করাচীতে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠে। ১৯শে তলোয়া ট্রেনিং স্কুল (বোম্বে) থেকে শুরু করে হিন্দু মুসলমান বিশ হাজার নাবিক ইংরেজের পতাকা নামিয়ে হিন্দু মুসলমান তথা কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের পতাকা উত্তোলন করে সরা ভারতে ইংরেজ জাতিকে হতভম্ব করে তোলে এবং মনে করিয়ে দেয় ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের মহা বিপ্লবের আগ্নেয়াগীরনের চিত্র। সমগ্র ভারতে যাঁরা স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতেন তাঁরা খুশীর পরশে প্রতীক্ষা করছিলেন ইংরেজের পরাজয় পর্ব অবলোকন করার।

এ নাবিক দলের বিদ্রোহের পূর্বে তাঁদের অভাব অভিযোগ কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের দরবারে পৃথক পৃথক ভাবে জানানো হয়েছিল কিন্তু কোন দলই কোন সাহায্য করে নি। তবু তাঁরা নিজেরা কমিটি গঠন করে এ ধর্মঘট পালন করেন। ইংরেজ সরকার বন্দুকের নল দিয়েই ঘুম পাড়াতে চেয়েছিল ঐ বিশ হাজার নৌসেনা এবং তাঁদের সমর্থক হাজার হাজার ভারতবাসীকে। ভারতীয় পদাতিক সৈন্য বাহিনী ইংরেজকে জানিয়ে দিলে ভারতীয় হয়ে ভারতবাসীর বুকে গুলি করা তাদের দ্বারা সম্ভব নয়। অগত্যা ব্রিটিশ বাহিনীকে নিয়েই তখন কাঁপ মারতে হয় ইংরেজকে। ২১শে ফেব্রুয়ারী ক্যাসেল ব্যারাকের বাইরে প্রবল সংগ্রাম শুরু

হল। মিঃ গড্ ফ্রে সদর্পে ঘোষণা করলেন যদি ভারতবাসী নিরস্ত্র না হয় তাহলে নৌ শক্তি একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেলেও ইংরেজ শক্তি দিয়ে বিদ্রোহ দমন করার জন্য সরকার প্রস্তুত। এ সময়ে লীগ ও কংগ্রেস কেউ যোগ দেয় নি। “উপরন্তু কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল ধর্মঘট ও হরতাল পালন না করিবার জন্য জনসাধারণের নিকট এক পাল্টা নির্দেশ জারী করিলেন।” (ঐ পুস্তক দ্রঃ) অবশ্য সাধারণ মানুষের ধারণা গান্ধীজীর অহিংস নীতি অবলম্বনের পরিপ্রেক্ষিতেই ঐ ব্যবস্থা কিন্তু আসল কথা তা নয়। “কংগ্রেস হিংসা ও অহিংসাকে বরাবরই সুবিধা অনুযায়ী গ্রহণ ও বর্জন করিয়া আসিয়াছে।” অবশ্য লীগ ও কংগ্রেস ধর্মঘটীদের আত্মসমর্পণ করার কথা স্বরণ করিয়ে দিয়ে জানিয়ে দিলে যাতে আর তাদের উপর গুলি না চলে বা তাদের সাজা শাস্তি না হয় তার ব্যবস্থা করা হবে। এখানে বেশ প্রমাণ হয় কংগ্রেস ও লীগ আসলে জনগণের কল্যাণে নিয়োজিত ছিল না বরং গদী ও ক্ষমতার লড়াইয়ের জেতাই তাদের টার্গেট ছিল। এমনকি কংগ্রেস ও লীগ, যে সেনাপতি ঐ দল ও সমর্থকদের ধ্বংস করতে সাবধান বাণী করেছিলেন তার বিরুদ্ধেও একটা কথাও করেননি। উপরন্তু কংগ্রেস নেতা সর্দার প্যাটেল বলেন, “নৌ-ধর্মঘটীদের অন্তর্ধারণ করা উচিত হয়নি। এমনকি নৌ-বাহিনীতে শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে প্রধান সেনাপতির অভিমতকে অভ্যর্থনা করিলেন।” (১৫ই আগষ্ট, পৃঃ ৪২) আযাদাকেও প্যাটেলের নীতি সমর্থন করতে হয়েছিল। তিনিও প্রতিবাদ করা প্রয়োজন মনে করেন নি। হয়ত বা গদিতন্ত্রের কারণ হতে পারে।

মহাত্মা তার স্বাভাবিক সুরে ১৯৪৬ সালে ৭ই এপ্রিল ‘হরিজন’ পত্রিকায় মন্তব্য করলেন, “I might have understood it if they had combined from top to bottom, that would of course. I would not want to live up to 125 to witness that consummation. I would rather perish in the flames.” - আমি এটা উপলব্ধি করতে পারতাম যদি তারা সমগ্র দেশকেই দলে টানতে পারত। উচ্ছৃঙ্খল জনতার হস্তেই ভারতের সমর্পণ বুঝাত। ১২৫ বছর বেঁচে থেকে সেই পরিণতি দেখবার ইচ্ছা আমার নেই—তার চেয়ে অগ্নিতে আত্মহুতি দেওয়া শ্রেয়। এক কথায় গণ অভ্যুত্থানকে অভিহিত করা হল, “উচ্ছৃঙ্খল জনতার উদ্ভূত আচরণ রূপে।”

(দ্রঃ ১৫ আগষ্ট পৃঃ ৪৩)

সবচেয়ে বোঝার বিষয় এটাই যে, ইংরেজের ক্ষতি হল গান্ধীজীর অহিংস নীতি যেমন গর্জে উঠতো ভারতবাসীর উপর ইংরেজদের অত্যাচারের ক্ষেত্রে তাঁর এ নীতি তুলনামূলকভাবে গর্জে উঠত না। দেশ এখন চায় ইংরেজ রাজ তড়াতাড়ি দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাক।

কংগ্রেসকে ভাঙ্গিয়া দিবার কথা বলিতেছেন। তাঁহাদের মতে এই প্রতিষ্ঠানটি ধনিক শ্রেণী ও চোরাবাজারীদের পুরোপুরি কবলস্থ না হইলেও তাহাদের দ্বারা প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত।

ভারতীয় কংগ্রেসের সংগ্রাম সম্পর্কে ডাঃ পট্টভী সিতারায়া স্পষ্টই বলেছেন, “The fight of Congress is the fight of the Indian capitalist against the British capitalist.” কংগ্রেসের সংগ্রাম ব্রিটিশ ধনিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে ভারতীয় ধনিক শ্রেণীর সংগ্রাম। তবুও কংগ্রেসের শ্রেষ্ঠ নেতা গান্ধীজীর মতামত অন্ততঃ স্বতন্ত্র হতে পারত কিন্তু তাও নয়। যখন সোদপুরে গান্ধীজীকে কংগ্রেসের সঙ্গে ধনিক শ্রেণীর সম্পর্কের স্বরূপ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হয় তাতে তিনি যে উত্তর দিয়েছিলেন তাতে হতভম্বই হতে হয়। তিনি বলেন, “My relation with the capitalist is the relation of Congress with the capitalist.” - অর্থাৎ আমার সঙ্গে ধনিকদের যে সম্পর্ক, কংগ্রেসের সঙ্গে ধনীদেব সেই সম্পর্ক। (উপরোক্ত তথ্যগুলো মিঃ সেনের লেখা ঐ পুস্তকের ১৬১-১৬৩ পৃঃ দ্রঃ)

আগেই বলা হয়েছে যে, গান্ধীজী কি কথা বললে কি পরিমাণ ফল দাঁড়াবে তা অনেক ক্ষেত্রে আঁচ করতে পারতেন না। গান্ধীজীরই পুত্র। আর লক্ষণীয় বিষয় এটাই যে, পত্রিকাটির মালিক ছিলেন তাঁদের পরম প্রিয় ধনকুবের মিঃ জি, ডি, বিড়লা। কংগ্রেসের সম্বন্ধে আলোচনার সাথে সাথে মুসলিম লীগকেও বোঝা কঠিন নয়, কারণ আজ যারা মুসলিম লীগে গতকাল তাঁরাই ছিলেন বেশীর ভাগ কংগ্রেসেরই হাতের পুতুল বা দলের দালাল। আর একথা তো পূর্বেই বলা হয়েছে যে, গান্ধীজীর অহিংসা নীতি একটা পলিসি মাত্র যা সুবিধা মত প্রয়োগ করা হত। যুদ্ধে কাটাকাটি মারামারি যদি অহিংস নীতির বিরুদ্ধেই হয় তাহলে কাশ্মীরে ভারতীয় সৈন্য প্রেরণের সময় তিনি এ নীতি প্রয়োগ করেননি কেন? পরন্তু বিপরীত মন্তব্য করেছিলেন। যেমন ২৯শে অক্টোবর তিনি তাঁর প্রার্থনা সভার বলেছিলেন, “শ্রীনগরে ইউনিয়ন গভর্ণমেন্টে সৈন্য প্রেরণ করা সমীচীন হইয়াছে।”

অথচ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তিনি জাপানীদের বিরুদ্ধে অহিংস প্রতিরোধের উপরই গুরুত্ব দিয়েছিলেন এবং এ সম্পর্কে জুলাই মাসের এক বক্তব্যে গান্ধীজীর যে মর্মবেদনা ব্যক্ত হয়েছিল তার সাথে কাশ্মীর সম্পর্কিত বিবৃতির কোথাও কোন সামঞ্জস্য বিহিত হয়নি। শুধু তাই নয়, তিনি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের ইউনিয়ন যুদ্ধ ঘোষণার যৌক্তিকতাও অস্বীকার করেছেন। (১৫ আগস্ট, পৃঃ ১৬৫ দ্রঃ)

এক কথায় কংগ্রেস ও লীগ স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছে সত্যি কিন্তু সে লড়াই ইংরেজদের সঙ্গে নয়, লীগের সঙ্গে কংগ্রেসের লড়াই, হিন্দু আর মুসলমানের লড়াই। ইংরেজ তাদের নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করতে যাতে কোনরকম অসুবিধা না হয় তার ব্যবস্থা করেছিল। এমনকি বিলেতী পিস্তল, বন্দুক, গোলাবারুদ, হিন্দু ও মুসলমানদের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছিল। পয়লা জুন লর্ড মাউন্টব্যাটেন রুয়েদাদ ঘোষিত হবার মাত্র কয়েকদিন পূর্বে লণ্ডনের বিখ্যাত ‘রেগুস নিউজ’ পত্রিকায় ভারতের বোম্বাইস্থ সংবাদদাতা মিঃ আর্নেস্ট সাটি যে বার্তা পাঠিয়েছিলেন তা এ রূপ—

"Enough arms and amunitions to equip more than a million men have been smuggled into india in the last few years. The arms range from pistol to tommy-guns. It is said that the Muslim League have weapons for half a million and Congress, the Hindoo organisation, has about the same. Many Hindus and Musli are reliably reported to be organizing houses into strong points, and preparing for a prolonged struggle, if necessary, by laying in stocks of food." গত কয়েক বৎসরে দশ লক্ষ লোককে সুসজ্জিত করার মত পিস্তল ও টমি বন্দুক ভারতবর্ষে গোপনে আমদানি করা হয়েছে। প্রকাশ যে, মোসলিম লীগ এবং কংগ্রেস উভয়েই যথাক্রমে এর অর্ধেকের অধিকারী। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গিয়েছে যে, বহু হিন্দু ও মুসলমান নিজেদের ঘরবাড়ী ঘাঁটি রূপে প্রস্তুত করেছে। এবং দীর্ঘকালব্যাপী সন্ধ্যামের (প্রয়োজন হলে) খাদ্য সংগ্রহ করে রাখছে। (দ্রঃ ঐ পুস্তক পৃঃ ১১৮)

উপরোক্ত তথ্য বহুল আলোচনায় কংগ্রেস ও লীগের স্বরূপ বোঝা সম্ভব অর্থাৎ নেতাদের বেশীর ভাগের স্বরূপ। কিন্তু হাজার হাজার হিন্দু মুসলমান সমর্থক অনেকে এমন ছিলেন যারা পরিস্থিতির ঘূর্ণ্য অবস্থা জেনেও কিছু করতে পারেন নি। অথচ উভয় দল হতে নানা অবস্থার পরিস্থিতিতে সেরে দাঁড়াতেও সক্ষম হন নি। প্রকৃত দেশহিতৈষী দরিদ্রের কল্যাণকামী ও ধর্মভীরু মুসলমান পুরান সংগ্রামীদের মুসলিম লীগের প্রচার প্রসার আর ইংরেজের গোপন ঢালাও সহযোগিতা এমনই রূপ নিয়েছিল যে, তাঁরাও ঐ ইংরেজ সৃষ্ট লীগে নিজেদের যুক্ত করতে বাধ্য হন। হিন্দুদের মধ্যে মহান নেতা অনেকেই কংগ্রেসের লেবেল এঁটে কংগ্রেসে প্রবেশ করতে হয়। যথা—শ্রী সুভাষ চন্দ্র, শ্রী চিত্তরঞ্জন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

ইংরেজ সৃষ্ট কংগ্রেস ও লীগের লড়াইয়ের কে জয়ী হল এই প্রশ্নের উত্তরে সত্যেন সেনের ষাট বৎসরের লড়াই যে খণ্ডিত ভারতের দাবীর ভিত্তিতে সুদীর্ঘ ষাট বৎসরের লড়াই যে খণ্ডিত ভারতের দাবীর ভিত্তিতে মুসলিম লীগের এক বৎসরের সক্রিয় প্রচেষ্টার নিকট পরাজিত ইহা সাধারণ মানুষের অনুমানের বাহিরে ছিল।

মিঃ জিন্নার পলিসি কংগ্রেসে পলিসির চেয়েও মারাত্মক ছিল। ১৯৪২ সালের ‘দুর্ভিক্ষে মানুষ যখন উলঙ্গ অর্ধেলঙ্গ অনাহারে হাজারে হাজারে মরতে লাগল তখন কংগ্রেসের নেতাদের ‘স্বরাজ’ গবেষণায় ও দিকে দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব হয়নি। কিন্তু লীগ রিলিফ নোঙ্গরখানা খুলে হাজার হাজার মানুষকে খেতে দিয়ে এবং শ্রমিক শ্রেণীতে অনেককে চাকরীর ব্যবস্থা করে স্থায়ী শক্তি বৃদ্ধি করে। অনেকের মতে গান্ধীজীর রাজনৈতিক অদূরশীতা এবং ডিস্টেটরী বা এক নায়কত্ব আর পদ প্রিয়তাই কংগ্রেসকে উন্নত করে জনসাধারণের উপযোগী করে তোলা সম্ভব হয়নি। তাই বিখ্যাত এক সাহিত্যিক এবং প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতার একজন নায়ক গান্ধীজীর পদত্যাগ চেয়ে মন্তব্য করেছিলেন, “যেখানে স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন উক্তি, স্বাধীন অভিমত বারম্বার প্রতিরুদ্ধ হইয়া জাতীয় মহা সমিতিতে পঙ্গু করিয়া আনিয়াছে সেখানে মহাত্মা অথবা কাহারও নিরবচ্ছিন্ন সার্বভৌম আধিপত্য কল্যাণকর নয়।” (সত্যেন সেনের ‘পনেরই আগস্ট’, পৃঃ ৩৩। এই মূল্যবান বক্তৃতা উক্তিটি ধারাল কলম নবীশ শ্রী শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের।

আধুনিক সমীক্ষায় প্রমাণিত হয় কংগ্রেস সর্ব ভারতীয় জনসাধারণের মুখপাত্র তো ছিলই না এমন কি সাম্প্রদায়িক দল হিন্দু মহাসভাও কংগ্রেসকে অস্বীকার করেছিল। প্রমাণ স্বরূপ নিম্নরূপ উক্তি গভীর প্রণিধান যোগ্য—“হিন্দু মহাসভা দাবী করল যে তারা ভারতের হিন্দুদের প্রতিনিধি, কংগ্রেস নয়। কংগ্রেস অভিজাত সম্প্রদায়ের, সাধারণ লোকের সাথে তাদের যোগ নেই। কংগ্রেসের নীতি শুধু তোষণ নীতি।”

(দ্রঃ ‘অবিস্মরণীয়’, গঙ্গানারায়ণ চন্দ্র, ১ম প্রকাশ, পৃঃ ৪৪)

ইংরেজ মাঝে মাঝে কিছু ভারতবাসীকে নানা কারণে প্রকাশ্য প্রয়োজনে বন্দী করে কারাগারে পাঠালেও তাদের অনেকের উপর ইংরেজের দারুন আস্থা ছিল। অনেকে মনে করেন গান্ধীর উপরও ইংরেজের খুব ভরসা ছিল কারণ তিনি সব সময় বিপ্লবীদের অন্য পথে অর্থাৎ অহিংস পথে চালাতে চেষ্টা করতেন। তাই ব্রিটিশ পার্লামেন্টে সদস্য মিস্ উইল কিনসনের কথায়—“ইংরেজের ভয় গান্ধীকে ততটা নয় যতটা ভয় ফ্রেপা ছেলের দলকে। গান্ধী ইংরেজের সব চাইতে বড় পুলিশ অফিসার অর্থাৎ আমাদের পোষা লোক।”

(অবিস্মরণীয়, গঙ্গানারায়ণ চন্দ্র, ১ম মুদ্রণ, পৃঃ ৪১৮)

গান্ধী কেন ইংরেজ তোষণ নীতি গ্রহণ করেছিলেন তা নিয়ে অনেকে এইজন্যই ভাবেন যাকে কেন্দ্র করে ইউরোপের ছায়া ছবিতে দেখানো হল “Every body loves music”। সারা ইউরোপে কি তোলপাড়। কি বিশী ছিল সে ছবি। যেখানে দেখানো হয়েছে অর্ধউলঙ্গ ইংরেজ রমণীর কণ্ঠ জড়িয়ে ধরে নেংটি পরা গান্ধীজী উন্মত্ত হয়ে বলড্যান্স করছেন। তবুও তা প্রতিবাদের বিষয়। মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের ভুলত্রুটিতে সারা দেশে ফলাও করে দেখিয়ে একটা দেশের জাতির নায়ককে তথা ভারতবাসীকে অপমান করা নিঃসন্দেহে নিন্দনীয়। শুধু এটাই নয় বরং “ইন্ডিয়া স্পিকস্” এবং “বেঙ্গলী” ইত্যাদি ছবিতেও এ সমস্ত নিন্দনীয়। শুধু এটাই নয় বরং “ইন্ডিয়া স্পিকস্” এবং “বেঙ্গলী” ইত্যাদি ছবিতেও এ সমস্ত প্রতিবাদ কেউ করেন নি। যখন জার্মানী ও ভিয়েনায় এ সমস্ত ছবি দেখিয়ে ভারতের সম্মান নাশ পর্ব প্রতি পালন করা হচ্ছিল তখন বাংলার বিপ্লবী নেতা নেতাজী সুভাষ চন্দ্র আপত্তি জানালেন Archbishop cardinal intizar এর কাছে। ফলে ভিয়েনায় এ ছবি

দেখানো বন্ধ হয়। হিটলারকে তিনি অনুরোধ জানালেন এ ছবি বন্ধ করতে, সএজ জার্মানিতেও এ বই দেখানো বন্ধ হয়। সুভাষের যোগ্যতাকে অনেকেই ভয় করতেন, বিশেষ করে যারা বুঝতেন তিনি থাকলে তাঁর উপর নেতা হয়ে থাকা মুশ্কিল।

যাই হোক, এ সুভাষ চন্দ্র যিনি গান্ধীর কত বড় বহু প্রচারিত সুনাম ঢেকে ফেললেন সেই সুভাষ চন্দ্রকেই পরে জোর করে প্রকাশ্যে তাড়িয়ে দেয়া হল। প্রমাণ স্বরূপ শ্রী গঙ্গানারায়ণ চন্দ্রের লেখা এ অবিস্মরণীয় পুস্তকের ১ম সংস্করণের ৪১৯ পৃষ্ঠার তথ্য খুবই স্মরণীয়—“সে সুভাষ চন্দ্রকেই পরে গান্ধীজী কংগ্রেস থেকে তাড়ালেন তিন বছরের জন্যে, অপরাধ বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংযোগ। আজও মনে পড়ে দেশের সেই দুদিনে যিনি সুভাষ চন্দ্রকে প্রথম আশীর্বাদ জানিয়েছিলেন তিনি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ।”

তাহলে যার বা যাদের মতে বিপ্লবী হওয়া অপরাধ তাঁকে বা তাঁদেরকে Father of Nation বা জাতির জনক বলা হয়—এটা ঠিক না অবশ্যই ভুল তা নিয়ে আজ অনেকেই ভাবছেন। বর্তমানে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে যাদের নিয়ে মাতামাতি হৈ চৈ করা হয় তাঁদের অধিকাংশই ‘হঠাৎ নেতার দল’। বরং তাঁরা অনেকে ইংরেজের পক্ষেই ওকালতি করেছেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের আসল ইতিহাস ‘সিপাহী বিদ্রোহ’ বলে কথিত ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে মহা বিপ্লবই হচ্ছে আন্দোলন বা সংগ্রাম। আর এ সংগ্রামে সংগ্রামীদের আত্মত্যাগ, যোগ্যতা ও বীরত্বের বিচার করে নতুন করে ইতিহাসকে ঢেলে সাজানো যদি প্রয়োজনই থাকে তবে তা অবশ্যই সম্বন্ধীয়। কিন্তু তবুও সেই সাধু প্রকৃতির কোমল প্রাণ মানুষকে বৃদ্ধ বয়সে প্রকাশ্য রাজপথে ক্রোধ চরিতার্থ করার জন্য গুলি করে হত্যা করা ন্যূনতম সভ্যতাকেও অতিক্রম করেছে। আর তাঁর ছবি পোড়ানো ও মূর্তি চূর্ণ করা অনেকের দৃষ্টিতে বাহুল্য উচ্ছ্বাস প্রবণবতা ছাড়া কিছু নয়।

শ্রী অরবিন্দ

শ্রী অরবিন্দও বঙ্কিমের মত ঋষি উপাধি পেয়েছেন। ১৮৭২ সালে জন্ম আর ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি ছিলেন গোঁড়া মুসলমান বিদ্রোহী নেতা। শক্তির রোদনকল্পে কালী, দুর্গা, বগলা, ভবানী প্রভৃতি দেবীর পূজা করতেন আর ভক্তিবাদ, লীলাবাদ প্রভৃতিকে বিশ্বাস করতেন আর শিবাজীকে তিনি তাঁর দলের আদর্শ করেছিলেন। এক কথায় বলা যায় বঙ্কিম যখন মারা যান তখন তাঁর প্রথম শ্রেণীর যুবক শিষ্যদের মধ্যে অরবিন্দ অন্যতম। অরবিন্দ শুধু মুসলমান জাতির শত্রু ছিলেন না বরং যেকোন অহিন্দু তাঁর বা তাঁদের শত্রু ছিল তাতে ইংরেজরাও পড়ে। প্রমাণস্বরূপ বলা যায় পাঞ্জাব কেশরী লাল লাঙ্গপতরায় মুসলমান ও অহিন্দু ধর্ম বিরোধী আর্থ সমাজে দীক্ষিত।...জনশক্তির বোধন শত্রুনিধনকল্পে বরদায় অরবিন্দ বগলা মূর্তি গড়িয়ে পূজা করেন (১৯০৩) গুপ্ত সমিতিতে নবাগত কর্মীদের তিনি একহাতে গীতা এবং অপর হাতে তলোয়ার দিয়ে বিপ্লবীদের শপথ গ্রহণ করাতেন। লাল, বাল, পাল অভিহিত এ তিনজন আর অরবিন্দ ঘোষ ছিঁরেন চরমপন্থী দলের চার স্তম্ভ। এঁদের মধ্যে অববিন্দ ছাড়া কেউ হিংসাত্মক বিপ্লবে বিশ্বাস করতেন না।” (বাস্তবী রাস্ত্রচিন্তা, পৃঃ ২৬৬০)। ১৯০২ সালে প্রতিষ্ঠিত ‘অনুশীলন দল’ প্রায় পাঁচশত শাখা নিয়ে গুপ্ত সমিতি চালু হয়েছিল। যেখানে শরীরচর্চা ও অস্ত্রচর্চা অনুশীলন হত আর তার সভ্যরা বেশীর ভাগই ডাকাতি, লুট ও হত্যার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। কিন্তু নেতা তা সমর্থন করতেন না। “প্রথমমিত্র, সরলাদেবী প্রথম নেতৃস্থানীয় অনেকেই গুপ্ত হত্যা ডাকাতি ইত্যাদি সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকলাপ সমর্থন করতেন না।” (দ্রঃ ঐ পুস্তক, পৃঃ ২৬২)। অতএব প্রমাণিত হচ্ছে বাকী অরবিন্দের দলের প্রায় সকলেই ঐ কাজে লিপ্ত ছিলেন। সমিতির বিভিন্ন শাখা ১৯০৯ সালের মধ্যে একের পর এক বেআইনি ঘোষিত হয়।...পরের দিকে গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনের সময় এই দু’টি বিপ্লবী দলের অনেক কর্মী ও নেতা কংগ্রেসের সদস্য পদ ও

কর্মপন্থা গ্রহণ করেন।” (দ্রঃ ঐ পুস্তক পৃঃ ২৬২) কংগ্রেস এতদিন ছিল ইংরেজের পোষা অনুগত এখন হতে নতুন মানুষদের আগমনের ‘অনুশীলন ও যুগান্তর’ দলের যুগা যোগে মুসলমান বিদ্রোহ যুক্ত হয়। আজও তার জের চলে আসছে। ফলে ভারতের ইতিহাসে যেন তিনিই তত বড় হীরো যতবেশী মুসলমান বিদ্রোহী।

ঋষি অরবিন্দের ঋষি “বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাই ছিল তাঁর প্রণয়ন উৎস। আনন্দমঠের আদর্শে অরবিন্দ ভবানী মন্দির প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়ে ছিলেন।” (দ্রঃ ঐ পুস্তক ২৬৩)। অরবিন্দ বিলেতে আই, সি, এস পরীক্ষায় ফেল করেন। অনেকে বলেন ইচ্ছা করে ফেল করেছিলেন। যদি তাই হয় তাহলে গোটা কোর্স পড়বার দরকার কি ছিল তা তিনিই জানতেন। সেখানেও তিনি সন্ত্রাসবাদী দল গঠন করেন দাদাভাই নৌরজীর নেতৃত্বে। “ঐ সময় সেখানে Lotus and Dager নামে গঠিত প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদের এক গুপ্ত বিপ্লবী সংস্থার সঙ্গে সংযুক্ত হন।” (দ্রঃ ঐ পুস্তক, পৃঃ ২৬৪)। “অভ্যন্তরীণ বিবাদ বিসংবাদে ফলে অরবিন্দের গুপ্ত সমিতি গঠন ও বৈপ্লবিক তৎপরতায় প্রথম প্রয়াস (১৯০২-৪) ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় (দ্রঃ ঐ)। ঋষির শিষ্য ঋষি অরবিন্দ কলকাতায় একটি পত্রিকার সম্পাদনা করেছিলেন। পত্রিকটির নাম “বন্দেমাতরম”—দ্রঃ ঐ।

গুপ্ত হত্যা ডাকাতি তা তাঁর নীতিতে রাজনৈতিক কারণে ইংরেজ বিরোধী নেতার ১৮০৮ খ্রিষ্টাব্দে জেল হয় প্রায় এক বছর জেলে হাতুড়ী পেটাই হয়ে তাঁর মনের গতি বদলে গিয়ে মুখের সুরও বদলে যায়। তাছাড়া আরও কারণ জেল হতে বেরিয়ে তিনি দেখলেন তার যেন কোন সমাদরই নেই। আসলে তাঁকে লোকে শ্রদ্ধা করত বলে যে ধারণা তাঁর ছিল সত্যিকার কথায় তা শ্রদ্ধা ছিল না বরং ছিল বিপদের ভয়ে ভক্তি যা মূল দৃষ্টিতে ভক্তির মতই মনে হয়।

(দ্রঃ Sri Aurobindo. Speeches, 1952, P-52)

জেল হতে বেরিয়ে অরবিন্দ কর্তৃপক্ষের অত্যাচার ও উৎপীড়ন সম্পর্কে বলেন যে, “দমন নীতি যেন ঈশ্বরের হাতুড়ি—যা দিয়ে পিটিয়ে তিনি আমাদের একটি শক্তিশালী নেশনে পরিণত করতে চায় এবং আমাদের যন্ত্র স্বরূপ ব্যবহার করে বিশ্বকে পরিচালনা করাই তাঁর ইচ্ছা।” (দ্রঃ ঐ)। পুলিশের ভয়ে ঋষি অনেক দিন আত্মগোপন করে শেষে রাজনীতি ছেড়ে পালিয়ে যান এবং যোগ সাধনা জপতপ্ প্রভৃতি করে ঋষি নাম অক্ষুণ্ণ রাখেন। “অরবিন্দের সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে যাওয়ায় অনেকে পলায়নী মনোবৃত্তি বলে মনে করেন।” (দ্রঃ বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা) জেলখানা হতে বেরিয়ে তিনি জানিয়েছিলেন ঠাকুর বাসুদেব তাঁকে জানিয়েছেন স্বাধীনতার চেষ্ঠা করা ভুল ভগবানে আত্মসমর্পণ করাই ভাল পথ। আর রাজনৈতিক স্বাধীনতা কাজের জিনিস নয় বরং বাজে বস্তু। “এখন সকলের কর্তব্য যোগস্থ হয়ে কাজ করা—ভগবানে আত্মসমর্পণ করাই হল যোগ সাধনার প্রথম পদক্ষেপ।” কারাগারে তিনি বাসুদেবের এই মর্মেই ‘আদেশ’ পেয়েছিলেন। তাছাড়া রাজনৈতিক স্বাধীনতাকেও তিনি খুব বড় করে দেখেননি।”

(দ্রঃ ঐ ২৭০)

“বিবেকানন্দ ও তিলকের মতো শ্রী অরবিন্দ গীতার মর্মবাণী সর্বভূত হিতে বিশ্বাসী ছিলেন....তবে হিতবাদীদের পন্থায় সংখ্যালঘুরা উপেক্ষিত হয়েছে। পক্ষান্তরে গীতার মর্মানুসারী ভারতীয় দার্শনিকরা মনে করতেন যে পরম দিব্য যেখানে সর্ববাণী সেখানে সকল মানুষের প্রতি সমান দিকপাত তথা সর্বাঙ্গিক মঙ্গল সাধনই চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত।” —দ্রঃ ঐ পৃঃ ২৮৪। এই উদ্ধৃতিতে প্রমাণিত হয় যে কাগজে কলমে বা বক্তব্য বলেন ঋষি মহাশয় গীতা ভক্ত হলেও আসলে তিনি বঙ্কিম ভক্ত ছিলেন তাই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মঙ্গল কামনা করা তাঁর নীতি বিরুদ্ধ ছিল। তবে গুরু বঙ্কিমের সঙ্গে তাঁর একটা বিশেষ পার্থক্য এই তিনি ইংরেজদের ভাল নজরে দেখতেন না বরং বিরোধিতা করতেন। “তাঁর মতে কম্যুনিষ্টদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার পরিমাণ মুষ্টিমেয় ক্ষমতাসীনের আধিপত্য।” দ্রঃ ঐ। আবার কংগ্রেস দলকেও তিনি ভাল চোখে দেখতেন না প্রকাশ্যভাবে ঘৃণা করতেন তিনি লিখেছেন “A

শরৎচন্দ্র আরও লিখেছেন, “সে কি উত্তেজনা। কি বিক্ষোভ। রবীন্দ্রনাথ নাকি পথের দাবী পড়ে ইংরেজদের সহিষ্ণুতার প্রশংসা করেছেন। এই বইয়েতে নাকি ইংরেজদের প্রতি বিদ্বেষের ভাব আছে বলে মত প্রকাশ করেছেন। আমার ‘পথের দাবী’ পড়ে আমাদের দেশের কবির কাছে যদি এই দিকটাই বড় হয়ে থাকে, তাহলে স্বাধীনতার জন্য আর আন্দোলন কেন? সবাই মিলে তো ইংরেজদের কাঁধে করে নেচে বেড়ানো উচিত। হায় কবি, তুমি যদি

জানতে ভূমি আমাদের কত বড় আশা-কত বড় গর্ব, তাহলে নিশ্চয় এমন কথা বলতে পারতে না। কবির কাছে আমার 'পথের দাবী' এত বড় লাঞ্ছনা হবে এ আমার স্বপ্নের অতীত ছিল। কি মন নিয়েই যে বইখানা লিখেছিলুম তা আমি কারুকে বুঝিয়ে বলতে পারব না।

দঃ শরৎচন্দ্রের টুকরো কথা, অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল)

শরৎ বাবু মৃত্যুর কয়েক বছর পূর্বে বলেছিলেন, "আমার আর পাঁচ খানা বই যদি সরকার বাজেয়াপ্ত করত তাহলে আমার এত দুঃখ হত না।" (নিষিদ্ধ বাংলা পৃঃ ৩৩) শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পূর্বে কেউ তাঁর স্বপ্নকে সফর করতে পারেন নি। মৃত্যুর পরে যিনি করেছিলেন তিনি হচ্ছেন মণ্ডলী ফজলুল হক? তখন তিনি বাংলার মন্ত্রী ছিলেন।

(দ্রঃ ঐ পৃঃ ৩৪)

রবীন্দ্রনাথকে জানতে গিয়ে শরৎচন্দ্রকে ও নজরুলকে আনতে হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে যে চোখে আমরা দেখি বা দেখানো হয়েছে শরৎচন্দ্রকে কিন্তু তা হয়নি। শুধু জানি একজন কথা শিল্পী কিন্তু নজরুল, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র, চিত্তরঞ্জন দাস এঁরা যে স্বাধীনতা শিল্পী তা আমাদের অজানার মত। এই শরৎচন্দ্র, নজরুল, রবীন্দ্র ও বঙ্কিমের চরিত্র যদি পর্যালোচনার তুলনাও ওজন করা হয় তাহলে কি দেখা যাবে না যে সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র ইংরেজ বিরোধী, তাঁর বই বাজেয়াপ্ত, তিনি জেল খাটতে প্রস্তুত, নিজে একজন বিপ্লবী। কিন্তু বঙ্কিমও একজন সাহিত্যিক, ইংরেজ প্রেমিক, ইংরেজ সরকারের মাইনে খাওয়া চাকর ইংরেজ পক্ষে প্রকাশ্যে লিখিত ওকালতি বা দালালিতে শীর্ষস্থানীয় আর দুজন প্রায় একই সময়ে ভারতের মাটিতে জীবন্ত। কিন্তু কাকে কতটা মর্যাদা দেয়া হয়েছে তা আজ হিসেবের দিন না হলেও আগামী কাল হয়ত হিসাব হবে বন্দেমাতরম চলবে কি করে? রবীন্দ্রনাথ একজন কবি বিরাট ধনী, জমিদার, পৃথিবীর ঘুরবার অর্থ তাঁর ছিল। ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে ভূমিকা কতটা ছিল আর ইংরেজ পক্ষে স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু করতে কতটা ভূমিকা ছিল তা উপরোক্ত তথ্যে উদ্ঘাটিত। ইংরেজ কর্তৃক নোবেল প্রাইজ, স্যার ও নাইট উপাধিপ্রাপ্ত এবং 'জনগণ মন অধিনায়ক' কবিতাটি জাতীয় সঙ্গীতে মর্যাদা প্রাপ্ত আর ইংরেজদের পক্ষ থেকে সে রক্তাক্ত আন্দোলনের সময় তিনি বারে বারে তাঁদের দেশে নিমন্ত্রণ প্রাপ্ত মনীষী ছিলেন।

আর এদিকে নজরুল অত্যন্ত দরিদ্র ঘরের অর্থাভাবী কবি। প্রকাশ্যে ইংরেজ বিরোধী, তাই তাঁর বই বাজেয়াপ্ত আর হাতকড়া দিয়ে জেলখানায় বন্দী জীবন-যাপন, কারাগারে চাবুকের আঘাত প্রাপ্ত। ইউরো বা বিলেত হতে নিমন্ত্রণ থেকে বঞ্চিত ইংরেজের দেয়া নোবেল প্রাইজ স্যার, নাইট প্রভৃতি উপাধি হতে বঞ্চিত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে ও নজরুলকে উপযুক্ত মর্যাদায় আমরা যা দেয়ার তা দিয়েছি? 'জনগণমন'....কবিতা এত সমাদৃত কেন তা নূতন ছেলে-মেয়েদের জানা নেই। কারণ সব জানা সত্ত্বেও ওপর মহল থেকে এ কাণ্ড ঘটেছে। নীচু মহলের লোক তা যে বুঝতে পেরেছেন তাতে সন্দেহ নেই। নজরুলকে রবীন্দ্রনাথের পাশে যতটুকু জানতে পারা গেছে তার অন্যতম কারণ কমিউনিস্ট জুজুদের এবং প্রাক্তন পূর্ব পাকিস্তান বা বাংলাদেশের অধিবাসীদের সম্মান প্রদর্শন।.....শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দে জন্মে জীবন্ত জীবনী রেখে ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতায় দরিদ্র ও অর্থাভাবী অবস্থায় পরলোকগমন করেন। যদিও তাঁর জন্য পৃথকভাবে লিখলাম না। তবে যা লেখা হয়েছে সেটাকে গ্রন্থ রচনার কাঠামো করা যায়।

জহরলাল নেহরু

মতিলাল নেজরুর পুত্র জহরলাল ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। স্কুলে পড়তে গিয়ে দেখা গেল তিনি একেবারেই বোকাটে। তখন পিতা পাঠিয়ে দিলেন পণ্ডিতদের দেশে এবং শাসক মনিবের দেশ ইংল্যান্ড। সেখানে থেকে এলেন কেমব্রিজ। ১৯১২ - তে ব্যারিস্টারী

পড়ে দেশে এলেন, একেবারে সাহেব হয়ে চলেন, বলেন, চরিত্রে ও চিন্তায় একেবারে বিলেতি সাহেব, বাপ চাইলেন ছেলের নাম হুড়িয়ে পড়ুক আইন ব্যবসায়। কিন্তু মস্তিষ্কটা জোরালো ছিলনা। তাই তাঁর দোষ দেয়া যায়না। তবু বাপের পয়সাইতেই সাহেবী চাল চালাতে লাগলেন। ১৯১৬ তে হয় বিবাহ। ১৯১৯ সালে চলে জালিয়ানওয়ালা বাগের পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড। তখন জহরলাল চুপচাপ আরামে দিন কাটাচ্ছিলেন ক্রীকে নিয়ে সিমলায় বড় হোটেল। আর সাহেবী হোটেলগুলোতে সাহেবী ফরমাসেস অনুযায়ী চটপট কাজ পাওয়া যায়। ঠিক এ সময় আফগানদের সঙ্গে ইংরেজদের একটা চুক্তির কথা কইতে আফগানী নেতাদের এ হোটেল আনা হয়। এ সময় একজন ইংরেজ ডিঃ ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে ভারতীয় বলে হোটেল থেকে চলে যেতে বললেন। জহরলাল অনেক অনুনয় করলেন শেষে বলা হল একটা লিখিত ছলেখা মুবও দিতে হবে যেকোন আফগানীর সাথে কথা বলবেন না। জহরলাল সাহেবদের কথায় খুব দুঃখ পেলেন কিন্তু বণ্ড দিতে রাজী হলেন না। তাই সাথে সাথে হুকুম হল চার ঘণ্টার মধ্যে শুধু হোটেল থেকে নয় একেবারে সিমলা ছেড়ে চলে যেতে হবে, তাই তিনি ক্রীকে কাছে খুব লজ্জিত হয়ে তাঁকে নিয়ে ট্রেনে উঠলেন। ট্রেনের কামরাতেও ইংরেজ প্রাসেঞ্জারদের কাছ থেকে অপমানিত হয়ে তিনি কংগ্রেসে যোগ দেন। সেখানে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজাত্য পাটিতে যোগ দেওয়া একটা স্বর্ণোজ্জ্বল পদক্ষেপ হত। বছর খানিক নানা কিছু ভূমিকা পালন করে তাঁর কারাদণ্ড হয়। "সে সময় তাঁর ইংরেজের প্রীতিতে কিছু দিনের জন্য তাঁটা পড়লে। তিনি কংগ্রেসের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন বটে কিন্তু অন্তরে অকৃত্রিম ইংরেজ প্রীতি থেকেই গেল। (দ্রঃ Mosley The last days of Brithsh Raj. P-76) গান্ধীজির কাছে নেহরু একরকম আত্মসমর্পণ করলেন। আর দু'জনের নীতিতে প্রায় মিল হয়ে গিয়েছিল। গান্ধী ও সুভাষচন্দ্রের মতবিরোধ চরমে ওঠে। গান্ধীজি দেশকে ঠাণ্ডা রাখতে চাইলেন আর সুভাষ স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করতে দেশবাসীকে প্রেরণা জোগাতে লাগলেন তখন জহরলাল কোন পক্ষে যাবেন সকলেই দেখতে চার, তাই তিনি ঠিক এ সময় ইউরোপ ভ্রমণে বের হলেন। শ্রী গঙ্গানারায়ন চন্দ্র জহরলালের জন্য কিছু কাজের বেলায় চূপ করে তাকালেন। আর যারা চিরদিনই গোপনে ইংরেজকে সাহায্য করে এসেছে। এমন কি শোনা যায় শ্রী চন্দ্র শেখর আজাদ ও শ্রী ভবত সিং এর মৃত্যু ও ফাঁসীর জন্যে যাদের দু'একজন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দায়ী, সে বঞ্চিত দুঃস্থ ভীরাবাই তখন কংগ্রেসের মন্ত্রণাদাতা। পণ্ডিত নেহরু ইচ্ছা করলে এ বিরোধের সমাধান করতে পারতেন মনে বুঝেও ভয়ে কাজে কিছু করতে পারলেন না। ভয়ই কাপুরুষতার লক্ষণ।" কারণ, সুভাষ বাবু যখন ব্যক্তিত্বের জোরে কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হলেন তখনই প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল আজ হতে সভাপতির ইচ্ছায় নয়, একমাত্র গান্ধীজীর ইচ্ছানুসারে ওয়ারকিং কমিটির সভ্য মনোনয়ন হবে। নেহরু গান্ধীকে বলতেন, "You permanent Super President of Congress"। ১৯৩৯ সনের ২৯শে এপ্রিল অগত্যা সুভাষ বাবু পদত্যাগ করেন। যোগ্য লোকের পদত্যাগ কংগ্রেসের কেউ দুঃখ করেনি আর আপত্তিও জানাই নি বরং বিজয় উল্লাসে গান্ধীজী কি জয়। শ্লোগান দিয়েছিল। সারা ভারতে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে উচ্চ শ্রেণীর স্বাধীনতার নায়ক দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের মতাবলম্বী সুভাষ বোসকে নেহরু কুৎসিত কথা বললেন-সুভাষ ফ্যাসিষ্ট।" সুভাষ উত্তর দিলেন-"যদি ফ্যাসিষ্ট বলতে হিটলার, মহান টিলার বা স্কুদে হিটলার বোঝার তাহলে সে রকম অনেক লোকই কংগ্রেসে দক্ষিণ পন্থীদের মাঝে পাওয়া যাবে।" (দ্রঃ Michael Edwardes—The Last year of British India. P. 67)

সুভাষ তাঁর বড়দের পরামর্শ নিয়ে ফাওয়ার্ড ব্লক দল গঠন করলেন। কংগ্রেস সে অজুহাতে তাঁকে তিন বছরের জন্য তাড়িয়ে দিলেন। তিনি জানতেন এরা বিপ্লব করেনি করবে না ও করতে দেবে না তাই আন্দোলন চালিয়ে যেতে লাগলেন। ছাত্রদল তাঁর পাশে

এসে দাঁড়াতেই সরকারের পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে ছাত্র নেতা জ্যোতির্ময় ভৌমিক ও ঢাকার অনিলচন্দ্র দাস প্রাণ দিলেন।

দলে দলে বীর জোয়ানরা যখন কমিউনিষ্ট দলে যোগ দিতে লাগল তখন জয় প্রকাশ নারায়ণ, নরেন্দ্রদেও আর অশোক মেটার চেষ্টায় কংগ্রেসের ভিতর জন্ম হয় কংগ্রেস সোসাইলিষ্ট পার্টির। এইবার মুসলমান জাতির পুরাতন পথে ও কমিউনিষ্ট পার্টির নতুন পথ অর্থাৎ পূর্ণ স্বাধীনতা ও বিপ্লবে বুলি বলে সংগ্রাম চালাবার কথা ঘোষণা করে।

(দ্রঃ V. V. Balabushevich — A Contemporary History of India. P. 294-95)

১৯৩৯ সনের ৩রা সেপ্টেম্বরে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ আরম্ভ হয়। জার্মানির আক্রমণ শাসক ইংরেজ ব্রিটিশের জাহাজ একে একে জলের তলে তলিয়ে গেল। তখন গান্ধীজী খুব শোক পেলেন এবং দুঃখময় বিবৃতিও দিলেন (দ্রঃ অবিস্মরণীয়, ৩২ পৃঃ ২য় খণ্ড)। লণ্ডনে পড়তে লাগল প্রচণ্ড বোমা। ইংরেজ বাহাদুররা বাদুড়ের মত কোথায় লুকাবে ভাবছে। ঠিক এ সময় গান্ধীজী কামনা করেছিলেন ইংরেজের জয়। কারণ তারা জয়ী হয়ে ভারতকে স্বাধীনতা দেবে আর যদি পরাজিত হয় তাহলে রাগে, দুঃখে, অভিমানে তা নাও দিতে পারে।

কিন্তু নেতাজী গান্ধীর কাছ থেকে আঘাত আর অপমানের কশাঘাত পেয়েও দেশের জন্য সব ভুলে নিজের ইচ্ছাত নষ্ট হওয়ার কথা চিন্তা না করেও গান্ধীর কাছে করুন আবেদন করলেন যে, এই উপযুক্ত সময় এখন যদি আমরা ভারতে বিপ্লব জোরদার করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যাই তাহলে বহুদিনের আশা পূরণ করে আমরা পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করতে পারব। আপনি একটু চিন্তা করুন। অর্পূর্ব সুযোগ।

“সেদিনের সেই শ্রী ব্রষ্ট দিনে গান্ধীজী ইংরেজ শোকে মুহুমান।” (দ্রঃ অবিস্মরণীয় ২য় খণ্ড) তাই যা উত্তরে বললেন তাতে অবাক অথবা ক্রোধ কোনটি এগিয়ে আসবে কে জানে? গান্ধী বললেন ইংরেজকে ধ্বংস করে আমরা স্বাধীনতা চাই না—অহিংসা সংগ্রামের নীতি এ নয়।” (দ্রঃ Indian struggle, p. 3-34) সারা ভারতের কোন বুদ্ধিমান ও দেশ ভক্ত এ কথা মানুন আর নাই মানুন পণ্ডিত জহরলাল তা সমর্থন করলেন। তাঁর পাণ্ডিত্য আরও জ্যোতির্ময় হয়ে উঠল। মাওলানা আযাদ কিন্তু প্রতিবাদ করে বলেছিলেন, “কংগ্রেস আপোষ করবার সমিতি নয়, ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের ব্যবস্থা। অনন্যোপায় হলে ভারতবাসীর অস্ত্র ধারণের অধিকার আছে। (দ্রঃ Azad India wins freedom, 34)

এ অবস্থায় মাওলানা আজাদের একটা স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হল। কিন্তু জহর যেন গান্ধীর ছায়া আর গান্ধী যেন তাঁরা ছায়া। ২রা জুলাই সুভাষ বন্দী হলেন, নয় তাঁকে বন্দী করা হল। অপরাধ হচ্ছে বিপ্লবের পক্ষপাতী আর মুসলমান শহীদ নবাব সিরাজের অক্ষকূপ হত্যার মিথ্যা মনুমেন্ট ভেঙ্গে ফেলার জন্য সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন। কারণ ওটা শুধু মুসলমানদের হীন চোখে দেখার চিহ্ন শুধু নয় বরং জাতীয় মর্যাদাহানির মনুমেন্ট সেটা। সুভাষের জেলে যাওয়া যেন সারা ভারতে মানুষের মনে তাঁর প্রতি ভক্তির জোয়ার এনে দিল। তখন গান্ধীজী, জহরলাল বুঝে দেখলেন জেলে যাওয়া ছাড়া সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখা বা জনসাধারণের মনের মোড় ঘোরানো যাবে না। তাই ১৯৪০ সারে অক্টোবর মাসে করলেন সত্যগ্রহ নামে জুলন্ত বিপ্লব। গলায় মালা পরে ইংরেজের মালের ও সম্মানের তেমন ক্ষতি না হয় এমন ছোট একটা আইন অমান্য করে একে একে ভদ্রভাবে জেলে যাবার সিদ্ধান্ত হয়। প্রথমে বিনোবাভাবে গলায় মালা পরে প্রথম সত্যগ্রহী সাজলেন। তিনি মাস জেল মঞ্জুর হল। গঙ্গানারায়ণ বাবু লিখেছেন, “এক দিনেই তিনি পরম ত্যাগী দেহ কর্মী হয়ে গেলেন আর সেই জোরেই আজও ভূদান যজ্ঞের পৌরহিত্য করেছেন আর কংগ্রেস তাঁর পৃষ্ঠপোষক। এর আগে দেশের লোক হয়ত তাঁর নামই নিত না।” কয়েক দিন পরে সারা ভারতের দু নম্বরের সত্যগ্রহী এগিয়ে এলেন পণ্ডিত নেহরু। তিনিও চার বছর কারাদণ্ড পেলেন। এমন করে ভারতে বিশ হাজার সত্যগ্রহী বন্দী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করলেন। এখানে নেতাজী আর নেহরুর পত ও মতের কত

তফাত। এ বিশ হাজার লোকের ইচ্ছাকৃতভাবে জেলে ঢোকান অগ্রহ নিছক ভ্রান্ত পথ বলে অনেকে মনে করেন। তাঁদের মতে জেলের বাইরে থেকে কাজ করলে তাতে লাভ ছিল বেশী।

আজ কিন্তু সেই সত্যগ্রহী দলের অনেকে জেল খাটার সনদ দেখিয়ে বাস চালাবার রুট আর ছেলের বড় চাকরী উদ্ধার করে উপকৃত হচ্ছেন। সুভাষবসু জেলে অনশন আরম্ভ করলেন। উদ্দেশ্য ছিল বাইরে আসা। তাঁকে মুক্তি না দিয়ে তাঁর গৃহেই বন্দী রাখার ব্যবস্থা হয়। ওখান হতেই নেতাজী মুসলমান সেজে মওলুবী জিয়াউদ্দিন নাম ধারণ করে বাইরের সাহায্য বা অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহে এবং ভারতের বাইরে থেকে কোন রেডিও সেন্টার খুলে তার মাধ্যমে ভারতের জনগণ বিশেষতঃ হিন্দু জনগণকে কংগ্রেসের মায়াজাল থেকে মুক্ত করার জন্য একেবারে কাবুলের পথে রাশিয়ার দিকে রওয়ানা হলেন। পৌছালেন পেশোয়ার। ওখান থেকে সাথে রাশিয়ার রেখারায় ওখান থেকে সমরখন্দ। ২৮শে মার্চ বিমানে বার্লিনে এলেন। সুভাষ জার্মান থেকে দু’টি রেডিও সেন্টার খুললেন একটির নাম দিলেন ‘কংগ্রেস রেডিও’ যার দ্বারা কংগ্রেস ভক্তদের ডাক দেবেন। আর সুদূর দৃষ্টিসম্পন্ন সুভাষ জানতেন ভারতের স্বাধীনতার শ্রষ্টা মুসলমান জাতি, তারা শুধু কংগ্রেস, ইংরেজ সৃষ্ট ভারতীয় নেতাদের বাধা দান ও বিরোধীতার জন্য অকৃতকার্য হতে চলেছে। তাই অপর রেডিও সেন্টারের নাম রাখলেন ‘আজাদ মুসলিম’ রেডিও। ভারতের এ মহানেতা সুভাষের বড় শত্রুদের মধ্যে অন্যতম ঐতিহাসিকি শত্রু ছিলেন নেহরু। সুভাষ যখন ভারতের বাইরে গিয়ে আযাদ হিন্দু ফৌজ গঠন করে লড়াই করতে করতে ভারতের দিকে এগিয়ে আসছেন তখন ব্যারিস্টার পণ্ডিত নেহরু দেশে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছেন আর বক্তৃতার বড় অংশ হচ্ছে “সুভাষ এলে আমি রাইফেল হাতে তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবো।” (দ্রঃ অবিস্মরণীয়, ২ খণ্ড) তাছাড়া অন্য জায়গায় তিনি ‘নিজ হাতে গুলি করে মারব’ বলে প্রকাশ্য সুভাষ ভাষণ দিয়েছেন। এর কারণ চিন্তা করলেই বোঝা যাবে তিনি কেন একথা বলেছিলেন? কে বা কারা তা বলিয়েছিলেন? আর অশোভন অন্যান্য উক্তি দেশের কল্যাণে বলেছেন না নিজের কল্যাণে?

আর আজ আমাদের মাতৃভূমিকে ত্রিখণ্ডিত দেখছি প্রথমে বিনা প্রমাণে জানতাম যত দোষ সব জিন্নার কিন্তু সে কথা সম্পূর্ণ সঠিক নয়। জিন্নাহও ইংরেজেরই হাতে গড়া নেতা কিন্তু গান্ধী, জহরলাল, প্যাটেল প্রভৃতি পণ্ডিতগণ যদি রাজি না হতেন ভারত ভাগ হত না এটা মত শত বর্তমান ইতিহাস বিজ্ঞানীর মত। মিঃ মাইকেল ব্রীচার খ্রিস্টান লেখক জহরলালের একজন প্রথম শ্রেণীর বন্ধু ছিলেন। প্রমাণে বলা যায় নেহরু তাঁর জীবনী লিখতে ভারত তাঁকেই দিয়েছিলেন। নেহরু তাঁকে বলে ছিলেন “অথও ভারত থাকলে প্রতিদিনই সাম্প্রদায়িক অশান্তি লেগে থাকত তাতে দেশের সর্বাসীন উন্নতি হতনা এবং অচিরে স্বাধীনতা পাবার কোন উপায় থাকত না তাই তিনি দেশ বিভাগ মেনে নিয়েছেন।”

(অবিস্মরণীয়, ২য় খণ্ড, পৃঃ-১৭৮)

পরে মিঃ মসলোকে নেহরু যা বলেছিলেন তা আরও স্বচ্ছতর। “সত্যি কথা বলতে কি আমরা ক্রান্ত, বার্ষিক্যও আসছে। আর জেলের কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা আমাদের অনেকেরই নেই। যদি ভারতের ঐক্যের জন্য লেগে থাকতাম তাহলে আমাদের জেলে যাওয়া অনিবার্য হয়ে উঠত। পাঞ্জাবে অমান্তির আগুন দেখেছি প্রতিদিন নরহত্যার খবর পেয়েছি এ থেকে পরিত্রাণ পাবার উপায় দেশ বিভাগ মনে করে এটা গ্রহণ করেছি। তবুও গান্ধীজী ‘না’ করলেই আমরা সংগ্রামই করে যেতাম। আমরা এই মনে করে দেশ বিভাগ মেনে নিয়েছিলাম যে পাকিস্তান হবে স্বাধীন আর আমাদের কাছে ফিরে আসতে বাধ্য হবে। আমরা কোন দিনই ভাবতে পারিনি যে এত লোক মরেও কাশ্মীর নিয়ে আমাদের এত তিক্ততা বাড়বে।”

(Mosley, P-218)

উপরোক্ত মন্তব্যে ভিতরের তথ্যও যেমন প্রকাশিত তেমনি নেহরুর দূরদর্শিতার কত স্বল্পতাও অনুমেয়। ভারতবর্ষকে ভাগ করার জন্য যখন বিলেত হতে আনানো হয়েছিল মিঃ

লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনকে তিনি শুধু তাঁর সুন্দরী স্ত্রীকেই আনেন নি তিনি এনেছিলেন তাঁর পরমা সুন্দরী কন্যাকেও। তার অনেক কারণ ছিল। জহরলালের সাথে তিন ঘণ্টা আলাপ করে তাঁর কোথায় দুর্বলতা ছিল সাহেব সব বুঝে ফেললেন। এও বুঝলেন একটু প্রশংসা করলে খুশীতে অনর্গল কথা বলে যান (Mosley, 94)। নেহরুকে মিঃ মাউন্ট ব্যাটেন প্রশ্ন করলেন—“জিন্নাহ লোকটা খুব একটা ভাল নয়, আপনি কি বলেন? নেহরু নিদেের শুদাম ঘর খোলার মত বলতে লাগলেন, জিন্নাহর নামে অনেক কিছু বলে ফেললেন যার সারকথা হচ্ছে জিন্নাহ নামেই ব্যারিস্টার কাজে কিছুই নয়, নিরেট বোকা ইত্যাদি। সাহেব জিন্নাহকে জানার ভানে জেনে ফেললেন জহরলালকে আর বুঝলেন জহরলাল একান্তই অযোগ্যতা অথচ নেহরু নিজেই আইন ব্যবসায়ে অকৃতকার্য তা তিনি জানতেন। আর জিন্নাহ ব্যারিস্টারী পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে পাশ করে বিলিতি ছাত্রদের চমকে দিয়েছিলেন তাও তিনি জানতেন। আর জিন্নাহ যে বুদ্ধির যুদ্ধে জহরলাল, গান্ধী ও কংগ্রেসের হত্যাকর্তাদের অধিকাংশকে পরাজিত করেছেন তাও মিথ্যা বলা মুশ্কিল।

লগুনে কমিউনিষ্ট পার্টির তরফ হতে একবার জিন্নাহকে কেস দিতে গিয়ে দেখা যায় তাঁর অখনকার দিনে ফিস ছিল দুই হাজার পাউণ্ড বা ত্রিশ হাজার টাকা। তাই ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির জন্মদাতা কমরেড মুফাফ্যর আহমদ লিখেছেন, “তিনি ফিস নিতে অস্বীকার করেননি কিন্তু ফিস দাবী করেছিলেন দুই হাজার পাউণ্ড (ত্রিশ হাজার টাকা)। মিঃ সি, অলষ্টনের দৈনিক ফিস ছিল এক হাজার টাকা। এ হিসেবে জিন্নাহ কিছু বেশী ফিস দাবী করেন নি।”

(দঃ আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি, পৃঃ ৪৪৭, মুজাফ্যর আহমাদ)

মাউন্ট ব্যাটেন তাঁর স্ত্রীকে নেহরুর প্রতি নিষ্ফেপ করলেন আর তাঁর সুন্দরী কন্যা কুমারী প্যামেলাকে রাজনীতি শেখবার ভান করে গান্ধীর দিকে নিষ্ফেপ করলেন। আর নেহরুর অত্যন্ত আদুরে মাতৃহীনা কন্যা ইন্দিরাকে স্নেহ ও ভালবাসা দেয়ার জন্য মিঃ জনসনকে নিয়োগ করলেন। আর লর্ড ইস্মে এবং জর্জ এবেলকে নিষ্ফেপ করলেন মুসলিমলীগ নেতাদের প্রতি। প্রায় সকলকে বশে আনা গেল শুধু জিন্নাহ ব্যতিক্রম। জহরলালের স্ত্রী অনেক দিন আগে মারা গিয়েছিলেন তাই তাঁর শূন্যস্থান পূরণ করতে যেন এগিয়ে এলেন মাউন্ট ব্যাটেনের স্ত্রী এডউনানা কিন্তু সেটা যে অভিনয় ছিল নেহরু তা বুঝতে পারেন নি। মিঃ মশলে তাই লিখেছেন, He had long been a widowe, and he was a lonely man. Lady Mount Batten filled an improtant gap in his life (Mosley 103)। মাওলানা আযাদ ও নেহরুকে একগুয়ে বা একরোখা বলেছেন কিন্তু একামাত্র সুন্দরী এডউইনার কথা তিনি কাটতে পারতেন না। ওখানেই ছিল তাঁর গুপ্ত অপ্রকাশ্য বিতর্কিত দুর্বলতা।

চতুর ইংরেজ বিলেত থেকে কাজ সমাধা করল প্রেরিত নেতার চাতুরী দিয়ে। আমাদের দেশের হঠাৎ নেতাদের দল তাদের চাতুরীর শিকার হয়ে ইতিহাসকে অন্ধকার করেছেন বললে ঠিক হবে কি ভুল হবে কে জানে?

চিত্তরঞ্জন দাস

১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দে চিত্তরঞ্জন দাস জন্মগ্রহণ করে ১৯২৫ সালে তিনি পরলোকগমণ করেন। তাঁকে অনেকেই দেশবন্ধু বলে থাকেন। অতি অবশ্যই তিনি দেশবন্ধু তো ছিলেনই বরং সর্ব ভারতীয় সমস্ত হিন্দু নেতাদের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। তিনি ছিলেন সত্যকার চিন্তাশীল দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সত্যবাদী নেতা। তিনিও একজন ব্যারিস্টার ছিলেন। তিনি আই, সি, এস, পরীক্ষায় ফেল করেছিলেন। তাতে তিনি ইচ্ছা করে ফেল করেছি বা ইচ্ছা করে ঘোড়ায় চড়ি নাই বলে কোন অজুহাত করতে পারতেন কিন্তু তিনি সহাস্যেই বলেছিলেন কোন অজুহাত করতে পারতেন কিন্তু তিনি সহাস্যেই বলেছিলেন I came out first in the unsuccessful list অর্থাৎ ফেল করার তালিকায় আমি প্রথম হয়েছি।

তিনি দাদাভাই নৌরজী, সুরেন্দ্রনাথ, আনন্দমোহন, অনুকুল ঠাকুর প্রভৃতি ব্যক্তিদের আদর্শ কি তা বোঝার চেষ্টা করেন আর ব্রাহ্ম পরিবারে তো তাঁর জন্মই হয়েছিল। ফলে প্রত্যেক নেতা ও সাধু পুরুষদের অকৃতজ্ঞতার্যতার পরিণাম ও পরিমাণের পরিমাপ তো তিনি করেই ছিলেন। সে সাথে সমস্যার সমাধান কি তাও তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। প্রথমে তিনি সাম্প্রদায়িক ‘অনুশীলন’ দলের টানাটানিতে সেখানে যুক্ত হয়েছিলেন। আর তাঁকে ভাই প্রেসিডেন্টের সেখানে যুক্ত হয়েছিল। কিন্তু তিনি প্রথমেই বুঝেছিলেন এ সংস্থার দৃষ্টিভঙ্গি খুব ক্ষীণ তবুও তাঁদের সংশোধনের চেষ্টা করলেন। যখন বুঝলেন তাঁর পক্ষে তা সম্ভব নয় তখন তিনি নিজেই সরে এলেন ‘অনুশীলন’ আওতা থেকে। ক্রমে ক্রমে লোকে তাঁর যোগ্যতায় মুগ্ধ হতে থাকে এবং আইন ব্যবসায়ে খুব নাম ছড়িয়ে পড়ে। টাকা উপার্জনও বহুল পরিমাণে হতে থাকে। কিন্তু দেশবন্ধু দু’হাতে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে দান করতে থাকেন। লোকে তাঁকে দাতা দধীচি বলত মুসলমানরা তাঁকে দাতা হাতেম তাই বলত। এবার তিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে নেমে পড়লেন। জহরলাল ও গান্ধীজী বেচারাদের ভাগ্য মন্দ ব্যারিস্টারী পাশ করেও আইন ব্যবসা চলেনি। তাই রাজনীতিতে এসে বরং ভালই করেছিলেন তাঁরা। কিন্তু দেশবন্ধুর অবস্থা তা নয়, উপার্জনের জোয়ার ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে যখন আন্দোলন চরম আকার ধারণ করে তখন তিনি তাঁর উপার্জনের রাস্তা ইচ্ছা করে বন্ধ করে দেন। কারণ তিনি বুঝেছিলেন যে, এ আন্দোলনে অনেকের চাকুরী ও রোজগারে বাধা আসবে সেখানে। তার আগেই তিনি নিজের আদর্শ সামনে রেখে জনগণকে অবাক করেন। যখন জালিয়ানওয়ালাবাগে হত্যাকাণ্ড ঘটে তখন কংগ্রেসের এক তদন্ত কমিটিতে সদস্য হিসেবে চিত্তরঞ্জনের চমকপ্রদ ভূমিকা ছিল। জহরলালের পিতা মতিলালের সভাপতিত্বে অমৃতসর কংগ্রেসে চিত্তরঞ্জনের “Total Obstruction” এর পন্থা সুপারিশ করেন এবং কংগ্রেস চিরকাল শোষক সরকারের তোষক হিসেবে এবারেও সভায় ভারত সচিবকে ধন্যবাদ জানাবার প্রদান ভীকৃত্য ও তোষণ ছাড়া কিছুই নয়। কিন্তু তাঁর এই যুক্তি কেউ গ্রহণ না করায় যে প্রস্তাবটি নিহত হয়। চিত্তরঞ্জনের পূর্বে জাতির জনক গান্ধীজীর আবির্ভাবই হয়নি। গান্ধী ও চিত্তরঞ্জন একই সময়ে কাজ করেছেন। গান্ধীর বহু কাজের তিনি প্রতিবাদ করেছেন। কিন্তু গ্রহণ হোক আর নাই হোক তিনি তাঁর উদার ও সমতাবাদের বা ন্যায় নীতিকে বর্জন করে গান্ধীবাদে আত্মসমর্পণ করতে পারতেন না।

১৯২২ সালে ডিসেম্বর মাসে মতিলাল, লাললাজপত রায় প্রভৃতি অনেকেই দেশবন্ধুর প্রভাব আঁচ করতে পেরে তাঁর সাথে যোগ দেন। ১৯২৩ সালৈ স্বরাজ দল পরিষদের নির্বাচনে সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করেন। কিন্তু মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করলেন না। চিত্তরঞ্জন বুঝেছিলেন স্বাধীনতার ইতিহাসে মাওলানা শাহ ওলিউল্লাহ আর সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী হতে মাওলানা মুহাম্মদ আলী, মাওলানা শওকত আলী প্রভৃতি হাজার আলেম ও কোটি কোটি মুসলমানদের অবদানকে চাপা দিয়ে এবং মুসলমানদের উপেক্ষা করে স্বাধীনতা ও সংহতি, সংগঠন, সংগ্রাম কিছুই সম্ভব নয়। তাই বাংলার হিন্দু ও মুসলমানদের মিলনের জন্য একটি চুক্তিপত্র রচনা করেন কারন বাংলা হচ্ছে ভারতের মস্তিষ্ক বাংলা ঠিক হওয়া মানে ভারত ঠিক হওয়া। বাংলার চুক্তি পত্রটি ছিল এই রকম—

১। “বঙ্গীয় ব্যবস্থার সভায় হিন্দু মুসলমান নির্বাচন লোক সংখ্যানুপাতে হইবে। কিছুকাল পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় নিজ নিজ প্রতিনিধি নির্বাচন করিবেন।

২। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, লোকাল বোর্ড ইত্যাদিতে ৬০ ও ৪০ অনুপাতে প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবে, অর্থাৎ যেখানে মুসলমান সংখ্যা বেশী সেখানে শতকরা ৬০ জন মুসলমান এবং হিন্দুরা সংখ্যা বেশী হইলে শতকরা ৬০ জন হিন্দু নির্বাচিত হইবেন।

৩। বাংলার মুসলমানগণ লোক সংখ্যানুপাতে চাকুরী পাইবেন।

৪। আইনের দ্বারা ধর্ম সংক্রান্ত কোন বিষয় বন্ধ হইবে না। যে সম্প্রদায়ের ধর্ম সংক্রান্ত বিষয়ে কোন কিছু নতুন নিয়ম প্রবর্তিত হইবে, সে সম্প্রদায়ের শতকরা অন্ততঃ ৭৫ জন লোক অনুমোদন করিলে তবে উহাতে পারিবে।

৫। (ক) ধর্মের জন্য যদি গোহত্যার প্রয়োজন হয় তবে হিন্দুগণ উহাতে বাধা প্রদান করিতে পারিবে না। আর মুসলমানগণও হিন্দুর প্রাণে ব্যথা লাগে এমন স্থানে গোবধ করিবেন না।

(খ) নামায পড়িবার সময়ে মসজিদের সম্মুখে সঙ্গীত হইতে পারিবে না। (দ্রঃ সুকুমার রঞ্জন দাসের 'দশবন্ধু চিত্তরঞ্জন' ১৯৩৬, পৃষ্ঠা ২০২-২০৩)

উপরোক্ত চুক্তিপত্রের জন্য শ্রী সৌরেন্দ্র বাবু বলেছেন, "তিনি মনে করতেন যে মুসলমান সম্প্রদায় সর্ব দিক দিয়ে হিন্দুদের মত সমান যোগ্যতা অর্জন করলে এ ব্যবস্থার প্রয়োজন স্বতঃই চলে যাবে।" চিত্তরঞ্জন একজন বিখ্যাত ব্যারিস্টার অতীতকে স্মরণ করে, বর্তমান পরিস্থিতি পরিদর্শন করে আর ভবিষ্যত চিন্তা করে চমৎকার চূড়ান্ত সমাধান সৃষ্টি করলেন। যারা সত্যিকারের শান্তিপ্ৰিয় ও ভারত প্রেমিক হিন্দুরা তা মেনে নিলেন আর অন্য ধারে সমগ্র মুসলিম সমাজও তা মেনে নেয়। তাই ভারত বন্ধু চিত্তরঞ্জনের এই বিখ্যাত চুক্তিটি ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে অনুমোদিত হয়। কিন্তু হিন্দু মহাসভার সমর্থকরা এবং মুসলমান বিদ্রোহী কংগ্রেসের খোলস পরা নেতারা নানা গুঞ্জন, আলোচনা, সমালোচনা ও পর্যালোচনা করে একটি আইনের ফাঁক বের করে সেটি হচ্ছে এই যে, একটি উপসমিতি গঠন হোক এবং এই প্রস্তাবটি সারা ভারতে কতটা গ্রহণযোগ্য দেখা হোক। (দ্রঃ Subhas Chandra Bose. The Indian Struggle, 1920-42, 1964, p-92)

বিরাট ষড়যন্ত্র চলতে লাগল। চিত্তরঞ্জনের কোমল হৃদয়ে বড় ব্যথা পেলেন, বুঝতে পারলেন নেতাদের কাছে দেশ আগে নয় সাম্প্রদায়িকতা আর নিজেদের জেদ বহালই বড়। তবু তিনি বীরত্বের সাথে কাজ করতে লাগলেন। সুভাষের উপরে তাঁর আস্থা ছিল খুব বেশী। আর গান্ধীজী সম্বন্ধে তাঁর যে ধারণাই থাক তবু তাঁকে তিনি অন্তত হিন্দু মুসলমান মিলনের ক্ষেত্রে পক্ষে পাবেন বলেই আশা রাখতেন। কলকাতায় পৌর সভার নির্বাচন আরম্ভ হয়। সে নির্বাচনে ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতার সর্ব প্রথম মেয়র নির্বাচিত হন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। আর তাঁর চিন্তা, কর্ম ও মনের সঙ্গী সুভাষ চন্দ্র হন চীফ একজিকিউটিভ অফিসার। তাঁদের দুজনেরই জন প্রিয়তা আরও প্রমাণিত হয়। গুপ্ত বিরোধীরা হিংসার দাবানল লুকিয়ে রাখে কোন মুহূর্তের প্রতীক্ষায়। গান্ধী, সুভাষ ও চিত্তরঞ্জনকে অনেক বিষয়ে ভার চোখে দেখতেন না। ফলে তাঁরাও তাঁকে অনেক ক্ষেত্রে ঠাণ্ডা সংযত অপমান করতেও কুঠাবোধ করেননি। তবুও দেশের খাতিরে তাঁকেও এক পথ ও মতে মিলিতে ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে বেরগাঁও কংগ্রেসে আপোষ হয়ে যায়। ফলে ভারতের ভাগ্যাকাশে পূর্ণিমার রাত্রি এগিয়ে আসে। এ সময় দেশে সুস্থ পরিবেশ গড়তে তাঁকে খুব পরিশ্রম করতে হয়। ১৮২৫ সালেই জুন মাসে হঠাৎ দেশবন্ধুর মৃত্যু হয়। দেশ বন্ধুর মৃত্যুতে দেশ কাঁদতে থাকে কিন্তু দেশ শত্রুর দল গোপন আনন্দে নরকের নৃতন পথ আবিষ্কার করে। সে ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে হিন্দু মুসলমান প্রাণ্ডি যার জন্ম দিয়ে গিয়েছিলেন চিত্তরঞ্জন। ১৯২৬ সমীক্ষায় গ্রহণ করে সে ঐতিহাসিক চুক্তিটি বাতিল করা হয়।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন হিসেব করে নিয়ে ছিলেন। জ্ঞান, বুদ্ধি, বীরত্ব ও মহত্ব মুসলমানরা হিন্দুদের অপেক্ষা কোন দিকে পশ্চাৎপদ নয়, তবুও তাঁরা ইংরেজী শিক্ষা বর্জন করেছেন স্বাধীনতার জন্যই। ফলে চাকুরীর রাস্তা নিজেরাই বন্ধ করেছেন। সে সময় হিন্দু জাতি সহযোগীতা না করে বরং বেশীর ভাগই তাঁদের বিরোধীতা করে এসেছেন। এখন মুখে শুধু মিলন মৈত্রীর লম্বা বুলি না বলে মিলন মৈত্রীর কিছু কাজের দরকার মনে করে তাই তিনি

নির্দিষ্টকারের জন্য মুসলমানদের শতকরা ৮০ আর হিন্দুদের বাকী শতকরা ২০টি হিসাবে চাকুরী বন্টনের কথা বলেছিলেন—

"Once Mr Das announced as A. I. C. C. President the as the Muslims of Bengal are backward in every sphere of life, therefore they will have the facilities to join in every government office by 80%. It's a matter of regret that after he died some of his followers assailed his oppositron and his declaration was repudiated. The result was that the Muslims of Bengal moved away from the Congress and the first seed of partiio was sown." (দ্রঃ India wins freedom by Azad)

মাওলানা আবুল কালাম আযাদের মতে চিত্তরঞ্জনের হঠাৎ মৃত্যু না হলে ভারতবর্ষ ভাগাই হতনা। ভারতের ইতিহাস অন্য রকম হত। "হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতি ছিল তাঁর আহোরাত্রের চিন্তা। সাম্প্রদায়িক ঐক্যের জন্য তিনি প্রাণপাত পরিশ্রম করেছেন। ঐক্য ও সহযোগিতার তাগিদে রচিত তাঁর কর্মপন্থা Das Formula নামে পরিচিত। ঐ কর্মপন্থার জন্য তাঁকে যথেষ্ট অপ্রিয় ভাজন হতে হয়।" (বাঃ রাষ্ট্রচিন্তা, পৃঃ ৩৮)। ১৯২৫ সারে তাঁর মৃত্যুর পরেই হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের নানা সংগঠন মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়, যথা 'শুদ্ধি সভা', 'হিন্দুসভা', 'হিন্দু মিশন', 'হিন্দু সংগঠন'। অনুরূপভাবে সৃষ্টি হয় মুসলমানদের মধ্যে 'আজ্জুমান', 'খিলাফত কমিটি', 'তানজীম কমিটি', 'জমিয়তে-ই-উলামা' ইত্যাদি। "হিন্দু মহাসভা" ও 'আর্য সমাজ' শুদ্ধি আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করে এবং ভারতের উত্তর প্রদেশের প্রায় ৮৪টি মুসলমান গ্রামে আন্দোলনের হানা দিয়ে তাদের হিন্দু ধর্মের অন্তর্ভুক্ত করে।" (দ্রঃ এ) মদনমোহন মালব্য, লাজপাতরায় প্রভৃতি নেতাদের পরিশ্রমে সে বাজারে মুসলমান বিরুদ্ধ ষড়যন্ত্রকে কাজে পরিণত করতে দশ লক্ষ টাকা সংগ্রহেরও ব্যবস্থা করা হয় এবং ঐ ১৯২৬ সালেই 'হিন্দু সংঘ' নামে একটি মারাত্মক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। তাছাড়া 'অভয় আশ্রমে' শিবাজী উৎসব পালন করার গোড়াপত্তন করে। হিন্দু মিশনের ভূমিকাও ছিল খুবই মারাত্মক এবং ধ্বংসাত্মক। (দ্রঃ A. Eporter, census of India, 1931. Vol. V. Part-1, Report, P. 394)

ইং ১৯২৭ সালে ফরিদপুর ও বরিশালে হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা হয়। ছোট বড় নানা দাঙ্গা নানা স্থানে চলতে থাকে। ১৯৩০ সারে ঢাকায় জোর দাঙ্গা হয়। কিন্তু মুসলমানদের পক্ষ থেকে যে দাঙ্গাগুলো হয়েছিল বেশীর ভাগ শোষণ মহাজল ও জমিদারদের উপর আক্রমণ। আর জমিদাররা এ আক্রমণ প্রতিহত করতে গিয়েই দাঙ্গা ভিষণ রূপ নেয় আসলে মিথ্যাভাবে কাগজে সাম্প্রদায়িক বলে উল্লেখ করলেও আসলে তা ছিল অর্থনৈতিক। প্রমাণ দ্রঃ—বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ, পৃঃ ৩২০, অধ্যাপক অমলেন্দু দে)

১৯২৯ সালে আগা খাঁর নেতৃত্বে অল ইন্ডিয়া মুসলিমলীগ ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দে সজাগ হয় এবং এ সুযোগ কাজে লাগাবার জন্য অগ্রসর হন। দেশ বন্ধুর মৃত্যুর পর হতেই এভাবে ভারতের সর্বনাশ সাধনের মহড়া চলতে থাকে। চিত্তরঞ্জন দাসের মত এতবড় বিরাট চিন্তাশীল নেতাকে ইতিহাসে যেভাবে স্থান দেয়া হয়েছে তা বড়ই লজ্জাকর। তাঁর বড় অপরাধ তিনি সাম্প্রদায়িকতা থেকে দূরে ছিলেন। সে জন্যই কি তাঁর খ্যাতি কম?

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে আলোচনা বন্ধিম প্রসঙ্গে কিঞ্চিৎ করা হয়েছে। অবশ্যই প্রখ্যাত নেতা প্রত্যেকের বিষয়ে আলোচনা অনেকের কাম্য তবুও তা সম্ভব নয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও কোন দিন স্বাধীনতা সংগ্রামের সমর্থক ছিলেন না। পুরোপুরি ইংরেজের বেতন ভোগী বিশ্বাস ভাজন ব্যক্তি ছিলেন। ইংরেজের স্ট্র ফরমুলায় ভারতে শিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থায় শুধুমাত্র

সম্ভ্রান্ত হিন্দুদের বশে আনতে যে সকল মূল কলেজ করার পরিকল্পনা করা হয়েছি তার বিরাট দায়িত্ব যার উপর দেয়া হয়েছিল তিনিই হচ্ছেন বিদ্যাসাগর। অনেক উন্নতি ও পুরস্কারের ব্যবস্থা ইংরেজরা তাঁর জন্য করেছিলেন। সংস্কৃত কলেজগুলোতে শুধু ব্রাহ্মণ সন্তানরা পড়ার অনুমতি পেত। সেকানে বিদ্যাসাগর কায়স্থদের ছেলেদের নেয়ার সুপারিশ করেন এবং তা সরকারকে মঞ্জুরও করতে হয়। কিন্তু কোটি কোটি অনুন্নত শূদ্র বা অবাক্ষণ জাতির জন্য কোন রকম সুপারিশ তিনি করেন নি। (দ্রঃ বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালী সমাজ, ওরিয়েন্ট লং ম্যান, পৃঃ ৫২৪-৫৪৪)

তিনি বিধবা বিবাহের প্রচলন যেভাবে বাধা পেয়েছিলেন যার ফলে তিনি ভারতবাসীর উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলেন। তাই তিনি বলেছিলেন, “আমার দেশের লোক এত অসার ও অপদার্থ বলিয়া পূর্বে জানিলে আমি কখনই বিধবা বিবাহ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতাম না।” (দ্রঃ উষ্টর দুর্গাচরণ বন্দোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র, পুস্তক ঐ, পৃঃ ৪৫৩) বিদ্যাসাগরের ঐ ভূমিকা ধর্মভীরুতার জন্য বলে অনেকে মনে করেন না। অনেকের ধারণা তিনি একটি বাল্য বিধবাকে ভালবেসে ফেলেছিলেন। কিন্তু ধর্মের বাঁধন ছিড়ে তার জন্য তিনি যা চেয়েছেন তা পারেন নি। কিছু দিনের মধ্যে বিদ্যাসাগরের ঐ ভালবাসার পাত্রী সমাজচ্যুত হয় এবং তাকে নিষ্ঠুর ভাবে আত্মহত্যা করতে হয়েছিল। ঐ দিন হতেই তাঁর প্রতিজ্ঞা ধর্মগ্রন্থ মন্বন করে বিধবা বিবাহ বৈধ করার রাস্তা বের করতেই হবে এবং সরকারকে মঞ্জুর করার ক্ষমতাও তাঁর ছিল। (দ্রঃ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, শ্রী বিনয় ঘোষ, পৃঃ ৭৪)

বিদ্যাসাগরকে আমরা সরস্বতীর বরপুত্র মনে করলে ও তিনি ধর্ম মানতেন কি না তাই আজ তর্কের ব্যাপার। কারণ কোন দিনই তাকে মন্দিরে পুরোহিত আর দেব দেবতাকে ভক্তি করতে দেখা যায় নি। শুধুমাত্র সরকারের স্বার্থে রাজনৈতিক কারণে ধর্ম সংস্কারের উদ্যোগী হয়েছিলেন। যেমন তিনি কোন হিন্দুকে পত্র লেখার সময় উপরে শ্রী হরি শরনম্ প্রভৃতি লিখতেন মাত্র। বিদ্যাসাগরের ভ্রাতা শঙ্কু মিত্র লিখেছেন, “একদিন দাদা সুখাসীন হইয়া কথাবার্তা বলিতেছেন এমনসময় দুইজন ধর্ম প্রচারক ও কয়েকজন কৃতবিদ্যা উদ্রলোক আসিয়া উপবেশন পূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘বিদ্যাসাগর মহাশয়! ধর্ম লইয়া বঙ্গ দেশে বড় হলুদ পড়িয়াছে যাহার যা ইচ্ছা সে তাহাই বলিতেছে, এবিষয়ে কিছুই ঠিকানা নাই; আপনি ভিন্ন এবিষয়ে মীমাংসা হইবার সম্ভাবনা নাই।’”

এক কথায় দাদা বলিলেন, ধর্ম যে কি তাহা মানুষের বর্তমান অবস্থায় জ্ঞানের অতীত এবং ইহা জানিবারও উপায় নাই।’ (দ্রঃ ঐ পৃঃ ৩৬০) বিদ্যাসাগর কোন দিন ধর্মের জন্য ধর্ম সভায় যোগ দেন নি শুধু বিধবা বিবাহের প্রচলনের পরিপেক্ষিতে ধর্ম কেন্দ্রিক জাতিকে বশে আনবার জন্য তিনি ধর্মের কথা বলেছেন বা লিখেছেন মাত্র। (দ্রঃ অধ্যাপক বদরুদ্দিন উমরের লেখা) সংস্কৃত কলেজ গুলির যদিও তিনি সরকার পক্ষের বড় অধিকর্তা ছিলেন, তথাপিও বেদ, সংখ্যা প্রভৃতি পাঠ্য তালিকায় থাকলেও তিনি ঐ সব পুরাতন ধর্ম গ্রন্থের উপর আস্থা রাখতেন কতটুকু তা তাঁর লেখায় যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। যেমনঃ— “কতকগুলি কারণে সংস্কৃত কলেজে বেদান্ত ও সংখ্যা আমাদের পড়াতেই হয়। কি কারণে পড়াতে হয় তা এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু সংখ্যা ও বেদান্ত যে স্ত্রান্ত দর্শন সে সম্বন্ধে এখন আর বিশেষ মত ভেদ নেই। তবে স্ত্রান্ত হলেও এই দুই দর্শনের প্রতি হিন্দুদের গভীর শ্রদ্ধা আছে। সংস্কৃতে যখন এ গুলি পড়াতেই হবে তখন তার প্রতিশোধক হিসেবে ছাত্রদের ভাল ইংরেজি দর্শন শাস্ত্রের বই পড়ানো দরকার।” (দ্রঃ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও ঊনবিংশ শতকের বাঙ্গালী সমাজ, অধ্যাপক বদরুদ্দিন উমর) উদ্ধৃতিটি খুব বুঝে পড়া প্রয়োজন। আর একটি উদ্ধৃতি-বিদ্যাসাগর, “একজন সুলেখক হওয়া সত্ত্বেও পত্র পত্রিকা, ছাপাখানা, প্রকাশন সংস্থা ইত্যাদির ওপর তাঁর যথেষ্ট কর্তৃত্ব থাকা সত্ত্বেও তিনি কৃষকদের দুরবস্থা অথবা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে একটি বাক্যও রচনা করেন নি। বিদ্যাসাগর সেটা না করার কারণ।

বন্ধিমের মত তিনিও জানতেন যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে আন্দোলনের অর্থ ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো; তার উদ্দেশ্য ঘটতে সহায়তা করা” -----। (দ্রঃ ঐ)

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ইংরেজী শিক্ষা ও ইউরোপীয় উদারনীতি বাদের বাঙালী সমাজের চিন্তাগত পঞ্চাদপদত্ব এবং অন্তহীন কুসংস্কার দূরীকরণের একটা নিশিচস্ত উপযুক্ত প্রতিশোধক হিসেবে ধরে নিয়েছিলেন এবং সেজন্যই তিনি ভারতবর্ষে ইংরেজ বিরোধীতা তো করেনই না, উপরন্তু সিপাহী বিদ্রোহের ব্যাপারে সম্পূর্ণভাবে উদাসীন থেকে ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের দীর্ঘ জীবনই কামনা করেছিলেন।” (দ্রঃ অধ্যাপক বদরুদ্দিন উমরের ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ, পৃঃ ১০৫) এমনি ভাবে আজকাল যারা ঐতিহাসিক নেতা তাঁদের একটি একটি করে তুলে ধরলে বহু বেড়ে যাবে। বেশিরভাগ চরিত্রে না পাই পূর্ণ দেশ প্রীতি আর না পাই ধর্মের নির্ভেজাল ভক্তি। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও আজকাল একজন ঐতিহাসিক পুরুষ স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁরও নাকি বহুকিছু অবদান আছে। তাঁর কাছে ভক্তের দল বিপর্যস্ত হয়ে যাবেন আর তিনি উদার হস্তে পরিবেশন করবেন ধর্মের অমৃত বাণী এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তাঁকে বিদ্যাসাগরের দরবারে যেতে হয়েছে। বিদ্যাসাগর কোন দিনও রামকৃষ্ণের ছায়া স্পর্শ করাও এতটুকু প্রয়োজন মনে করেন নি।

বিবেকানন্দের গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব বিদ্যাসাগরের কাছে গিয়ে অত্যন্ত অনুনয় বিনয় করে বলেন, “আমি সাগরে এসেছি, ইচ্ছে আছে কিছু রত্ন সংগ্রহ করে নিয়ে যাব।” বিদ্যাসাগর বুঝতেই পারলেন তাকে দলে ভিড়বার ষড়যন্ত্র। তিনি উত্তর দিলেন, “আপনার ইচ্ছে পূর্ণ হবে বলে তো মনে হয় না, কারণ এ সাগরে কেবল শামুকই পাবেন।” রামকৃষ্ণ বলেন, এমন না হলে আর সাগরকে দেখতে আসব কেন? তারপর গুরু হবার সাধ নিয়ে পরকাল আর মোক্ষ লাভের অনেক কথা বললেন। কিন্তু সুবিধা করতে না পেয়ে প্রকরাস্তরে অপমান আর উপেক্ষার বোঝা নিয়ে ফিরে গেলেন। যারা তাঁর কাছে ধর্মীয় রিপোর্ট নেয়ার জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন তাদের তিনি বলেন, “এমনকি তাঁর নিজের মোক্ষ লাভের জন্য ভগনবানের নাম করাও তাঁর কোন স্পৃহা নেই, সেটাই বোধ হয় তাঁর সবচেয়ে বড় ত্যাগ।’ আও অনেক কথার মধ্যে বলেন আপন কল্যাণ মুক্তি পর্যন্ত তিনি উপেক্ষা করলেন।” (দ্রঃ শ্রী বিনয় ঘোষের ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর)

কায়দে আযম মুহাম্মদ আলি জিন্নাহ

কায়দে আযম মুহাম্মদ আলি জিন্নাহ ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি কংগ্রেসের একজন বিশিষ্ট ব্যারিষ্টারও নেতা ছিলেন। পনের বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয়। লগুণে পড়ার সময়েই তাঁর স্ত্রী মারা যান। গান্ধীজীও মাত্র তের বছর বয়সে বিয়ে করেন।

১৯২০ সালে নাগপুর কংগ্রেসে জিন্নাহর সাথে গান্ধীর মতান্তর হয়। “তিনি অহিংসা অসহযোগে নীতি সমর্থন না করে বললেন আইন সঙ্গত উপায়ে স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম।” সাথে সাথে কংগ্রেসের সভ্যরা প্রতিবাদ ও বিদ্রোপে তাঁকে উপেক্ষা করেন। সভায় বিশিষ্ট একজন কংগ্রেসী বলেন, “মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত।” গান্ধীজী নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ বিদ্রোপ উপভোগ করলেন কোন প্রতিবাদ করলেন না। মিঃ জিন্নাহ ক্ষোভে দুঃখে কংগ্রেস ছাড়লেন। তিনি বুঝলেন যে গান্ধীজী থাকতে তিনি কোন দিনই হিন্দু কংগ্রেসে প্রাধান্য পাবেন না।

জিন্নাহ সম্বন্ধে আগেই বলা হয়েছে তাঁর দেশ প্রেমাপেক্ষা কিসের প্রেম বেশি? তবে একথা দিবালোকের মত সত্যি যে, জিন্নাহকে যদি উপযুক্ত মর্যাদা দেয়া যেত অথবা অন্তত মুসলমান হিসেবে ঘৃণা ও অপমানিত না করা হত তাহলে তিনি পূর্বের মত কংগ্রেসের ভ্রান্ত পথের গোলামী করতে কসুর করতেন না। জিন্নাহ দেশ ভাগ করে পাকিস্থান সৃষ্টি করে সারা ভারতের যে চরম ক্ষতি করেছেন তাও যেমন সত্য গান্ধীর অবিচার, পক্ষপাতিত্ব, অদূরদর্শিতা

‘মামার জয়’ বলার ও সমর্থন করার নীতিও ততই ক্ষতি করেছে। জিন্নাহ ইসলাম ইসলাম করে চীৎকার করলেও সেটা ছিল প্রহসণ আর অভিনয় মাত্র।

কথায় তিনি ইসলামের এজেন্ট মনে হলেও কাজে তিনি পুরোপুরি সাহেব ও সাহেবদেরই গোলামী করেছেন। ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে “হঠাৎ নেতার দল” বেশির ভাগই যে প্রশংসা পেয়েছেন তা প্রায় সব টুকুই ভাঁওতাবাজী। কারণ মস্ত বড় একটা সত্য হজম করা হয়েছে ইতিহাসের পাঠায়। সেটা হচ্ছে এটাই মূলতঃ হিন্দুদের কংগ্রেস ও মুসলমানদের মুসলিমলীগ লড়াই করেছে সত্য কিন্তু ইংরেজের সাথে নয়, লড়াইটা হিন্দু ও মুসলমানে। আর মীমাংসা বিচার করতে উভয়েই গোমলামী করেছেন ইংরেজের দরবারে। আর তাঁরাই ক্রীতদাসদের খাদ্য ও পোশাক বস্তুনের মত ভাগ বন্টন করে দিয়ে গেছেন। জিন্নাহকে প্রত্যেক বিষয়ে কোনঠাসা করে রাখার প্রবণতা গান্ধীর যে কেন ছিল তার অন্যতম কারণ তাঁরা উভয়ে একই বংশের লোক, একই রক্তে জন্ম।

প্রমাণে বলা যায় যে, “মিঃ মহম্মদ আলী জিন্নাহর ও শ্রী মোহনদাস করম চাঁদ গান্ধীর পিতামহ ছিলেন কাথিয়াড়ের এক সম্প্রদায় ভুক্ত গুজরাটী হিন্দু। কোন বিশেষ কারণে মিতঃ জিন্নাহর পিতা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে করাচীতে বসবাস করেন।” (দ্রঃ অবিস্মরণীয়, ২খণ্ড, পৃঃ ৫, শ্রী গঙ্গা নারায়ণ) এ গ্রন্থে পূর্বে আরও প্রমাণিত হয়েছে হিন্দু থেকে যারা মুসলমান হয়েছেন সে নতুন মুসলমানরা পুরাতন মুসলমানদের অপেক্ষা অত্যন্ত গোঁড়া এবং হিন্দু বিদ্বেষী।

স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁন

চলতি ইতিহাসে ভেজাল সমালোচনা এ গ্রন্থের বিশেষ অঙ্গ। এ গ্রন্থে মাওলানা সৈয়দ আহমাদ ব্রেলবীর অবদান দেখানো হয়েছে। এবং স্বাধীনতার অবদান বিষয় সমীক্ষা করার সৈয়দ ব্রেলবীর একার অবদান অপরাপর শতাধিক প্রকৃত নেতা অপেক্ষা ও বেশি। তাঁর নাম চাপা দেয়ার জন্য দিল্লীর একজন সৈয়দ আহমদকে শাসক আমদানী করে।

অর্থাৎ ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে দিল্লীতে আর এক সৈয়দ আহমদ জন্ম গ্রহণ করেন। প্রথমে তিনি মাদরাসায় পড়ে একটি অর্দ্ধ মওলবীর বিদ্যা অর্জন করেন। সরকার নিঃশব্দে তাঁকে একটি সরকার পৌষ্টে সেরেস্তাদারের পদ দিয়ে নিজেদের সেবায় নিয়োজিত করেন। কিছুদিন পরে দয়ালু ব্রিটিশ সরকার তাঁকে ইংরেজী শেখার পরামর্শ দেয়। শুধু তাই নয় ভাল শিক্ষক দিয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিলিতি কায়দায় যবনিকার অন্তরাল হতে তাকে ইংরেজী শিখিয়ে ফেলার ব্যবস্থা হয়। তাঁর পরেই এক লাফে তিনি মুনসেফের পদ পান। পরের পদক্ষেপেই স্যার সৈয়দ আহমাদ খাঁন সাব জজ হবার সৌভাগ্য লাভ করেন।

চারিদিকে ইংরেজ বিরোধী বিপ্লব তখন নয়া আহমদ বহু ইংরেজকে বিপ্লবীদের হাত থেকে বাঁচান। তাঁকে দেশবাসীর সাথে শঠতা করতে হলেও ইংরেজের সাথে সততা বজায় রাখতে তিনি সমস্ত ব্যবস্থা করেছিলেন। ইংরেজের নিমক খেয়ে তিনিও ইংরেজের নিমক হারামী করেন নি। সরকার খুব খুশী হয়ে তাঁকে শুধু নাইট উপাধি দান করেনি। শুধু তাই নয় প্রতি মাসে জীবনভোর সে বাজারে দুই শত টাকা করে বৃত্তি দেয়ার ব্যবস্থা হয়। এবার ইংরেজ মনিবের পরামর্শে তিনি একটি উর্দু বই লিখলেন যার নামের অর্থ সিপাহী বিদ্রোহের কারণ। ইংরেজদের চালে বহু মুসলমান বিব্রান্ত হয় এবং অনেকের ধারণা মাওলানা, মওলবী ও বুজুর্গরা সমাজে যে বিপ্লবে ঘটিয়েছেন এবং ইংরেজী শিক্ষা নিষেধ করেছেন আর চাকুরী বয়কট করেছেন, এ সমস্তই ভুল পদক্ষেপ। আজও অনেক ইংরেজী শিক্ষিত মানুষকে বলতে শুনেছি যে ইংরেজী শিক্ষা হারাম বা নিষেধ বলে দিয়ে মওলবীরা মুসলমান জাতির প্রগতিকে একশত বছর পিছিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু তা নয়। দুধ বড় উপকারী নিদ্রা শ্রমের প্রতিবেদক। টাইফয়েড রোগীকে দুধ দেয়া আর সদ্য সাপে কাটা রোগীকে ঘুমাতে দেয়া অনেক ক্ষেত্রে

নিষিদ্ধ। ঠিক ইংরেজ তাড়াবার জন্য ‘ননকো অপারেশন’ই একমাত্র উপায় ছিল তখন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে নয়া সৈয়দ আহমদ The Royal Mohammedan of India নাম দিয়ে একটি পত্রিকা চালাতে লাগলেন। শুধু তাই নয় সম্মানীয় সমগ্র মওলবী সমাজকে বোকা ও বেকুফ বানাবার জন্য নানা মতবাদ জাহির করলেন। যথা-কোরআন শরীফ সংক্ষেপে করা ইত্যাদি।

স্যার আহমদ মনিবদের আদেশ নিষেধ ও পরামর্শ মূলক বহু বই ইংরেজী থেকে উর্দুতে অনুবাদ করার জন্য ‘অনুবাদ সমিতি’ প্রতিষ্ঠা করেন।

ইংরেজরা উপযুক্ত লোক চিনতে পারেন। এ প্রশংসা তাদের করলে বোধ হয় অবিচার হয় না। এবার নয়া সৈয়দ আহমদকে ইংলণ্ডে নিয়ে যাওয়া যায়। সেখানে ভাল ভাবে ট্রেনিং দিয়ে আবার ভারতে ফিরিয়ে আনা হয়। ফিরে এসে একটি সোসাইটি তৈরি করলেন, যেটা ‘Society for Education Progress মত Indian Muslims’ নামে বিখ্যাত। এ সমিতি বিলিতি টাকার গাড়ীতে চড়ে প্রচার কাজ চালিয়ে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে Mohammedan Anglo Oriental আলীগড় কলেজ তৈরি করলেন বা করালেন। আর এ কলেজেই বিশ্ব বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। এবার যা চাই করা, বাছাই করা ভাল ভাল কর্মী এখানে নিয়োগ করা হয়। তারই ফল স্বরূপ—

নবাব ভিকারুল মূলক, নবাব মহসীনুল মূলক, কাজি আলতাফ হুসাইন হালী, মিঃ নজির আমমদ প্রভৃতির নেতারা নয়া আহমাদ সাহেবের পাশে এসে দাঁড়ান। ভারতের মুসলমান ১৯৭৫’র পর থেকে যে লড়াই চালিয়ে আসছিল এতদিন পরে যেন তাঁরা বুঝলেন আর নয় এখন ইংরেজ বিদ্বেষী না হয়ে কিছু দিনের জন্য ইংরেজের সাথে হিন্দু নেতাদের মত সহযোগিতা করার প্রয়োজন মেনে নেন।

ফলে স্বাধীনতা সংগ্রামী মুসলমান জাতি ইংরেজ ভক্ত ও ইংরেজ বিরোধী শিবিরে বিভক্ত হয়ে জাতীয় ঐতিহ্য শিক্ষা ও সংহতি হারিয়ে ফেলে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এ সময়ে ভাটা পড়ার দরুন সংস্কৃতি শিখিল ব্রিটিশ রাজের ভিত্তি মজবুত হয়। চতুর ইংরেজ চাতুরী দিয়ে ভারতে কেরানী শ্রেণী সৃষ্টির আশ্বাদ পায়। অসহযোগী নীতি রাতারাতি বদলে গিয়ে সাম্প্রদায়িকতার দুষ্ফল দ্বিজাতি তত্ত্বের অদৃশ্য ভূমিকার সৃষ্টি হয়। নয়া আহমদকে ‘নাইট’ ও খাঁন উপাধি আগেই দেয়া হয়েছিল। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে তাঁকে তাঁর মনিবরা চরম চাঞ্চল্যময় পরম পুরস্কার ‘স্যার’ টাইটেল দান করেন। তার পরের দশ বছর সরকারের সর্ব প্রকার সেবা করে ১৮৯৮ খৃঃ তিনি মারা যান।

এ বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু বিদ্বেষের বীজ বপনের ব্যবস্থা ও ইংরেজের প্রতি অনুগত্যের তালিমের উপর বেশ জোর দেয়া হয়। তারই ফল স্বরূপ ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে এ মহা বিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রাপ্ত নেতারা এবং আলীগড় আন্দোলনের নেতৃবৃন্দই মুসলিমলীগের জন্ম দেন। আর সে নবজাতক শিশুকে গড়ে তোলেন মিঃ জিন্নাত আর এ শিশুর খোরাকের ব্যবস্থা করেন কংগ্রেসে ও তাঁর প্রধান সাধু নেতা গান্ধীজীর দুর্বলতা ও অদূরদর্শিতা।

অষ্টাদশ অধ্যায় বিখ্যাত হয়েও অখ্যাত যারা

আগেই বলা হয়েছে মুসলমান জাতি কোন দিনই ইংরেজকে গ্রহণ করতে পারে নি। এবার পরিবর্তনের পালা আরম্ভ হল। উনিশ শতাব্দীর গোড়ায় বা বিশ শতকের শুরুতে মনে হয় যেন কোন মুসলমান আর কিছুই করেনি, যা কিছু করেছিল যদি সত্যি হয় তো সে সিপাহী যুদ্ধের আগে বা সময়ে। কিন্তু তা নয়। শুধু ১৯০৬ সালে যে সমস্ত বিখ্যাত মুসলমান রাজনীতি সচেতন নেতারা নতুন ইংরেজ ভাইসরয় আর্ল অব মিণ্টোকে সেন্ট্রাল মহাম্মদান এ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে অভিনন্দন করেছিলেন তাঁরাও বেশির ভাগই মাওলানা ও মাওলানা ধাঁচের ব্যক্তি বৃন্দ যথা-মাওলানা মহাম্মদ ইউসুফ, মাওলানা সৈয়দ নাসিরুদ্দিন, মাওলানা সিরাজুল ইসলাম, মাওলানা বজলুল খান, মাওলানা মোস্তাফা খান, মাওলানা দেলওয়ার হোসেন, মাওলানা সিরাজুল হক খান, মাওলানা আবদুল হামিদ, মাওলানা বদরুদ্দিন, মাওলানা, মির্জা মঃ মাসুম, মাওলানা আবদুল লতিফ, মাওলানা ইবনে আহমদ, মাওলানা সৈয়দ আশরাফুদ্দিন, মাওলানা আবদুল কাদের, মাওলানা গোলাম রহিম, মাওলানা আবদুল মজিদ, মাওঃ কাজী মমতাজুদ্দিন, মাওলানা শামশুল হুদা, মাওলানা সৈয়দ নাসিরুদ্দিন, সৈয়দ আমীর আলী এম এ, জনাব মির্জা কাদের, অনারবল নবাব মমতাজ উল্লাহ, জনাব নবাব সৈয়দ মহম্মদ, প্রিন্স হাবিবুজ্জামান, প্রিন্স আক্রাম হোসেন, জনাব মুহাম্মদ হাফিজ, জনাব মুহাম্মদ ভাই, জনাব হাজী নূরমুহাম্মদ জাকারিয়া, জনাব নূরমুহাম্মদ হসমাইল, জনাব ইসমাইল খাঁ, জনাব হোসেন ভাই, হাজি সেখ বখশে ইলাহি, জনাব আলিবেগ খান, জনাব করম আলী ভাই, জনাব সরফরাজ খান, জনাব সৈয়দ বাদশাহ নবাব প্রভৃতি নেতারা ই সেদিন এ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে সরকারের সাহায্যে ভারতীয় মুসলমানদের উন্নতি সাধন করেন।

(দ্রঃ অধ্যাপক অমলেন্দু বাবুর ঐ পুস্তক, পৃঃ ৩৩০)

উপরোক্ত মুসলমান নেতারা বঙ্গ ভঙ্গি বিরোধী আন্দোলনের বিরুদ্ধে যোগ দিয়ে ছিলেন। আর যারা বঙ্গভঙ্গের বিরোধী ছিলেন তাঁদের মধ্যেও খ্যাতনামা মুসলমান নেতা যথেষ্ট ছিল যেমন- ব্যারিষ্টার আবদুল্লাহ রসুল, আবদুল হালিম গজনবী (পরে স্যার উপাধি পেয়েছিলেন) ইসলামাবাদের মাওলানা মনিরুজ্জামান, মাস্টার মাওলানা কাজেম আলী, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, বর্ধমান জেলার কাসিয়ারা গ্রামের মওলবী সৈয়দ আবুল কাশেম, মাওলানা আবদুল মজিদ (দি মুসলমান নামে সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক)। পাটনার জনাব আলি ইমাম (পরে স্যার উপাধি পেয়েছিলেন) হাসান ইমাম, ব্যারিষ্টার মোজাহেরুল হক, মাওঃ লিয়াকত হোসেন ও ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী প্রভৃতি। (দ্রঃ ঐ পুস্তক এবং 'সমকালের কথা' পৃঃ ৭)

কমরেড মুজাফর আহমদ লেখেন, "সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে প্রথম পর্যায় (১৯০৪-১৯১৭) কঠোর ভাবে হিন্দু ধর্ম অনুশাসিত ছিল। -----হিন্দু রাজত্বের প্রতিষ্ঠাই তাঁদের অভিপ্রেত ছিল। সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের আন্দোলন শুধু হিন্দু আন্দোলন ছিল না, আসলে তা ছিল বর্ণ হিন্দুদের আন্দোলন।

(দ্রঃ সমকালের কথা, পৃঃ ১০)

মুসলমানরা সামগ্রিক ভাবে যখনই ইংরেজ বিদ্বেষ প্রকাশ বন্ধ করল সাথে ইংরেজরা মুসলমানকে সমর্থন ও হিন্দুদের বিষ নজরে দেখতে আরম্ভ করল। যুগ যুগ ধরে মুসলমানরা যে অগ্নি আন্দোলন জ্বালিয়ে তুলেছিল যেন স্তব্ধ হল। এবার ইংরেজের প্রতি আন্তর্জাতিক নান্দ প্রকার চাপের কারণে নিজেরাই দেশ ছেড়ে পলায়নের প্রয়োজন অনুভব করে। এ সময় হিন্দুদের সন্ত্রাসবাদী আক্রমণে সাথী হিসেবে মুসলমানদের তেমন ভাবে ডাকেও নি আর মুসলমানেরাও একটু পালা বদলের জন্য ব্যাপক ভাবে যায়ও নি।

রবীন্দ্রনাথ সঙ্ক্ষে অনেক আলোচনা করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কবি প্রতিভা স্বীকার সকলকেই করতেই হবে। তিনি ভারতের বাইরে ঘুরে বেশ করে বুঝেছিলেন মুসলমান জাতি সর্ব ভারতীয় নয় বরং আন্তর্জাতিক জাতি। তাই তিনি শেষের দিকে মুসলমানদের বিরুদ্ধের যাদের তীব্র বিদ্বেষ ও পদোন্নতি কাতরতা ছিল তাদের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলতে গিয়ে রবী বাবু লিখেছেন, "হিন্দু মুসলমানের সঙ্ঘর্ষ লইয়া আমাদের দেশে একটা পাপ আছে। এ পাপ অনেক দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইহার যে ফল তাহা না ভোগ করিয়া আমাদের কোন মতেই নিস্তার নাই।"

"আর মিথ্যা লেখার প্রয়োজন নাই। এবার আমাদেরকে স্বীকার করিতেই হইবে হিন্দু মুসলমানের মাঝখানে একটা বিরোধ আছে, আমরা যে কেবল স্বতন্ত্র তাহা নয়। আমরা বিরুদ্ধে। ----

"আমরা জানি অনেক স্থানে হিন্দু মুসলমানে বসেনা-ঘরে মুসলমান আসিলে জাজিমের এক অংশ তুলিয়া দেওয়া হয়, হুকার জল ফেলিয়া দেওয়া হয়।

"তর্কের বেলায় বলিয়া থাকি কি করা যায় শাস্ত্র তো মানিতে হইবে। অথচ শাস্ত্রে হিন্দু মুসলমান সঙ্ঘর্ষে পরস্পরকে এমন করিয়া ঘৃণা করিবার তো কোন বিধান দেখি না। যদি না শাস্ত্রের সেই বিধানই হয়, তবে সে শাস্ত্র লইয়া স্বজাতি স্বরাজের প্রতিষ্ঠা কোন দিন হইবে না। মানুষকে ঘৃণা করা যে দেশে ধর্মের নিয়ম প্রতিবেশির হাতে জল খাইলে যাহাদের পরকাল নষ্ট হয়, পরকে অপমান করিয়া যাহাদের জাতি রক্ষা করিতে হইবে, পরের হাতে চিরদিন অপমানিত না হইয়া তাহাদের গতি নাই। তাহারা যাহাদিগকে মেচ্ছ বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছে সেই মেচ্ছের অবজ্ঞা তাহাদিগকে সহ্য করিতে হইবে।"

(দ্রঃ রবীন্দ্র রচনাবলি, দশম খণ্ড, পৃঃ ৬২৮-৬২৯)

ভারতের স্বাধীনতা ইতিহাসে যারা বিখ্যাত হয়েও অখ্যাত অথবা অবলুপ্ত তাঁদের মধ্যে মুসলমান ও হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ই রয়েছেন। মুসলমানদের নাম চাপা দেয়ার কারণ সাম্প্রদায়িকতা ও গোষ্ঠী সঙ্কীর্ণতা। যখন হঠাৎ নেতার দল দেখলেন মুসলমানদের পূর্বপরিষ্কৃত পথে স্বাধীনতা আসবেই তাকে আর ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হবে না তখন গান্ধীজী, নেহরু, প্যাটেল প্রভৃতি নেতারা দেশ বিভাগ মনে নিয়েছিলেন। একথা আগেই জানানো হয়েছে কিন্তু কেন যে নিয়েছিলেন তাঁর এক অপ্রচারিত অকাটা কারণ আধুনিক চিন্তাশীলরা নির্দ্বারিত করেছেন, সেটা হচ্ছে এটাই যে, যদি ভারত অখণ্ড থাকে তাহলে স্বাধীনতার ইতিহাস মধ্যে হঠাৎ নেতার দলের বেশির ভাগই বাদ পড়ে যাবেন আর চিরদিনের বিরুদ্ধবাদী মুসলমান জাতিই হবেই সর্বসর্বা। নিজেদের নামে জয় ঢাকা বাজানো আর ইচ্ছামত ইতিহাস লেখানোর সন্ধানেই আজ অখণ্ড ভারত নিষ্ঠুর ভাবে আহত অথবা ত্রিখণ্ডে নিহত।

সুভাষবসু, চিত্তরঞ্জন, নজরুল, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি প্রকৃত স্বাধীনতা প্রার্থী আজ উপেক্ষিত প্রায়। তাঁদের তো তবুও কোন প্রকারে নাম টুকু জানানো হয়েছে কিন্তু অবদানের মূল্যায়ন হয়নি। এছাড়াও বহু হিন্দু, মোকদ্দা শহীদ, ও প্রবাসীদের নাম হজম করা হয়েছে তার কারণ কি? যদি সাম্প্রদায়িকতাই কারণ হয় তাহলে হিন্দুদের নাম গোপন করা হয়েছে কেন? তার সত্য ও সহজ উত্তর তাঁরা সব কমিউনিষ্ট গিয়েছিলেন তাই তাদের বিষয়ে ভালমন্দ কিছু না বলে চুপ থাকাই ভাল মনে করা হয়েছে। অবশ্য কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম হয়নি তা নয়।

ইংরেজ বিরোধী সংগ্রামী, যাদের ইতিহাসে যথাযোগ্য স্থান নেই তাঁদের সংখ্যা সহস্র সহস্র। কিন্তু আমাদের ইতিহাস সেদিকে না গিয়ে যদি রাম, সীতা বারন, দ্রোপদী, লাইলি মজনু আর রস্তুম পালোমানের নাম দিয়ে ইতিহাসকে ভরিয়ে তোলে তাহলে আর কি বা বলা যায়?

কমরেড মানবেন্দ্রনাথ রায়, কমরেড মুজাফর আহমদ, কমরেড সওকত উসমানী, কমরেড গুলাম হুসাইন, কমরেড শ্রীপাট অমৃতভাঙ্গ, কমরেড সিঙ্গার ভেলু চেটিয়ার, কমরেড রামচরণ শর্মা কমরেড শামসুদ্দিন হাসনান, কমরেড এম. পি. টি, বেলাধুন, কমরেড মনিলাল, ডক্টর কমরেড সম্পূর্ণনন্দ ও কমরেড সত্যভক্ত প্রভৃতি নেতাদের নাম কানপুর ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার রেকর্ডে পাওয়া যায়। অবশ্য এদের অনেকের বিপক্ষেও বিপক্ষীদের বক্তব্য নেই তা নয় তবুও এঁরা হঠাৎ নেতাদের অনেকের চেয়ে বিপদকে মাথায় নিয়ে পথ চলেছেন।

(দ্রঃ আমার জীবন ও ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি, মুজাফফর আহমদ)

যাঁরা জেল খেটেছেন ইংরেজের বিরুদ্ধবাদী বলে তাঁদের অনেকের মধ্যে ডাঃ যদু গোপাল মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক জ্যোতিষ ঘোষ, ভূপতি মজুমদার, অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্র কুমার দত্ত, মনোরঞ্জন গুপ্ত, উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোমোহন ভট্টাচার্য, রবি সেন; অমৃতলাল সরকার, রমেশ চৌধুরী প্রভৃতি ব্যক্তিগণের আজও মূল্যায়ন হয় নি। এমনি ভাবে ব্যারিস্টার পুলিন বিহারী দিন্দা ও একজন কমরেড ছিলেন কমরেড ক্রেমেন্স পামদত্ত একজন নাম করা লোক। এছাড়া কমরেড সাজ্জাদ জহীর, কমঃ ডক্টর জেড, এ, কমরেড মোসাম্মাৎ হাজেরা বেগম, কমরেড কুমার মঙ্গলম, কমঃ পার্বতী কৃষ্ণাণ, কমঃ নিখিল নাথ চক্রবর্তী, কমঃ হরজিত গুপ্ত, কমঃ রেনুরায় ও কমত জ্যোতি বসু প্রভৃতি ভারতীয়গণ বিলেতে পড়তে প্রবাসী অবস্থাতেই কমিউনিস্ট পার্টিকে আদর্শ বলে মনে করেন এবং দেশে ফিরে এসে ভারতে পার্টির সাথে সংযুক্ত হন। এঁরা বেশির ভাগই দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট। “আর জ্যোতি বসু প্রমুখ ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসিস্ট) এর সভ্য। বাকী সকলেই দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট পার্টিতে রয়েছেন।”

(দ্রঃ এ পৃঃ, ৫৮১)

এমনি ভাবে ভারতের বাইরে যে সব ভারতীয়দের অভিযান তাঁদের মধ্যে রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ, মুহাম্মদ সফীক, মুহাম্মদ মাসউদ আলী শাহ, হাবীব আহমদ, মথুরা সিং প্রভৃতি কমরেডদের নাম ও তাঁদের কর্ম ও জীবন সংগ্রাম সমীক্ষিত হয় নি। মুসলমানরা যখন হতে মোটামুটি লোক দেখানো ইংরেজ শ্রীতি দেখাতে থাকেন তখনকার স্বাধীনতার চিত্রটুকুই ইতিহাসে তুরে ধরা হয়েছে যাতে মনে হয় স্বাধীনতা শুধু হঠাৎ নেতার দল ও হিন্দু ভাতারাই এনেছেন আর এক আধ জন মাত্র মাওলানা আযাদের মত মুসলমান স্বাধীনতার সমর্থক ছিলেন। কিন্তু আসল কথা তা নয় মুসলমান যখন বারে বারে প্রমাণ প্রায় তারা ছাড়া কেউ স্বাধীনতা চায় না। তখন তারা সাময়িক ভাবে বাহ্যিক ইংরেজ শ্রীতি দেখালেও ভিতরে ভিতরে ইংরেজ বিরোধী আশুন জ্বালাতে বদ্ধ পরিকর হয়। সেখানেও মাওলানা উবায়দুল্লাহ (সিদ্ধি) মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (দেওবন্দ) মাওলানা আলী আতুঘর ও আর ও শত শত আলেম নিজেদের কার্যসিদ্ধি করতে অন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। প্রথমতঃ কিছু শিক্ষিত যুবকদেরকে ভারতের বাইরে পাঠিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করেন। যেমন ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে লাহোরের বিভিন্ন কলেজ থেকে বিপ্লবী, ‘দেশগত প্রাণ’ প্রচুর ছাত্রকে উধাও বা নিরুদ্দেশ হতে দেখা যায়। যাঁরা দেশান্তরে গিয়েছিলেন দেশের জন্য তাঁদের নামের আংশিক তালিকা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোক্তা মুজাফফর আহমদ বলেছেন, “লাহোরে বিভিন্ন কলেজ থেকে যে পনের জন ছাত্র পালিয়ে গিয়েছিলেন তাঁদের কয়েক জনের নাম নীচে দিলাম।

১। খুশী মুহাম্মদ (২) আবদুল হামিদ (৩) জাফর হাসসান (৪) আল্লাহ নওয়াজ (৫) আবদুল বারী (৬) মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আবদুর রহমান (৮) আবদুর রশীদ (৯) রহমত আলী (১০) আবদুল মজিদাবী পাঁচজনের নাম আমি জানতে পারি নি।” (দ্রঃ এ পৃঃ ১৮৯)

অবশ্য এসব দেশগত প্রাণরবীদের ইংরেজের বিরুদ্ধে ‘জিহাদ’ করার জন্যই পাঠিয়েছিলেন এ মাওলানাদেরই দল। এ কথাটির প্রমাণ এ বইতেই আছে “তবে একটি কথা এখানে বলে রাখা ভাল যে লাহোবের ছাত্রদের দেশ ত্যাগ করার বৈপ্লবিক প্রেরণা জুগিয়েছিলেন মৌলবী ওবায়দুল্লাহ সাহেব। উল্লেখিত ১৫ জন ছাত্র পরে

‘পলাতক ছাত্র’ বা ‘মুজাহিদ ছাত্র’ নামে অভিহিত হয়েছেন। ‘জিহাদ’ শব্দের অর্থ ধর্ম যুদ্ধ। যাঁরা ধর্ম করেন তাঁদের বলা হয় ‘মুজাহিদ’। পলাতক ছাত্রদের উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা।” (দ্রঃ এ, ১৮৮ পৃঃ)

আগেই বলা হয়েছে মুসলমানরাই শুধু পূর্ণ স্বাধীনতার কথা বার বার দাবী করেছেন আর কংগ্রেস নেতারা তার বার বার প্রত্যাখ্যান করেছেন। শেষে মুসলমানদের খিলাফত কমিটি এবং কংগ্রেস যখন এক হয়ে যায় তখনও অনেক দিন অনেকবার এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান হয়ে শেষে যখন পূর্ণ স্বাধীনতার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তখন রেজুলেশনে যে কথাটি লেখা হয়েছিল তা জানতে পারলে হঠাৎ নেতাদের প্রতি অনেকের ঘৃণা আরও বৃদ্ধি হয়। সেটি হচ্ছে এ— The best interests of India and the Moslems demand that the Congress creed the term "Swaraj" be substituted, henceforth by the term "Complete independence." অর্থাৎ ভারতবর্ষের স্বার্থে এবং মুসলমানদের দাবীতে এখন থেকে কংগ্রেসের মূলমন্ত্র “স্বরাজের পরিবর্তে পূর্ণ স্বাধীনতা হওয়া উচিত।” (দ্রঃ সত্যেন সেনের পূর্বোক্ত পুস্তক, পৃঃ ১০৬) নতুন সরকার গঠনের দুঃসাহস মুসলমান নেতারা বারে বারে বিক্ষিপ্ত ভাবে করেছিলেন আর হিন্দু নেতাদের মধ্যে একমাত্র যিনি এ সাহসে সাহসী হয়েছিলেন তিনিই হচ্ছেন নেতাজী সুভাষ চন্দ্র। ভারতের বাইরে কাবুল রাষ্ট্রে গিয়ে মাওলানা উবায়দুল্লাহ বারতের জন্য একটি সরকার গঠন করেছিলেন এবং সেই সূচিন্তিত পদক্ষেপ যে শুধু মাত্র মুসলমানী ভাবধারা যেঁসা ছিল তা মোটেই বলা যায় না কারণ এ সরকারের কমিটিতে ভারতের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন মাওলানা বরকতুল্লাহ আর স্বরাষ্ট্রপদে যোগ্যতার পূর্ণ প্রতীক মাওলানা উবায়দুল্লাহ স্বয়ং আর রাষ্ট্রপতির সম্মানীর পদে যাকে বরণ করা হয়েছিল তিনি হচ্ছেন রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ। আর লাহোর থেকে আগত মুসলমান যুবকগণ অন্যান্য পদ গ্রহণ করেছিলেন। (দ্রঃ মুজাফফর আহমদের পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১৮৯)

মানবেন্দ্রনাথ রায়ের আসল নাম নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য পাক্ষা একজন ব্রাহ্মণ। অতএব তিনি তখনকার নীতি অনুযায়ী সন্ত্রাসবাদীর দলেই ঢুকে ছিলেন। “অস্ত্র সংগ্রহের তাগিদে প্রয়োজনীয় অর্থের জন্যই বিপ্লবীরা তৎকালে রাজনৈতিক ডাকাতিতে লিপ্ত হতেন। ১৯০৭ সালে নরেন্দ্রনাথ এক রেল স্টেশনে ডাকাতির দায়ে অভিযুক্ত হন।” (বাস্তালীর রাষ্ট্রচিন্তা, পৃঃ ৪১০) বহুবার বয়স অল্পের জন্য তিনি মুক্তি পান শেষে ১৯১০ সালে তাঁর জেল হয় পরে জেল থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি পাকা ধার্মিক ও সন্ন্যাসী হয়ে পড়েন। পুনরায় আবার অস্ত্র সরবরাহ মামলায় অভিযুক্ত হন এবং বিদেশে পাড়ি দেন। তখন শিক্ষিত ও সাহসী যাঁরাই বিদেশে যাবার জন্য প্রস্তুত হতেন মাওলানার দল নানা কৌশলে তাদের পাঠাবার ব্যবস্থা এবং বিদেশে গিয়ে তাঁরা যাতে এ পলাতকদের সঙ্গে বা ভারত দরদীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন তার সব ব্যবস্থা করে দিতেন। মানবেন্দ্রনাথ বিদেশে গিয়েই সব রকমের সমর্থন ও সহযোগিতা পেয়েছিলেন। তাঁকে অনেকে বিদেশে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির স্রষ্টা বলে থাকেন। কিন্তু তা সঠিক নয়। অবশ্য তিনিও একজন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বলা যায়। তাই কমরেড মুজাফফর আহমদও বলেছেন, “প্রবাসে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিরও তিনি ছিলেন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।” মানবেন্দ্রনাথের রাশিয়ার মস্কোয় পৌঁছার আগেই মাওলানা জাকারিয়া সেখানে যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা সারা মস্কোকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল। ১৯১৯ সালের ৯ই জুন তারিখে তাককণ্ডে অনুষ্ঠিত তুর্কিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির তৃতীয় কংগ্রেসে জাকারিয়া বক্তৃতা দিয়েছিলেন।”

(দ্রঃ আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, পৃঃ ১৯৫)। পরে এ জাকারিয়া সাহেব পৃথিবীর নানা রাষ্ট্র ঘুরে প্যারিসে আরও পড়াশুনা করেন এবং ফরাসী ভাষায় একটি থিসিস লেখেন সেটার অর্থ হচ্ছে ‘মার্কসীয় দৃষ্টিতে ভারতের হিন্দু মুসলমান সমস্যা এবং এতে তিনি ডক্টর উপাধি লাভ করেন।

স্বাধীনতার জন্য যাতৃত্বমি পরিত্যাগ করে যারা জীবনকে তুচ্ছ করে ভারতের বাইরে গিয়েছিলেন তাঁদের সত্যই ইতিহাসে হীরো হয়ে থাকা কর্তব্য। অবশ্য যারা ইংরেজের ভোষণ, পোষণ ও আমন্ত্রণে নিমন্ত্রণে গিয়েছিলেন তাঁদের কথা বলছি না। সুভাষচন্দ্র আর মাওলানা উবায়দুল্লাহর মত মানুষের কথাই এখানে আলোচ্য। জানলে অবাক হতেই হবে মুসলমান জাতির “খিলাফত আন্দোলন থেকে ‘হিযররত’ আন্দোলনের উদ্ভব হয়েছিল। (দ্রঃ এ) হিযররত মানে ধর্মের জন্য অত্যাচারিত হয়ে পরিত্যাগ। অতএব মাওলানার দল সাধারণ মুসলমানদের কোনযাদুতে বশ করেছিলেন, যে দলে দলে লোক ভারত থেকে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত চুটে বেড়িয়েছে। ডাঃ পট্টিভি সীতা রামাইয়া তাঁর কংগ্রেসের ইতিহাস The History of the Indian National Congress, Vol. 1, p 199 এ লিখেছেন যে, “আঠারো হাজার মুসলমান এ সময়ে পরিত্যাগ করেছিলেন।” এ অর্থ সত্য ঘটনা মুজফ্ফর আহমদও স্বীকার করেছেন ‘আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি’ পুস্তকে ১৯৭ পৃষ্ঠায়।

১৮,০০০ হাজার মুসলমান প্রত্যেকেই ইতিহাস খ্যাত মানুষ। তাঁদের ভিতর থেকে ১৮ শত ও দূরের কথা ১৮ জনও চলতি ইতিহাসে যথাযোগ্য স্থান পান নি। একধার থেকে তাঁদের নাম যদি পর পর লিখে তাঁদের সম্বন্ধে অল্পস্বল্প করেও পরিচয় দেয়া যায় তাহলে এক পৃষ্ঠা করে লিখলেও ১৮০০ পৃষ্ঠা হবে তাই কয়েকজন মুসলমান ও হিন্দুর নাম ইঙ্গিত হিসেবে আরও লিখছি। কমরেড আবদুর কাদীর (গুলিতে নিহত হয়েছিলেন), মুহাম্মদ আকবর খাঁন, অবনী মুখার্জি প্রভৃতি। পরে আরও কিছু ভারতীয় ইউরোপ থেকে রাশিয়ায় গিয়েছিলেন যেমন বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, বীরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, সৈয়দ আবদুল ওয়াহিদ, অধ্যাপক পাণ্ডুরঙ্গ খানখোজা, হেরম্বলাল গুপ্ত, গুলাম আযিয়া লুহানী, আগনেশ স্বেডলি, নলিনী গুপ্ত প্রভৃতি। এছাড়াও নামজাদা অনেক তরুণ ভারতের বাইরে অনেক কাজ করেছেন, নিজামুদ্দিন, সাঈদ আহমাদ রাজ, সুলতান মাহমুদ, ফিদআ আলী আবদুল কাদের শেহরাই, হাবীব আহমদ, রফিক আহমদ, ফিরোজুদ্দিন মনসুর ও মীর আবদুল মজিদ, আমীর হায়দর খাঁন, কলকাতার শামসুল হুদা, অধ্যাপক ক্ষিতিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ব্যারিস্টার জীবন লাল কাপূর, মুঃ কুতুবুদ্দিন প্রভৃতির নামও উল্লেখযোগ্য। মাওলানা ব্যতীত বাকী যাদের নাম করা হল তাঁরা প্রায় সকলেই কমিউনিষ্ট হয়ে গিয়েছিলেন। মাওলানা উবায়দুল্লাহ আশা করেছিলেন যাদের পাঠানো হচ্ছে তাঁরা ঠিক মত নামায রোযায় অভ্যস্ত না হলেও বা পোশাক পরিচ্ছেদে খানিকটা সাহেবী গন্ধ থাকলেও ধর্মীয় বিশ্বাস তাদের গাঢ় হলে তারা জয়ী হবে এবং তাদের খুব পাকা মুসলমান বানিয়ে নিতে পারা যাবে। রাশিয়ার মস্কোতে এক বিরাট বিশ্ব বিদ্যালয় খোলা হয়েছিল তা প্রবাসীদের জন্য। সেখানে শুধু মাথা গুজবার জায়গাই ছিল না, বরং ফ্রীতে খাওয়া দাওয়া থাকা আর সম্ভাব্য আরাম আয়াস ও গোলাপী বিলাসীতারও ব্যবস্থা ছিল। তার চেয়েও লোভনীয় জিনিষ ছিল অন্য রাষ্ট্রে যাতায়াত বা যোগাযোগেরও রাষ্ট্রের তরফ থেকে তখন করা হত। সেটির নাম ছিল “Communist University of the Toiling East” মানে শ্রমজীবীদের প্রাচ্যের কমিউনিষ্ট বিদ্যালয়। রাশিয়ার আরো একটি “Russin's University of Oriental Communism” প্রাচ্য কমিউনিষ্ট বিশ্ব বিদ্যালয় ছিল। মিঃ এ. সি. ফ্রি ম্যান যা লিখেছেন তাতে এ বিশ্ব বিদ্যালয়ে কারা থাকাত বেশ বোঝা যায়—“নয়ন তৃণ্ডিকর পোশাক পরিহিত লোকেরা এ বাড়ীর ভিতরে ছিলেন, কার্কাখি খচিত টুপি পরা বুখারার দর্জির, ভোল্লা আর ক্রিমিয়ার বাদাম চোখো তাতারেরাও ছিলেন, ছিলেন ককেশাসের পার্বত্য মুসলমানেরা আরও ছিলেন ভারত, চীন, জাপান ও কোরিয়ার রাজনীতিক আশ্রিতেরা।” (দ্রঃ এ পৃষ্ঠা-৮৯)

এখান থেকে বোঝা যায় যে পুরোপুরি অগ্নিমন্ত্রে রঞ্জিত এবং দীক্ষিত না করে বিদেশে পাঠানো ঠিক হয়নি। ওখানেই যারা থাকার ছলনায় পড়েছেন ও থেকেছেন তাঁরাই পরে কমিউনিষ্ট ও কমরেড উপাধিতে ভূষিত হয়ে আমাদের কাছে নাস্তিক বলে চিহ্নিত। অথচ

তাঁদের ধর্মীয় জোশ ও হোশ কিছুই কম ছিলনা। শুধু অভাব ছিল পূর্ণ ধর্ম শিক্ষা ও ইসলামের মতবাদ থেকে বিচ্ছিন্নতা মাত্র। রাশিয়ানরা মানবেন্দ্রনাথ রায়কে একটা শিক্ষকের পোষ্ট দিয়ে ভারতীয় মুসলমানদের নানাভাবে দলে টেনেছিল। অথচ তাঁদের ইংরেজী শিক্ষা ধর্মের পূর্ণ উন্মাদনা পুরো মাত্রায় ছিল। যেহেতু মিঃ রায় লিখেছেন—“Most of them transferred their fanatical allegiance from Islam to Communism”। “এই অল্প সংখ্যক মুহাজির যুবকের ভিতরে ইসলাম সম্বন্ধে যতটা উন্মাদনা ছিল ঠিক ততটাই উন্মাদনা তাঁদের ভিতরে এসে গেল কমিউনিজম সম্বন্ধেও।” (দ্রঃ এ, পৃঃ ৫০) কমরেড মুজাফ্ফর আহমদ নিজেও একজন পূর্ণ মৌলবী না হলেও বেশ কিছু জানতেন, যেহেতু তিনি প্রথমে নোয়াখালিতে আখতারিয়া মাদরাসায় পড়েছিলেন এবং পরে পড়া ছেড়ে দিয়ে অন্য লাইন গ্রহণ করেন। পরে তিনি কেমন করে নাস্তিক হয়ে পড়লেন তা চিন্তা করা উচিত।

এ কমিউনিজম সাধারণতঃ গরীব শ্রেণীরই বেশী পছন্দ যেহেতু তাতে দরিদ্র শ্রেণী মোটা ভাত কাপড়ের আর অনটনের হাত থেকে রেহাই পাবার আশ্বাস পাওয়া যায়। কিন্তু এখানে মনে রাখা দরকার ভারতের মৌলানা মওলুবী ধর্মভীরু বিরাট পণ্ডিত সম্প্রদায়টি ধনী নয়, কোটি কোটি মুসলমান এখনো তাঁদের সাথে বিজড়িত কিন্তু তাঁরা কেন কমিউনিজম বিরোধী? তাহলে কি তাঁরা সে ইজমের প্রতীক্ষায় আছেন যেখানে আল্লাহকে স্বীকার করে নিয়ে শান্তিবাদ ও সমতাবাদ থাকবে, সেখানে থাকবে না মানুষের মনগড়া পরিবর্তনশীল অস্থায়ী অসার আইন।

জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনা ঘটেছিল ১৯১৭ সালে ১৩ই এপ্রিল আর কিসসাখানি বাজারে অনুরূপ আর একটা ঘটনা ঘটেছিল ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে ২৩শে এপ্রিল। ১৯১৭ সালে আমেরিকায় ভারতীয় রামচন্দ্র ভরদ্বাজ ইংরেজের বিরুদ্ধে গদর পত্রিকায় লিখতেন। তাই ইংরেজরা ১৯১৭ সালে ২৩শে এপ্রিল তাঁকে গুলি করে হত্যা করে। এ তারিখকে কেন্দ্র করে ১৯৩০ সালে ২৩শে এপ্রিল মাওলানা আবদুর রহিম পোপলজি, আল্লাহ বখশ হরতী, গোলাম রব্বানী শেষ্টির নেতৃত্বে একটি কাউন্সিল গঠিত হয়। বহুলোক তাঁদের ভাষণ শোনে আসেন। সাথে সাথে সরকারী গাড়ী আসে এবং মাওলানাদের এরেষ্ট করে। জনতা বাধা দিতে গিয়ে বাধা পায়। অবশেষে পুলিশ গুলি চালায়। জনতা তখন গাড়ীর পেট্রলের ড্রাম ফাটিয়ে গাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দেয়। পরে মিঃ মেটকাফ ও মিঃ কর্নেল গার্ডন অল্প সময়ের মধ্যেই মেশিনগান, কামান ও গোলাগুলি আনিতে নেয় তখনও জনতা নেতাদের মুক্তির দাবীতে চীৎকার করছিল। আরম্ভ হল ফায়ার সমস্ত মানুষই প্রায় আগুনে আহত হতে বাকী থাকে নাই আর অনেকেই বাজারের উপর শহীদ হয়ে মৃত্যুর সঙ্গে সন্ধি করলেন। ওখানে লালকোর্তা বাহিনীর বীরত্ব ভোলায় নয়। যার নেতা ছিলেন সীমান্ত গান্ধী আবদুল গাফ্ফার। তিনিও কিসসাখানিতে বন্দী হলেন। (আজ গাফ্ফার প্রবন্ধ ভারতের মুক্তি সংগ্রাম ও মুসলিম সমাজ, শান্তিময় রায়।) (১৯০৮ ডিসেম্বর)

১৯০৬ সালে বরিশালের সংগ্রামে যিনি নেতৃত্ব দেন তিনি হচ্ছে আবদুল্লাহ রসুল। বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলন শুধু হিন্দুরাই করেছিলেন বলে অনেকে মনে কিন্তু তার সাথে মুসলমান উকিল, মোক্তার, তালুকদার প্রভৃতি প্রচুর মুসলমান যোগ দিয়ে ছিলেন তার কিছু কিছু নাম বলা হয়েছে তবু তার তাখিক হিসেবে কোন জেলা হতে কতগুলো নেতৃস্থানীয় মুসলমান যোগ দিয়েছিলেন বলতে হলে, নোয়াখালি ৪০, রবিশাল ৮০, চট্টগ্রাম ৫০, ফরিদপুর ৫০, ময়মনসিংহে ১১০, ঢাকার ৭৫ ও কলকাতায় ২০০ সভা হয় তাতে মুসলমানদের সংখ্যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। “এসব জেলায় বিপুল সংখ্যক মুসলিম জনসাধারণ অংশ গ্রহণ করেছিলেন ও মুসলিম জননেতা এইসব সভাগুলোতে ভাষণ দিয়েছিলেন। (দ্রঃ এ, পৃঃ ৩৭-৩৮) আমরা ইতিহাসে হিন্দুদের গুপ্ত সমিতির নাম পাই তা সন্ধীর্ণ ও অসন্ধীর্ণ যাই হোক। কিন্তু মুসলমানদের প্রচুর গুপ্ত ঘাঁটির নাম ইতিহাসে গুপ্তই আছে।

“অনেক মুসলিম যুবক মুসলিম গুপ্ত সমিতি গঠন করেন। মৌলানা আযাদ মধ্যপ্রাচ্যে বিভিন্ন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতির সাথে যুক্ত ছিলেন।” পরবর্তী সময়ে তিনি মধ্যপ্রাচ্য, আফগানিস্তান, পেশোয়ার ও উত্তর ভারতের অনেক জায়গায় পরিক্রমা শেষ করে কোলকাতায় হালিবুদ্বাহ (আল্লামার ও সমতাবাদ থাকবে, সেখানে থাকবে না মানুষের মনগড়া পরিবর্তনশীল অস্থায়ী অসার আইন?

‘জাহানী ইসলাম’ নামে একটি পত্রিকা জাহাঙ্গীরী বন্দরে বন্দরে বিলি করতেন তাঁরা প্রায় সবই মুসলমান তার একটিতে মিশরের ইনভার পাশার একটি মন্তব্য ছিল; “হিন্দু মুসলমান তোমরা উভয়ে একই বাহিনীর সৈনিক। তোমরা দুই ভাই। এই নীচ ইংরেজ জাতি তোমাদের শত্রু। এদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধে (জিহাদ) যোগ দিয়ে তোমরা মহত্ব লাভ কর।” (দ্রঃ ঐ)

এই সংগঠিত প্রচেষ্টার ফলে ১৯১৫ সালের জানুয়ারী মাসে ১৩০ নম্বর বেলুচি রেজিমেন্ট রেঙ্গুনে, ব্যাঙ্ককে ও সিঙ্গাপুরে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করে। ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯১৫ সালে ৫নং নেটিভ লাইট পদাতিক সেনাবাহিনী (যার প্রায় গোটা সেনাবাহিনীই মুসলিম) সিঙ্গাপুরে বিদ্রোহ করে। (শান্তিময় রায়, ঐ)

শোষক ইংরেজ বন্দুকের নল দিয়ে তা ব্যর্থ করে দুজন নেতার ফাঁসী দেয় আর বাকী প্রত্যেককে যাবজ্জীবন দীপ্তান্তর দেয়।

১৯১৭ সালে দ্বিতীয় মান্দালয় ষড়যন্ত্র মামলায় তিনজন বিপ্লবী সৈনিকের প্রাণদণ্ড হয়। অবশ্য তাদের নাম প্রচলিত ইতিহাসে নেই কিন্তু সত্য ইতিহাসে খোদিত। তাঁরা হচ্ছেন জয়পুরের মুজতবা হোসেন, লুধিয়ানার অমর সিং আর ফৈজাবাদের আলি আহমদ।

১৯১৫ সালে বিপ্লবীদের সর্বোত্তম সাহায্য করার জন্য এবং ধনী হয়েও বিপ্লবীদের সাহায্য করে স্বৈচ্ছায় দারিদ্র বরণ করার অপরাধে যে মহামানবীধীর ফাঁসী হয় তিনি হচ্ছেন কাসেম ইসমাইল খান।

১৯১৫ সালে মার্চ মাসে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বজ্র হামলা ও বিদ্রোহের অপরাধে মহাম্মদ রাইসুল্লা খানের ফাঁসী হয়। ইংরেজী রিপোর্টে এই নামটি রাসুলুল্লাহ আছে কিন্তু এই নামটির বানান ভুল a-s এর মধ্যে একটি। বাদ গেছে বলেই মনে হয়। সুতরাং আমরা রাইসুল্লাহ লিখলাম। ঐ ১৯১৫ সালেই মহাম্মদ ইমতিয়াজ আলীও বীরদর্পে ফাঁসীর মঞ্চে আরোহণ করেন এবং জীবন আর সমস্ত রক্ত বিন্দু দান করেন। ঐ ১৯১৫ - তে রুকনুদ্দিন ফাঁসীর মঞ্চ অলঙ্কৃত করেন। সবচেয়ে আশ্চর্য ঘটনা শয়তান ইংরেজ সরকার, তাঁর প্রাণ ভিক্ষার আবেদন নিবেদন করলে প্রাণদণ্ড শিথিল হতে পারে বলে জানায় কিন্তু তাঁরা শত্রু শাসক সরকারের কাছে আবেদন নিবেদন জানানো তীব্র ঘৃণা ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন। তাই হাসিমুখে মঞ্চে আরোহণ করেন।

১৯২৭ সালে বিপ্লবী বরকতুল্লাহ ভারতের বাইরেই প্রাণ ত্যাগ করেন, মরার আগেই জানিয়েছিলেন একটি সাধের কথা সেটা হচ্ছে ভারতের স্বাধীনতা পাওয়া আর ভারতের মাটিতে তাঁর কবর হওয়া।

ভারতের বিখ্যাত বীর আমীর হাইদার ভারতের বাইরে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, জাভা, সুমাত্রা, জাপান প্রভৃতি দেশে এমনভাবে ঘুরে বেড়িয়েছেন যে কোন দিন যায় সরকার তাঁকে ধরতে পারে নাই। অবশেষে তিনিও কমিউনিষ্ট হয়ে গেছেন। তাই তাঁর অবদানও বোধ হয় চাপা পড়ে গেছে।

মৌলানা আযাদের একজন অন্যতম বিপ্লবী সহকর্মী ছিলেন নাম রেজা খাঁ, অস্ত্রশস্ত্র আমদানীতে তাঁর অবদান আছে যথেষ্ট। তিনিও পরে কমিউনিষ্ট হয়ে গেছেন। এমনভাবে নেত্রকোণার মকসুদ্দিন আহমদ, নাসিরুদ্দিন আহমদ, মাওলানা গিয়াসুদ্দিন আহমদ, নাসিরুদ্দিন আহমাদ এবং তাঁর কন্যা রাজিয়া খাতুন বিপ্লবী ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। আরও অমর হয়ে আছেন মওলবী আবদুল কাদের। কিশোরগঞ্জের আলি নওয়াজ, মুহাম্মদ

ইসমাইল, চাঁদ মিয়া ও আলতাফ আলীর নাম বিপ্লবী দলে বিশেষভাবে বিদ্যমান। যুগান্তর দলের সাথে যোগ দিতে গিয়ে নিজেদের ধর্মীয় ঐতিহ্য নামায রোযা বাদ দিয়েও সিরাজুল হক ও হামিদুর হক সন্ত্রাসবাদী হয়ে কাজ করেছিলেন। তাঁদের জেল হয়েছিল।

১৯৩০ সালের মে মাসে সোনারপুরের ফাঁসী মঞ্চে যারা গলা দিলেন, যাদের ইংরেজের পক্ষ থেকে প্রাণ ভিক্ষার আবেদন করতে বলা হয়েছিল যারা তাদের আবেদন পরামর্শে পদাঘাত করেছিলেন এবং ফাঁসীর মঞ্চে গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ছিলেন কোরবান হোসেন ও আবদুল রশীদ।

উত্তর ভারতে বটুকেশ্বর, চন্দ্রশেখর, ভগত সিংহ প্রভৃতি ব্যক্তিবৃন্দ “হিন্দুস্তান রিপাবলিক্যান আর্মি” নামে একটি দল তৈরী করেছিলেন। এ দলেও মুসলমান মাথা গুজে অংশ গ্রহণ করতে ভোলেনি। তাঁদের মধ্যে মুহাম্মদ আসফাকুল্লাহ নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ফাঁসীর পূর্বে তাঁর আত্মীয়-স্বজন অনেকে তাঁকে দেখতে এসে কাঁদছিলেন তাতে তিনি বলেছিলেন আমাদের নামাযের মধ্যে প্রতিদিন ভালদের পথে, বীরদের পথে, শহীদদের পথে চলার কথা স্মরণ করতে হয় সূরা ফাতেহার মধ্যে। তাই তোমরা কেঁদে আমাকে অশান্ত কর না।

আজ মুসলমান সম্প্রদায়ের অনেকের মত আমিও ভারতে স্বাধীনতার জন্য অসন্তোষের বিরুদ্ধে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ে ফাঁসীতে যাচ্ছি তাতে আমার অনেক আনন্দ ও গর্ব আছে। এই বলে ফাঁসীর রজু গলায় পরে জোরে জোরে গভীর কণ্ঠে তিনি কোরানের আয়াত পাঠ করেছিলেন। (শান্তিময় রায়ের ঐ লেখা পৃঃ ৪৫)

বীর রাম প্রসাদেরও বিপ্লবের অপরাধে ফাঁসী হয়। উপরোক্ত তথ্যগুলো সংগৃহীত হয়েছে মৌলানা আবুল কালাম আযাদের লেখা (মহাফেজখানা) কালিচরণ ঘোষের The Rule of Honour, পেশওয়ার ষড়যন্ত্র মামলার কাগজপত্র, বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি কথা, যদু গোপাল মুখপাধ্যায়ের বিপ্লবের পদ চিহ্ন, ভূপেন্দ্র দত্তের সমকালের কথা মুজাফফর আহমদ প্রভৃতি পুস্তক থেকে।

হঠাৎ নেতাদের আবির্ভাব বা জন্মের পূর্বে মুসলমানদের কি বিরাট ভূমিকা ছিল তা বিশেষ করে বিশদভাবে দেয়া সম্ভব হল না। যদি মন বোঝানো করে ধরেই নেয়া যায় জাতির জনকদের জন্ম পরেই হয়েছে আর এদের পূর্বে যারা আন্দোলনকারী আহত ও নিহত হয়েছেন তাঁরা জাতির জনক নন কাতির শিশুপুত্র, তাহলেও তো হঠাৎ নেতার দলের সাথে যারা তালে তালে চলেছেন তাঁদের নাম বাদ গেল কেন?

ফরুখ আবাদের নবান ইকবাল মন্দু খাঁ দেশের জন্য ফাঁসীতে প্রাণ দিয়েছেন। গজনফর হুসাইন খাঁও প্রাণ দিয়েছেন ফাঁসীর নিষ্ঠুর ফাঁসে। এমনভাবে সাখাওয়াত হুসাইন ও তাফাজ্জু হুসাইনকেও ফুদিরামের মত ফাঁসী দেয়া হয়।

মুনশী আবদুল করীম, কাজী মিয়াজান, সেখ রহিম বখশ ও মাওলানা ইলাহী বখশকে সারা জীবনের জন্য নির্বাসন দণ্ড দেয়া হয়েছিল যা ফাঁসীর চেয়ে কম নয়। ওধু তাই নয় তাঁদের যথা সমস্ত কিছু ইংরেজ সরকার বাজায়গু করেছিল।

মাওলানা জাফর এবং আলহাজ্ব মুহাম্মদ শফী সাহেবের ফাঁসীর রায় হয়। কিন্তু শহীদ হবার জন্য তাঁদের আনন্দ স্মৃতি দেখে ইংরেজরা অবাক হয়। হয়ত ভিতরে ভয় ও দুঃখ নিয়েও উপরে বীরত্বের ভান করা যে যায় না, তা নয়। কিন্তু এদের শহীদ হবার আনন্দে শরীরের ওজন বেড়ে গিয়েছিল। তাই সরকার ক্রোধে তাঁদের বীরত্বপূর্ণ হতে না দিয়ে ফাঁসীর রায় বাতিল করে চির নির্বাসন দিয়েছিল। জেলখানায় নানা অত্যাচার করা হয়েছিল এমন কি ইসলামের জাতীয় প্রতীক তাঁদের দাড়ি ও মাথার কেশ মুগুন করে দেয়া হয়েছিল।

হযরত আহমদুল্লাহ সাহেব শহীদ হয়েছেন ইংরেজদের অল্পে অবশ্য এঁদের কিছু আলোচনা পূর্বে হয়েছে। কিন্তু এঁরা প্রত্যেকে এত বড় বড় মানুষ যে এঁদের নামে এক একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করা সম্ভব।

এমনিভাবে পীর আলীর নাম পূর্বেই করা হয়েছে কিন্তু ইংরেজদের সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে তিনি ও তাঁর আর ৩১ জন সঙ্গী মুসলমান যোদ্ধাও বন্দী হন আর এ ৩১ জনেরই একটি একটি করে ইংরেজ নিষ্ঠুরভাবে ফাঁসী দিয়ে হত্যা করে।

“বিভিন্ন প্রসিদ্ধ উচ্চপদস্থ ইংরেজদের রিপোর্ট মতেও ২৭/২৮ হাজার মুসলমানকে বিনা বিচারে ফাঁসী দেয়া হয়েছে এবং প্রায় সাত শত বিশিষ্ট আলেমকেও ফাঁসী কাঠে ঝুলতে হয়েছে।” (দ্রঃ হায়াতে মাদনী, পৃঃ ৪১-৪২) কিন্তু আসলে এটা ইংরেজদের রিপোর্ট এর চেয়ে বহু বহু গুণ মুসলমান আলেম আর বিপ্লবীকে নিহত হতে হয়েছিল।

বহু মুসলমানকে শূকরের চামড়ায় মাথা মুখ ঢেকে জলন্ত চুলাতে ফুটন্ত তেলের উপর ছাড়া হয়েছিল। (এ বর্ণনা মিঃ এডওয়ার্ড টমসনের। দ্রঃ এ)

সর্দার বিঠল ভাই মরার আগে সুভাষ বোসকে ভারতের বাইরে কাজ করার জন্য এক লাখ টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু সে টাকা কোন এক কঠিন চক্রান্তে তাঁকে টাকা দেয়া হয়নি।

গান্ধীজী ১৯২৮ সন থেকে সুভাষ বাবুকে দেখে এসেছেন সন্দেহের চোখে সুভাষ বাবুর মত ব্যক্তির সম্পন্ন পুরুষ কংগ্রেসের বামপন্থীদের আয়ত্বে এনে আপোষহীন সংগ্রামের পথে এগিয়ে যাবেন এ আশঙ্কা তাঁর ছিল। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের কাছে তখন কংগ্রেসরাই বড় দেশের কল্যাণ কিছু নয়।” (দ্রঃ অবিস্মরণীয় ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০ শ্রী গঙ্গানারায়ণ চন্দ্র) ১৯৪১ সারে ১লা মার্চ ভারত ত্যাগ করেন সুভাষ আর দেশের নেতারা কেউ খোঁজ করেননি। ২৫ দিন পর সংবাদপত্রে প্রকাশ হয় ‘সুভাষ চন্দ্র বসুকে পাওয়া যাচ্ছে না।

বিশ্ব যুদ্ধ যখন জোর চলছে। তখন ভারতীয়কে জোর করে দলে দলে শাসক ইংরেজ সৈন্যদের দলে ভর্তি করেছে হাজার হাজার। আর ভারতকে পিষে পিষে কোটি কোটি টাকার পণ্য চালান দিয়েছে বিদেশে। কারণ এ যুদ্ধে ভারত থেকে ১৮০০০ হাজার লক্ষ পাউণ্ড অর্থ ১৯৩৮ হতে ১৯৪৫ পর্যন্ত সময়ে ইংল্যান্ডে রপ্তানি হয়। ভারতীয় মাল পাচারের যে পরিমাণ ছিল তা আরও বেড়ে যায়। আর ভারতের জন্য যতটুকু ইংরেজরা আমাদানি করত তা ছিল শতকরা ৩০% এখন যুদ্ধের সময় তা কমিয়ে করা হল ২০%। ফলে ভারতের লোক অনাহারে মরতে লাগল এবং ঐ সময় আমেরিকা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ছিল তাই ১৯৪১ সালের মার্চ থেকে ১৯৪৫ এর সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আমেরিকা, ভারত ও সিংহলকে ২১১৬ লক্ষ ডলার মূল্যের খাদ্য ও মালপত্র সরবরাহ করে। এসব তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। (a) Banker. London, gamary 1946 P. I. The Eastern Economist at 21-10-49 P 633, (b) India Review of Commercial Con'ditions (London) Aug, 1945, P. 12-16, (c) Survery of current business (Washington) March 1946 P. 9.

এ সময় জিন্মা বললেন তিনি ইংরেজের বিরুদ্ধেই লড়বেন (ভারতের বিরুদ্ধে নয়) “হিন্দু মহাসভার নেতারা বলেন তাঁরা লীগের বিরুদ্ধে লড়বেন (ইংরেজের বিরুদ্ধে নয়) আর ইংরেজের সাথে সহযোগীতা করবেন।” (শ্রীগঙ্গানারায়ন চন্দ্রে লেখা ঐ পৃঃ ৫৪)

শ্রী সুভাষচন্দ্রের এক গৌরবময় ইতিহাস আছে অবশ্য তিনি ইতিহাসে স্থান পেতে একেবারে বঞ্চিত হননি কিন্তু জহরলাল কেন বলেছিলেন “সুভাষ এলে আমি রাইফেল হাতে তার বিরুদ্ধে দাঁড়াব।”

আসল কথা হচ্ছে এটাই, ইতিহাস খ্যাত হঠাৎ নেতার দলরা প্রকৃত স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষে উদিত হয়ে ইংরেজের সাথে লড়াই না করে হিন্দু মুসলমান লড়াই করেছেন আর শাসক ইংরেজ হাসি চাপা রেখে গভীর মুখে এ মারামারিকে স্বাধীনতা যুদ্ধ আর মোড়লদের যোদ্ধা চলে চাইটেল দিয়েছেন। সুভাষকে দলে গ্রহণ না করার শ্রেষ্ঠতম কারণ হচ্ছে এটাই, তিনি মুসলমানদের আন্দোলনের ফরমূলা গ্রহণ করেছিলেন। আর তাঁর রাজনৈতিক গুরু মাওলানা উবাইদুল্লা সিদ্ধী (সিদ্ধু প্রদেশে বাড়ী ছিল তাই সিদ্ধি বলা হয়)। সরকার যখন বুঝতে পারল উনি অগ্নিলিঙ্গ যেখানে থাকবেন সেখানেই বিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠবে তখন তাঁর উপর আইনের আদেশ চাপানো হল যে, তাঁকে চিরদিন ভারতবর্ষে প্রবেশ করা চলবে না। বাধ্য হয়েই তাঁকে ভারত ছেড়ে চলে যেতে হয়। কিন্তু ইংরেজ যদি ভারতের বাইরে তিনি কতটা সংগঠন ও বিপ্লবীদের সাহায্য এবং ভারত ত্যাগী মুজাহিদদের পথ চলার পাথ্রে পরিবেশন করতে পারেন চিন্তা করত তাহলে তাঁকে ভারতেই আটকে রেখে বরং বহিঃভারতে যাতায়াত বন্ধ করত।

মাওলানা উবাইদুল্লা বৃদ্ধ বয়সে দেশে আশার অনুমতি পান। প্রথমেই তিনি আসেন ভারতের মন্তক বঙ্গে। কলকাতায় ওখানে আলেমদের ‘জমিয়তে উলামায়ের’ অধিবেশনে। নেতাজী সুভাষচন্দ্র আগ থেকেই তাঁর যোগ্যতা, দৃঢ়তা ও ভারত প্রেমের কথা সবাই জানতেন কিন্তু শিষ্য হবার মত বিশেষভাবে পরামর্শ করার মত সুযোগ পাননি। সুভাষ এবার মাওলানার সাথে সাক্ষাত করলেন এবং তাঁর পরামর্শ চাইলেন এবং তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করতে চাইলেন। তিনি জানলেন ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতায় তিনিও বিশ্বাসী আর ভারতের জন্য জীবন দিতে তিনিও প্রস্তুত। মাওলানা উবাইদুল্লা তাঁকে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন এবং আস্তে আস্তে বললেন আজ রাতে তৈয়েব ভাই জরিফের বাড়ীতে গোপন আলোচনা হবে। রাত্রিতে আলোচনা হয়েছিল, অনেক গোপন কথা হয়েছিল। সেখানে ছিলেন চৌধুরী আশরাফুদ্দিন আর বর্ধমানের মৌলানা আবুল হায়াত প্রভৃতি বিখ্যাত প্রকৃত নেতা। এখানে উবাইদুল্লা তাঁকে আদেশ করেন “অত্যন্ত চুপি চুপি তুমি মাওলানা জিয়াউদ্দিন নাম নিয়ে ১৭ই জানুয়ারী (১৯৪১) রওনা হও।” তারপর মাওলানা উবাইদুল্লাহ সাহেব নিজে হাতে অনেক চিঠি পত্র লিখে দিলেন। এবং জানলেন কোন জায়গায় কোথায় কি নাম, কি বেশে, কি পদে, কোন রাষ্ট্রে তাঁর শিষ্য ভক্ত ও কর্মীরা আছেন। হয়েছিলও তাই। অতএব মুসলমানের পরামর্শ মত চললে আর ইংরেজের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা দাবী করলে তাঁকে গুলি করে মারার কথা তখনকার কংগ্রেস নেতা জহরলাল বলবেন বৈ কি? তাই সুভাষ কোন দিন বিশ্বাসঘাতকতা করেননি তাই তাঁর আযাদহিন্দ ফৌজে বড় নেতাদের বেশীর ভাগই মুসলমান দেখা যায়। যেমন ক্যাপটেন শাহ নাওয়াজ, ক্যাপটেন বুরহানুদ্দিন, ক্যাপটেন আবদুর রশীদ, জমাদার ফতেহ খান প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য ও মাওলানা উবাইদুল্লা সাহেব যে পরিকল্পনা ও প্রস্তাব সুভাষকে দিয়েছিলেন সে প্রস্তাব “কংগ্রেস নেতাদেরও দিয়েছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস নেতা গান্ধীজী তা অস্বীকার করেছিলেন।

মাওলানা আবুল কালাম আযাদ তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু মাওলানা জহীরুলহককে যে পত্র লিখেছিলেন তার তরজমার কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি। (দিল্লী ১৫ই সেপ্টেম্বর)

স্নেহের মণ্ডলুবী জহীকুল হক (ধীনপুরী)

আসসালামু আলাইকুম অ রাহমাতুল্লাহ,

আযাদী উপলক্ষে আপনার প্রেরিত পত্রের জন্য শুভেচ্ছা জানাই। পত্র পড়ে স্মৃতিপটে ভাসে শুধুই মাওলানা উবায়দুল্লাহর সিকির (রহঃ) স্মৃতি। সে ঘটনা অনেক লম্বা, সংক্ষেপে করলেও যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন। ১৮১৪ সারে বিশ্ব যুদ্ধের সময় শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহঃ) কাফেলার নেতা হযরত মাওলানা হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান (রহঃ) অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতিতে মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিকিকে কাবুল প্রেরণ করেন। সেখানে মাওলানা উবায়দুল্লাহ বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করেন। তন্মধ্যে জার্মান, ফ্রান্স এবং জাপানের এমন সব কর্মী নেতা ছিলেন যারা পরবর্তী কালে শাসন ক্ষমতার উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

পঁচিশ বছর নির্বাসন দণ্ড ভোগ করে ১৯৩৯ সনে তিনি যখন এখানে আসেন তখন ২য় মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। তিনি তাঁর নিজস্ব পরিকল্পনা কংগ্রেসের কাছে পেশ করে সর্ব ভারতীয় সংগ্রামের প্রাথমিক রচনা করেন। সে সময় গান্ধীজী পর্যন্ত এ পরিকল্পনার বিরোধীতা করেন। তাহলেও “ভারত ছাড়” আন্দোলনটুকু অনুমোদন লাভ করে। একদিন চায়ের মজলিসে তাঁর সাথে আমার আলাপ হয়। তাঁর চোখ ও চেহারা চিত্তার চিহ্ন দেখে আমার মনে অনুসন্ধিৎসুর প্রশ্ন জাগে। আমি প্রশ্ন করতেই তিনি উত্তরে জানানেন, “আমার ইচ্ছা সুভাষ ভারতের বাইরে চলে যাক।” কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে তিনি তাঁর বাসা উখলায় ফিরে যান।

দ্বিতীয় দফায় উখলা থেকে দিল্লী পর্যন্ত আট মাইল সড়কের কোন একটি জনমানব শূন্য স্থানে তাঁর সাথে সুভাষের সাক্ষাত সংঘটিত হয়। তার পরের সাক্ষাতটি হয়েছিল কলকাতার বালিগঞ্জ এলাকায়। এখানেই তিনি সুভাষকে জাপান যাত্রার জন্য রওনা করেন। জাপান সরকারের নামে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মন্ত্রী হিসেবে তিনি একটি পরিচয়পত্র দেন। এবং সেখানকার প্রধান সেনাপতির নামে একটি ব্যক্তিগত বিশেষবার্তাও পাঠান। তাই সুভাষ সেখানে পৌঁছানোর সাথে সাথে জাপান সরকারের সৈন্য বিভাগ ও তাঁর প্রতি আস্থা করতে পেরেছিলেন। শেষ পর্যন্ত ভয়ঙ্কর বিষয় প্রয়োগ করে মাওলানা সাহেবের জীবন শেষ করা হয়। ১৯৪৪ সালের ২২শে আগস্ট তিনি মহা মিলনে সামিল হলেন মহান স্রষ্টার সাথে। সেদিন আকাশ থেকে অশ্রু করেছিল। সারা পৃথিবী শোকে মুহ্যমান হয়েছিল। (ভারতে এ সংবাদ ইংরেজ সরকার গোপন রেখেছিল)। অবশেষে সাধারণের ধারণা সত্য বলে প্রমাণিত হয়। ১৯৪৫ সালের ১লা সেপ্টেম্বর পুরো এক বছর নয় দিন পর সরকারীভাবে স্বীকার করা হয়—মাওলানা সাহেব নিহত হয়েছেন। বাস্তবিক এমনি একজন বিপ্লবীকে ওজনের তুলনায় এক পাল্লায় রেখে অন্য পাল্লায় সারা পৃথিবী চাপালেও এ বিপ্লবীর সমান হয়না। এখন রয়ে গেছে তাঁর অপরূপ স্মৃতি আর অপরূপ বিরহ বেদনা। দুঃখ কিন্তু এজন্য নয় যে তিনি চলে গেছেন, বড় এ জন্য দুঃখ যে যে এ জগতের মানুষ ছিলেন তা আজ প্রায় অবলুপ্ত। আমরা সে দলেরই পশ্চাতবর্তী কর্মী, সে কাফেলার অনুরূপ দল আর পায় না আর পাচ্ছি না গন্তব্য স্থানের ঠিকানা। আমাদেরকে কেউ চেনে না, আর অন্যদেরকেও আমরা চিনতে পারছি না সে শহীদদের উপর স্বাধীনতার গৌরব অর্পিত হোক। তাঁদের কবরের উপর আল্লাহর শান্তি শান্তিধারা বর্ষিত হোক।

আলহামদুলিল্লাহ! (আল্লাহর প্রশংসা) আমি সুস্থই রয়েছি আপনার কুশল সংবাদ জানাবেন। আপনার সম্মানীয়া মাতার প্রতি রইল আন্তরিক সালাম।

ইতি—

আবুল কালাম।

পত্রটি প্রাণধানযোগ্য আজ সুভাষ বসুর ভারতের বাইরে যাওয়া ও রহস্যময় আত্মগোপনের কথা যা করেই হোক সকলের কাছে পৌঁছেছে কিন্তু কোন অপরাধে অন্ততঃ দশ গুণ যাকে সম্মান দেয়া উচিত ছিল তিনি আজ নিষ্ঠুরভাবে নিষ্কিণ্ত।

মাওলানা আযাদই একমাত্র লোক যিনি সত্যিকারে রাজনীতি বুঝতেন এবং কংগ্রেসকে টিকিয়ে রেখেছিলেন। তবে বহুবার প্রতিবাদ করলেও তাঁকে অনেক কিছু মুখ বুখে সহ্য করতে হত। তার কারণ অনেকে খুঁজে পান না। অনেকের ধারণা তিনি গদীর জন্য অনেক অন্যায্যকারী ও অযোগ্যদের মাঝে নিজের যোগ্যতা নষ্ট করেছেন। কিন্তু না, হযরত মুহাম্মদের (সাঃ) প্রিয় আরব খান্দানের একটি রত্ন আবুল কালাম আযাদ। তিনিই প্রকৃতপক্ষে ভারত বিভাগের বিরোধী ছিলেন। শেষে তাঁর কথা চলল না। দেশ বিভাগ হয়েই গেল তবুও তাঁর কংগ্রেসে থাকার কারণ মুসলমান জাতি আর অব্রাহ্মণ হরিজনদের প্রতি দ্রবদ। তিনি মহান গোয়েন্দার মত যদি না থাকতেন তাহলে ভারতের মুসলমানদের উপর যারা খড়গহস্ত তাঁরা তাঁদের কার্যোদ্ধার করতে হয়ত পারতেন। তাই তিনি কোটি কোটি মানুষের কাছে শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁর লেখা ‘ইন্ডিয়া উইনস্ ফ্রিডম’ বইটি প্রত্যেক ভারতবাসীর পড়া কর্তব্য তাতে প্রত্যেকেই প্রকৃত রাজনীতি শিখতে পারবেন এবং ভারতের রাজনৈতিক গোপন তথ্য জানতে পারবেন আর তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিমাণ নির্ধারণ করতেও অসুবিধা হবেনা। তবে তাঁর লেখা এ বইটি প্রথম ও দ্বিতীয় মুদ্রণের বইগুলো আবিষ্কৃত অবস্থায় দেখা যায়। পরে তাঁর লেখা অমৃত পুস্তকে ভেজাল দেয়া হয়েছে। জল খাবারকে খাবার জল বললে অর্থ যেমন অনেক বদলে যায়। তাতেও তাই হয়েছে।

অবশ্য ইনিও মাত্র যথায়োয়া না হলেও কিছুটা স্থান পেয়েছেন। সিরাজের অন্ধকূপ হত্যার প্রহসনের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে অথচ ইংরেজ সত্যিকারের এ রকম অত্যাচার করেছে ভারতের মুসলমান বিপ্লবীদের উপর।

১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে মাদ্রাজে মুসলমানদের মোপলা বিদ্রোহ সম্বন্ধেও কিছু বলা হয়েছে। এ সময় বাংলা পত্রিকা প্রবাসীতে, বাংলা ১৩৩৮ সালে পৌষ মাসে সে সংবাদ ছাপা হয়েছিল তা অন্ধকূপের মিথ্যা ইতিহাসকে আর একবার প্রমাণ করিয়ে দেয়। মাওলানা ও মুসলমান বিপ্লবীর ১২৬ জন একটি দলকে কেটি মালগাড়িতে চড়িয়ে ৪৬০ মাইল পথ অতিক্রম করে নিয়ে যাওয়া হয়। ট্রেনের কুঠুরীটি ছিল ১৮ ফুট লম্বা ও ৯ ফুট চওড়া অর্থাৎ ১৬২ বর্গফুট ছিল। দরজায় তালা লাগানো ছিল। ছোট একটি জানালার মত ছিল তাতে তারের জাল দেয়া ছিল। জালে আবার রঙ লাগানো ছিল ফলে জালের ছিদ্রগুলো বুজে গিয়েছিল। পথেই ৫৬ জন বন্দী পিপাসায় কাতর হয়ে শহীদ হলেন। আর বাকী বন্দীগণ ঘামে ভেজা জামা নিংরানো ঘাম পান করেন। তাঁরা পানি পানি করে চীৎকার করেছিলেন, কিন্তু পরিবর্তে পেয়েছিলেন নিষ্ঠুর হাসি আর বিদ্রূপ। এসব ঘটনা হঠাৎ নেতাদের আবির্ভাবের আগে নয়। ঘটনাটি ঘটে ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে ২০ শে নভেম্বর। এসব মুসলিম অবদান চিত্তরঞ্জনকে অবাক করে। তাই তিনি মুসলমানদের মর্যাদা স্মরণ রেখেই কাজ করতেন কিন্তু ১৯২৫ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

ইংরেজের অতি আধুনিক গুপ্তচর বাহিনীকে এমনভাবে মুসলমান বিপ্লবীরা এড়িয়ে গেছেন যে তাঁদের চিঠিপত্র পড়েও তার অর্থ উদ্ধার করতে পারতো না। কারণ কতকগুলো এমন শব্দ পত্রে ব্যবহার করা হত যা একমাত্র প্রকৃত বিপ্লবীরা ছাড়া কেউ জানতেন না যেমন “প্রাদি আদান-প্রদানের ব্যাপারে তারা অভিনব উপায়ে যেকোন গুপ্ত ও সাংকেতিক ভাষা ব্যবহার করিয়াছে তাহাকে ষড়যন্ত্রের ইতিহাসেও বিস্ময়কর বলা যাইতে পারে। তাহারা তাহাদের সাংকেতিক ভাষায় যুদ্ধকে মোকদ্দমা নামে, খোদাকে আইন সম্মত এজেন্ট, সুবর্ণ মুদ্রাকে লাল বর্ণের হীরক, অথবা দিল্লীর সোনার জরির জুতা কিংবা লালবর্ণের জন্তু এবং সুবর্ণ মুদ্রার আদান-প্রদানকে লাল বর্ণের দানার তসবীহ (মালা), টাকা পয়সা আদান-প্রদানকে পুস্তক আদান-প্রদান এবং ড্রাফট ও মনি অর্ডারকে সাদা প্রস্তর এবং উহার সংখ্যাকে তসবীহ

দানার সংখ্যা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে। যেমন এক সহস্র মুদ্রা পাঠাইয়া বলা হইত—এক সহস্র দানার তসবীহ পাঠান হইল, ইত্যাদি।” (দ্রঃ পাকিস্তানের জুডিশিয়াল কমিশনারের নিকট অন্তর্ভুক্ত আপীল মামলার ফলাফলে নথিপত্রের ১৮৪ ও ১৮৭ প্যারা)। ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী থেকে কুখ্যাত জেলখানা ভারতের বাইরে বহু দূর মাল্টার দ্বীপ বন্দীখানায় মুসলমান তথা মাওলানাদের মধ্যে সে সময় শুধু মাওলানা উবাইদুল্লাহ এ ইতিহাস প্রসিদ্ধ ছিলেন তা নয় বরং আরও অনেক অনেক নেতা প্রাণ দিয়ে সংগ্রাম করতে এগিয়ে ছিলেন। মাওলানা হাজী তোরজজয়ী, মাওলানা লুৎফর রহমান, মাওলানা ফজলে মাহমুদ, মাওলানা মুহাম্মদ মিয়া, মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিদ্দিকি, মাওলানা মাহমুদুল হাসান, মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (রহঃ) মাওলানা আলী প্রভৃতি অনেকে। উবাইদুল্লাহ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা হয়েছে। এখন সামান্য একটু করে বর্ণনা দিলেও অনেক কিছুই বলতে হয় তবুও বলা যায় মাওলানা মাহমুদুল হাসানের (রহঃ) নিজের এবং তাঁর ছাত্র ও শিষ্য মাওলানা হুসাইন আহমদ (রহঃ) ভারতের জন্য জেল খেটেছেন, অনেকের মত পুতুল খেলার মত নয়, দস্তুরমত লড়াই করে বা জনতাকে লড়াই করতে উদ্বুদ্ধ করে। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের কথা প্রচলিত ইতিহাসে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় কিন্তু তার গোড়াপত্তন করেছিলেন, তিনি হচ্ছেন হযরত হুসাইন আহমদ। অসহযোগের জন্য তিনি একটি বিখ্যাত পুস্তক লিখেছিলেন যেটির নাম ‘রোসালাতে তরকে মুআলাত’ সারা ভারতে তা এত জনপ্রিয়তা ও মনপ্রিয়তা অর্জন করে যাতে ইংরেজ খুব ভীত হয়ে পড়ে এবং সেই বইটি বাজেয়াপ্ত হয়।

(দ্রঃ হায়াতে মদনী, পৃঃ ১২৮, মাওলানা মহীউদ্দিন খান ও মাওলানা মুহাম্মদ সফিউল্লাহ।)

১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে ১২ই মার্চ পর্যন্ত তাঁদের কষ্টদায়ক জেলে থাকতে হয়। সে সিদ্ধ লেটার বা ‘রেশমী চিঠির’ ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনেক বেশী যদিও চলতি ইতিহাসে তার স্থান নেই। মাওলানা উবাইদুল্লাহ দেওবন্দ মাদরাসা হতে মাওলানা হয়ে মাওলানা মাহমুদুল হাসানকে প্রথমে উদ্বুদ্ধ করেন এবং বিপ্লবে তাঁর মাদরাসার প্রত্যেক আলেমকে আবার আগের মত ব্যাপকভাবে যুদ্ধ করতে জানান। কাজ আরম্ভ হয় বটে কিন্তু মাদরাসা কর্তৃপক্ষ তাতে একটু বিব্রত মনে করেন। তবুও ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে মাওলানা হুসাইন আহমাদের ওস্তাদ মাওলানা মাহমুদুল হাসান সাহেব ১৮ই সেপ্টেম্বর ভারত ত্যাগ করে আরবের হেজাজে উপস্থিত হন। (দ্রঃ এ, পৃঃ ১১৬-১১৭) তাঁরপর আরম্ভ হয় রেশমী চিঠির আন্দোলন। একটি হলুদ বর্ণের রেশমের কাপড়ে খুবই পরিষ্কার অক্ষরের লেখা চিঠি যেটি ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে ৯ই জুলাই তারিখে হায়দ্রাবাদের শাইখ আবদুর রহিমের নামে পাঠানো হয়। লেখক মাওলানা উবাইদুল্লাহ তাঁর সাথে মুহাম্মদ মিঞা আনসারীরও পত্র সংযুক্ত ছিল। পত্রে ছিল তুর্কি ও জার্মানদের আগমনের কথা, জার্মানদের প্রত্যাগমন, গালেবনামার প্রচার, খোদায়ী যোদ্ধা বাহিনীর পরিকল্পনা এবং মদীনা, কাবুল, তেহরান প্রভৃতি নানা স্থানে কেন্দ্র স্থাপনের কথা।

“১৯২১ খ্রিষ্টাব্দের ৮, ৯ ও ১০ জুলাই করাচীতে ‘নিখিল ভারত বিখালত কমিটির’ সম্মেলন আহ্বান করা হইল। সম্মেলনে মদানী এই মর্মে এক প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন যে, ‘বর্তমান পরিস্থিতিতে যে কোন মুসলমানের পক্ষে ব্রিটিশ সৈন্য বাহিনীতে চাকুরী করা বা চাকুরী করিতে উৎসাহিত করা সম্পূর্ণ হারাম (বা অবৈধ) এবং প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে কর্তব্য হইল ব্রিটিশ সৈন্য বাহিনীর প্রত্যেকটি মুসলিম সৈনিকের নিকট এই কথা পৌছাইয়া দেয়া।’ ব্রিটিশ সরকার মাওলানার এই প্রস্তাবকে প্রকাশ্য রাষ্ট্রদ্রোহিতা বলিয়া ঘোষণা করে এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০, ১৩১ ও ৫০৫ ধারা মূতাবেক মাওলানা মদনী, মাওলানা মুহাম্মদ আলি জওহর, মাওলানা শওকত আলি, ডক্টর সাইফুদ্দিন কিচলু, কানপুরের মাওলানা নিসার আহমদ, পীর গোলাম মুজাদ্দিদ সিদ্দী ও স্বামী শঙ্করাচার্যের বিরুদ্ধে এক মোকদ্দমা দায়ের করে।”

(দ্রঃ এ, পৃঃ ১৩৪)

এ মামলায় শ্রেয়ে আসামীরা কোন উকিল নিযুক্ত করেন নাই, নিজেরাই বক্তব্য রেখেছিলেন নিজেদের। কয়েকদিন ধরে শুনারী চলেছিল। বক্তৃতার ভিতর মদনী সাহেবের ও মুহাম্মদ আলীর বক্তৃতা এত উল্লেখযোগ্য ছিল যে তা ভারতের ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্য তালিকা হওয়া লাভজনক।

মদনী সাহেব কুরআন, হাদীস, আইন, ইতিহাস সম্বলিত বিরাট বক্তব্য রেখেছিলেন যার শেষ কথা হচ্ছে এ “ভারতের তেত্রিশ কোটি হিন্দুকেও অনুরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। অবশ্য আমি মুসলমানদের পক্ষে ইংরেজ সরকারকে সতর্ক করে দিতে পারি যে যদি সরকার ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে দিতে পারি যে যদি সরকার ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে তাহলে মুসলমান গণ ধর্মের খাতিরে জীবন উৎসর্গ করতে কিছুমাত্র চিন্তা করবে না এবং আমিই সকলের আগে জীবন দিতে প্রস্তুত।

ইংরেজ জাতির সেদিন হৃদকম্প হল যে স্যার সৈয়দ আহমদ অর্থাৎ নয়া আহমদ দ্বারা মুসলমানদের যেভাবে ঘোরানো হয়েছিল আবার মাওলানা মুহাম্মদ আলি ও মাওলানা মদনীর ভূমিকা তা উল্টে পাল্টে দিল। যাই হোক ১৯২১ সালে ১লা নভেম্বর আসামীদের ৫০৫ ও ১০৯ ধারা মতে দু বছর করে জেল নির্ধারিত হয়।

তারপর থেকেই মুসলমান জাতি সমবেতভাবে আবারও ইংরেজ বিরোধী হয়ে উঠে। আগেই বলা হয়েছিল ইংরেজকে মুসলমানদের সমর্থন ছিল সাময়িক লোক দেখানো মাত্র।

আমাদের উপরোক্ত আলোচনায় এ মনে করার কারণ নেই যে হিন্দুদের কোন অবদান স্বাধীনতার ক্ষেত্রে নেই। বরং অনেকে তাঁরা গান্ধীজীর অহিংস নীতিকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে অস্ত্র হাতে লড়াই করেছিলেন তাই তাঁদের উপর আমাদের ইতিহাস খুব রাগান্বিত।

১৯৪২ সালে ব্যাপকভাবে হিন্দু বিপ্লবী যারা বুঝলেন সে পথই একমাত্র পথ ইংরেজকে তাড়ানোর, তা হল পূর্ণ অসহযোগ এবং অস্ত্র হাতে লড়াই করে দেশে অচল অবস্থার সৃষ্টি করা। ৯ই আগস্ট হতে লুট, অগ্নি সংযোগ সরকারি অফিস, রেল, টেলিগ্রাফ, পোস্ট অফিস, থানা সব কিছুর উপর হামলা চলল। সরকার সৈন্য ও পুলিশ তলব করে কিছুই সুবিধা করতে না পেরে ইষ্টার্ল রেল ওয়েজের সমস্ত ট্রেন বাতিল করল। ছাত্ররা দলে দলে মিছিল করে দেশকে কাঁপিয়ে তুলল “মাওলানা মুহাম্মদ আলী জিন্দাবাদ” আওয়াজও মিছিলে শোনা যেত। সৈন্যরা গুলি চালালে শ্রী বৈদ্য নাথ সেন ১৩ই দেশের জন্য প্রাণ দিলেন। ১৪ই ভবানীপুরে প্রচুর ছাত্র আহত ও দুজন নিহত হলেন। মওলবী ফজলুল হকের অবিভক্ত বঙ্গের মুখ্য তথ্য থেকে জানা যায় আগস্টে ২০ জন নিহত, ১৫২ জন আহত ও ৩৫০০ জন বন্দী হন।

সিনেমা হলে বড় লাটকে মারার জন্য বোমা ফাটানো হয় কিন্তু তিনি এ সিনেমায় আসেননি। পুলিশ ইনস্টেক্টর জেনারেলের বাড়ীতে আক্রমণ করা হয় এবং অনেক অস্ত্রশস্ত্র হাতে আসে।

(দ্রঃ Amrita Bazar Patrika Independence Number 1947 P 133-34, India in Revolt—Tarini Sankar P 29).

উত্তর ভারতে ১৫টি স্টেশন পুড়িয়ে দেয়া হয় ১০৪ আধপোড়া করা হয় এবং গুমাম, সরকারী ভবনগুলি প্রচুর পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ৬০, ২২৯ বন্দী হন এবং ৯৪০ জন পুলিশের গুলিতে শহীদ হন। আর আঠার হাজার বিপ্লবী আহত হন। যারা যুদ্ধ করেন নি সমর্থন করেছেন তাঁদের জরিমানা করা হয়। মোট টাকার পরিমাণ দু লক্ষ তেরাশি হাজার দুশ টাকা।

(দ্রঃ এ, ৩১)

২০শে আগস্ট বালিয়ার লোকেরা বালিয়াকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করে ছিটর নেতৃত্বে নতুন সরকার ঘোষণা করে। ২২শে ও ২৩শে সরকার সৈন্য নামায়, সৈন্যরা নির্বিচারে লুট ও গুলি বর্ষণ করে।

(দ্রঃ Nehru on Gandhi, 2-431)

২০শে গুলিতে মারা যান শ্রীমতি কনকলতা এবং মুকুন্দ কাকোতী। তুলেশ্বরী নামেও একটি কিশোরীও গুলিতে মারা যান। আরও নিহত হন ফুলেশ্বরী নামে এক বৃদ্ধা। আর প্রাণ দিলেন তনুরায়, বলুরাম ও শ্রীলক্ষ্মীরাম। ১৯৪৩ এ ১৬ জুন শ্রী কানওয়ারের ফাঁসী হয়। শ্রী কমলা জেলেই প্রহারে প্রাণ দিলেন। বিহারে ভাগলপুরে সৈন্যর সাথে সাধারণের লড়াই হয়। ২১৮ জন নিহত হন, ২৮০ জন আহত হন, পীরপত্নী ৩৩৭ জন নিহত ৬২ জন আহত, সুলতানগঞ্জে ৬৭ জন নিহত ও ১৫০ জন আহত, দ্বার ভাস্কর ৩৮ জন নিহত এবং শতাধিক লোক আহত হন (দ্রঃ অমৃত বাজারের ঐ স্বাধীনতা সংখ্যা)

মেদনীপুরের ৪২ সালে চারিদিকে বিপ্লবের অগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে উঠে। দু হাজার বাঙ্গালীর জনতা চীৎকার করে বলল ভারত হতে চাল ধান বয়ে যাওয়া চলবে না। চলবে না। পুলিশ গুলি চালায়। প্রচুর মানুষ মারা যায় মৃত দেহ গুলি তাদের আত্মীয়দের ফিরিয়ে না দিয়ে নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হয়।

শ্রী গঙ্গানারায়ণ চন্দ্র লিখেছেন, “হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে দলে দলে শোভা যাত্রায় চলেছেন তমলুকের দিকে।” বিরাট দল। আট হাজার লোককে শায়েস্তা করতে বহু পুলিশ ও বড় তেজী অফিসার মনোভ্রান্ত ব্যানার্জীকে পাঠানো হয়েছে। ব্যানার্জীর আদেশে লাঠি চার্ঘ আরম্ভ হয়। বহুলোক আহত হন অনেকে মারা যান তার মধ্যে আহত অবস্থায় রামচন্দ্রবেরা বুকে হেঁটে থানায় গিয়ে বলেন ‘থানা দখল করেছে’ বলেই শেষ নিঃশ্বাস ফেললেন। এমনিভাবে প্রাণ দান করেছেন লক্ষ্মীনারায়ণ দাস, মাতঙ্গিনী হাজরা, শ্রী নিরঞ্জন জানা, পূর্ণচন্দ্র মাইতি। ২২শে সেপ্টেম্বর প্রাণ দিলেন শ্রী যামিনীকান্ত, অনন্ত কুমার, ভজহরি, শ্রী চৈতন্য, সর্বেশ্বর প্রামাণিক ও রামপ্রসাদ, শশী ভূষণ মান্না, সুরেন্দ্রনাথ কর, ধীরেন্দ্রনাথ দিড়াবেরা। ২৭শে নন্দীগ্রাম থানায় প্রাণ দিলেন বীরেন্দ্র মণ্ডল, ভানুরানা, ভূতনাথ সাহু ও গোবিন্দ দাস। মহীষাদল থানায় প্রাণ দিলেন ভোলানাথ মাইতি, হরিচরণ দাস, আশুতোষ কুইলা, সুধীর হাজরা, পঞ্চানন দাস, রাখাল চন্দ্র সামন্ত ক্ষুদিরাম বেরা প্রভৃতি বীর কেশর কুমারী বন্দ। কেশপুর থানায় মারা গেলেন শ্রীমতি শশীবালা, রামকৃষ্ণ ঘোষ আরও অনেকে। অমূল্য মাসমল, সুধীর মাইতি, কৈদার নাথ জানা, মুচিরাম দাস, ভগীরথ রথ, মুরারী মোহন বেরা, বিপিন মণ্ডল, চন্দ্রমোহন দিন্দা, হরেকৃষ্ণ ধর। ভগবানপুর থানায় প্রাণ দেন যুধিষ্ঠির, বিভূতি দাস, জগন্নাথ পাত্র, নাথচন্দ্র প্রধান, হরিচরণ, রামকান্ত, রঘুনাথ পরেশ চন্দ্র, কৃষ্ণমোহন চক্রবর্তী, শ্রী ভূষণ ও ধীরেন্দ্রনাথ দাস পাঠ প্রভৃতি।

হাসপাতালে রোগীদের রোগীনিদের সম্পূর্ণ উলঙ্গ ও মেয়েদের ব্লাউজ ও গেঞ্জি খুলে সায়া তুলে দাঁড়াতে হত এবং এভাবে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হত। সরকারকে অনেক আবেদন নিবেদন করা হয়। কিন্তু অবশেষে মুসলমান নারীদের জন্য শুধু এ আইন রদ হয়। কারণ সমস্ত মুসলমান তার জন্য প্রাণ দেয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল। (দ্রঃ অবিস্মরণীয় পৃঃ ৩০)

শ্রী দামোদরের ফাঁসী হয় ১৮ই এপ্রিল। বালকৃষ্ণেরও ৮ই মার্চ ফাঁসী হয়। (দ্রঃ Kali Charan Ghosh, The Roll of Honour p 45) ৮ই মে বাসুদেব ও রানাডের প্রাণ দণ্ড হয়।

১৯৪২ এ ৯ই নভেম্বর “হাজারী বাগ সেন্ট্রাল জেল থেকে পালালেন ৯ জন তার মধ্যে ছিলেন স্যোসালিষ্ট নেতা শ্রী জয় প্রকাশ নারায়ণ।” “কংগ্রেস স্যোসালিষ্ট দল (গান্ধীর) অহিংসা নীতিতে বিশ্বাসী নয় তা, প্রমাণ হয়ে গেল।” (দ্রঃ গঙ্গানারায়ণ চন্দ্র, পৃঃ ৮৮-৮৯) এমনিভাবে অলিখিত অনেক তথ্য লুকিয়ে আছে বিস্মৃতির অতল তলে।

জহরলাল দুঃখ করে বলেছিলেন, “তারা গত কুড়ি বছর ধরে যে অহিংস নীতি প্রচার করে এলেন এক দিনেই ভুলে গেল তার প্রভাব।” (অবিস্মরণীয় ২য় খণ্ড, পৃঃ ৭০)

“কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ অবশ্য স্বীকার করেছিলেন যে ১৯৪২ সালের আন্দোলনে কংগ্রেসের সম্পর্ক বা যোগাযোগ ছিলনা।” (দ্রঃ ঐ)

প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলনে হযরত মুজাফ্ফের আলফেসানী জীবন্ত পরিকল্পনায় যিনি প্রথমে এগিয়ে এলেন তিনি হচ্ছেন স্বাধীন ভারতের প্রকৃত জনক মাওলানা শাহ ওলিউল্লাহ মাওলানা আবদুল কাদের (পুত্র) মাওলানা আবদুল আজিজ, (পুত্র) মাওলানা আবদুল গনি (পুত্র), মাওলানা আবদুল হাই, (জামাতা) মাওলানা মাখসুসুল্লাহ, (ভাইপো) মাওলানা ইসমাইল (ভাইপো) মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক, (নাতি) মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব, (নাতি) মাওলানা সৈয়দ আহমদ বেরলবী, মাওলানা হোসেন আহমদ মালিহাবাদী, মাওলানা হাসান আলী, (লাখল্লো) মাওলানা সদরুদ্দিন, জনাব গোলাম আলী, মাওলানা বশিরুদ্দিন ও মাওলানা করীমুল্লাহ প্রভৃতির নাম যেমন স্বর্ণময় ইতিহাস তেমনি শেষের দিকেও মাওলানাদের অবদান উল্লেখযোগ্য সন্দেহ নেই। জনাবা বিআম্মা, গান্ধীজী ও নেহরুর সময়ও মাওলানা মওলুদী ও মুসলমানদের যথেষ্ট অবদানের মধ্যে মাওলানা শওকত আলী ও মাওলানা মুহাম্মদ আলীর নাম হঠাৎ নেতাদের অনেক উচ্চ বলে উচ্চ শ্রেণীর ঐতিহাসিকগণ মনে করেছেন।

১৯১৫ হতে ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর পর্যন্ত ভারতে ইংরেজ বিরোধী কর্মধারা এক রকম সাফল্য বিহীনই মনে হয়েছিল। মুসলমানরাও যেন একটু কিংকর্তব্যবিমূঢ়। সারা ভারতে বিপ্লবে ভাটা পড়ার প্রধান কারণ ভারতের সিংহ শাবক দুটি মাওলানা মুহাম্মদ আলী ও শওকত আলীকে সরকার কারাগারে বন্দী করে রেখেছিলেন।

১৯১৭ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন। কলকাতার অনুষ্ঠিত হয় তখন বোরখা পরিহিতা একটি মুসলমান নারী সভায় প্রবেশ করলেন। সভাপতি ব্যবহারজীবী বৈকুণ্ঠ সেনকে বিদূষী রমনী পরিচয় দিলেন তিনি আলী ভাতাদের আম্মা বা মা, নাম বিআম্মা সাথে সাথে সভায় ‘আল্লাহ আকবার’ আওয়াজ করা হয় এবং কংগ্রেসিক জয় ধ্বনিতে সভা উত্তপ্ত হয়ে উঠে। এ সভায় ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, বিপিন পাল, বাল গঙ্গাধরতিলক, মদনমোহন মালব্য, সত্যমূর্তী, চিত্তরঞ্জন দাস, ফজলুল হক, গান্ধীজী ও জিন্নাহ।

বিআম্মা তাঁর স্বল্প বচনে জানালেন মেয়েদের জাগ্রত হতে হবে। আর বলেন আমি পরকালে আমার ছেলেদের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করব যদি তারা সারাজীবন ইংরেজকে তাড়াবার জন্য লড়াই না করে। যদি সংগ্রাম না চালায় তাদেরকে আমার স্তন্য পান করানো অনায়াস হয়েছে বলে মনে করব। বিখ্যাত বীর আলি ভাতাদের বীরঙ্গনা মাতা বি-আম্মা ১৯২৪ সালে নভেম্বর দেহ ত্যাগ করেন।

মাওলানা শওকত আলী

বি-আম্মার পুত্র মাওলানা শওকত আলী ১৮৭৩ সালে ১৬ই মার্চ তারিখে রামপুরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে ২৭শে নভেম্বর দেহ ত্যাগ করেন। পিতার নাম ছিল আবদুল আলী সাহেব। তরুণ অবস্থায় তিনি কলোয়ার মারা যান। বিধবা বি-আম্মার বয়স মাত্র তখন ছিল সাতাশ বছর। মা এর প্রচেষ্টায় আলিগড় হতে বি, এ, পাশ করে যে চাকরী পেয়েছিলেন, দেশে আদর্শ স্থাপনের জন্য ১৯১১ সারে সে চাকুরীতে পদাঘাত করে পদত্যাগ করেন। তারপর পূর্ণভাবে রাজনীতিতে আত্মবিসর্জন দেন। ১৯১৫-তে তাঁর জেল হয় এবং তাঁকে মার্কক নামক স্থান হতে পরে চিন্দোদারায় স্থানান্তরিত করা হয়।

১৯২০ সালে গান্ধীর সাথে যোগাযোগ যুক্তি ও গোপন চুক্তি হয় দুই আলী ভাই এর সাথে। পরে গান্ধীজীর ব্যবহার ও ইংরেজ যেনা মনোভাবের জন্য গান্ধীজীর সাথে সম্পর্কচ্যুত হন। ১৯৩২ সালে ইয়র্ক মায়ারের এক মহিলাকে বিয়ে করেন। মাওলানা শওকত আলীর রাজনৈতিক ভূমিকা শুধু ভারতেই ছিলনা। ছিল আরব, পারস্য, প্যালেস্টাইন, মিশর, তুরস্ক প্রভৃতি বহু রাষ্ট্রে। তুরস্কের কামাল পাশার উন্নতি ও প্রশংসার মূলে আছেন আল্লাহ ভক্ত সূচতুর নেতা মাওলানা শওকত আলী। কারণ তুরস্কের সুলতানের পরিবারের সাথে ভারতের

হায়দ্রাবাদের রাজ পরিবারের যে বিবাহ সম্বন্ধ হয়েছিল তা ছিল তাঁরই পবিত্র কৌশল। তাই এঙ্গোলার প্রধানমন্ত্রী এসেছিলেন বলে, "Had there been on Ali Brothers in India, there would have no Kamal Pasha in Turkey". ভারতে আলী ভ্রাতৃত্বের জন্য না হলে তুরস্কে কামাল পাশার অভ্যুদয় সম্ভব হত না।

১৯৩২ সালে ইন্ডিয়ান মাইনরিটি প্যাক্ট তাঁরই অবদান। মৃত্যুর তিন ঘণ্টা পূর্বে যে সমস্ত পত্র লিখেছেন তাতে তাঁর জ্ঞান ও দেশপ্রেমের পরিচয় আরও সুগভীরভাবে অনুভব করা যায়।

মাওলানা মুহাম্মদ আলী

মাওলানা মুহাম্মদ আলী বি-আম্মার গর্ভে, মওলুবী আবদুর আলীর ঔরসে ১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দে রামপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মাওলানা শওকত আলীর সহোদর ভ্রাতা। দু বছর বয়সে পিতৃহারা হন। খেলাধুলায় ও পড়া শোনাতে খুবই দক্ষ ছিলেন তিনি। আলিগড় হতে পরীক্ষায় ভালভাবে উত্তীর্ণ হয়ে বিলেতে অক্সফোর্ডে গিয়ে পড়াশোনা শুরু করেন। সে সময়েই বিশ্ব বিখ্যাত অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মণ্ডলী এবং ছাত্র-ছাত্রীরা তাকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হন।

তিনিই ভারতের সর্ব প্রথম অক্সফোর্ড সোসাইটির সেক্রেটারী নির্ধারিত হন।

তিনিই কমরেড পত্রিকার মূল প্রাণ ছিলেন। তাঁর লেখায় সারা বিশ্বের বুদ্ধিজীবীরা চিন্তার খোরাক পেতেন। তাঁর কমরেড পত্রিকার গ্রাহক নানা দেশের রাজকীয় মহলে পর্যন্ত ছড়িয়ে গিয়েছিল যেমন জার্মানীর প্রিন্স, বুটেনের প্রধান মন্ত্রী প্রভৃতি। তখন বুটেনের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন মিঃ ম্যাকডোনাল্ড। তিনিও তাঁর প্রবন্ধ পড়ে বিশ্বয় প্রকাশ করতেন।

তিনি দেশে ফিরে এসেও তাঁর রাজনীতি অব্যাহত রাখেন। দুটি পত্রিকার পরিচালনা করতে থাকেন একটি "কমরেড" অপরটি "হামদাদ" ইত্যাকার স্বাধীনতার নায়ক তাঁদের শাসকের পক্ষ থেকে অত্যাচারীত্ব হতেই হবে। সেখানে উপাধি প্রাপ্তি আর ভোজ সভায় আমন্ত্রণ আর বিলেতে বেড়াতে যাবার নিমন্ত্রণ মেলে না। মাওলানা মুহাম্মদ আলীর উপর বারে বারে জেল দণ্ড দেয়া হয়েছিল। শুধু কি তাই? তাঁর পত্রিকা দুটিও বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। এবং প্রেসটি পর্যন্ত ধ্বংস করা হয়েছিল। বাড়ীতে পুলিশ দিয়ে আসবাবপত্র ভেঙ্গে চুরে তসনস করা হয়েছিল। বাড়ীর শিশুর ও নারীদের বাড়ী ছেড়ে প্রাণ ও ইজ্জতের খাতিরে পলায়ন করতে হয়েছিল।

তিনিও উপলব্ধি করেছিলেন মুসলমানদের স্বাধীনতা আন্দোলনের মার খাওয়ার প্রধান কারণ হিন্দুদের আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়ানো। তাই তিনি বড় বড় আলোচনার নিয়ে গোপনে পরামর্শ করলেন এবং জানালেন ভারতে হিন্দু জাতি বিরাট একটা শক্তি, তাকে বাদ দিয়ে স্বাধীনতা আনা যায় না। যদি তাঁরা দূরে আছেন তবুও তাঁদের কাজে লাগাতে একজন এমন নেতাকে নেতা বলে জয় ঢাক বাজাতে হবে যার ফলে হিন্দু জাতি তাঁর আহ্বানে দলে দলে আসতে পারবে। তিনি জানান যদি স্বাধীনতায় কাম্য তাহলে নেতৃত্বের সর্বোচ্চ আসনে যদি কাউকে বা হিন্দু নেতাকে বসাতে হয় তাতে হিংসা করা সঠিক হবে না। মুসলমানদের আন্দোলনে হিন্দুদের যোগ না দেয়ার অন্যতম কারণ। আন্দোলনটি পুরোপুরি ধর্মভিত্তিক ছিল তাতে বড় ভুল বোধহয় এটিই হয়েছিল হিন্দু ধর্মের সংরক্ষণের বা ধর্মের উন্নতির জন্য তাদের আহ্বান করা হয়নি। শেষে গান্ধীজীকেই বাছাই করা হয়। তাকে মহাত্মা উপাধির পোশাক পরানো হয় এবং সারা ভারতে তাঁর নাম প্রচার করে তাঁর অধীনস্থের মত মুসলিম নেতারা সভা সমিতি করে বেড়াতে থাকেন। তখনই সারা ভারতে হিন্দু জনগণ ইংরেজ বিরোধী হতে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠতে থাকে তাই মাওলানা মুহাম্মদ আলীর জন্য লেখক লিখেছেন, "কংগ্রেসকে কংগ্রেসে পরিণত করেছেন গান্ধীজীকে "মহাত্মা" বানিয়েছেন, দেশে স্বাধীনতার বীজ ফেলেছেন আর সিঁধন করেছেন বলিষ্ঠ বীরত্বের রাঙারক্ত। কঠিন পথের সর্ব বিপদ সহ্য

করেছেন, সরকারের সাথে সমান তারে লড়েছেন, কঠিন কারাগারকে জীবন্ত করেছেন জীবনের সর্ব প্রকার আরামকে হারাম করে কষ্টের জীবনই বেছে নিয়েছেন।" (দ্রঃ ইফাদাতে মুহাম্মদ আলী পৃঃ ১৪, ১৫, ১৯৪৫ সালে হায়দ্রাদে মুদ্রিত)

১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর বড় ভাই মাওলানা শওকত আলীই নিজের চাকুরী ইচ্ছা করে ছেড়ে দিয়ে জনসাধারণকে জানিয়েছেন সরকারের যারা শত্রু বলে দাবী করে তাদের সরকারী চাকুরী করা পাটির সংগঠনের জন্য মারাত্মক ক্ষতি। সে সময়েই আলী ভ্রাতাদের উত্তপ্ত ভাষণে মুগ্ধ হয়ে চিত্তরঞ্জন দাস নিজের স্বাধীন ব্যবসা, ব্যারিষ্টারী ছেড়ে দিতে উদ্বুদ্ধ হন যেহেতু ইংরেজ বিচারপতিদের সম্মুখে "My Lord" "আমার প্রভু বাহাদুর" বলার উপর ঘৃণ্য পোষণ করেন। চিত্তরঞ্জন দাস ও বি-আম্মা অর্থাৎ আলী ভ্রাতাদের মাকে "আম্মা" বলে ডাকতেন এবং বি-আম্মা বা আবিদা বেগমকে মা এর মতই শ্রদ্ধা করতেন।

এ ১৯১১ সালেই মুসলমানদের ইংরেজের বিরুদ্ধে পূর্বের মত সক্রিয় হবার জন্য একটি সমিতি সৃষ্টি করেন যেটির নাম আজ্ঞামানে খাদেমে কাবা। এটাই হচ্ছে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ প্যান ইসলামিক প্রতিষ্ঠান। (দ্রঃ মুহাম্মদী পত্রিকা, পৌষ, ১৩৪৫ সাল, আবদুল হাকিম পৃঃ ২৩০)

"যখন গান্ধীজী ভারতে আইন অমান্য ও সাইমন কমিশন বর্জন আন্দোলন আরম্ভ করিলেন তখন আলী ভ্রাতৃত্ব মোসলেম সম্প্রদায়ের গোলটেবিলে যোগদানের জন্য আন্দোলন আরম্ভ করিলেন।" উভয়ে ভারতীয় মোসলেম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি রূপে লণ্ডনে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের জন্য আহূত হন।" (দ্রঃ পৃঃ ২৩১) কংগ্রেসের ভিতর ব্রাহ্মণ্যবাদের গোড়ামী এত বেশী ছিল যার ফলে ভারতে অব্রাহ্মণ সম্প্রদায় নেতাদের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। মাওলানা মুহাম্মদ আলী সমস্ত অব্রাহ্মণ হিন্দুকেও স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট মদনমোহন মালব্য সম্বন্ধে একটি ঘটনাতে তার পরিচয়ের কিছু প্রমাণ পাওয়া ১৯৩৩ সালে যখন তিনি পেশওয়ার গিয়েছিলেন তখন সেখানকার একজন কংগ্রেস সদস্য তাকে খাওয়ানোর জন্য ব্যবস্থা করেন। "পণ্ডিত মালবীয়া যেহেতু ব্রাহ্মণ তাই তিনি সে পাত্র থেকে খেতে পারেন না, যে পাত্রে কখনো মাংস খাওয়া হয়েছে। তাই তাঁর নিমন্ত্রণকারী বাজার থেকে কিনে আনেন সম্পূর্ণ নূতন এক ডিনারসেট আর যেহেতু পণ্ডিতজী ছিলেন নিরামিষাশী তাই তাঁর নিমন্ত্রণকারী বাজার থেকে যোগাড় করলেন সর্বোৎকৃষ্ট ধরনের কলা ও কমলাদি। ডিনার টেবিলে প্রশ্ন উঠল তখন, তাকে প্রদত্ত এ সব ফল বাগান থেকে টেবিলে আসার মাঝখানে কোন মুসলমান বা অজ্ঞাত অস্পৃশ্য হিন্দু ছুয়েছে টুয়েছে কিনা?

দুর্ভাগ্যবশতঃ নিমন্ত্রণকারী সে হিন্দু কংগ্রেস সদস্য পণ্ডিতজীকে সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন নি। ফলে, নিমন্ত্রণকারীকে সাংঘাতিক রকমের বিব্রত করে দিয়ে পণ্ডিত মালবীয়া কিছু না খেয়েই ডিনার টেবিল থেকে উঠে যান।" (সে, এ, সিদ্দিকী বার এ্যাট, ল এর লেখা ভুলে যাওয়া ইতিহাস পৃঃ ৮৪) ১৯৩৩ সালে পর্যন্ত যদি এ মনোভাবের পরিমাণ হয় তাহলে সেখানে হিন্দু মুসলমান মিলন সেতু রচনা করা কত কঠিন। এ কঠিন কাজ করেছিলেন ভারত সিংহ মাওলানা মুহাম্মদ আলী।

জহরলালকে রাজনীতি মৌলিক শিক্ষার তালিম তিনিই দিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে গুরু বলে মেনে নিতে পারেন তিনি। মতিলালের জীবদ্দশায় জহরলাল কলকাতার কংগ্রেসের মিটিং এ মাওলানা মুহাম্মদ আলীর পরামর্শে স্বাধীনতার প্রস্তাব করতে চেয়েছিলেন কিন্তু মতিলাল তাকে থামিয়ে দিয়ে বসিয়ে দিয়েছিলেন। তখন মুহাম্মদ আলী রেগে সিংহ নিনাদে গর্জে উঠেছিলেন। তিনি 'নেহরুর জন্য বলতেন, "ফারসীতে একটা কথা আছে কুকুর হয়ে, ছোট ভাই হইও না.....জহরলালের বেলায় বলব.....বিড়াল হয়ে, তোমার বাবার পুত্র হইও না"। কারণ তাঁর পিতাই ১৯২৮ সালে কলকাতায় কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হিসেবে বেচারী জহরলালের কণ্ঠরোধ করে দিয়েছিলেন তখন, যখন পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য তিনি কথা বলতে

পারছিলেন। না তাঁর স্থলে আমি উঠে দাঁড়াই এবং প্রতিবাদ করি ডোমিনিয়ন স্টেটসের সে ধারায়।” (দ্রঃ ঐ, পৃঃ ১২৬) বার বার মাওলানা মুহম্মদ আলী হিন্দু মুসলমানের মিলনের চেষ্টা করেছেন কিন্তু ব্যর্থ হয়েছেন। গান্ধীজিকে মহাত্মা টাইটেল তিনিই দিয়েছিলেন। বিলেতে গোলটেবিল বৈঠকে জহরলাল, গান্ধী, মুহাম্মদ আলী প্রভৃতি নেতারা এবং ছয় কোটি হরিজনের নেতা ডঃ বি. আর. আম্বেদকর একত্রে বসে একটা মিলনের চেষ্টার সিদ্ধান্ত হয়েছিল কিন্তু সে সভায় গান্ধীজী ও জহরলাল হাজির হননি। মুহম্মদ আলী বিলেতে গিয়ে তাঁদের অনুপস্থিতিতে খুব দুঃখিত হন। ইংরেজরা তাদের চিরাচরিত স্বভাব অনুযায়ী মুহাম্মদ আলীকে বশ করার চেষ্টা করে, যেন তিনি পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী না করেন।

মাওলানা আগ থেকেই অসুস্থ ছিলেন। সারা ভারতে হিন্দু মুসলমানকে এক করবার জন্য তাঁকে শহর ও গ্রামে, গঞ্জে অগ্নিময় বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে হয়। তখন হতেই তাঁর মুখ দিয়ে রক্ত উঠতে থাকে। হিন্দু মুসলমান বন্ধু-বান্ধব ও ডাক্তারদের পরামর্শে দেশের খাতিরেই তাঁকে বিশ্রাম নিতে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু তিনি তা উপেক্ষা করে উত্তর দেন, “বিশ্রাম নেব স্বাধীনতা পাবার পর।” এ অবস্থাতেই লগুনে পৌঁছালেন। ইংরেজদের বৃকে বসে এ ১৯৩০ সালের ১৯শে নভেম্বর যে জ্বালাময়ী বক্তৃতা তিনি দিয়েছিলেন। তার জাতির জন্য মূল্যবান দলিল। “স্বাধীনতার আসল জিনিস নিয়ে যেতে পারলেই আমি আমার ভারতে ফিরে যেতে চাই অন্যথায়। “আমি এক গোলামের দেশে ফিরে যেতে চাই না।” (দ্রঃ ঐ) তিনি তাঁর ভাষণে জানিয়ে ছিলেন আমাদের হিন্দু মুসলমান সমস্যার সমাধান করা উচিত ছিল ভারতের মাটিতেই। কিন্তু “আমরা যাঁরা গান্ধীজির সাথে সকল অবস্থাতেই দশটি বছর কাজ করেছি আমরা তাঁকে এজন্য চাপ দিয়েছি। কিন্তু নিজেরও পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর হিন্দু জনপ্রিয়তা সংরক্ষণের মানসে সে মীমাংসা স্থগিত রেখেছেন। স্যার তেজ বাহাদুর সপ্র ও সনির্বন্ধ অনুরোধে ১৯২৮ সালের ডিসেম্বর কংগ্রেসে হিন্দু মুসলমানে বিভেদ মীমাংসার জন্য সর্বান্তকরণে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন।” (দ্রঃ ঐ, পৃঃ ১২১)

গান্ধীজির উপর অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ও খুশী ছিলেন না। কারণ তাদের নেতা ‘ছোট ঘরের ছেলে’ বলে এত শিক্ষিত হয়েও সম্মান পাননি তাই অনুন্নতদের নেতা। ডক্টর আম্বেদকর ১৯৩১ সালে ১লা জানুয়ারী লগুনে গোলটেবিল বৈঠকে বলেন, “প্রথম যে মন্তব্য রাখতে চায় তা হচ্ছে এটাই যে, আমরা নির্বাচিত শ্রেণীরা আমাদের ও হিন্দুদের মধ্যে সম্পূর্ণ বিভক্তি চাই। এটাই হচ্ছে প্রথম জিনিস। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের জন্য আমাদের বলা হয়েছে হিন্দু। কিন্তু সামাজিকভাবে কখনো হিন্দুদের দ্বারা আমরা তাদের ভাই হিসেবে স্বীকৃত হইনি।” (দ্রঃ ঐ, পৃঃ ১২৩) গান্ধীজী আম্বেদকরকে বলেছিলেন, “আমাদেরকে বিশ্বাস করুন, বিশ্বাস করুন বর্ণ হিন্দুদেরকে”—উত্তরে ডক্টর শ্রী আম্বেদকর বলেন, “আমরা আপনাদের বিশ্বাস করব না, কারণ আপনারা আমাদের বংশগত শত্রু।” (দ্রঃ ঐ পৃঃ ১১২) ঐ পরিস্থিতিতে ভারতীয় কোন্ডল কলহকে সুযোগ মনে না করে মুহাম্মদ আলী বীরদর্পে অসুস্থ শরীরে বক্তৃতা দিচ্ছেন। আর ইংরেজদের কলিজাতে আগুন ধরিয়ে চলেছেন সে সময়।

যখন ইংরেজের তরফ থেকে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল ধর্ম আলাদা ও রাজনীতি আলাদা শিক্ষিত বিশ্ববরেন্য মানুষরা তো তাই বলেন। আপনার মতামত কি? উত্তরে মুহম্মদ আলী বলেছিলেন, “ধর্ম সম্বন্ধে আপনাদের যে ধারণা তা ভুল হবে যদি রাজনীতিকে এর বাইরে বাইরে রাখেন। এটা ইসলাম মতবাদের গোড়ামী নয়। নয় কোন ধর্মাচরণ পদ্ধতি। আমার মতে ধর্মের অর্থ জীবনের ব্যাখ্যা। আল্লাহর নির্দেশই আমি প্রথমতঃ একজন মুসলিম দ্বিতীয়তঃ একজন মুসলিম শেষতঃ একজন মুসলিম এবং একজন মুসলিম ছাড়া আমি অন্য কিছুই নেই। কিন্তু ভারতবর্ষের কথা যেখানে, যেখানে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রশ্ন জড়িত, জড়িত যেখানে ভারতবর্ষের কল্যাণের প্রশ্ন, সেখানে প্রথমতঃ আমি ভারতীয়, দ্বিতীয়তঃ আমি ভারতীয়, শেষতঃ আমি একজন ভারতীয় এবং একজন ভারতীয় ছাড়া অন্য কিছু নেই।

যখন তাঁকে অসুস্থতার কথা রক্তক্ষরণের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয় তখনও তিনি বলছেন—বিদেশেও আমি মৃত্যুকে শ্রেয়তর মনে করব যতক্ষণ সে বিদেশ থাকবে এক মুক্ত দেশ। আর যদি আপনারা আমাদের ভারতবর্ষের স্বাধীনতা না দেন তাহলে আপনাদের এখানে দিতে হবে এক কবর।”

সে বিরাট বক্তৃতা দিতে দিতেই তিনি বুঝতে পারলেন তাঁর মৃত্যু সম্মুখে। তাই তিনি তাঁর মৃতদেহ ভারতে নিয়ে যেতে মৃত্যুর আগেই নিষেধ করেছিলেন। হলও তাই ১৯৩১ সালে ৩রা জানুয়ারী ভারতের স্বাধীনতা ইতিহাসের সিংহ ভ্রাতা মাওলানা মুহাম্মদ আলী প্রাণ ত্যাগ করলেন। ইন্সলিগ্লাহ।

তাঁর মৃতদেহে আর ভারতে এল না বহু নবীর জন্মস্থান জেরুজালেমে তাঁর কবর হয়। এ সংবাদ ভারতে যখন পৌঁছায় কোটি কোটি ভারতবাসী শোকাহত কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। চিৎকার করে মুহম্মদ আলী কি জয় স্লোগান দেয়। কংগ্রেসের পোশাক মোটা খদ্দর চোপত পাজামা শেরওয়ানি গলাবন্ধ করা কোর্টে এ ইসলামী পোশাক আজও মনে করিয়ে দেয় অতীতের মুসলমান নেতাদের পরিচ্ছদের প্রতীকের কথা।

কংগ্রেস ও লীগ সম্বন্ধে যা কিছু বলা হয়েছে তা পুরানো ঘটনার ইতিহাসের ইতিহাস পরে বা আগামীতে তা ভিন্ন প্রকার ভিন্ন দৃশ্য হয়েছে আরও হবে হয়ত। হয়ত আরও মন্দ কিংবা আরও ভাল।

শেষের কথা

আমরা শুধুমাত্র ভারতের ইতিহাসেই দেখলাম যেখানে মুসলমানদের গভীর ধার্মিকতা, দাড়ি, টুপি, পোশাক, পরিচ্ছদে ভাল মুসলমান, তাঁদের করা হয়েছে বিকৃত আর যাঁরা ইসলাম ধর্মকে অবজ্ঞা আর অনাদর করেছেন মুসলমান হয়েও অমুসলমানদের মত নিজেকে যত বেশী হারিয়েছেন তাঁরাই ইতিহাসে সম্মানের আসনে গৃহীত। মুসলমান জাতি এবং কমিউনিস্টদের বিপ্লবাত্মক ইতিহাসের বিকৃতি ঘটানো হয়েছে। আরও দেখল মুসলমান ছাত্ররা ভারতের বাইরে স্বাধীনতার জন্য গিয়ে তারা বেশীর ভাগ আর মুসলমান হয়ে ফিরে এলেন না, এলেন কমিউনিস্ট হয়ে।

তার কারণ হচ্ছে এটাই, শুধু ডিগ্রি, জ্ঞান-বুদ্ধি আর ধর্মীয় যোশাই সব নয় পবিত্র কুরআন আর হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর আদর্শ সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় জ্ঞান এবং তাতে রুচিশীল না হওয়া পর্যন্ত কাঁচা অবস্থায় শিক্ষা সংগ্রাম বা রাজনীতি সংগ্রামের গভীর জঙ্গলে কাউকে ছেড়ে দিলে তাকে ফিরে না পাবার সম্ভাবনাই বেশী।

ভারতে ধর্মের ভগ্নমীর রাজত্বে ভারতীয় মুসলমানদের মেরুদণ্ড সোজা করে যাঁরা দাঁড় করাতে চান তাঁদের কারো ধারণা জাতির উচ্চ ইংরেজী শিক্ষা করা রাজনীতি শিক্ষায় সচেতন হওয়া, ইতিহাসে সচেতন হওয়া, মাদরাসা মজব করে মওলুবী হাফেয সৃষ্টি করা, পত্রিকার মারফত জনমত গঠন করা, অর্থনৈতিক উন্নতি করা সমিতি ও সংস্থা সৃষ্টি করা, ধর্মীয় ফাও তৈরীকরা প্রভৃতি একটি অঙ্গ সতেজ করতেই তাঁরা বদ্ধ পরিকর। যদিও প্রত্যেকটির প্রয়োজন কিন্তু আমাদের মতে সবগুলোর দরকার স্বীকার করলেও সর্ব প্রথমে প্রয়োজন সর্ব প্রকার সর্ব শ্রেণীর মুসলমান সম্পূর্ণ জনসাধারণকে যেমন করে হোক ন্যূনতম প্রয়োজনীয় ধর্মীয় জ্ঞান দান আর কুরআন ও হাদীসের আদেশের অনুকূলে জীবন গঠন করার ব্যবস্থা সর্বাত্মক প্রয়োজন। সে কাজ শুধু ভারতে নয় সারা বিশ্বে এক সাথে প্রায় প্রত্যেকটি রাষ্ট্রে যাঁরা কাজ করেছেন তাঁরা হচ্ছেন তবলীগ জামাতের মুবাঙ্লিগগণ। তার ফলে একদিন আদর্শ রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রী, এম, এল, এ, ব্যারিস্টার, ডাক্তার, অধ্যাপক, কেরাণী, শ্রমিক, ধনী ও দরিদ্র প্রত্যেকে নিখুঁত হয়ে উঠছে বা উঠবে বিন্দু বিন্দু মানুষ শুদ্ধ হয়ে একদিন মহা সিন্ধু ও সমুদ্রে পরিণত হবে সেদিন সুদূরে নয় অদূরেই।

বিদায় বেলায় বলি। মানুষ প্রায় মিথ্যাবাদী, মিথ্যাবাদী ঐতিহাসিকদের ইতিহাস ও মিথ্যাবাদী হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তাই সত্যবাদিতাই হচ্ছে ইতিহাস সৃষ্টির প্রাণ। ঐতিহাসিকগণ যা লিখে যান পরে পরবর্তীগণ তার পরিবর্তন ঘটায়। প্রকৃত সত্য ইতিহাস সত্যবাদীদের কাছ হতেই পাওয়া যায়। তাই পবিত্র কুরআন কেন্দ্রীক বই ‘পুস্তক সম্রাট’ এ তার আলোচনা করা হয়েছে। তা আল্লাহর বাণী, তার কথাই স্বতন্ত্র। যে কোন যুগের যে কোন জাতির জন্য যে সমস্ত স্রষ্টা বাণীগ্রন্থ হিসেবে হয়েছে সেগুলো সবই নির্ভেজাল। মানুষের সৃষ্টি করা বাণী সংকলনে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর বাণী “হাদিস যেভাবে সত্য ও নির্ভেজাল রাখা হয়েছে তা অত্যন্ত চর্যের ও উপরে।”

হযরত ওসমান গনির (রঃ) সময় কিছু শয়তান শ্রেণীর মানুষ হাদীসে ভেজাল প্রদান করতে চেষ্টা করে। সর্বপ্রথমে এ কর্মের কুখ্যাত কর্মী ছিল আবদুল্লাহ-বিন-সাবা। হযরত আলী (রাঃ) তার প্রাণদণ্ড দেন। তারপর মনসুর আব্বাসী তাঁর খেলাফত কালে মুহাম্মদ নামে হাদীস ভেজাল দেওয়ার কারণে তাকে ফাঁসী দিয়েছিলেন তার বাবার নাম ছিল সাঈদ মাসলুম। এমনিভাবে গভর্ণর খালেদ জুবাইকের কুপুত্র বয়ানকে হাদীসে মিথ্যা মেশানর অপরাধে প্রাণ দণ্ড দেন।

এমনিভাবে মুহাম্মদ বিন সুলাইমান আওয়াজের কুপুত্র আবদুল করিমকে হাদীসে ভেজাল দেয়ার অপচেষ্টার প্রমাণিত অপরাধে প্রাণদণ্ড দেন। যার মধ্যে পূণভাবে “হযরত” হাদীসাদি পূর্ণভাবে স্মরণ রাখার ক্ষমতা থাকে এবং পূর্ণভাবে সমীক্ষা শক্তি ন্যায় নীতি থাকে তাঁকে ‘ফেকাহ’ বলে। যাতে ভবিষ্যতে হাদীসে কেউ ভেজাল দিতে না পারে, এ আর ভেজাল দেয়া হাদীস চম্বুকের মত ধরা যায় তার জন্য ‘কিতাবুস সেকাত’ নামে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য চারটি গ্রন্থ আছে লেখক যথাক্রমে আজালী হাফেয, আহমদ বিন আবদুল্লাহ ২৬১ আরবী সনে।

আবু হাতেম বুস্তি, মোহাম্মদ বিন হিব্বান ৩৫৪ আরবী সনে। ইবনে শাহীন, আবু হাফস ওমর ইবনে শাহনী ৩৮৫ আরবী সনে। জয়নুদ্দিন কাসেম বিন কোতলুবাগা ৮৭৯ আরবী সনে।

তাছাড়া এ রকম ধরনের গ্রন্থ “তাবাকাতুল হোফফাজ” একই নামে সাতখানি গ্রন্থ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ৫৪৬ হিজরী সনে লিখেছেন ইবনে দাব্বাগ। ৬১৬-তে লিখেছেন ইবনে মোফাজ্জাল মাকদেসী। ৮৫২-তে লিখেছেন হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী। ৯১১-তে লিখেছেন জালালুদ্দিন সুয়তী তারপর আরও দুজন লেখক এ লিখেছেন প্রথমে তকীউদ্দিন ইবনে ফাহাদ ও ২য় লেখক মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ হাশেমী। ৭৪৮ আরবী সনে লিখেছেন ইমাম জাহবী শামুদ্দিন অবশ্য এঁর গ্রন্থটি একই বিষয়ের উপর হলেও নামটি হচ্ছে “তাককেরাতুল হোফফাজ”।

তাঁর যারা হাদীস বর্ণনা করেছেন অথচ তাঁদের বর্ণনা দুর্বল তাকে আরবীতে ‘জয়ীফ’ বলা হয়। এ জয়ীফ সম্বন্ধে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে দশটি যেমন ‘কিতাবুল জুআফা’, লেখক ইমাম বুখারী। এ একই নামে আরও নয়টি গ্রন্থ নয়জন লেখক লিখেছেন যথাক্রমে ইমাম নাসায়ী, ওয়াকাইলী মোহাম্মদ বিন আমর, ইবনে হিব্বান বুস্তী, আবু আহমাদ, ইমাম দারা কুতনী, হাকেম আবু আবদুল্লাহ, ইমাম ইবনুল জাওজী, ইমাম হাসান সাগানী, আর এ রকম আর একটি গ্রন্থ মিজানুল-এ-তেদাল লিখেছেন ইমাম জাহবী (রহঃ) প্রভৃতি প্রখ্যাত হাদীসবিদগণ।

হযরত মুহাম্মদের (সাঃ) প্রাণপ্রিয় সঙ্গীদের সাহাবা বলা হয়। প্রত্যেক সাহাবীর এ বৈশিষ্ট্য ছিল হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সম্বন্ধে কোনদিন কোন প্রকারে ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ মিথ্যা বলেননি। হাদীস সম্বন্ধে এত সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে যে একটি বর্ণ পর্যন্ত কেউ পরিবর্তন করার কল্পনা করেননি কারণ হাদিসের মধ্যে আছে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন যে, “যে ইচ্ছে করে আমার নামে মিথ্যা হাদীস রচনা করেছে সে যেন তার স্থান জাহান্নাম তৈরী করেছে। (ইসবাহ ৪/২০৬ পৃঃ)

মুসলমান সেজে মুসলমানের নাম নিয়ে যারা যারা হাদীসে ভেজাল দেয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে তার কারণ হাদীসবিদদের অব্যর্থ তিষ্ণ সংরক্ষণশীলতা।

যত নকল হাদীস প্রচলিত হতে গিয়েছিল তারও তালিকা তৈরী হয়ে বহু পুস্তক পুস্তিকাও তৈরী করা হয়েছে। যথা আল-মওজুয়াতে অর্থাৎ বাতিল বর্ণনামালা, আদদুররুল মুলতাকাত, অর্থাৎ (নির্বাচিত মতি। কিতাবুল কিতাবুল আবাতীল অর্থাৎ (বর্ণনা বর্জন পুস্তক) আলমাওজুয়াত (লেখক ইবনে আবদুল বার) অর্থাৎ বাতিল বর্ণনামালা। আলমুগনী অর্থাৎ (যথেষ্ট পুস্তক) আল-লায়ালিউল মাছনুআহ অর্থাৎ (নকল মতি) আদদুররুল মুনতামেরাহ অর্থাৎ (ছড়ানো মতি) আলমাওজুয়াত (লেখক ইবনুল কিরানী) অর্থাৎ বাতিল বর্ণনামালা, আলমাকাসিদুল হাসানাহ অর্থাৎ (শুভ কামনা) আলমাওজুয়াত (লেখক মোল্লা আলী কারী) অর্থাৎ (বাতিল বর্ণনা মালা) ভামজীদুত্ তইয়েব অর্থাৎ (পবিত্র প্রকাশ) আলকাওয়ায়েদুল মাজমুআহ অর্থাৎ (কল্যাণ ভাণ্ডার) আল-আসারুল মারফুআহ অর্থাৎ (প্রমাণিত হাদীসসমূহ) আল কলামুলমারফুয় অর্থাৎ (প্রমাণিত বাণী) ইত্যাদি। এমনিভাবে পৃথিবীর আর কোন ইতিহাস গ্রন্থ এভাবে সংরক্ষিত হয়েছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না।

সব শেষে বলা যায় যে, কোন ইতিহাস মিথ্যা হতে পারে এ ‘ইতিহাসের ইতিহাস’ ও মিথ্যা হতে পারে কিন্তু হযরত মুহাম্মদের (সাঃ) সহীহ হাদীসের একটি বর্ণও নকল নয়। অতএব প্রকৃত ইতিহাসের ইতিহাস ওটাই।

যেদিন ভারতে রবিরারের পরিবর্তে শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটির দিন বলে বিবেচিত হবে সেদিন চরম কর্তব্য পরায়ণতার নিদর্শনের বিকাশ প্রমাণ করবে মুসলমান জাতির প্রকৃত মর্যাদা। যেদিন ভারত হতে মিথ্যার কাসুন্দি তৈরীর নামান্তর ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখা আইন করে বন্ধ হবে, যেদিন শহর-গঞ্জে গ্রামে ঐতিহাসিক উপন্যাসের বিভেদ ও বিদ্বেষের বীজবপন যাত্রা থিয়েটার বন্ধ হবে সেদিন ভারতের চরম সীমায় উন্নতির প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ পরিলক্ষিত হবে। বে-মুসলমান জাতি জ্ঞান-বিজ্ঞান, স্থাপত্যে ভাস্কর্যে বীরত্বে, রসায়নে ভূগোলে, খগোলে, চিকিৎসায়, সাহিত্যে আবিষ্কার ও সৃষ্টিতে সারাবিশ্ব তথা ভারতকে পথ দেখিয়েছে তাদের সর্বমোট পরিচিতি শুধু ভারতেই নয় সরাবিশ্বে আছে তার বিস্তার ও প্রমাণিত প্রকাশ।

ভারতের মুসলমান যদি কোন প্রকারে ধ্বংসই হয়ে যায় তবুও বহু রাষ্ট্রই রয়েছে যেগুলো মুসলিম রাষ্ট্র, যেখানে বেঁচে আছে কোটি কোটি মুসলমান যথা-ইন্দোনেশিয়া, মালেশিয়া, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ইরান, ইরাক, সিরিয়া লেবানন, জর্ডান, কুয়েত, সউদী আরব, ইয়ামেন, বাহরাইনে, দক্ষিণ ইয়ামেন, কাতার, আবুধাবি, আজমান, দুবাই, ফুজাইয়্যা, বাস আলখিমা, সারজা, উমমাল কুইউন, মিশর, সুদান, লিবিয়া, তিউনেশিয়া, আল-জিরিয়া, মরক্কো, মৌরী তানিয়া, সেনেগাল, মালি, গিনি, নাইজার, নাইজেরিয়া, চাদ, সোমালিয়া, সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক, আইভরিকোষ্ট, ভাহোমি, সিয়েরালিওন, গামিয়া, উগান্ডা, আল-বানিয়া, পূর্ব তুর্কীস্থান, ইতিওপিয়া, তানজানিয়া প্রভৃতি প্রচুর মুসলমান রাষ্ট্র বিদ্যমান। তাছাড়া যে রাষ্ট্র মুসলমান রাষ্ট্র নয়, সেখানে মুসলমান প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান

যেমন মরিসাস, ভারতবর্ষ, সাইপ্রাস, প্যালেষ্টাইন, বার্মা, রাশিয়া, থাইল্যান্ড ইন্দোচীন, ও সিংহল রাষ্ট্রেও মুসলমান কোথাও প্রচুর কোথাও অপ্রচুরভাবে বিদ্যমান। এ কথা মনে রেখে সমস্যার সমাধান যদি করা হত তাহলে ভারতের বুকে শানিত কৃপান চালনা করে ত্রিখণ্ডিত করার প্রয়োজন হতনা। সকলে মিলেমিশে প্রত্যেক স্ব-স্ব স্বাতন্ত্র্য সংস্কৃতি বজায় রেখে শান্তিতে বাস করতে পারত। মুসলমান জাতিকে প্রকৃত মর্যাদা দেয়ার ব্যাপারেই 'যাঁরাই' কথা বলেছেন তাঁদেরই ঘৃণা ভরে উপেক্ষা করা হয়েছে নতুবা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ধামা চাপা দেয়া হয়েছে। তাই সব সব শেষে ভারত বিখ্যাত একজন নেতার উদ্ধৃতি দিয়েই তা প্রমাণ করা যায়।

(ক) “খিলাফত উপলক্ষে মুসলমান নিজের মসজিদে এবং অন্যত্র হিন্দুকে যত আছে টেনেছে, হিন্দু মুসলমানকে তত কাছে টানতে পারেনি। আচার হচ্ছে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধের সেতু, সেইখানেই পদে পদে হিন্দু নিজেদের বেড়া তুলে দিয়েছে।”

(খ) “আমরা যে মুসলমানদের অথবা আমাদের দেশের জনসাধারণের যথার্থ হিতৈষী তাহার কোন প্রমাণ দিতে পারি নাই। তাহারা আমাদের হিতৈষীতায় সন্দেহবোধ করিলে তাহাদিগকে দোষী করা যায় না। আমরা যে দেশের সাধারণ লোকের ভাই তাহা দেশের সাধারণ লোকে জানেনা। এবং আমাদের মনের মধ্যে যে তাগের প্রতি ব্যাতৃভাব অত্যন্ত জাগরুক আমাদের ব্যবহারে এখনও তাহার কোন প্রমাণ নাই। আমরাই দেশের সাধারণ লোককে দূরে রাখিয়াছি, অথচ প্রয়োজনের সময় তাহারা দূরে থাকে বলিয়া রাগ করি।”

(গ) হিন্দু মুসলমানের পার্থক্যটাকে আমাদের সমাজে আমরা এতই কুশ্রীভাবে বেআব্রু করিয়া রাখিয়াছি যে, কিছুকাল পূর্বে স্বদেশী অভিযানের দিনে একজন স্বদেশী প্রচারক একগ্রাস জল খাইবেন বলিয়া তাঁহার মুসলমান সহযোগীকে দাওয়া হইতে নামিয়া যাইতে বলিতে কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করেন নাই। বাংলার মুসলমান যে এই বেদনায় আমাদের সঙ্গে এক হয় নাই তাহার কারণ তাহাদের সঙ্গে আমরা কোনদিন হৃদয়কে এক হতে দিই নাই।”

বাংলা ১৩১৫ সালের শ্রাবণ মাসে রবীন্দ্রনাথ লিখিত ‘সদুপায়’ প্রবন্ধ হতে ‘ক’, ইং ১৯১৪ সালে ‘সবুজপত্র’ পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের লেখা ‘লোকহিত’ প্রবন্ধ হতে ‘খ’ উদ্ধৃতি নেয়া হয়েছে।

ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমান সমস্যার সমাধান কি? জানতে চেয়ে ডাঃ কালিদাস নাগ যে পত্র লিখেছেন তারই উত্তর থেকে ‘গ’ উদ্ধৃতি, শ্রী সত্যেন সেনের পনেরই আগষ্ট পুস্তকের ১১২ পৃষ্ঠা ও ১২৩ পৃষ্ঠা থেকে নেয়া হয়েছে।

ভারতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, মিলন মৈত্রীর সেতু রচনায় স্বাধীনতা সত্য ইতিহাস প্রকাশের পরিপ্রেক্ষিতে আর একটি ব্যাপক বস্তু প্রয়োজনীয়, যা মানুষের মেজাজ ও মানবতা গঠনে এবং প্রয়োজনীয় সত্য তথ্যের পরিবেশনায় আর অবাস্তুর অসত্য বা অন্যায়ের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে অপরিহার্য, তা দৈনিক পত্রিকা। অবশ্য তা বাংলা ভাষায় একাধিক থাকলেও মুসলমানদের বড় তো দূরের কথা মাঝারি ধরনের নিরপেক্ষ নির্ভিক পত্রিকা নেই। অথচ আজকের দিনে শ্রমিক থেকে মন্ত্রী পর্যন্ত প্রত্যেকের মগজ পরিচালিত হয় কাগজের নির্দেশে। তাই চাই পারস্পরিক সহযোগিতা, নিজে বেঁচেও অপরকে বাঁচতে দেয়ার নীতিই হচ্ছে স্বচ্ছ ও সুন্দরতর পদ্ধতি।